সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা

GIFT

আরবী বিষয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

403660

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
403660

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

মো. আবদুল কাদির
এম.এ. (ঢাকা)
সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

আগষ্ট, ২০০৬ ইং

‘আরবী বর্ণমালা (الحروف الهجائية العربية)-এর বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র অভিসন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ء = ا	ঊর্ধ্ব কমা’	ز	যা	ق	ক.া
ب	বা	س	সা	ك	কা
ت	তা	ش	শা	ل	লা
ث	ছা	ص	স.া	م	মা
ج	জা	ض	দ.া	ن	না
ح	হ.া	ط	ত.া	و	ওয়া
خ	খা	ظ	জ.া	ة/ه	হা/হ্
د	দা	ع	‘আ	ي	ইয়া/য়া
ذ	য.া	غ	গা/ঘা		
ر	রা	ف	ফা		

403660

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আল-কোরআন, ৩০:১৫	:	প্রথম সংখ্যা সূরার দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের।
ই. ফা. বা.	:	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
ই. বি.	:	ইসলামী বিশ্বকোষ।
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
আ.	:	আলায়হিস্ সালাম।
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।
রহ.	:	রাহিমাহুল্লাহ।
হি.	:	হিজরী।
খৃ. পূ.	:	খৃষ্ট পূর্ব।
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ বা খৃষ্টীয়।
বাং.	:	বাংলা।
জ.	:	জন্ম।
মৃ.	:	মৃত্যু।
পৃ.	:	পৃষ্ঠা।
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য।
সং.	:	সংস্করণ।
খ.	:	খণ্ড।
ড.	:	ডক্টর।
অনূ.	:	অনূবাদ বা অনূবাদক।

403660

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি. (আলীগড়)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সূত্র..................

তারিখ ২১/৫/২০০৮ ই.

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মোঃ আবদুল কাদির কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত "সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

[signature] ২১/৫/২০০৮ ই.
(প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

যোগাযোগের ঠিকানা: ৩১/এফ, ঈসা খান রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৫৯/৪২৯৩, ৯৬৬১৯০০-১৯/৪২৯৩ (অফিস); মোবাইল: ০১৭১-২২১০৮১, ০১৭৫-০১৮৫৪২ (টিএন্ডটি কানেকশনসহ); ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩; E-mail: duregstr@bangla.net, Websit://www.univdhaka.edu

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা" শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

২১.৮.০৯ইং

(মো. আবদুল কাদির)
পিএইচ.ডি গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা" শীর্ষক আমার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আরবী সাহিত্যের একজন ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে এমনিতেই আরবী শব্দের প্রতি ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক, উপরন্তু হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের এতদ্বিষয়ে পারঙ্গমতা এবং আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগ করে তাঁদের অনবদ্য কাব্যসৃষ্টি আমার মনে কৌতুহল সৃষ্টি করে। আমি এতদ্বিষয়ের উপর গবেষণার লক্ষ্য স্থির করি এবং আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মহান তিন-দ্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহারের ধারাবাহিক বিন্যাস, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পড়াশুনা করি। গবেষণার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সে মোতাবেক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর উক্ত বিষয়ে প্রণীত একটি খসড়া আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক-এর সমীপে উপস্থাপন করি। তিনি খসড়াটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা যাচাই পূর্বক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য পেশ করার চূড়ান্ত অনুমোদন করেন।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক-তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা পদ্ধতিসহ সার্বিক বিষয়ে আমাকে অকৃপণভাবে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, এ জন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের সহধর্মিণী ড. সুলতানা রাজিয়া খানমকে যিনি আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে অভিসন্দর্ভটি রচনায় উৎসাহিত করেছেন।

স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কলা অনুষদের সভাকক্ষে আমার দু'-দু'টো সেমিনারে উপস্থিত থেকে যাঁরা আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি। তন্মধ্যে যাঁদের কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কলা অনুষদের মাননীয় ডীন, অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, আরবী বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক আ ত ম মুছলেহ উদ্দিন, অধ্যাপক আ ন ম আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. আ স ম আবদুল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, সহকারী অধ্যাপক জনাব যুবাইর মোঃ এহসানুল হক, ড.আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ও প্রভাষক জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। আমি তাদের প্রতি আবারো মোবারকবাদ জানাই। গবেষণাকর্মের শুরু থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাঁরা আমাকে ঋণী

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন, প্রফেসর ড. মু. আব্দুল মা'বুদ (বিভাগীয় চেয়ারম্যান) ও প্রফেসর ড.এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ফার্সী ও উর্দূ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া, ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর জনাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানসহ সকল শুভাকাংখী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ভীস্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল্লাহ খান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া, ড. মো. সিরাজুর ইসলাম, ড. সৌমিত্র শেখর, জনাব মো. হাকিম আরিফ ও জনাব বায়তুল্লাহ কাদেরীর কাছে, যাঁরা আমাকে বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে অভিসন্দর্ভটি রচনায় সহযোগিতা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন গ্রন্থাগার, ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত যে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমার গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

যার অনুপ্রেরণায় আমার গবেষণা কর্মের পথ চলা সে মহীয়সী নারী আমার শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী মোসাম্মৎ হুস্‌নুন নাহার বেগমের ঋণ শোধ হবার নয়। আমার শ্বশুর বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন পরিচালক, জনাব এ এম এমদাদুর রহমার এবং আমার মামা শ্বশুর বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক, জনাব মো. মাহবুবুল আলম আমাকে দুস্প্রাপ্য বই-পুস্তক সরবরাহ করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার মা.মোসাম্মৎ মাসুমা খাতুন গভীর রাতে ওঠে অভিসন্দর্ভের সফল সমাপ্তির জন্য নামাজ পড়ে দু'আ করেছেন তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রখ্যাত সূফী-সাধক সূফী আবদুস সালাম ও মাওলানা নাছির উদ্দিন সাহেবের প্রতি যাঁরা আমার সার্বিক কল্যাণের জন্য সব সময় দু'আ করেছেন।

আমার স্ত্রী মিসেস সাবাহ্ শবনম তাঁর অধ্যাপনা এবং সাংসারিক ব্যস্ততার মাঝেও আমার অভিসন্দর্ভের প্রুপ দেখা, স্ক্রিপ্ট পড়ে টাইপের কাজে সহযোগিতা করাসহ বহুবিধভাবে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আক্ষরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাই না। আমার একমাত্র কন্যা 'আতকি.য়া ফায়রোয (বারিষা) স্ক্রিপ্ট পড়ে বাবাকে অভিসন্দর্ভের কাজে সহযোগিতার করার ছোট্ট মন নিয়ে এগিয়ে এসেছে, তার প্রতি আমার স্নেহের অন্ত নেই। অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যস্ত থাকায় ছোট্ট নয়নমণি ছাকী.ফ্‌কে করেছি স্নেহ-বঞ্চিত। জানালার ওপার থেকে তার বাবা ডাক আমাকে বড় কষ্ট দিত, তাদের প্রতি কাঙ্ক্ষিত স্নেহ-বঞ্চনার স্মারক আমার এ গবেষণাকর্ম। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের সর্বাঙ্গীন সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমার স্নেহের ছাত্র মুহাম্মদ নুরে আলম বই-পত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রুপ দেখা পর্যন্ত সকল কাজে অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। পরিশেষে আমার জান্নাতবাসী পিতা মরহুম চাঁন বক্স মাষ্টার এবং আমার সম্মানিত শিক্ষক মরহুম মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, যাঁরা আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সারাটি জীবন আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেছেন।

বিনীত

আগষ্ট ২০০৬ ইং

মো. আবদুল কাদির
পিএইচ.ডি. গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা:	১-১৭
প্রথম অধ্যায় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রভাব	১৮-৮০
দ্বিতীয় অধ্যায় : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম	৮১-১০৬
প্রথম পরিচ্ছেদ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনকথা ৮১-৯৫	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যকর্ম ৯৬-১০৬	
তৃতীয় অধ্যায় : মোহিতলাল মজুমদারের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম	১০৭-১৪৯
প্রথম পরিচ্ছেদ: মোহিতলাল মজুমদারের জীবনকথা ১০৭-১২৭	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্যকর্ম ১২৮-১৪৯	
চতুর্থ অধ্যায় : কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম	১৫০-১৯৭
প্রথম পরিচ্ছেদ: কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকথা ১৫০-১৬৬	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম ১৬৭-১৯৭	
পঞ্চম অধ্যায় : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার	১৯৮-২৪৭
ষষ্ঠ অধ্যায় : মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার	২৪৮-২৮৭
সপ্তম অধ্যায় : কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার	২৮৮-৩৫০
অষ্টম অধ্যায় : সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল-এর আরবী শব্দ ব্যবহার: প্রকৃতি, শব্দগত তুলনা ও বৈশিষ্ট্য বিচার	৩৫১-৩৮২
উপসংহার:	৩৮৩-৩৮৪
গ্রন্থপঞ্জি:	৩৮৫-৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজকের এই ঐতিহ্যবাহী অবস্থানে আসার পূর্বে অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছে; প্রভাবিত হয়েছে বহু ভাষাগোষ্ঠী দ্বারা। বিশেষত আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রভাব চোখে পড়ার মতো। বাংলা ভাষা-ভাষী সকলেরই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রভাব কতটুকু এবং কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও জানা উচিৎ। আর এ প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই আমার "সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বাংলা ভাষার এখন যে রূপ দাঁড়িয়েছে, সূচনা পর্বে এমনটি ছিল না। তখন ছিল তার শৈশবকাল। তাই শব্দ ভাণ্ডার যেমন ছিল সীমিত, তেমনি প্রকাশ ক্ষমতাও ছিল সংকীর্ণ। এর দেহ গঠনে নেগ্রিটো-অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষার শব্দাবলী, আর্যদের বয়ে আনা মধ্য এশীয় ও বিশাল ভারত ভূমির জাতি-গোষ্ঠীসমুহের ব্যবহৃত ভাষা সমুহের শব্দ সম্ভার এবং সংস্কৃত ও গৌড়ী প্রাকৃত ভাষার বিপুল ঐশ্বর্যকে পুঁজি করে যে বিশাল ভান্ডার গড়ে তুলেছে তাকেই আমরা বলি আত্মীকৃত বাংলা। এ আত্মীকৃত বাংলা সমগ্র বাংলার অর্ধেকেরও বেশী। অর্থাৎ বাংলা ভাষার মোট সোয়া লক্ষ শব্দ ভান্ডারের মধ্যে প্রায় একাত্তর হাজার শব্দ উক্ত শ্রেণীভূক্ত।

আধুনিক কালে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণে বিদেশী শব্দ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এর প্রধানত কারণ বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমনের পর থেকে বিদেশী ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষায় আসতে শুরু করে। যে সব বিদেশী শব্দ কম-বেশি বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে তার মধ্যে প্রধান হল আরবী,ফার্সী, তুর্কী, পর্তুগীজ ও ইংরেজী এবং সামান্য কিছু ওলন্দাজ, ফরাসী ও চীনা ভাষা। ডক্টর মহম্মদ এনামুল হকের মতে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা শতকরা আটভাগ।[১]

ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ ইব্‌ন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর সমগ্র মুসলিম আমল[২] ও ঔপনিবেশিক শাসনের কিছুকালসহ প্রায় ছয় শতোর্ধ বছর (১২০৩-১৮৩৭ খৃ.) এ দেশের রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সী এবং আরবী ভাষায় রচিত আল-কোরআন ও আল-হাদিস ছিল মুসলিম শাসনে আইনের প্রধান উৎস। ফলে আরবী ও ফার্সী ভাষা এদেশের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপকভাবে মিশে যায়। তাছাড়া মোট বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মুসলিম বলে ধর্মীয় কারণেও তাদের আরবী ভাষা চর্চা ও

---

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮ খৃ.), পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

আরবী পরিভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। এ দু'কারণে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটে বিপুল সংখ্যক ফার্সী ও আরবী শব্দ। প্রখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে দীর্ঘ ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসনের ফলে প্রায় দুই হাজারেরও বেশী ফার্সী শব্দ বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ আড়াই হাজারেরও বেশী। আরবী-ফার্সীর এ প্রভাব বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাভাষা তার শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে এবং সারাটা মধ্যযুগ ধরে আরবী-ফার্সীর এ প্রভাব কার্যকর থাকে।

এ সকল শব্দভাণ্ডার বাংলা ভাষাকে শুধু সমৃদ্ধশালীই করেনি, বাংলা ভাষাকে করেছে অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষারূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। আরবী. ফারসী. তুর্কী, পর্তুগীজ. ইংরেজী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার শব্দসম্পদে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার আজ পরিপূর্ণ। এ সমুদয় শব্দ সম্পদের দ্বারা বাংলা আজ একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ভাষা। আরবী মূলীয় খাঁটি বাংলা শব্দের মধ্যে অন্যান্য ভাষা হ'তে বিশেষ করে আরবী ভাষা হ'তে ঋণগ্রহণ করেই বর্তমান বাংলা ভাষা যে একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী ভাষা হ'তে পেরেছে তা বলাই বাহুল্য।[৩]

এ কথা সত্যি যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বেশী দিনের পুরনো নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল 'চর্যাপদ'। 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামের চর্যাপদের সংকলন গ্রন্থে ২৩ জন কবির ৪৭টি পদ আছে। এসব পদকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এদের আবির্ভাবকাল বিবেচনা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৬৫০ খৃ. থেকে ১২০০ খৃ. পর্যন্ত এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেন নবম-দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে চর্যাপদের রচনা কাল নির্ণয় করেছেন। এ হিসেব অনুযায়ী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে, অপরদিকে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ কাল খৃষ্টীয় দশম শতকে।

চতুর্দশ শতাব্দে বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণ চাঞ্চল্য শুরু হয়। এটাই মূলত বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাকাল। এ শতাব্দীর প্রথম গ্রন্থ বড়ুচণ্ডী দাসের (১৩৭০-১৪৩৩ খৃ.) 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্য। শ্রীমান কৃষ্ণ, শ্রীমতি রাধিকা ও বড়াই এ তিন চরিত্র অবলম্বনে রচিত কাহিনী কাব্যটির বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এ সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালটা বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ বলে বিভাজিত। অবশ্য ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ মানতে নারাজ। মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যই পদ্যে রচিত। এ পদ্য সর্বস্ব কাব্য সাহিত্য প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। হিন্দু কবিদের রচনা আর মুসলিম কবিদের রচনা। হিন্দু কবিদের সাহিত্য ছিল মূলতঃ চার ধারায় প্রবাহিত: বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও

---

২. তুর্কী, ইরানী, পাঠান ও মোগল।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনচরিত। পক্ষান্তরে মুসলিম কবিদের সাহিত্য কীর্তি ছিল দু'ভাগে বিভক্ত: আরবী-ফার্সী-হিন্দী থেকে অনূদিত কাহিনী কাব্য ও ইসলাম ধর্মীয় কাব্য।

খৃ. চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী শাসন শুরু হলে সুলতানগণ এদেশকে নিজেদের স্বদেশ ভূমিরূপে গ্রহণ করে। ফলে এ দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়ে যায়। সে আগ্রহ চরিতার্থ হয় এ দেশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতে রচিত প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র-পুরাণ ও কাব্য গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে। অনুবাদের এ পর্বে উল্লেখ্যযোগ্য সাহিত্য কর্ম হচ্ছে; গৌড়ের সুলতানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু (জন্ম পনের শতকের মাঝামাঝি) কর্তৃক অনূদিত ভাগবত পুরাণের বিশেষ অংশ, বাংলার সুলতান হুসেইন শাহের আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্রপরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী কর্তৃক অনূদিত 'অষ্টাদশ মহাভারত' এবং গৌড়েশ্বরের আদেশে কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৮১-১৪৬১ খৃ.) কর্তৃক অনূদিত 'সপ্তকাণ্ড রামায়ন' প্রভৃতি।

মুসলিম কবিগণ বাংলা সাহিত্যকে দেবদেবীর উক্ত মাহাত্ম কীর্তনের গৎবাঁধা শিকল থেকে বের করে এনে নুতন গতি সঞ্চার করেন। সে সাহিত্যে তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি বর্ণাঢ্য রূপে প্রতিভাত হয়। শাহ্ মুহাম্মদ সগীর (জ. ১৩৮০ খৃ.) এ ধারার অন্যতম রূপকার। আরাকান রাজ সভায় যে ক'জন কবি কাব্য চর্চার সুযোগ লাভ করেন তাদের মধ্যে কবিত্ব শক্তি ও ভাবের মৌলিকত্বে কাজী দৌলত খাঁ (আ. ১৬০০-১৬৩৮ খৃ.) ও আলাওল (১৬০৭-১৬৮০ খৃ.) শ্রেষ্ঠ। আলাওল ছিলেন আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা হিন্দিসহ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের আরবী-ফার্সী-হিন্দী থেকে অনূদিত কাহিনী কাব্যগুলোর মধ্যে 'ইউসুফ-জুলেখা', 'চন্দ্রভান', 'চন্দ্রাবতী', 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল', 'পদ্মাবতী', 'মধুমালতী', 'মৃগাবতী', 'লাইলী মজনু', 'আলিফ লায়লা', 'গুলে আনোয়ারা', 'গুলে বকাওলী' ইত্যাদি প্রধান। ধর্মীয় বিষয়গুলো দ্বন্দ বহুল উপাখ্যান নিয়ে বর্ণিত; যেমন 'সোনাভান', 'আমির হামজা', 'জৈগুন', 'কারবালা', 'মকতুল হুসেইন', 'জঙ্গে বদর' ও 'শাহনামা' ইত্যাদি। আলোচনামূলক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মোহাম্মদী তত্ত্ব', 'নছিহতনামা', 'ইবলিসনামা', 'ফক্করনামা', 'ফালনামা', 'কিয়ামতনামা' 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'কাছাছুল আম্বিয়া' ইত্যাদি প্রধান।

মধ্যযুগের শেষ ভাগে তথা ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে আরবী-ফার্সী-উর্দু-হিন্দী মিশ্রিত পশ্চিম বঙ্গের হুগলী বন্দরে এক ধরণের গীতধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এটা বাংলা সাহিত্যে পুঁথি সাহিত্য বা দোভাষী সাহিত্য নামে পরিচিত। এ দোভাষী পুঁথি সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্টপূর্ণ সাহিত্য নিদর্শন। এ ধারার প্রাচীন পুঁথিকার ছিলেন ইসমাইল খাঁ গাজী বা বড় খাঁ গাজী। পরবর্তীতে এ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখেন শাহ্ গরীবুল্লাহ্ (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) ও সৈয়দ হামজা (আ. ১৭৩৩-১৮০৭ খৃ.)। সে

৩. আনিসুল হক চৌধুরী, বাংলার মূল (ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫খৃ.), পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের উল্লেখ্যযোগ্য পুঁথিগুলো হচ্ছে 'সত্যপীরের পুঁথি', 'জঙ্গনামা', 'আমীর হামজা', 'কারবালা কাহিনী' ইত্যাদি।[৪]

বাংলা সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে লোক সাহিত্য। বিষয়-বৈচিত্রে ব্যাপকতা এবং জীবনের সঙ্গে একাত্মতায় এটি একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলার লোক সাহিত্য বাঙ্গালী জীবনের প্রতিচ্ছবি। লোক সাহিত্যের নিদর্শনের বিভাজিত শাখাগুলো হচ্ছে- ছড়া, গান, গীতিকা, কথা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সংগৃহিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩ খৃ.) ও 'পূর্ব বঙ্গ গীতিকা' (১৯২৬ খৃ.) লোক সাহিত্যের প্রাচীন কীর্তি হিসেবে এগুলো আজো সমাদৃত। ড. আশুতোষ ভট্রাচার্যের মতে, লোক সাহিত্যের মৌখিক ধারার উপর ভিত্তি করেই মঙ্গল কাব্যের লিখিত ধারার সৃষ্টি হয়েছে।[৫]

এরপর যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খৃ.)-এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়। এদিকে প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খৃ.) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালী প্রসন্ন মিত্র তাঁর 'হুতোম পেঁচার নকশা' ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করলেন উৎকট কথ্য ভাষাবলম্বী একই রীতির বৈকল্পিক ঢং। যা পরিচিত হয়ে উঠে 'আলালী ভাষা' বা 'হুতোমী ভাষা' নামে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খৃ.) এ দু'ভাষার অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে একটি বৈকল্পিক গদ্যরীতি আবিস্কারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন এবং মেধা ও প্রতিভার সামর্থে এক সময় সন্ধান পেয়ে গেলেন তাঁর সে কাঙ্ক্ষিত ভাষার। তাঁর প্রবন্ধ-উপন্যাসে উঠে আসল এমন এক পরিচ্ছন্ন, সহজ-সরল ও পাঞ্জল ভাষা, যা না বিদ্যাসাগরী না আলালী কিংবা হুতোমী। সবার কাছে সে ভাষা সমাদৃত হল। এ যুগ সন্ধিক্ষণে বৈদেশিক সাহিত্য-ঐশ্বর্যস্নাত প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খৃ.)। তাঁর স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে যুগান্তকারী নাটক 'শর্মিঠা' (১৮৫৯ খৃ.), 'কৃষ্ণকুমারী', 'পদ্মাবতী', 'মায়াকানন' ইত্যাদি। বাংলা নাটকে মাইকেল ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩ খৃ.), মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খৃ.), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খৃ.), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খৃ.), ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭ খৃ.) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খৃ.) ছিলেন স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। বাংলা গদ্যের নির্মাণকালের আর একজন স্বার্থক রূপকার ছিলেন রামরাম বসু (আনু. ১৭৫৭-১৮১৩ খৃ.)। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০৫ খৃ.) আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগের এক অনুকরণীয় ভাণ্ডার হিসেবে আজো সাহিত্যিক মহলে সমাদৃত।

৪. কাজী দীন মুহাম্মদ, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য-গদ্য (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,১৯৯২), পুণঃমুদ্রণ, পৃ. ২২৪

৫. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং,১৯৯০ খৃ.) সং. ৪, পৃ. ২২৭-৩১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে অন্য এক কাব্য সাধনার পথ আবিস্কৃত হয় বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪ খৃ.)–এর হাতে। কবিগুরু তাঁকে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বাংলা গীতি কবিতায় 'ভোরের পাখি' বলেছেন। মাইকেল-বঙ্কিম সৃজিত জোয়ার পড়তে না পড়তেই রবি'র তেজ নিয়ে আবির্ভূত হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.)। তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হল রবীন্দ্র সামাজ্য।

রবীন্দ্র যুগেই সর্বাধিক সংখ্যক কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খৃ.), হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০ খৃ.), কালীদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫খৃ.), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪ খৃ.), যতীন্দ্র মোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮ খৃ.), জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪ খৃ.), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০ খৃ.) ও পল্লী কবি জসিম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খৃ.) প্রধান। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বকীয়তায় এবং স্বমহিমায় ছিলেন সমুজ্জ্বল। কবি-সাহিত্যিকদের কাছে তিনি ছন্দের যাদুকর ও অমর অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অপরদিকে মোহিতলাল মজুমদার প্রথম দিকে রবীন্দ্র-প্রীতির অর্ঘ গলায় পড়লেও শেষের দিকে রবীন্দ্র-সমালোচনায় ছিলেন মুখর। তিনিও সমালোচনার মত একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

অন্য দিকে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) আপন মাটি-মানুষ-স্বাধীনতাকে পুঁজি করে একাই শির উঁচু করে দাঁড়ান রবিন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে। তিনি একদিন বিনা নোটিশে এসে 'আল্লাহু আকবর' তকবীরের হায়দরী হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে বাংলা সাহিত্যের দূর্গ জয় করে বসলেন।[৬] বাংলা কাব্যে মাত্রাবৃত্ত মুক্তছন্দের প্রবর্তন এবং আরবী ছন্দ প্রয়োগ করে সাড়া জাগিয়ে তুললেন সমালোচনার আসরে। শিল্পোত্তীর্ণ গানের সংখ্যায় অতিক্রম করলেন বিশ্বের সকল রেকর্ড।

আরবী ভাষা একটি বিশ্বজনীন ভাষা। বাংলাভাষার সহিত আরবী ভাষার সম্পর্ক অতি প্রাচীন ও অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব হ'তে আরবী ভাষা বাংলায় বিভিন্নভাবে[৭] অনুপ্রবেশ করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলা ভাষার জন্মেরও অনেক আগে থেকে বাঙ্গালীর কথাবার্তায় আরবী শব্দমালা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরবী শব্দমালা বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যমটি ছিল

---

৬. আব্দুল মুকীত চৌধুরী, নজরুল ইসলাম:ইসলামী কবিতা (ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খৃ.), আমাদের কথা।
৭. ব্যবসা-বাণিজ্য, পীর-অলীর দাওয়াত ও মুসলমান রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরব বণিকদের আগমন। সুদূর আরব থেকে আগত বণিকদের সাথে পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলেই এমনটি হয়েছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, চীনা লেখকগণ ও আবুল ফজলের বর্ণনা মতে, চট্টগ্রাম গঙ্গার মোহনার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এর (চট্টগ্রাম) অবস্থানের দরুণ আরব বণিকগণ চট্টগ্রামের নাম দিয়েছিল 'সাত-আল-গঙ্গা', যা কালক্রমে চাটগাঁও বা চট্টগ্রামে রূপান্তরিত হয়।[৮] Robertson এর Ancient India নামক গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে- Arabian Language was understood and spoken in almost every seaport of any note " প্রতিটি উল্লেখ্যযোগ্য সামুদ্রিক বন্দরেই আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বর্তমান আঞ্চলিক ভাষার ক্রিয়া পদে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষারই অনুকৃতি; অধুনা চট্টগ্রামের বহু পরিবার নিজেদের আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করছেন। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকার নাম যেমন আলকবণ, সুলুকবহর, বাকালিয়া ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্যেরই প্রমাণ বহন করে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূল এলাকা অধিকতর আরবীয় প্রভাবযুক্ত। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর স্থানীয় উপভাষায় বহু আরবী শব্দ, বাগধারা ও ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতির সংমিশ্রণ রয়েছে। এমনকি চট্টগ্রাম অঞ্চলের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বাঙ্গালী কবিদের লেখায়ও আরবী শব্দমালা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। আজো অনেক আরবীয় প্রথা, এমনকি বহু আরবী খেলাধুলা পর্যন্ত সেখানে প্রচলিত আছে।[৯]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশের আরেকটি মাধ্যম ছিল ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অলী-দরবেশগণের অবাধ আগমন। খৃ. সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার শুরু করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর ও সংস্কারমুক্ত জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপকার। দুনিয়ার সমস্ত জাহেলী, শিরকবাদী চিন্তা-চেতনার বিলুপ্তি ঘটিয়ে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের সত্য, সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের যে গুরুদায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল , জীবদ্দশাতেই তিনি তা সমগ্র আরবে কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশে যাদের দান সর্বোতভাবে স্বীকার্য, তারা হলেন মুসলিম স্বাধীন সুলতানগণ। ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় থেকে শুরু

---

৮. ড. মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ৪৫

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

করে ইংরেজ আমলের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত (১২০৩-১৮৩৭ খৃ.) দীর্ঘ ছয় শতাধিক কাল ব্যাপী এ দেশের স্বাধীন সুলতানগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশের সুক্ষ্ম কাজটি সম্পন্ন করেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারত বর্ষের পাঞ্জাব সীমান্তে তুর্কী এবং ইরানীরা হানা দেয়। ১২০২ খৃ. নাগাদ বহিরাগত তুর্কী সেনাদের দ্বারা বাংলাদেশ বিজিত হয়। সেমেটিক রক্তের বিজয়ী তুর্কী শাসক ও তাদের অনুগামী আরব ও ইরানের বণিক, ধর্ম প্রচারক, আলেম-ওলামা ও সুফীগণ আরবী-ফার্সী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১০] তুর্কীরা ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমান আর সংস্কৃতিতে ফার্সী। তাঁরা তুর্কী ভাষায় কথা বলতেন, রাজনীতিতে ফার্সী এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন।[১১] এভাবে রাজার ভাষার প্রভাব প্রজাসাধারণের উপর পড়তে থাকে।

তুর্কী আমলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিদর্শন 'শূন্য পুরাণ'। ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পণ্ডিত কর্তৃক রচিত শূন্য পুরাণে বেশ কিছু আরবী ফার্সী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উক্ত শূন্য পুরাণের অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুস্মা' কবিতায় মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশের ফলে কিভাবে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী রাতারাতি ধর্মান্তরিত হয়েছে, তার কাল্পনিক চিত্র অংকিত হয়েছে এভাবে:

ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈল পেকম্বর
আদম হৈল শূল পানি।
গণেশ হৈল কাজী কার্ত্তিক হৈল গাজী
ফকীর হৈল যত মুনি।
....
আপনি চণ্ডিকা দেবী হিত হৈলা হায়া বিবি
পদ্মা বিবি হৈলা বিবি নূর।[১২]

তবে আরবী-ফার্সী প্রভাবের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের চর্চা না হলেও তূর্কী বিজয়োত্তর প্রথম দেড়শ' বছরকে বাংলা ভাষার ভিত্তি গঠনের এবং সাহিত্যের পটভূমি রচনার যুগ বলা যেতে পারে।

'শূন্য পূরাণের' পর ১৩৫০ খৃ. থেকে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত মধ্যযুগ। এ যুগের দ্বিতীয় কবি এবং মুসলমানী বাংলা সাহিত্যে আদি কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও সুলতান কর্তৃক অনুগৃহীত হয়েছিলেন। এ সময় শাহ্ মুহম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ইউসুফ

---

১০. ওয়াকিল আহমদ. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০২), ৩য়,সং. পৃ. ৯৭
১১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৭
১২. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ (ঢাকা:আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৭৭), পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

জোলায়খা' রচনা করেন। 'ইউসুফ জোলায়খা'র কাহিনী সংগৃহীত হয় মহাগ্রন্থ আল-কোরআন থেকে। এ ধর্মীয় ও রম্য উপাখ্যান বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে।[১৩] বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবির প্রথম গ্রন্থেই আরবী শব্দ ব্যবহারের বাহুল্যতা লক্ষণীয়:

কোরান কিতাব মধ্যে দেখিনু বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমৃত বিশেষ।।
কহিব কেতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ্ ভক্ত জন শ্রুতি ঘট ভরি।।[১৪]

মুসলমান কবিদের এ সকল অনবদ্য সৃষ্টি শিশু প্রায় বাংলা সাহিত্যকে তাদের বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য ও চিন্তাধারা দিয়ে সমৃদ্ধশালী করে তোলে এবং আরবী ও ফার্সী ভাষা থেকে বহু শব্দ, প্রবাদ ও ভাষা-পদ্ধতি আমদানী করে বাংলা ভাষায় এক অসাধারণ জীবনীশক্তি সঞ্চয় করেন। তাঁরা তাদের ভাষার সংগতি রক্ষার্থে এবং বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব তোলে ধরার প্রয়োজনে যথাস্থানে আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রয়োগ ঘটান। মুসলিম কবিগণ অনায়াসে আল্লাহ, খোদা, নবী, পয়গাম্বর, কোরান, হাদিস, কেতাব, আলেম, ফাজিল, রাসুলে খোদা, নূরে মোহাম্মদী, সওয়াল, জওয়াব, গুনাহ, মাফ, নেক, বদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।[১৫] মধ্য যুগে এমন কোন মুসলিম কবি পাওয়া যাবেনা যিনি তাঁর কবিতায় সচেতন ভাবেই আরবী শব্দ ব্যবহার করেননি।

মুসলমানদের ভাষা বিষয়ক ঐতিহ্যের প্রাচুর্য এবং ইহার শক্তিশালী প্রাণচাঞ্চল্য হিন্দুদেরকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে বাস্তবিকই কালক্রমে আরবী ও ফার্সী শব্দ এবং এর বাচ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের এরূপ একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে দাঁড়ায় যে, গোঁড়া হিন্দু কবিরাও এর ব্যবহার না করে পারেননি। কেননা তারা ঐ সকল সাবলিল ও প্রাণবন্ত শব্দসমুহের উপযুক্ত প্রতিশব্দ অন্যত্র খুঁজে পাননি।

পাঠান যুগের অবসানের পর ১৫৭৬ সালে বাংলায় মোগল রাজত্ব শুরু হয়। যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৭৫৭ খৃ. পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে। মোগল আমলে বাংলাদেশে ফার্সী ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রায় ১৮০ বছর ধরে বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফার্সী ভাষার চর্চা করতে থাকে। মুদ্রার পৃষ্ঠে ফার্সী, মসজিদ গাত্রে ফার্সী, গৃহ নির্মাণ লিপিতে ফার্সী, শাহী ফরমানে ফার্সী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফার্সী, রাজস্ব বিভাগে ফার্সী, শিক্ষা-দীক্ষা

---

১৩. এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা:পাকিস্তান পাবলিকেশ, ১৯৫৫), পৃ. ১০৪
১৪. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ , পৃ. ২০৪
১৫. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

ও আলাপ আলোচনায় ফার্সী দেদার চলতে থাকে। ফলে বিদ্যাবত্তা, চাক্‌রী-বাকরী এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও ফার্সী হয়ে উঠে।[১৬]

সে কালের কবিগণ আরবী-ফার্সী মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে কাব্য চর্চা করেছেন এবং আরবী-ফার্সী-বাংলা এ তিন এলেম অত্যাবশ্যক বলেও মন্তব্য করেছেন। এ তিনের কোনটা ঘাটতি হলে তার জীবনটাই বৃথা বলে তিরস্কারও করেছেন। সতের শতকের প্রসিদ্ধ কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খৃ.) আরবী ফার্সী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যে কথা বলে গেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য–

"আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান॥
আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিত।
ফারসী পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥
ফারসী পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
* * *
এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার"॥[১৭]

ফলে আরবী ও ফার্সী ভাষা মিশ্রিত বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা হল। ফলশ্রুতিতে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে, তৎসূত্রে সাহিত্যিক জীবনে বিভিন্নভাবে এর প্রভাব দেখা দিল। বাংলা ভাষা আরবী ও ফার্সী প্রভাব দুষ্ট হয়ে পড়ল। আঠারো শতকে বাংলার এরূপ ভাষা পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮ খৃ.) বলেন, বাংলা ক্রিয়ার সাথে সর্বোচ্চ সংখ্যক আরবী-ফার্সী বিশেষ্য মিশ্রিত করে যারা কথা বলেন তাঁরাই সূচারুরূপে বাংলা বলেন বলে গণ্য করা হয়। তাঁর ভাষায়– At present those persons are thought to speak this Compound idiom with the most elegence who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persion and Arabic nouns."[১৮]

এ শতকের দলিল দস্তাবেজে এরূপ ভাষারই প্রাধান্য ছিল। সুকুমার সেন একে হিন্দু-মুসলমানের কাজের ভাষা 'ব্যবহারিক বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন। ভারতচন্দ্র একেই 'যাবনী মিশাল' ভাষা

---

১৬. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ৯০
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন। তিনি নিজে 'আরবী-ফার্সী-হিন্দুস্থানী' মিশ্রিত এরূপ ভাষাই শিখেছিলেন। রসাল ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন না হলেও সকলে এ ভাষা বুঝে বলে তিনি দাবীও করেছেন। এ সম্পর্কে কবির উক্তি–

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিৎ যে আরবী ফারসী হিন্দুস্থানী ॥
পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না হবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবণী মিশাল ॥[১৯]

আরবী-ফার্সী মিশ্রিত এ ভাষা সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এটাকে 'মুসলমানী বাংলা' বলে অভিহিত করলেন। তিনি বেশ জোড়ালোভাবে বললেন– এটা বাংলার মুসলিম সমাজের কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়। এটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। তাঁর ভাষায়–

One of the features of `Musalmani Bengali' which demonstrates its rattur artificial cheracter, is the Frequent use of Hindustani words and forms.............which has no existance in the bengali as spoken by the Musalmans in the villages within the different dialectical arias. `Musalmani Bangali' thus savours of the mixed Bangali-Hindustani-Awadhi jargon which is heard in the bagars of Calcatta among Muhamedan working classes, cabmen, petty traders and others. who speaks Calcutta Bengali and Hindustani equally badly, and inlike the Muhamedan masses in the country have no proper dialect.[২০]

পুঁথি সাহিত্যের কবিগণ অবাধে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন। পুঁথি সাহিত্যকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ "মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য" বলেছেন। ১৩২৪ বাংলা সনের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন "যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার

১৮. Sunity Kumar chatterjee, The Origin and Development of the Bengali Language (Calcutta. 1926), Vol-1, PP.211-12
১৯. ওয়াকিল আহ‡মদ, বাংলা সাহি‡ত¨র পুরাব,,Ë , ৩য় সং, প,,. ৪০৯
২০ Kazi Abdul Mannan, The Emargence and Development of Dobhasi Literature in Bangla up to 1855 (Dhaka, 1974), PP. 50-8

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।"[২১]

শুধু মুসলমানরাই পুঁথি সাহিত্য লিখেছেন এমনটি নয়; হিন্দুরাও এ জাতীয় সাহিত্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। রাধাচরণ গোপ নামক জনৈক হিন্দু কবির একখানা কাব্য পাওয়া যায়। কাব্যের নাম 'ইমামের কেচ্ছা'। জঙ্গনামা জাতীয় এ কাব্যটির রচনাকাল আনুমানিক আঠারো শতক। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অনেক কবিই আরবী-ফার্সী জাত শব্দ প্রয়োগ করে একটি উপভোগ্য ও রসাল সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে মেতে উঠেছিলেন।

মোগল আমলের বাংলা সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র, মননশীলতা ও বিশালতার কথা চিন্তা করলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মোগল আমলকে 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করতে হয়।[২২] এ সময়ের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিগণ ইসলামী শরা-শরীয়ত, মুসলিম কাহিনী, মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন বা সূফিতত্ত্ব, মুসলিম প্রেমোপাখ্যান, মর্সিয়া সাহিত্য, ঐতিহাসিক কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর অসংখ্য কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে সায়্যিদ সুলতানের 'নবী বংশ', 'রসূল বিজয়', 'জ্ঞান চৌতিশা' ও 'সব-ই-মিরাজ'; নসরুল্লাহ খানের 'মুসার শওয়াল', 'শরীয়তনামা', 'জঙ্গনামা' ও 'হিদায়াতুল ইসলাম'; শেখ মুত্তালিবের 'কিফায়াতুল মুসল্লীন'; আব্দুল হাকিমের 'ইউসুফ-জুলেখা', 'নসিহতনামা', 'শিহাবুদ্দীননামা', 'নূরনামা', 'চারি-মাকাম-ভেদ', 'লালমতি-সয়ফুল মুলুক' ও 'কারবালা'; মুহম্মদ খানের 'হানিফার লড়াই', 'মকতুল হুসেন' ও 'কিয়ামাতনামা'; নওয়াজিশ খানের 'বয়ানাত' ও 'গুল-ই-বকাওলী'; হায়াত মাহমুদের 'হিতজ্ঞানবাণী', 'আম্বিয়াবাণী', 'জঙ্গনামা' ও 'সর্বভেদবাণী'; সাইয়্যেদ মরতুজার 'যোগ-কলন্দর'; শাহ গরীবুল্লার 'আমীর হামযা', 'সোনাভান', 'ইউসুফ-জুলেখা' ও 'মকতুল হুসেন'; সৈয়দ হামযার 'আমীর হামযা' (খ.২) ও 'জৈগুণের পুঁথি' এবং সৈয়দ নূরুদ্দীনের 'রাহাতুল কুলুব', 'দাকাইকুল হাকাইক', 'মুসার শওয়াল' ও 'কিয়ামাতনামা' ইত্যাদি।[২৩] এদের এ সকল কাব্য গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আরবী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যা লক্ষণীয়।

শেখ মুহাম্মদ কবীর (ষোড়শ শতকের শেষ দিকে) সম্ভবত গৌড়ের সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খৃ.)-এর প্রসঙ্গে বাংলা কোন পরিভাষা ব্যবহার না করে আরবী পরিভাষা 'সুলতান' ব্যবহার করেছেন:

শেখ কবীরে ভনে বহি গুণ পামরে জানে

২১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খ. ২, (মধ্যযুগ), পৃ. ২০৯
২২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

ছুলতান নাছিরা শাহা ভুলিছে কমল বনে ।[২৪]

সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.) তাঁর নবী বংশ কাব্যের রাসূলের অন্তিম শয্যা শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন:

আজরাইল মহামতি আইল বায়ুর গতি

রসূলের পুরীর দুয়ারে ।

রসূলের নাম ধরি ডাকি কহে ভক্তি করি

আজ্ঞা মাগে যাইতে অন্তঃপুরে ॥

পএগাম্বরে ফাতেমারে কহিলেন্ত দেখিবারে

দ্বারেত আসিছে কোন জন ।[২৫]

কবি শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬২৫ খৃ.) তাঁর 'রাসূল বিজয়' কাব্যে স্বীয় পীর শাহাদৌলার প্রশংসায় লিখেছেন:

শাহাদৌলা পীরজান আল্লার নিজ জাত ।

ফকিরেতে দম ধরে নূরের ছিফত ॥

চারি পীর চৌদ্দ খান্দান জেই জানে ।

শরীয়ত পন্থ জান সে সকল মানে ॥

শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারেফত ।

এই চারি মঞ্জিলে জান করে এবাদত ॥[২৬]

কবি আবদুল হাকীম (১৬২০-১৬৯০ খৃ.) তার 'নূরনামা' কাব্য গ্রন্থের 'বঙ্গবাণী' নামক কবিতায় লিখেছেন:

আরবী ফারছি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ ।

দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ ॥

আরবী ফাছি হিন্দে নাই দুইমত ।

যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত ॥[২৭]

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৭০
২৪. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ, পৃ. ১৭০
২৫. উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন:গদ্য ও পদ্য, (ঢাকা:গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৮৪), পৃ. ২০৯
২৬. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২১৯
২৭. মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য-কবিতা (ঢাকা:বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড, ১৯৮৪), পুণর্মুদ্রণ, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ শতাব্দের আর একজন প্রথিতযশা কবি 'সৈয়দ হামযা' তার 'জৈগুন-হানিফার যুদ্ধ' কাব্যে লিখেছেনঃ

হইল হানিফা পরে আল্লার রহম।
আপনা কুদরতে বন্ধ করে তারদম ॥
বাঘ বাচ্চা মারা যাবে আওরতের হাতে।
ফতে নাহি দিব আমি আওরতের জাতে ॥[২৮]

অষ্টাদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ তাঁর 'মকতুল হুসেন' বা 'জঙ্গনামা' পুঁথির 'শহীদে কারবালা' অংশে লিখেছেনঃ

যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
সের জুদা কৈল যদি এমামের তরে ॥
আরশ কোরশ লওহ কলম হইতে।
বেহেস্ত দোজখ আদি লাগিল কাঁপিতে ॥
আসমান জমিন আদি পাহাড় বাগান।
কাঁপিয়া অস্থির হইল কারবালা ময়দান ॥[২৯]

এ মধ্যযুগেই আরবী শব্দ ও রূপকল্পের ব্যবহার মুসলিম কবিদের ছাড়িয়ে ধর্মাশ্রয়ী কাব্য সাধক হিন্দু কবিদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু কবিগণও সেই মধ্য যুগ থেকেই মুসলমান রাজ সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে, মুসলমান রাজাকে সম্বোধন করতে গিয়ে, ইসলামী ভাবধারা, আদর্শ এবং কুরআন বা অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের উল্লেখ করতে গিয়ে, মুসলমান দরবেশ বা আলেমদের কথা বলতে গিয়ে, এমন কি নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনী কাব্যেও অসংকোচে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩০] যেমন–

ষোড়শ শতকের চণ্ডী মঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠতম কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর মঙ্গল কাব্যে মুসলমান প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরী করয়ে নমাজ।

---

২৮. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৬৯ বাং), পৃ. ২৯৯,৩০২
২৯. মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে-কবিতা, পৃ. ১৭
৩০. সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৯ বাং), শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

সোলেমানি মালাধরে জপে পীর পেগম্বরে

পীরের মোকামে দেই সাঁজ ॥[৩১]

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি দ্বিজ লক্ষণ তাঁর সংস্কৃত আধ্যাত্ম ও অদ্ভূত রামায়ণের সংমিশ্রণে রচিত পুরামাপের রামায়ণে (১৬৫৪ খৃ.) আরবী 'বিদায়' শব্দটি প্রয়োগ করেন এভাবে :

পিতৃ বোলে প্রভু রাম তুলিলেন তারে।

বিদায় হইল গুহা প্রণমি সভারে ॥[৩২]

কবি মানিক রাম গাঙ্গুলী তাঁর রচনায় (১৭৮১ খৃ.) আরবী 'নকল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

গীত বর ধর্মের গৌরব হবে বাড়া।

নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া ॥[৩৩]

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০ খৃ.) তাঁর অন্নদা মঙ্গলের একটি শ্লোকে আরবী 'মশাল' শব্দটির ব্যবহার করেছেন এভাবে:

দেখিযা সকল লোক মসাল নিবায়।

শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥[৩৪]

উল্লিখিত অসংখ্য উদাহরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, যেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত যাত্রা শুরু সেখান থেকেই আরবীর উপস্থিতি। ফলে এ সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অজু-গোসল, আদব-কায়দা, আশরাফ-আতরাফ, আসল-নকল, আনসার, ইনসাফ, ইনসান, ইজ্জত, ইবাদাত, ঈমান, ঈদ, ওয়াসিল, উযীর, নাযীর, উকিল-মোক্তার, হাকিম-মুনসেফ, এজলাস, কলম, কিতাব, কানুন, খবর, খাস, গরহাজির, গরীব, সালাম-কালাম, জবাব, জায়েয, জাহের-বাতেন, নিকাহ্-তালাক, তমীয, তা'যিম, মসজিদ-মাদ্রাসা, মাযার, দোকান, নগদ-বাকী ইত্যাকার শব্দগুলো যে আরবী ভাষার শব্দ এ কথাটিই যেন আজ আমরা ভুলতে বসেছি। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী বাদশাহ্, সুলতান ও নবাবদের দ্বারা শাসিত এ বৃহৎ বঙ্গে আরবী-ফার্সী ভাষা ও সংস্কৃতির সুদূর প্রসারী প্রভাব আজ সুস্পষ্ট।

শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকরাই তাঁদের সাহিত্য কর্মে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে স্বস্তি বোধ করেছেন তা নয়, অনেক হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের মাঝেও এ প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। এদের

৩১. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৫০
৩২. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ, পৃ. ১৮৩
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে রামরাম বসু (১৭০৭-১৮১৩ খৃ.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খৃ.), প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) (১৮১৪-১৮৮৩ খৃ.), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খৃ.) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) প্রমূখ স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ খৃ.) বইটিতে তিনি বিষয়োপযোগী আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার করেছেন এবং ষড়যন্ত্র কবলিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানী উপাদান বজায় রাখার পথ সুগম করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন।

টেকচাঁদ ঠাকুর বাংলা গদ্যের ভাষাগঠন পর্বেই তাঁর রচনায় স্বভাবসিদ্ধভাবে সমাজের আত্মীকৃত আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দাবলী প্রয়োগ করে গেছেন। কি হাস্যরস কি করুণরস সর্বত্রই বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ ছিল স্বতঃস্ফুর্ত। আলালী ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে কথ্য ভাষার অবাধ প্রয়োগ তাঁর আরবী-ফার্সী উপাদান ব্যবহারেও একই চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮ খৃ.) গ্রন্থে তিনি আরবী-ফার্সী শব্দের রসময় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্যারীচাঁদের ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলো যেমন– অছি, অম্বুরী, আমলা, উজু, একিদা, এজেহার, এত্তাহাম, এত্তেলা, এলাজ, এলেকা, ওক্ত, ওজর, ওতন, ওয়াজিব, কবজ, কবিলা, কাওয়াজ, কুদরত, গমি, তকরার, তজবীজ, তদারক, তসবিহ্, তসবীর, তহমত, ফয়তা, ফেরেক্কা, বদিয়ত, বরাত, বাব, মকরর, মদৎ, মশগুল, মহব্বত, মাফিক, মুসাফিরি, মোনাসেব, মৌজ, মৌত, রাতিব, রেয়াত হাবেলী, হারাম[৩৫] ইত্যাদি শব্দগুলির প্রতি তাকালেই প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের হাতে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য আমরা দেখেছি। তাঁদের এ সব শব্দ ব্যবহারের মূলে ছিল একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ। এঁদের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। কিন্তু মুসলিম অনুষঙ্গ চিত্রায়ণে এবং আরবী-ফার্সীজাত শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ঈর্ষণীয় সাফল্যের অধিকারী। নজরুলের হাতে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, বিপুল ব্যঞ্জনাময়, গভীর তাৎপর্যবাহী এবং বহুলাংশে সঠিক ও যথাযথ হয়েছে। নজরুল কাব্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে আরবী-ফার্সী শব্দের সুসম ব্যবহার। পয়ারের শোষণ ক্ষমতার মত নজরুলের শব্দ আত্মীকরণ ক্ষমতা অবিশ্বাস্য রকমের।

নজরুলের মৌল কবি-প্রতিভার স্পর্শে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে একটি বৈচিত্রময় দিগন্ত উন্মোচন করেছে। শৈশবে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে নজরুলের আরবী-ফার্সী শিক্ষা, লেটো দলে গান বাঁধার সময় হিন্দু পুরাণ ও কল্প-কাহিনীর সাথে গভীর পরিচয় এবং করাচীর

৩৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্যারিচাঁদ রচনাবলী (ঢাকা: কথাকলি,১৯৬৮), ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

সেনানিবাসে পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে ইরানী কবিদের কাব্যপাঠ তাঁকে কবি-প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছে।

নজরুল-কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারে ফার্সী সাহিত্যের প্রভাব যেমন লক্ষণীয়, তেমনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রভাবও কম নয়। আরবী-ফার্সী শব্দ সম্বলিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী 'পুথি সাহিত্যের সাথে নজরুলের প্রত্যক্ষ ও গভীর সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্ক তাঁর মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, রূপকল্প সৃষ্টিতে সর্বোপরি ভাষার সুখকর বিন্যাস ও আবহ রচনায় তারই পরিচয় দীপ্ত।

"সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহারঃ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা" শীর্ষক আমার অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা এবং উপসংহার ছাড়াও আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় : "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রভাব"–এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের ভৌগলিক ইতিহাস, বঙ্গ বা বাংলা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কিত আলোচনা, বাংলা ভাষার ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আরবী ভাষার ইতিহাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্ন যুগের রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতাসহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার এবং সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের সময় পর্যন্ত আরবী শব্দ প্রভাবিত বাংলা সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : "সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম"–এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনকথা ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যিক জীবন আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যিক জীবন আলোচনা করতে গিয়ে থিসিসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছাকৃতভাবেই কাব্য-সাহিত্য বিশ্লেষণে বেশির ভাগ আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : "মোহিতলাল মজুমদারের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম"–এ অধ্যায়টিও দু'টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মোহিতলাল মজুমদারের জীবনকথা ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয় যেহেতু কাব্য-সাহিত্য সেহেতু তাঁর কাব্য-সাহিত্য বিশ্লেষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : "কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম"–এ অধ্যায়টিও দু'টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকথা ও দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। থিসিসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কাব্য সাহিত্য হওয়ায় সাহিত্যকর্ম আলোচনা করতে গিয়ে শুধু তাঁর কাব্য-জগত সর্ম্পকেই আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : "সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার"-এ অধ্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাসমূহে ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলোই খুঁজে বের করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর কাব্যানুবাদও স্থান পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : "মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার"-এ অধ্যায়ে মোহিতলাল মজুমদারের কবিতাসমূহে ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলোই খুঁজে বের করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : "কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার"-এ অধ্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলোই খুঁজে বের করা হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ছাড়াও অসংখ্য গজল ও গান রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে তিনি প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত সকল আরবী শব্দ খুঁজে বের করলে ছোটখাট একটি অভিধান হয়ে যাবে। নজরুলের কাব্য-সাহিত্য আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়ায় আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর গজল-গানে ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলো পরিহার করেছি। কবিতায় ব্যবহৃত আরবী নামবাচক বিশেষ্যগুলোও যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করেছি। তবে যে দু-একটি নামবাচক বিশেষ্য আলোচনায় এসেছে তা শুধু অর্থের ব্যাপকতার কারণেই।

অষ্টম অধ্যায় : "সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল-এর আরবী শব্দ ব্যবহারঃ প্রকৃতি, তুলনা ও বৈশিষ্ট্য বিচার"-এ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধান তিন-দ্রষ্টা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের কবিতায় আরবী শব্দ ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট আলোচনাপূর্বক তাঁদের ব্যবহৃত আরবী শব্দসমূহের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর তিনজন কবির ব্যবহৃত আরবী শব্দসমূহের প্রকৃতি, শব্দগত তুলনা ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটির শেষ পর্যায়ে গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে আরবী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক তথ্যসূত্র গ্রন্থ ও সাময়িকীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের ইতিহাস বিশেষত সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার আগ্রহ একটা জাতির জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। জাতির আত্মপরিচয় লাভে এর আবশ্যকতাও নিতান্ত কম নয়। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দর্পণে নিজেদের চেহারা দেখে জাতি তার আপন আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে। অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেই ভবিষ্যতের লক্ষ্য স্থির করতে হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের সাংস্কৃতির প্রধান বাহন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আজকের এই ঐতিহ্যবাহী অবস্থানে আসার পূর্বে অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছে; প্রভাবিত হয়েছে বহু ভাষাগোষ্ঠী দ্বারা। বিশেষত আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রভাব চোখে পড়ার মতো। বাংলা ভাষা-ভাষী সকলেরই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রভাব কতটুকু এবং কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও জানা উচিৎ। আর এ প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই আলোচ্য বিষয়ে গবেষণার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রভাব আলোচনার পূর্বে আমাদের আত্মপরিচয় তথা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ্' ও বাঙ্গালী এবং বাংলা ভাষার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে জানা উচিৎ।

এক

যে কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং এর অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ জনসাধারণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করেছে। এদেশের প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র বর্তমানের ন্যায় অতীতেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী একটি দেশ। বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিস্তৃত জনপদের একটি অংশ মাত্র। এ অঞ্চলের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম রাজ্যের অংশ এবং মায়ানমারের আরাকানে বাংলা ভাষা-ভাষী লোক বাস করে।[১] বর্তমানে বিশ্বে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় ২১ কোটি।

ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় ১৯৭১ ইং সালে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপলাভ করে। বর্তমান বাংলাদেশের ঠিকানা পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ,

---

১. কে.এম.রাইসউদ্দিন খান, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ১৯৯৬), পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মায়ানমার (বার্মা) এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আয়তন ১,৪৫,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি।

বাংলাদেশের বর্তমান সীমানার সাথে প্রাচীন সীমানার হুবহু মিল করা দুরূহ ব্যাপার। এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিম বাংলার সবটুকু নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাত। আবার কখনো বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ়, পুণ্ডবর্ধন, গৌড় ও তাম্রলিপ্ত রাজ্য বুঝাত। 'মহাভারতের' যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকিকচ্ছ, সুস্ম, প্রসুস্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত এসব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল।[২]

জনপদ অর্থে 'বঙ্গ' শব্দটি প্রথম নজরে পড়ে ঋক, ঋযু, সাম, অর্থব এ চার খণ্ডে বিভক্ত ভারত বর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্র ও সাহিত্য যা সম্প্রদায় বিশেষের কাছে 'বেদ' বলে পরিচিত গ্রন্থের ঐতরেয় মুণি কর্তৃক রচিত 'ঋক'-এর 'আরণ্যক' শীর্ষক উপসংহার ভাগে।[৩] এর রচনা কাল খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্বের বলে মনে করা হয়। এ সময় 'বঙ্গ' একটি ক্ষুদ্র জনপদ রূপে বিবেচিত ছিল। খৃষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর পূর্বে সংঘটিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যসদেব রচিত 'মহাভারত', খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর পূর্ব হতে লোক সমাজে প্রচলিত রামচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে বাল্মীকী মুনী বিরচিত 'রামায়ন' কিংবা 'জৈনউপাংগ'সহ আরো অনেক প্রাচীন সাহিত্যে 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সে থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গভূমি 'বঙ্গ', 'পুণ্ড্র', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'সুক্ষ', 'ব্রক্ষ', 'তাম্রলিপ্ত', 'সমতট' প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক এ জনপদগুলোকে 'গৌড়' নামে একতাবদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায়।[৪] এরপর ইতিহাসের মধ্য যুগে এসে মোগল সম্রাট মহামতি আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে দেশ অর্থে 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ্' শব্দ ব্যবহার করেন।

হিন্দু আমলে 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ্' বল্‌তে নদ-নদী বেষ্টিত বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। এ সময় বাংলা, রাঢ়, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, লক্ষণাবতী ও গৌড় ইত্যাদি নামে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে

---

২. ফজলুল হাসান ইউসুফ, বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ১; আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি (ঢাকা:বর্ণায়ন,২০০২ খৃ.), পৃ. ১১-১৮

৩. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃ.১৩

৪. ডক্টর মুহম্মদ এনোমুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিচিত ছিল। ড. আর সি. মজুমদারের মতে– পাল রাজাদের সময়ে বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাকে নির্দেশ করা হত। পক্ষান্তরে ড. এইচ. সি রায় চৌধুরীর মতে– পাল ও সেনদের 'বঙ্গ' বলতে বাংলার একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলকে বুঝাত। মুসলিম শাসনামলের প্রথম দিকেও একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত ছিল।

মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'তাবাকাত-ই-নাসিরিয়ার' বহু স্থানে 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ করেন। যেমন বখতিয়ার খিলজীর বিহার বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন– "বিধর্মীদের হৃদয়ে লাখনৌতি ও বিহার রাজ্যে এবং বঙ্গ ও কামরূপ রাজ্যে তিনি পূর্ণ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি করেন।"[৫] মিনহাজ, পূর্ব ভারতের ভৌগোলিক বিভাগ এবং বিভিন্ন নামের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং 'বঙ্গ' বলতে তিনি বাংলার পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলকে মনে করতেন।

'বঙ্গ' নামের উৎস নিয়ে কয়েক ধরণের মতভেদ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এবং আর্য বংশোদ্ভূত ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 'বঙ্গ' নামের উৎস সম্পর্কে আর্য বংশোদ্ভুত হিন্দু লেখকগণ যে মতটি গ্রহণ করেন তা হল- মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত আছে যে "ক্ষত্রিয়রাজ 'বলি' নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি একদিন স্নান করতে এসে এক অন্ধ ঋষিকে জলে ভেসে যেতে দেখলেন। ঋষিকে সযত্নে স্বীয় ঘরে এনে অতিশয় ভক্তির সাথে তার সেবা করতে লাগলেন। অনন্তর রাজা জানতে পারলেন ইনিই মহাশক্তি সম্পন্ন দীর্ঘতমা ঋষি। রাজা দীর্ঘতমা ঋষিকে সন্তুষ্ট করে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করার জন্য রাণীকে তার নিকট পাঠান। ঋষিবর রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন– তোমার আদিত্যতুল্য তেযস্বী পাঁচপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। সে পুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। আর এ ভূ-মণ্ডল তাদের স্ব-স্ব নামে বিখ্যাত হবে।"[৬]

মুসলিম পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, সৃষ্টির আদিতে মানব জাতিকে এক গোষ্ঠিতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে– "সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভূক্ত ছিল।"[৭] পরবর্তীকালে জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধির ফলে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল-কোরআনে আরো বলা হয়েছে– "আর সমস্ত মানুষ একই

---

৫. মিনহাজ-ই-সিরাজ (অনু. আ. কা. ম. জাকারিয়া), তাবাকাত-ই-নাসিরী (ঢাকা, ১৯৮৩), পৃ.২১

৬. অঙ্গ=বর্তমান ভাগলপুর, পুণ্ড্র=উত্তরবঙ্গ, সুহ্ম=পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্গ=দক্ষিশ ও পূর্ববঙ্গ, কলিঙ্গ=উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগ। (বিভূষণ ভট্টাচার্য, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, কলকাতা, অশোক পুস্তকালয়, পৃ.৩৮)

৭. আল-কোরআন, সুরা-২ আয়াত-১১৩

Dhaka University Institutional Repository

উম্মতভূক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে।"[৮] আল-কোরআন ও তাওরাতের ভাষায় আজ থেকে সাড়ে সাত হাজার বছর পূর্বে "হযরত নূহ (আ.)-এর সময় এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়।"[৯] উক্ত প্লাবন থেকে এ উপমহাদেশও বাদ পড়েনি।[১০] এ মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আ.)-এর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর পরিবারবর্গ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। যে সব অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করেন, তাদের নামানুসারে সে অঞ্চলের নাম রাখা হয়।[১১]

গোলাম হুসায়ন সলীমের বর্ণনা মতে– "হযরত নূহ (আ.)-এর এক ছেলের নাম ছিল হাম; হামের পুত্র হিন্দ; হিন্দের পুত্রের নাম বং। বং ও তার সন্তানেরা এতদঞ্চলে বসতিস্থাপন করেছিল বলেই এ জনপদের নাম হয় বঙ্গ।" তিনি আরো বলেন– "হিন্দের পুত্র 'বঙ্গ'-এর প্রশংসনীয় চেষ্টায় বাংলা অঞ্চলে জনবসতি স্থাপিত হয়। তাঁর বংশধরেরা এ অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও সুন্দর করেন এবং এ দেশ শাসন করেন।"[১২]

মুসলিম পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ব্রাক্ষণ আরণ্যক এবং রামায়ন মহাভারতের রচনাকাল যদিও খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ববর্তী এক হাজার বছরের মধ্যে বলেই অধিকাংশের ধারণা, তবুও এ সব গ্রন্থ রচনার অনেক আগেই যে এ অঞ্চলে কৌম সমাজ আর কৌম চেতনার বিকাশ ঘটেছিল, তা নিশ্চিত। কাজেই 'মহাভারতের' বক্তব্যটি এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত বলে মনে হয়।[১৩] ব্রাত্যজনের চরিত্র হননের জন্য এটি একটি চিত্তাকর্ষক ব্রাক্ষণ্য প্রচার।[১৪]

'বাঙ্গালাহ্' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথম ব্যাখ্যা দান করেন আবুল ফজল। তিনি বলেন– The original name of bangalah was Bang. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in hight and twenty in breach throughout the province which were called el. From the suffix, this name Bangalah took its rise and currency.[১৫] আবুল ফজলের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা যে, 'বঙ্গ' ই 'বাঙ্গালাহ' নামে

---

৮. আল-কোরআন, সুরা-১০, আয়াত-১৯
৯. আল-কোরআন, সুরা-১১, আয়াত-৭১; তাওরাত শরীফ, ১ম খণ্ড, সৃষ্টি কিতাব
১০. মনসুর মুসা সম্পাদিত বাঙলাদেশ (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪), পৃ.৪৬
১১. গোলাম হুসায়ন সলীম (অনুঃ আকবর উদ্দীন), বাঙলাদেশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,১৯৭৪),পৃ. ১৬
১২. গোলাম হুসায়ন সলীম, বাঙলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮
১৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অর্থনীতিক ভূ-গোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮), পৃ.১
১৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,১৯৮৫), পৃ.১৩
১৫. আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, ২য় খ. পৃ.১২০, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স,১৯৯৮), ২য়- সং, পৃষ্ঠা-১০

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত হয়েছে। 'রিয়াজ-উস-সালাতীনে'ও এ অভিমত পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।[১৬] রমেশ চন্দ্র মজুমদার আবুল ফজলের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন– 'বঙ্গ' দেশের নাম হতে 'আল' প্রত্যয় যোগে অথবা অন্য কোন কারণে 'বঙ্গাল' বা 'বাংলা' নামের উদ্ভব হয়েছে ইহা স্বীকার করা যায় না। ....বঙ্গাল দেশের নাম হতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের নাম বাংলা হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১৭] পক্ষান্তরে আবদুল করিম বলেছেন–"প্রাচীনকালে বা কোনকালেই 'বঙ্গাল' নামে আলাদা কোন দেশ বা ভূ-ভাগ ছিল না।[১৮]

আবদুল মান্নান তালিব তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' নামক বইতে বলেন– বঙ্গাল নামে কোন দেশ বা ভূ-খণ্ড না থাকলেও বঙ্গাল শব্দের প্রচলন ছিল। "সেমেটিক ভাষায় আল অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙাল বা বঙ্গাল (অর্থাৎ বং-এর বংশধর) শব্দের উৎপত্তিটাকে উপেক্ষা করা যায় না।[১৯]

গিয়াসউদ্দীন বলবনের সময় থেকে 'বাঙ্গালাহ' নাম মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত হয়। বারণী সর্ব প্রথম মুসলিম লেখক যিনি 'বাঙ্গালাহ' নাম ব্যবহার করেন। তিনি 'বাঙ্গালাহ' বলতে বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের উল্লেখ করেন।[২০]

প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইব্নে বতুতার ভ্রমণকালে (১৩৪৫-৪৬ খৃ.) 'বাঙ্গালাহ' বলতে পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলকেই বুঝাত। সুলতান হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের সময় থেকে এ নামের বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয় এবং সমগ্র বাংলাদেশ 'বাঙ্গালাহ' ও অধিবাসীরা 'বাঙ্গালী' হিসেবে অভিহিত হয়। এর ফলে এ দেশে রাজনৈতিক. ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্য স্থাপিত হয়। বাঙ্গালী একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) সবগুলো বাংলা ভাষী অঞ্চল নিয়ে 'সুবা-ই-বাঙ্গালাহ্' নামে একটি ঐক্যবদ্ধ 'বঙ্গ' প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব সিরাজুদ্দৌলার আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বাংলাদেশ। ঔপনিবেশিক আমলে (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃ.) 'divide and rule' নীতির ফলে ঐক্যবদ্ধ বঙ্গদেশে পুনর্বিভক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। শাসনতান্ত্রিক সুবিধা ও সাম্প্রদায়িক

---

১৬. গোলাম হুসায়ন সলীম, বাঙলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ..১৬
১৭. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ (কলকাতা, ১৯৮১), ১ম খ. পৃ-২,
১৮. ডক্টর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ-১৭
১৯. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃ.-১২
২০. ড. মুহম্মদ আবদুর রহীম প্রণীত ও মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃষ্ঠা-১-৩

Dhaka University Institutional Repository

সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯০৫ খৃ. লর্ড কার্জন বাংলা প্রেসিডেন্সি ভেঙ্গে উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১১ খৃ. বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হয়ে গেলেও 'বঙ্গ' ভূমিগুলো পুনঃ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। এ সময় বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশের মর্যাদা পেয়ে যায়। আসাম পৃথক প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পূর্ববঙ্গ, দার্জিলিং ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে গঠিত হয় মূল বঙ্গ প্রদেশ। এর ফলে বাংলা ভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়াল পাড়ার একটি অংশ আসামে থেকে যায়; একই ভাষা-ভাষী আরো কিছু অঞ্চল চলে যায় বিহার ও ছোটনাগপুরে। পরে নিখিল ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে তিরিশের দশকে উদ্ভব ঘটে অঞ্চল ভাগাভাগি বিষয়ক ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতি তত্ত্বের। ১৯৪০ খৃ. লাহোরে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডন করে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি প্রস্তাবাকারে উত্থাপিত হয়। তদনুযায়ী ভৌগোলিক রূপরেখার ভিত্তিতে প্রথমে ১৯৪৭ খৃ. পূর্ব বঙ্গ এবং ১৯৫৬ খৃ. পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্ত র্ভুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আজকের বাংলাদেশ। ১৯৭১ খৃ. এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এ পূর্ব পাকিস্তানই স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়।

দুই

পৃথিবীর আরো অনেক জাতির ন্যায় বাঙালী জাতির আদি ইতিহাসও অনেকটা অস্পষ্ট। ঠিক কবে থেকে এখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল তার সুস্পষ্ট ইতিহাস আজো অজানাই রয়ে গেছে। তবে গোলাম হুসায়ন সলীমের মতে– প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর পূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ের মহাপ্লাবনের পর তাঁর প্রপৌত্র বং ও তার বংশধরগণ এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন এবং ক্রমে এখানে বঙ্গ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে।[২১] গ্রীক লেখকদের বর্ণনা মতে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে (খৃ.পূ. ৩২৭) এ দেশে গংগারিডই নামে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। এ গংগারিডই রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত অক্ষণ্ন ছিল। অনেকে বলছেন, গংগারিডই রাজ্যটিই মুলত বঙ্গ রাজ্য ছিল।[২২]

বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও নব্য প্রস্তর যুগের এবং তাম্র যুগের যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকেও অনুমিত হয় যে, প্রস্তর ও তাম্রযুগেও এ দেশে মানুষের বসতি ছিল। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বেদ যুগ তথা খ্রিষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত আর্যদের সাথে

---

২১. গোলাম হুসায়ন সলীম, বাঙলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮
২২. বাংলাদেশের ইতিহাস, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য (ঢাকা:বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড,১৯৮৪),পৃষ্ঠা-১২

বঙ্গবাসীর কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। কারণ মধ্য এশিয়ার অভিবাসিরা বেদ যুগের পরেই এ অঞ্চলে আসতে শুরু করে। তাছাড়া মূল ঋগ্বেদসহ অপরাপর বৈদিক গ্রন্থাদিতেও ঐ সময়ের বঙ্গীয় নরনারীকে অনার্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সূচনা পর্ব থেকেই বাঙালী জাতির সঠিক ধারাবাহিক ইতিহাস জানা না গেলেও প্রায় ছয় হাজার বছরের যে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা যায় তাতে একথা নিশ্চিত যে, বর্তমান বাঙ্গালী জাতি আর্যতো নয়ই অন্য কোন একক জাতি-গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় থেকেও উদ্ভূত নয়।

ভূগোলের এ অংশে উল্লেখিত ছয় হাজার বছর আগে এ অঞ্চলে নিগ্রোদের মত দেহ গঠন বিশিষ্ট এক আদিম জাতি বাস করতো। আজকের ইতিহাস যাদেরকে চিহ্নিত করেছে "নেগ্রিটো" বলে। ঐ সময় নতুন করে ইন্দোচীন হতে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে অষ্ট্রিচ জাতি। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এ জাতি আদিবাসী নেগ্রিটোদের চেয়ে উন্নততর ছিল বলে নেগ্রিটোরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এদের মোকাবেলায় টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়। এ উভয় সম্প্রদায়ের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় নবতর জাতি-গোষ্ঠি। আজকের আদিবাসী বলে পরিচিত কৌল, ভীল,সাঁওতাল,মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে তাদের স্মৃতি আজো টিকে আছে।

অষ্ট্রিকদের আগমনের কাছাকাছি সময়ে অথবা আরো কিছুকাল পরে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু অঞ্চল হতে আগমন ঘটে দ্রাবিড় জাতির। এ জাতির সাথে পূর্ববর্তী অষ্ট্রিক ও নেগ্রিটো জাতিদ্বয় মিশে গিয়ে রূপান্তর ঘটে আর এক নতুন জাতির। যারা আদিবাসী বাঙ্গালীর প্রধান দুই অংশের প্রথমাংশ, প্রাক আর্য বা অনার্য বা আর্যতর জনগোষ্ঠি। পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতা এদেরই কীর্তি। খনন কার্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত হরোপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর রাজ প্রাসাদের ধ্বংস চিহ্ন মূলত দ্রাবিড় সমাজের রাষ্ট্র ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে।

দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রলুব্ধ হয়ে আর্য জাতি ভারত বর্ষে আগমন করে। বাংলায় এদের আগমন ঘটে আলেকজাণ্ডারের ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পর খৃ. পূ. ৩২২ অব্দে মুরার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর। আনুমানিক ৩২০ খৃ. পাটনায় প্রথম গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকেই বাংলায় আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়তা লাভ করে এবং দীর্ঘ পাঁচশ' বছর ব্যাপী আর্যায়ন কালে এরা দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাকে সমুলে ধ্বংস করে দিয়ে সমগ্র ভারত বর্ষে নিজেদের পেশী শক্তির অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। এরাই বাংলাদেশের কথিত আদিবাসী বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুই অংশের শেষাংশ আর্য-নরগোষ্ঠি। এরপর বাংলায় আগমন ঘটে ভোটচীনীয় জনগোষ্ঠির। শক্তিমান আর্যদের দাপটে এরাও সমাজে নিজেদের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ হয়। মিশে যায় আর্যদের অন্যায় অত্যাচারে পিছিয়ে পড়া অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠির সাথে। বর্তমান গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা প্রভৃতি উপজাতি এদেরই স্মৃতি বহন করে।

তিন শতাব্দীরও অধিককাল (৩২০-৬৩৭ খৃ.) সাফল্যের সাথে রাজত্ব করার পর ৬৩৭ খৃ. মহাপরাক্রমশালী সম্রাট অশোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গুপ্ত শাসনের অবসান হয়। এরপর দীর্ঘ এক শতাব্দীরও অধিককাল (৬৩৭-৭৫৬ খৃ.) সমগ্র বাংলায় এক চরম অরাজকতা বিরাজ করে এবং ৭৫৬ খৃ. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ অরাজকতা প্রশমিত হয়। আনুমানিক ৮৬১ খৃ. দেবপালের মৃত্যুর পর গোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুশৃংখল পাল বংশের পতন শুরু হয় এবং ১১২৪ খৃ. রামপালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলার দীর্ঘ স্থায়ী রাজবংশের অবসান ঘটে। পরবর্তী একশ' বছর বাংলা শাসন করে কর্ণাটক থেকে আগত হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন বংশ। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, এরাও রাংলাদেশে একটি অভিবাসী গোষ্ঠী। ১২০৩ খৃ. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক লক্ষণসেনের রাজধানী নদীয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আগমন ঘটে আর একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতিগোষ্ঠীর, তার নাম হল মুসলিম জাতি।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তুর্কী, পারসিক, আফগান ও পাঠান প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোক ব্যাপকভাবে বাংলায় আসতে থাকে। এর আগে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দিকে ইসলাম প্রচার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করে সেমেটিক নরগোষ্ঠীর আরবরা। এদের সাথে আসে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় হাবশীরাও। ধর্ম প্রচারের মত মহৎ চেতনাকে বুকে নিয়ে অধিক সংখ্যক বিদেশী এদেশে স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে থেকে যায়। এর ফলে বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর মাঝে এক সাথে অনেকগুলো নরগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ও মিশ্রণ ঘটে। এভাবে প্রায় ছ'হাজার বছরব্যাপী সংঘটিত অভিবাসন-মিশ্রণ-রূপান্তর-গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে গঠিত হয় আজকের বাঙ্গালী জাতি। সুতরাং বলা যায়, বাঙ্গালী আক্ষরিক অর্থেই একটি সংকর জাতি।[২৩]

তিন

বঙ্গ বা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের ন্যায় বাংলা ভাষার ইতিহাস কিন্তু অতটা প্রাচীন নয়। তবে অস্পষ্টতা এই যে কখন, কবে, কোথায় যে তার জন্ম হয়েছিল তা বলা মুশকিল। তাই তো ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বলতে শুনি-"জানিনা কতদিন বঙ্গ বাণী জন্মিয়া ঘরের কোণে

২৩. চৎড়ভ.অ.ত.গধহভড়বফ, অ হযড়ৎঃ যরংঃড়ৎু ড়ভ ঃযব ড়িংষফ (গড়ংপড়ি, চৎড়মৎবংং চঁনষরংযবৎং, ১৯৭৪), ১ংঃ উফহ, ঠড়ষ.১, ঢ়ঢ়. ৪১-৫

Dhaka University Institutional Repository

লাজুক বধুটির মত নিরিবিলি বাস করিয়াছিল। সে দিন বাংলার অতি স্মরণীয় সুপ্রভাত, যে দিন সে সাহিত্যের বিস্তীর্ণ আসরে দেখা দিল।"[২৪]

বাংলা ভাষার এখন যে রূপ দাঁড়িয়েছে, সূচনা পর্বে এমনটি ছিল না। তখন ছিল তার শৈশবকাল। তাই শব্দভাণ্ডার যেমন ছিল সীমিত, তেমনি প্রকাশ ক্ষমতাও ছিল সংকীর্ণ। এর দেহ গঠনে নেগ্রিটো-অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ভাষার শব্দাবলী, আর্যদের বয়ে আনা মধ্য এশীয় ও বিশাল ভারত ভূমির জাতি-গোষ্ঠীসমুহের ব্যবহৃত ভাষা সমুহের শব্দ সম্ভার এবং সংস্কৃত ও গৌড়ী প্রাকৃত ভাষার বিপুল ঐশ্বর্যকে পুঁজি করে যে বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে তাকেই আমরা বলি আত্মীকৃত বাংলা। এ আত্মীকৃত বাংলা সমগ্র বাংলার অর্ধেকেরও অধিক। অর্থাৎ বাংলা ভাষার মোট সোয়া লক্ষ শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে প্রায় একাত্তর হাজার শব্দ উক্ত শ্রেণীভূক্ত। বাংলা ভাষা সর্বাধিক ঋণ গ্রহণ করেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। এ ভাষার ঋণের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বলে ধারণা করা হয়।

আধুনিক কালে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণে বিদেশী শব্দ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এর প্রধানত কারণ বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমনের পর থেকে বিদেশী ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষায় আসতে শুরু করে। যে সব বিদেশী শব্দ কম-বেশী বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে তার মধ্যে প্রধান হল ফার্সী, আরবী , তুর্কী, পর্তুগীজ ও ইংরেজী এবং সামান্য কিছু ওলন্দাজ, ফরাসী ও চীনা ভাষা। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকের মতে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা শতকরা আটভাগ।[২৫]

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর সমগ্র মুসলিম আমল[২৬] ও ঔপনিবেশিক শাসনের কিছুকালসহ প্রায় ছয় শতোর্ধ বছর (১২০৩-১৮৩৭ খৃ.) এ দেশের রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সী এবং আরবী ভাষায় রচিত আল-কোরআন ও আল-হাদিস ছিল মুসলিম শাসনে আইনের প্রধান উৎস। ফলে আরবী ও ফার্সী ভাষা এদেশের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপক ভাবে মিশে যায়। তাছাড়া মোট বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মুসলিম বলে ধর্মীয় কারণেও তাদের আরবী ভাষা চর্চা ও আরবী পরিভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। এ দু'কারণে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ ঘটে বিপুল সংখ্যক ফার্সী ও আরবী শব্দ। প্রখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে দীর্ঘ

২৪. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১৪
২৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৩
২৬. তুর্কী, ইরানী, পাঠান ও মোগল।

ছয়শ' বছরের মুসলিম শাসনের ফলে প্রায় দুই হাজারেরও বেশী ফার্সী শব্দ বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ আড়াই হাজারেরও বেশী। আরবী-ফার্সীর এ প্রভাব বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাভাষা তার শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে এবং সারাটা মধ্যযুগ ধরে আরবী-ফার্সীর এ প্রভাব কার্যকর থাকে। তাছাড়া সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনামলের (১২০৩-১৭৫৭ খৃ.) অধিকাংশ শাসকই ছিলেন তুর্কী মুসলমান।[২৭] ফলে এ দেশের সাথে উল্লেখযোগ্য হারে তুর্কী যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় চার শতাধিক তুর্কী শব্দ স্থায়ী নিদর্শন হিসেবে বাংলা ভাষার সাথে মিশে যায়।

মুসলিম শাসনের মধ্যেই এদেশে আগমন করে ইউরোপীয় বানিয়া গোষ্ঠী। ১৫১৬ খৃ. সর্ব প্রথম ইউরোপীয় পর্তুগীজরা ভারতের গোয়ায় এসে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। শক্তিশালী সেনা ও নৌ শক্তির অধিকারী পর্তুগীজরা ষোড়শ শতকের চল্লিশের দশকে দল্লীশ্বর শরশাহের বরুদ্ধে াংলার সুলতান মাহমুদ শাহকে সহযোগীতার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বন্দরে কুঠি স্থাপনের সুযোগ লাভ করে এবং নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৪-১৬৮৮ খৃ.) বাংলা হতে এদের প্রস্থান ঘটে। ১৬৫৩ সালে বাংলার চুঁচুড়া, বালেশ্বর, কাসিমবাজার ও বরানগর প্রভৃতি এলাকায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে হল্যান্ডের ওলন্দাজরা। এরপর ১৬৭৬ খৃ. 'দিনেমার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে ডেনমার্কের কিছু লোক শ্রীরাম পুরে এসে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেএবং ১৮৪৫ খৃ. এরা এদেশ থেকে বিদায় নেয়। এরপর মহা সমারোহে আগমন ঘটে ইংরেজদের। এরা ১৬৩৩ খৃ. বাংলার হরিহরপুর ও বিহার সীমান্তস্থিত বালেশ্বরে, ১৬৫১ খৃ. হুগলীতে, ১৬৫৮ খৃ. পাটনা ও কাসিমবাজারে এবং পরবর্তীতে ঢাকা, রাজমহল, মালদহ প্রভৃতি স্থানে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। বুদ্ধিমান ইংরেজরা প্রথমে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে বাংলার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে বাঙ্গালী জাতিসত্তাকে প্রায় দু'শ বছর গোলাম বানিয়ে রাখে।

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পাঁচ পাঁচটি ভাষা-ভাষী ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আগমন - নির্গমন এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিতে সমুজ্জ্বল স্মৃতি রেখে যায়। ইংরেজ ছাড়া অবশিষ্টদের অবস্থান স্বল্পস্থায়ী হলেও আমাদের ভাষায় তাদের অবদান মোটেও অল্প নয়। বালতি, ছবি, সাবান, আলপিন, জানালা ও বারান্দাসহ এজাতীয় প্রায় দেড়শত পর্তুগীজ ও ফরাসী শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় মিশে আছে।

---

২৭. মাহমুদ সবুক্তগীন (গজনীর রাজা), মোহাম্মদ ঘোরী (পৃথিরাজকে যিনি পরাজিত করেন), কুতুবুদ্দিন (ভারতের প্রথম মুসলমান সুলতান), এবং বঙ্গ বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজি।

ওলন্দাজ এবং দিনেমার শব্দও খুঁজে পাওয়া কঠিন কিছু নয়। আর ইংরেজির কথাতো বলাই বাহুল্য। প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ রাজত্বকালে বিপুল পরিমাণ ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করে। এর সংখা হাজার খানেকের কম নয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এর সংখ্যা প্রায় আট/নয় শত।

এ সকল শব্দভাণ্ডার বাংলা ভাষাকে শুধু সমৃদ্ধশালীই করেনি, বাংলা ভাষাকে করেছে অন্যতম শ্রেষ্ঠভাষা রূপে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। আরবী. ফারসী. তুর্কী পর্তুগীজ. ইংরেজী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার শব্দসম্পদে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার আজ পরিপূর্ণ। এ সমুদয় শব্দ সম্পদের দ্বারা বাংলা আজ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ভাষা। আরবী মূলীয় খাঁটি বাংলা শব্দের মধ্যে অন্যান্য ভাষা হ'তে বিশেষ করে আরবী ভাষা হ'তে ঋণ গ্রহণ করেই বর্তমান বাংলাভাষা যে একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধশালী ভাষা হ'তে পেরেছে তা বলাই বাহুল্য।[২৮]

চার

এ কথা সত্যি যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বেশী দিনের পুরনো নয়। যদিও পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ কাল সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ আলোক সম্পাত করা যাচ্ছে না। ফলে ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিতগণ বিষয়টি নিয়ে নানা মত পোষণ করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করেছেন। তাদের মধ্যে ড.দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ড. অসিতকুমার বন্ধোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ভূদের চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা', ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার 'বাংলা ভাষার ইতিহাস' ও মাহবুবুল আলমের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের এসব ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে,বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল 'চর্যাপদ'। 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামের চর্যাপদের সংকলন গ্রন্থে ২৩ জন কবির ৪৭টি পদ আছে। এসব পদকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এদের আবির্ভাবকাল বিবেচনা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৬৫০ খৃ. থেকে ১২০০ খৃ. পর্যন্ত এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেন নবম-দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে চর্যাপদের রচনা কাল নির্ণয় করেছেন। এ হিসেব অনুযায়ী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে, অপরদিকে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ কাল খৃষ্টীয় দশম শতকে।

---

২৮. আনিসুল হক চৌধুরী, বাংলার মূল (ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা:আধুনিক প্রকাশনী,১৯৯৫খৃ.), পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের উন্মেষকাল যাই হোক না কেন, চর্যাপদগুলোই যে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন এটা সর্বমহলে স্বীকৃত। 'সন্ধ্যা ভাষায়' সাধন পদ্ধতিতে রচিত এ গীতিমালায় বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ ব্যক্ত হয়েছে। সে সাথে চিত্রিত হয়েছে সমকালীন সমাজচিত্র। ১২০৩ খৃ. মুসলিম বিজেতাদের বাংলায় আগমনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতা শুরু হয়। যদিও এক/দেড় শতক বাংলা ভাষার রূপ ছিল স্থিতিস্থাপক। কখনো অপভ্রংশ ঘেঁষা, আবার কখনো পরবর্তী যুগের বাংলা ঘেষা। এ সময়ের প্রাপ্ত সাহিত্য নিদর্শনের মধ্যে প্রাকৃত-পৈঙ্গল, শুন্য পুরাণ, খনার বচন, পীর মাহাত্ম জ্ঞাপক 'শোক-শুভোদয়া', আর্যা এবং রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন সংগৃহীত চর্যাপদ উল্লেখযোগ্য।[২৯]

খৃ. চতুর্দশ শতকে বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণ চাঞ্চল্য শুরু হয়। এটাই মূলত বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাকাল। এ শতাব্দীর প্রথম গ্রন্থ বড়ুচণ্ডী দাসের (১৩৭০-১৪৩৩ খৃ.) 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্য। শ্রীমান কৃষ্ণ, শ্রীমতি রাধিকা ও বড়াই এ তিন চরিত্র অবলম্বনে রচিত কাহিনী কাব্যটির বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। এ সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দ পর্যন্ত কালটা বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ বলে বিভাজিত। অবশ্য ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ মানতে নারাজ। মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্যই পদ্যে রচিত। এ পদ্য সর্বস্ব কাব্য সাহিত্য প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। হিন্দু কবিদের রচনা আর মুসলিম কবিদের রচনা। হিন্দু কবিদের সাহিত্য ছিল মূলতঃ চার ধারায় প্রবাহিতঃ বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য ও জীবন চরিত। পক্ষান্তরে মুসলিম কবিদের সাহিত্য কীর্তি ছিল দু'ভাগে বিভক্তঃ আরবী-ফারসী-হিন্দী থেকে অনুদিত কাহিনী কাব্য ও ইসলাম ধর্মীয় কাব্য।

বৈষ্ণব পদাবলী এক ধরণের কাহিনী কাব্য। শ্রী চৈতন্যের ভক্ত অনুসারী বৈষ্ণবদের আরাধ্য শ্রীমতি রাধিকা ও শ্রীমান কৃষ্ণের প্রেমলীলাই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা প্রায় দেড় শতাধিক কবির মধ্যে বিদ্যাপতি (১৩৫৪-১৪৬০ খৃ.), বড়ুচণ্ডী দাস (১৩৭০-১৪৩৩ খৃ.), জ্ঞান দাস (১৫৩০-১৬১৫ খৃ.) ও গোবিন্দ দাস (১৫৩৫-১৬১৩ খৃ.) প্রধান।

মঙ্গলকাব্যগুলো মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বিশেষ এক ধরণের পাঁচালীকাব্য। এ কাব্যের কবির সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে শিবায়নের কবি রামেশ্বর, গোরক্ষ বিজয়ের কবি শেখ ফয়জুল্লাহ্ (ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত), মণষা মঙ্গলের কবি নারায়ন দেব (পঞ্চদশ-ষোড়শ মতাব্দী), চণ্ডী মঙ্গলের কবি মাধবাচার্য, অন্নদা মঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০

২৯. মুহম্মদ এনামুল হক, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য,প্রবন্ধ সংগ্রহ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৯২), চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩২৩-৩২৪

খৃ.) বিশেষ ভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। তাছাড়া মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আ. ১৫৪০-১৬০০ খৃ.), বিজয় গুপ্ত (পঞ্চদশ শতকের কবি), দ্বিজ বংশীদাস (ষোড়শ শতকের কবি)ও বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

খৃ. চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী শাসন শুরু হলে সুলতানগণ এদেশকে নিজেদের স্বদেশ ভূমি রূপে গ্রহণ করে। ফলে এ দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়ে যায়। সে আগ্রহ চরিতার্থ হয় এ দেশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতে রচিত প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র-পুরাণ ও কাব্য গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে। এ উদ্যোগের ফলে শুধু নবাগত মুসলিম শাসকগণই নয় অভিজাত হিন্দুদের মাঝেও বাংলা ভাষার কদর বেড়ে যায়। যদিও এতকাল তারা বাংলাকে অনভিজাত্যের ভাষা বলে দূরে ফেলে রেখেছিল। অনুবাদের এ পর্বে উল্লেখ্যযোগ্য সাহিত্য কর্ম হচ্ছে; গৌড়ের সুলতানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু (জন্ম পনের শতকের মাঝামাঝি)কর্তৃক অনূদিত ভাগবত পুরাণের বিশেষ অংশ, বাংলার সুলতান হুসেইন শাহের আমলে চট্রগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্রপরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী কর্তৃক অনূদিত 'অষ্টাদশ মহাভারত' এবং গৌড়েশ্বরের আদেশে কৃত্তিবাস ওঝা (১৩৮১-১৪৬১ খৃ.) কর্তৃক অনূদিত 'সপ্তকাণ্ড রামায়ন' প্রভৃতি। যদিও মহাভারত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাসের অনুবাদের মাধ্যমে।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য দেব বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট উপাদান। তাঁর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। এক কথায় বলতে গেলে, বাংলায় জীবনী সাহিত্য একমাত্র তাঁকে অবলম্বন করেই উদ্ভূত হয়েছে। সাহিত্যগুলোর বিষয় বৈচিত্র ছিল চমৎকার। ফলে বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতিও নতুন আঙ্গিকে মোড় নেয়। বাংলায় যে কয়খানি চৈতন্য জীবনী রচিত হয়েছে তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসের (১৫৩৪-১৬১৩ খৃ.) 'কড়চা', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল', লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের (১৫৫০-১৬১৫ খৃ.) 'চৈতন্য চরিতামৃত' বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

মুসলিম কবিগণ বাংলা সাহিত্যকে দেবদেবীর উক্ত মাহাত্ম কীর্তনের গৎ বাঁধা শিকল থেকে বের করে এনে নুতন গতি সঞ্চার করেন। সে সাহিত্যে তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি বর্ণাঢ্য রূপে প্রতিভাত হয়। শাহ্ মুহাম্মদ সগীর (জ. ১৩৮০ খৃ.) এ ধারার অন্যতম রূপকার। আরাকান রাজ সভায় যে ক'জন কবি কাব্য চর্চার সুযোগ লাভ করেন তাদের মধ্যে কবিত্ব শক্তি ও ভাবের মৌলিকত্বে কাজী দৌলত খাঁ (আ. ১৬০০-১৬৩৮ খৃ.) ও আলাওল (১৬০৭-১৬৮০ খৃ.) শ্রেষ্ঠ। আলাওল ছিলেন আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা হিন্দিসহ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের আরবী-

Dhaka University Institutional Repository

ফারসী-হিন্দী থেকে অনূদিত কাহিনী কাব্যগুলোর মধ্যে 'ইউসুফ-জুলেখা', 'চন্দ্রভান', 'চন্দ্রাবতী', 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল', 'পদ্মাবতী', 'মধুমালতী', 'মৃগাবতী', 'লাইলী মজনু', 'আলিফ লায়লা', 'গুলে আনোয়ারা', 'গুলে বকাওলী' ইত্যাদি প্রধান। ধর্মীয় বিষয়গুলো দ্বন্দ বহুল উপাখ্যান নিয়ে বর্ণিত; যেমন 'সোনাভান', 'আমির হামজা', 'জৈগুন', 'কারবালা', 'মকতুল হুসেইন', 'জঙ্গে বদর' ও 'শাহনামা' ইত্যাদি। আলোচনামূলক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মোহাম্মদী তত্ত্ব', 'নছিহতনামা', 'ইবলিসনামা', 'ফক্করনামা', 'ফালনামা', 'কিয়ামতনামা' 'তাজকিরাতুল আউলিয়া', 'কাছাছুল আম্বিয়া' ইত্যাদি প্রধান।

মধ্যযুগের শেষ ভাগে তথা ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে আরবী-ফারসী-উর্দু-হিন্দী মিশ্রিত পশ্চিম বঙ্গের হুগলী বন্দরে এক ধরণের গীতধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এটা বাংলা সাহিত্যে পুঁথি সাহিত্য বা দোভাষী সাহিত্য নামে পরিচিত। এ দোভাষী পুঁথি সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্টপূর্ণ সাহিত্য নিদর্শন। এ ধারার প্রাচীন পুঁথিকার ছিলেন ইছমাইল খাঁ গাজী বা বড় খাঁ গাজী। পরবর্তীতে এ সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখেন শাহ্ গরীবুল্লাহ্ (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) ও সৈয়দ হামজা (আ. ১৭৩৩-১৮০৭ খৃ.)। সে সময়ের উল্লেখ্যযোগ্য পুঁথিগুলো হচ্ছে 'সত্যপীরের পুঁথি', 'জঙ্গনামা', 'আমীর হামজা', 'কারবালা কাহিনী' ইত্যাদি।[৩০]

বাংলা সাহিত্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে লোক সাহিত্য। বিষয়-বৈচিত্রে ব্যাপকতায় এবং জীবনের সঙ্গে একাত্মতায় এটি একটি উজ্জল নিদর্শন হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বাংলার লোক সাহিত্য বাঙ্গালী জীবনের প্রতিচ্ছবি। লোক সাহিত্যের নিদর্শনের বিভাজিত শাখাগুলো হচ্ছে- ছড়া, গান, গীতিকা, কথা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি। ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সংগৃহীত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' (১৯২৩ খৃ.) ও 'পূর্ব বঙ্গ গীতিকা' (১৯২৬ খৃ.) লোক সাহিত্যের প্রাচীন কীর্তি হিসেবে এগুলো আজো সমাদৃত। ড. আশুতোষ ভট্রাচার্যের মতে, লোক সাহিত্যের মৌখিক ধারার উপর ভিত্তি করেই মঙ্গল কাব্যের লিখিত ধারার সৃষ্টি হয়েছে।[৩১]

এরপর যুগ সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খৃ.)-এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হয়। তাঁর গদ্য কীর্তির মধ্যে 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' ও 'সত্য নারায়নের ব্রত কথা' প্রধান। এ সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের নবীন শাখা-গদ্যের রূপ-রস-রং-

---

৩০. কাজী দীন মুহাম্মদ, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য-গদ্য (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,১৯৯২), পুণর্মুদ্রণ, পৃ. ২২৪

৩১. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২২৭-৩১

Dhaka University Institutional Repository

ঢং-গতি-প্রকৃতি কি হবে বা কি হওয়া উচিৎ তা নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খৃ.) তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ খৃ.), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪ খৃ.), ও 'সীতার বনবাস'(১৮৬০ খৃ.) প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে অতি লঘুগতির এমন এক সাধু ঢং এর প্রস্তাব করলেন, যা বাংলার কোথাও চলনে-বচনে ব্যবহৃত হতো না।

এদিকে প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খৃ.) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কদালী প্রসন্ন মিত্র তাঁর 'হুতোম পেঁচার নকশা' ইত্যাদির মাধ্যমে উপস্থাপন করলেন উৎকট কথ্য ভাষাবলম্বী একই রীতির বৈকল্পিক ঢং। যা পরিচিত হয়ে উঠে 'আলালী ভাষা' বা 'হুতোমী ভাষা' নামে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্রপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খৃ.) এ দু'ভাষার অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে একটি বৈকল্পিক গদ্যরীতি আবিস্কারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন এবং মেধা ও প্রতিভার সামর্থে এক সময় সন্ধান পেয়ে গেলেন তাঁর সে কাংখিত ভাষার। তাঁর প্রবন্ধ-উপন্যাসে উঠে আসল এমন এক পরিচ্ছন্ন, সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা, যা না বিদ্যাসাগরী না আলালী কিংবা হুতোমী। সবার কাছে সে ভাষা সমাদৃত হল। হল উত্তরসূরিদের কাছে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দুর্গেশ নন্দিনী' সমালোচকদের দৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেল। এ যুগ সন্ধিক্ষণে বৈদেশিক সাহিত্য-ঐশ্বর্যস্নাত প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খৃ.)। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তুললেন। আবিস্কার করলেন পদ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের এবং রচনা করলেন মহাকাব্য 'মেঘনাধ বধ'। তাঁর স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তির মধ্যে আরো রয়েছে যুগান্তকারী নাটক 'শর্মিঠা' (১৮৫৯ খৃ.), 'কৃষ্ণকুমারী', 'পদ্মাবতী', 'মায়াকানন' ইত্যাদি। বাংলা নাটকে মাইকেল ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩ খৃ.), মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২ খৃ.), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খৃ.), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খৃ.), ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭ খৃ.) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খৃ.) ছিলেন স্বমহিমায় সমুজ্জল। বাংলা গদ্যের নির্মাণকালের আর একজন স্বার্থক রূপকার ছিলেন রামরাম বসু (আনুমানিক ১৭৫৭-১৮১৩ খৃ.)। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০৫ খৃ.) আরবী-ফারসীজাত শব্দ প্রয়োগের এক অনুকরণীয় ভাণ্ডার হিসেবে আজো সাহিত্যিক মহলে সমাদৃত।

বাংলা সাহিত্যে অন্য এক কাব্য সাধনার পথ আবিস্কৃত হয় বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪ খৃ.)-এর হাতে। তাঁর আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের ধারা অবসিত হয়ে আধুনিক গীতি কবিতার ধারা সূচিত হয়। পরবর্তীতে তাঁর এ প্রবর্তিত ধারা কবিগুরুসহ অনেকেই অনুসরণ

করেন। কবিগুরু তাঁকে যুক্তি সঙ্গত ভাবেই বাংলা গীতি কবিতায় 'ভোরের পাখি' বলেছেন। মাইকেল-বঙ্কিম সৃজিত জোয়ার পড়তে না পড়তেই রবি'র তেজ নিয়ে আবির্ভূত হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.)। তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হল রবীন্দ্র সামাজ্য। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রবল প্রতাপে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমদের যাবতীয় কীর্তি। মহাকাব্য ছাড়াও ছড়া থেকে শুরু করে সিনেমা ও চিত্রাংকন পর্যন্ত সাহিত্য শিল্পের এমন কোন গলি নেই যেখানে রবীন্দ্র প্রতিভায় ঋদ্ধ হয়নি। রবীন্দ্র যুগ ছিল বাংলা সাহিত্যের হিরন্ময় যুগ।

রবীন্দ্র যুগেই সর্বাধিক সংখ্যক কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খৃ.), হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০ খৃ.), কালীদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫খৃ.), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪ খৃ.), যতীন্দ্র মোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮ খৃ.), জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪ খৃ.), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০ খৃ.) ও পল্লী কবি জসিম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খৃ.) প্রধান। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বকীয়তায় এবং স্বমহিমায় ছিলেন সমুজ্জল। কাব্য-সাহিত্যিকদের কাছে তিনি ছন্দের যাদুকর ও অমর অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। অপরদিকে মোহিতলাল মজুমদার প্রথম দিকে রবীন্দ্র-প্রীতির অর্ঘ গলায় পড়লেও শেষের দিকে রবীন্দ্র-সমালোচনায় ছিলেন মুখর। তিনিও সমালোচনার মত একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪ খৃ.), সুধীন দত্ত (১৯০১-১৯৬০ খৃ.), বিষ্ণুদে (১৯০৯-১৯৮২ খৃ.), অমিয় চক্রবর্তি (১৯০১-১৯৮৭ খৃ.), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪ খৃ.), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭ খৃ.), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খৃ.) প্রমুখ ইংরেজী শিক্ষিত কবিগণ রবীন্দ্র নাথের রোমান্টিক ধাঁচের বিপরীতে ইউরোপীয় আদর্শে একটি ভিন্নতর আধুনিক ধারায় কবিতা লিখে রাবিন্দ্রীয় বলয় ভেদ করার চেষ্টা করে সফল হন। অন্য দিকে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) আপন মাটি-মানুষ-স্বাধীনতাকে পুঁজি করে একাই শির উঁচু করে দাঁড়ান রবিন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে। তিনি একদিন বিনা নোটিশে এসে 'আল্লাহু আকবর' তকবীরের হায়দরী হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে বাংলা সাহিত্যের দূর্গ জয় করে বসলেন।[৩২] অভূতপূর্ব প্রতিভার দাপটে কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই বেরিয়ে

---

৩২. আব্দুল মুকীত চৌধুরী, নজরুল ইসলাম:ইসলামী কবিতা (ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খৃ.), আমাদের কথা।

আসলেন বাংলা সাহিত্যের রাবিন্দ্রিক বলয় থেকে। রবীন্দ্র সাম্রাজ্যের বাইরে গড়ে তুললেন স্বশাসিত সার্বভৌম সাহিত্য রাষ্ট্র। বাংলা কাব্যে মাত্রাবৃত্ত মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন এবং আরবী ছন্দ প্রয়োগ করে সাড়া জাগিয়ে তুললেন সমালোচনার আসরে। শিল্পোত্তীর্ণ গানের সংখ্যায় অতিক্রম করলেন বিশ্বের সকল রেকর্ড। বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে দিলেন সমাজে-রাষ্ট্রে। জেগে উঠল বাঙ্গালী মুসলমান। সচকিত চিত্তে বুঝল এবং বিস্মিত নয়নে দেখল যে, বাংলা সাহিত্যাকাশে হঠাৎ ধুমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে।[৩৩]

তিরিশের দশকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা কাব্যে নব্য আধুনিকতার যে ধারা সুচিত হয় চল্লিশের দশকে মুসলিম কবিদের দ্বারা তা বিপুল ভাবে অনুসৃত হয়। এতকাল কলকাতাই ছিল বাংলা সাহিত্যের তীর্থস্থল। আর মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল বলে তারা ছিল অবহেলিত। দেশ বিভাজনের পর এ অঞ্চলের কবি সাহিত্যিকদের নিজস্ব জীবন ও সংস্কৃতির রূপায়ণ আর স্বতন্ত্র পাঠকগোষ্ঠী থাকার ফলে তাদের সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হয় এবং সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানদের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এসময় যারা অসামান্য অবদান রাখেন তাদের মধ্যে বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩ খৃ.), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪ খৃ.), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১- ১৯৯৯ খৃ.), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪ খৃ.), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-১৯৯৯ খৃ.), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৬ খৃ.), আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮ খৃ.) প্রমূখ প্রধান।

পঞ্চাশের দশক থেকে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে প্রবল প্রাণ জোয়ার শুরু হয়। '৫২'র ভাষা আন্দোলন এর সাথে যোগ করে নতুন মাত্রা। ফলে প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, কাব্য তথা সাহিত্যেব সকল শাখায় সাধিত হয় অসামান্য অগ্রগতি। প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯১৬-১৯৮২ খৃ.), মুহাম্মদ আবদুল হাই (১৯১৬-১৯৬৯ খৃ.), সৈয়দ আলী আহসান, ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৮ খৃ.), ড. আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭ খৃ.); উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১ খৃ.), শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮ খৃ.), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮ খৃ.), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৬-১৯৭১ খৃ.); ছোটগল্পে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, সরদার জয়েন উদ্দীন (১৯২৩-১৯৮৬ খৃ.) আবু ইসাহাক (জ. ১৯২৬ খৃ.), আবুল কালাম শামসুদ্দীন; নাট্য সাহিত্যে সিকান্দার আবূ জাফর (১৯১৮-১৯৭৫ খৃ.), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১ খৃ.), আশকার ইবনে শাইখ (জ. ১৯২৫ খৃ.); কবিতায় শামসুর রহমান (জ. ১৯২৯ খৃ.), আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬ খৃ.),

৩৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩২-২০০০ খৃ.), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩ খৃ.) আবদুস সাত্তার (জ. ১৯৩১ খৃ.) প্রমুখ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

ষাটের দশকের কবিতা আরো গদ্যাত্মক রূপ লাভ করে। একেবারে অকাব্যিক, মৌখিক, সাবলীল গদ্য। গদ্য কবিতার এ ধরণটি ষাটের দশকেরই নিজস্ব-এর আগের দশকগুলোতে আর কখনো দেখা যায়নি।[৩৪] এ দশকের শ্রেষ্ঠ কবিগণ হচ্ছেন বেলাল চৌধুরী (জ. ১৯৩৮ খৃ.), মুস্তফা আনোয়ার, আবদুল মান্নান সৈয়দ (জ. ১৯৪৩ খৃ.), সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২-২০০৩ খৃ.), রফিক আজাদ (জ. ১৯৪৩ খৃ.), নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫ খৃ.)।

সত্তর দশকের কবিতা ছিল সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। ১৯৭১ খৃ. মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ এসে আছড়ে পড়ে তরুণ কিশোর কবিদের উপর। সময়ের এ প্রভাব এতটাই তীব্র ছিল যে অগ্রজ বিভিন্ন দশকের কবিরাও তার দ্বারা আমূল আলোড়িত হয়েছিল। বাংলাদেশের সত্তরের পুরো দশকটাই ছিল কবিদের দখলে। যেহেতু জোয়ারটা ছিল প্রবল সেহেতু জোয়ার নেমে গেলে দেখা গেল অনেক কবির হাত ও চেতনা থেকে কলম খশে গেছে। এ ভাটার টানকে অগ্রাহ্য করে যারা টিকে গেলেন তাদের মধ্যে আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, শহীদুজ্জামান ফিরোজ, মাহবুব বারি, মসউদ উশ শহীদ, রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৫৬-১৯৯১ খৃ.) প্রমুখ কীর্তিমান।

আশির দশকে বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনা পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। এ সময় পূর্ববর্তী কবিতার ধারাকেও অতিক্রমের চেষ্টা চালানো হয়। নতুন চেতনাবাহী কবিদের মধ্যে রিফাত চৌধুরী, কাজল শাহনেওয়াজ, খাদেম হাফিজ, সরকার মাসুদ, খন্দকার আশরাফ হোসেন, মাসুদ রানা, রেজাউদ্দিন ষ্টালিন, আবদুল হাই শিকদার, মোশারফ হোসেন খান, তমিজ উদ্দিন লোদী ও আসাদ বিন্ হাফিজ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ হ'তে বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত একশ' বছরে বিপুল সংখ্যক শক্তিমান প্রতিভা যেমনি বাংলা সাহিত্যের দুর্দিন ঘুছিয়ে গেছেন, তেমনি পশ্চিমা হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করে মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ নিজ আসনও সুদৃঢ় করেছেন। বাংলা সাহিত্যের একমাত্র দুর্বল দিক নাট্য সাহিত্যেও বর্তমান মুসলিম নাট্যকারগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পা ফেলে চলেছেন। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, আশকার বিন্ শাইখ প্রমুখ এ ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছেন। কাব্য ও ছোটগল্পে কবি

৩৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, করতলে মহাদেশ (ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী,১৯৯৩), ২য় সং, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

আল মাহমুদ যথেষ্ট সুসংহত। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দীর্ঘ সাত শতাধিক বছরব্যাপী বাংলা সাহিত্যে যে সকল আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ অত্যন্ত গৌরবের সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল তা আজ সন্তর্পনে-নির্বিবাদে বিতাড়িত হচ্ছে। গোলামী যুগের মার্শম্যানী-কেরীয় মানষিকতাবাদী এ সব শত্রুদের ব্যাপারে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের সে রকম কোন সতর্কতা-উদ্যোগ-উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

পাঁচ

আরবী ভাষা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠী অপেক্ষা অতি প্রাচীন ভাষা। প্রাচীন সামী ভাষা গোষ্ঠী হ'তে আরবী ভাষার উৎপত্তি। এ গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষা হচ্ছে; ব্যাবিলনীয়, হিব্রু, হিময়ারী, আরামী, ফীনীকী, হাবশী ইত্যাদি। আরবী ছাড়া বাকিগুলো সবই এখন মৃত প্রায়। তবে হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যবহৃত আরামী ভাষাটি বর্তমানে ফিলিস্তিনের দু'একটি গ্রামে কথ্য ভাষা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।

আরবী এক সময় আরবদেশের ভাষা হলেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এসে ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে এ ভাষা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিন মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে ইউরোপ আরবীকে বিদায় করে দিলেও বাকি দুই মহাদেশে আরবীর অবস্থান সুসংহত থেকে যায়। মধ্যযুগে এসে পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, অনুশীলন ও গবেষণা আরবী ভাষাতেই সম্পন্ন হয়েছে; ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, নৃ-তত্ব, ভূ-তত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, রসায়ন, শিল্পকলা, চিকিৎসা, গণিত, সংগীত বিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগণিত পুস্তক এ ভাষাতে রচিত হয়। উনিশ শতকের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এ ভাষা স্বীয় দুর্জয় সত্বা ও স্বকীয়তা নিয়ে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, লোকগীতি, শিশুসাহিত্য, কথাসাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, মননশীল রচনা আর প্রবন্ধ লিখে আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৮৮ খৃ. প্রখ্যাত মিসরীয় লেখক ও সাহিত্যিক নাজীব মাহফুজ কর্তৃক সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ নিঃসন্দেহে আরবী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুধু মুসলমানরাই নয়, খৃস্টান, ইহুদী ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও এর সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে এগিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে জীব্রান খলীল জীব্রান, জুরজী যায়দান ও রাজা রামমোহন রায় প্রমূখ ইহুদী, খৃস্টান ও হিন্দু লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৫]

৩৫. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪), ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের বিজয় পর্বে যে সব জাতি আরবদের আনীত ইসলামকে অবলম্বন করে বিশ্বে মর্যাদার আসন লাভ করেছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র ইরানই আরবীর প্রবল প্রতাপ প্রতিহত করে নিজ ভাষা ফার্সীকে আপন মহিমায় বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ফার্সী ভাষা ইসলামী দুনিয়ায় ইসলামের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদায় লাভ করে। উত্থান-পতনের দিনগুলো পেরিয়ে বর্তমান আরবী ভাষা বিশ্বের মানচিত্রে পারস্য-তুর্কিস্থানের সীমানা-পেরিয়ে মিশর এবং সুদানের অধিকাংশ এলাকা (নীল নদ হতে চাদ পর্যন্ত); ত্রিপোলী, মৌরিতানিয়া, তিউনিস, আলজেরিয়া ও মরক্কো; ফরাসী পশ্চিম সুদান এবং সাহারা মরুভূমির উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এ অখণ্ড ভূ-ভাগ ছাড়াও ভূমধ্যসাগরের মাল্টাসহ কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল; আরো রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় বসবাসকারী আরবগণ। বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোক আরবী ভাষায় কথা বলে।[৩৬]

মূল সামী ভাষা হ'তে উদ্ভূত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবী ভাষা নানা কারণে সামী ভাষার নিকটতম ভাষা। তন্মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে, মূল সামী ভাষার বৈশিষ্টগুলো আরবীতেই সংরক্ষিত আছে। তাছাড়া একই বর্ণে লিখিত এ উপভাষাগুলোর মধ্যে আরবী হল সর্ব কনিষ্ঠ।[৩৭] আর সামীদের আদি বাসস্থান আরব দেশ। এদেশের অধিবাসীরা বাইরের সংশ্রবে খুব কমই এসেছে বিধায় এদের ভাষা ছিল নিষ্কলুষ। আর মধ্য আরবই সেমিটিকদের আদি বাসস্থান হওয়ার কারণে এরা বিভিন্ন সময় সিরিয়া, বাবিল, ওমান, ইয়ামেনসহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মূল সেমিটিক আরবী ভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব ঘটে ।

আরবী আরবদের ভাষা। আরবীকে যে আরব দেশের ভাষা বলা হয় সে আরবদেশের বিস্তার দক্ষিণে ইয়ামেন থেকে উত্তরে শাম বা সিরিয়া পর্যন্ত। 'আরব' শব্দটি একটি দূরবর্তী ভূ-খণ্ড হিসেবে সর্ব প্রথম উক্ত হয়েছে প্রাচীন গ্রীক উপকথায়। পরে ল্যাটিন ও গ্রীক লেখকগণ আরব এবং আরবী দ্বারা নীল নদ ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী মিশরের পূর্বাঞ্চলীয় মরুভূমিসহ সমগ্র আরব উপদ্বীপের অধিবাসীকে বুঝাতে শুরু করে। এটা খৃ. পূর্ব ১০০০ অব্দের সলোমনী আমলের কথা। শব্দটি অ্যাসীরীয় লিপিতে উক্ত হয়েছে খৃ. পূ. ৮০০ অব্দে। ভৌগলিকদের মতে "আরাবাহ্" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'আরব'।

---

৩৬. সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা:ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৬; মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, আরবী সাহিত্য সমালোচনা (ঢাকা:সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯), ভূমিকা।

৩৭. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮২), পৃ. ১-৭

Dhaka University Institutional Repository

সব সামী ভাষায় 'আরাবাহ' অর্থ মরুভূমি বা অনাবাদী ভূমি। কুরআনে কারীমে হযরত ইসমাঈলের (আ.)-এর বাসস্থানের বর্ণনায় মক্কাকে واد غــير ذي زرع অর্থাৎ ফসলবিহীন একটি উপত্যকা বলে মূলতঃ 'আরাবাহ' শব্দেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরবী ভাষায়ও 'আরাবাহ' শব্দটি যাযাবর বা বেদুইন অর্থে ব্যবহৃত। মরুময় অঞ্চল বলে এ দেশ আরব। সুতরাং দেশের নামানুসারে অধিবাসীরা আরব এবং তাদের ভাষা আরবী হিসেবে অভিহিত হয়ে আসছে।[৩৮]

ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে আরবরা উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরব এ দু'ভাগে বিভক্ত। আবার অধিবাসিরাও দুটো পৃথক দলে বা উপজাতিতে বিভক্ত। দক্ষিণের অধিবাসীরা 'আরবে আরেবাহ্' খাঁটি আরব, যেমন- বনু কাহতান আর উত্তরের আরবরা 'আরবে মুস্তা'রিবা' আরবী জাতীয়তা গ্রহণ করেছে বলে আরব। তাঁরা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর। এ দু'অঞ্চলের ভাষায়ও বেশ কিছু বিভিন্নতা লক্ষণীয়। দক্ষিণ আরবের ভাষায় কতগুলো dialect বা উপভাষা প্রচলিত ছিল; মুসনদ, যবুর, রশ্‌ক্, হভীল, যকযকা ইত্যাদি।[৩৯] উত্তর আরবের ভাষায়ও আঞ্চলিক প্রভাবে উচ্চারণ, স্বরচিহ্ন ইত্যাদিতে বিভিন্নতা বিদ্যমান ছিল। এতগুলো আঞ্চলিক বিভিন্নতার মাঝেও উত্তর আরবস্থ্ মক্কার ভাষা ছিল তুলনামূলক পরিচ্ছন্ন। এখানকার ভাষাকে 'আরবী-ই-মুবীন' বলা হতো।[৪০] এ জন্যই প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবূ আমর-ইব্‌ন্-আল-'আলা বলেছেন, "দক্ষিণ ও উত্তর আরবের ভাষা এক নয়, বরং দুটো আলাদা ভাষা।[৪১]

ইসলামের প্রাথমিক যুগেও ভাষার এ এখতেলাফ পরিলক্ষিত হয়েছে। জাহিলী যুগের কবিদের কবিতা এ ভাষায় রচিত। পবিত্র কোর'আনের ভাষাও সে যুগের কবিতার ভাষা। কিন্তু কবিতাগুলোতে এমন সব শব্দ রয়েছে যে গুলোর অর্থ অভিধানের সাহায্য ব্যতীত উদ্ধার করা মুশকিল অথচ কোরআনের ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। আরবী ভাষায় আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়ায় অগণিত dialect'র ভাষা আরবীর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাবাতের বাজারে কিংবা মক্কার গ্রামে লোকমুখে যে dialect'ই ব্যবহৃত হোক না কেন প্রত্যেকের কাছে আল-কোরআনে ব্যবহৃত ক্লাসিক্যাল আরবীই ভাষার লিখিত রূপ। আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়ায় প্রথমত আরবী ভাষা টিকে

---

৩৮. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন, সেমিটিক (সামী) ভাষা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা:কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা,১৩৮২, পৃ. ২১
৩৯. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ্ (মিশর:মাতবা'আতু হিলাল,১৯৫৭), খ.১, পৃ. ৪৯

৪০. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২৫৩-৫৪
৪১. আহমদ হাসান আলযায়্যাত, তারিখ আদব আল আরবী (লাহোর:প্র.বি,১৯৬১), উর্দু অনুবাদ, পৃ. ৪৬

থাকার নিশ্চয়তা পেয়েছে, দ্বিতীয়ত কোরআনের যুগের ভাষা পণ্ডিতদের চোখে যা ক্লাসিক্যাল আরবী তা আজো প্রায় অবিকৃতভাবে বিভিন্ন আরব অধ্যুষিত এলাকায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভাষার ইতিহাসে এমন নজীর আছে কিনা বলা মুশকিল। বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ গান ও দোহার ভাষা সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য। সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে যে ভাষা প্রচলিত ছিল সে ভাষা প্রাচীন ইংরেজী বলে অভিহিত। আধুনিক ইংরেজীর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।[৪২] এমনকি চতুর্দশ শতাব্দীতে মহাকবি চষার যে ভাষায় কবিতা লিখেছেন, আধুনিক ইংরেজীর কাছে তা একেবারে অবোধ্য না হলেও দুর্বোধ্য। প্রাচীন ফরাসী মহাকাব্য রোলাঁর ভাষা বর্তমান যুগে কোন ফরাসী কবি অনুসরণের কথা ভাবতেই পারেন না অথচ প্রাক ইসলামী যুগের কবি ইমরাউল কায়েস-এর কাব্য আর বিংশ কিংবা একবিংশ শতাব্দীতে রচিত আরবী কাব্যের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।[৪৩] কালের এ দীর্ঘ পরিক্রমায় আরবী ভাষাটি টিকে যাবার একমাত্র কারণ হচ্ছে এ ভাষায় প্রতিভাবান কবিদের আবির্ভাব এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কোরআনের অবতরণ।

২৯ বর্ণে লিখিত আরবী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শব্দ সমৃদ্ধ, ব্যাকরণ সিদ্ধ, সুস্থ প্রকাশ ভঙ্গি সম্পন্ন ও অর্থপূর্ণ ভাষা। এ ভাষার বর্ণগুলো এসেছে মূল সামী বর্ণমালা হতে। আরবী বর্ণমালাই কালে-কালে নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে জগতে সহস্র সহস্র ভাষার সৃষ্টি করেছে।[৪৪] তাই আরবীকে ام الالسنة যা ভাষার জননী (Mother of Languages) আর আরবী হরফকে জগতের সর্বপ্রথম হরফ (Alphabet) বলা হয়ে থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এ জন্যই ইহাকে The great Mother of Alphabet বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টিও যে সেমিটিক বর্ণমালা হ'তে তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। Taylor বলেন: To some very ancient but unknown period, We must also assign the origin of the primitive Arabian or Ismaelite alphabet, which became the Parent of the Ethiopic and Indian alphabets. অর্থাৎ আরবী বা ইসমাইলী বর্ণমালার উৎসমূল অতি প্রাচীন। এ আরবী বর্ণমালা হ'তে হাবশী ও ভারতীয় বর্ণমালার জন্ম।[৪৫] ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ ও The Indian history congress কতৃক প্রকাশিত এবং K.A.Nila Kantha Shastri কর্তৃক সম্পাদিত

---

৪২. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা:বুক ফোরাম, ১৯৭৫), পৃ. ৬-৭
৪৩. ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।
৪৪. আনিসুল হক চৌধুরী, বাংলার মূল, (ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯৫), পৃ. ৫৩।

Comprehensive History of India, Vol-11 (325B.C-A.D.300) গ্রন্থের একুশ অধ্যায়ের ৬৭১ পৃষ্ঠায় বলা আছে যে, ৮০০ খৃ. পূর্বাব্দে তামিল ভাষায় অক্ষর সেমিটিক হ'তে উদ্ভূত হয়েছে।

নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' গ্রন্থে বহু শব্দ সম্পদের উদাহরণ দিয়ে প্রদর্শন ও প্রমাণ করেছেন যে, দাক্ষিণাত্রের দ্রাবিড়দের তামিল ভাষার সাথে বাংলাভাষার ঐক্য ও সাদৃশ্য রয়েছে এবং বাংলা ভাষার অক্ষরও ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সেমিটিক হ'তে উদ্ভূত হয়েছে।[৪৬]

ড. সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তার The Origin and Development of Bangali language গ্রন্থে দ্রাবিড় বলতে আরব জাতি এবং আরবী ভাষাকেই বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কবি মুকুন্দরামও আরবের দিলমুন. তিলমুন ও দিলমান জাতিকে দামিল. তামিল ও সংকৃত ভাষার দ্রাবিড় বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, Thousands of years ago, The inhabitants of India spoke and understood Arabic............The words for mountain,rivers,towns, heavens,earth, names of relations........etc are all in Arabic. অর্থাৎ হাজার হাজার বৎসর আগে ভারত বর্ষের লোকেরা আরবী ভাষা বলিত ও বুঝিত। ....পাহাড়, নদী, নগর, স্বর্গ, পৃথিবী, আত্মীয়দের নাম ইত্যাদি সকল শব্দই ছিল আরবী।[৪৭] সুতরাং আরব দেশই যে হরফের আদিম জন্মস্থান এবং আরবী ভাষাই যে সকল ভাষার জননী এতে কোন সন্দেহ নেই।

শুধু ভাষা আর বর্ণমালার দিক থেকেই নয়, পৃথিবীর গ্রন্থসমুহের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থটিও আরবী ভাষায় রচিত। বাইবেল পুরান নিয়ম বা মোসীর পঞ্চ পুস্তক রচিত হওয়ার সমকালে اسفر ايوب الحديـــق বা Book of Iob গ্রন্থটি যে বিশুদ্ধ আরবী ভাষার প্রথম গ্রন্থ তা ঐতিহাসিক অকাট্য যুক্তি দ্বারা নিশ্চিৎরূপে প্রমাণিত। খৃ. পূ. পঞ্চম শতকে পুস্তকটি রচিত বলে আধুনিক পণ্ডিতগণের

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৬।
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
৪৭. অ.ঐ.রিফুধৎঃযর, অৎধনরপ: এঃযব গড়ঃযবৎ ড়ভ ধষষ ষধহমঁধমবং; ঋধহংশৎরঃ: ওঃং রহপড়মহরঃড় ড়ভভংঢ়ৎরহম.(এঃযব ওংষধসরপ জবারবি, ঔধহঁধৎু, ১৯৫৯), ঠড়ষ-ীখা১১, ঘড়-১, ঢ়. ১০.

ধারণা ।[৪৮] সুতরাং পাহলবী ভাষার প্রাচীন কবি মহামানব জরোথুস্ত্র ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মহাগ্রন্থ 'জেন্দ' ও 'আবেস্তা' অর্থাৎ 'জেন্দাবেস্তা' এবং পাহলবী ভাষা থেকে আগত সংস্কৃত ভাষার প্রথম পুস্তক 'বেদ' অপেক্ষাও আরবী ভাষার প্রথম পুস্তক ' Book of Iob'-ই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ নিশ্চিত ।

অনন্যসাধারণ এ আরবী ভাষা ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে অদ্যাবদি নানা ঘাত প্রতিঘাত ও নানা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। মঙ্গোল আক্রমণে বাগদাদের পতন হলে (১২৫৮ খৃ.) আরবী ভাষা বিরাট ক্ষতির সন্মুখীন হয় । তদুপরি আরবী তার জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে ।

মধ্য যুগে যে ভাষা দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সংস্কৃতির বাহন ছিল; যে ভাষা প্রাক-ইসলামী যুগের কবিদের ভাষা; যে ভাষায় কুস্-ইব্ন সা'ইদাহ (৬০০ খৃ.) 'উকায মেলায় ধর্মীয় বক্তৃতা দিয়েছেন; যে ভাষায় প্রাচীন যুগ হতে অসংখ্য প্রবাদ বাক্য রচিত হয়েছে এবং আজো সে গুলি পুস্তকাকারে সংরক্ষিত আছে; যে ভাষায় আল-কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে; যে ভাষায় প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) তাঁর প্রচার কার্য চালিয়েছেন, সাহাবাদের আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন, নানা সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেছেন, তৎকালীন রাজা বাদশাহদের চিঠি লিখে দাওয়াত দিয়েছেন; আরব দেশের সীমানা পেরিয়ে তৎকালীন সভ্য জগতের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডে সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সরকারী কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল; যে ভাষার বিশাল শব্দ-ছন্দ-বর্ণ ভাণ্ডার আছে বলেই এ ভাষায় ফায়দী কর্তৃক বিন্দু বিহীন বর্ণে কোরআনের তাফসীর রচনা কিংবা ওয়াসিল বিন আতা কর্তৃক 'রা' বর্ণ ব্যবহার না করেই দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান সম্ভব হয়েছে;[৪৯] সে ভাষাই ক্লাসিক্যাল আরবী বা আরবী-ই-মুবীন । নিঃসন্দেহে এগুলো একটি ভাষার বাহাদুরির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । ভাষার এ ঐশ্বর্যের জন্যেই আরব জাতি জীবিকার অন্বেষণে বা ধর্ম প্রচারের ব্রতে পৃথিবীর যেখানেই পা রেখেছে সেখানেই তাদের অনুপম ভাষা-সম্পদের টুকটাক প্রভাব পড়েছে । বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি । যদিও কিছু পুরাণ, উপাখ্যান, উপকথা, রূপকথা বিশ্ব সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যেও গৃহীত হয়েছে ।

---

৪৮. মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (ঢাকা:ঐতিহ্য, ২০০২), পৃ. ১৪

৪৯. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২৬০-৬১

Dhaka University Institutional Repository

ছয়

আরবী ভাষা একটি বিশ্বজনীন ভাষা। বাংলাভাষার সহিত আরবী ভাষার সম্পর্ক অতি প্রাচীন ও অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব হ'তে আরবী ভাষা বাংলায় বিভিন্নভাবে[৫০] অনুপ্রবেশ করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলা ভাষার জন্মেরও অনেক আগে থেকে বাঙ্গালীর কথাবার্তায় আরবী শব্দমালা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরবী শব্দমালা বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যমটি ছিল বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরব বণিকদের আগমন। সুদূর আরব থেকে আগত বণিকদের সাথে পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলেই এমনটি হয়েছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

বিশ্বময় একথাটি স্বীকৃত যে, আরবরা ব্যবসায়ী জাতি। মরুময় দেশে জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আবহমানকাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হয়েছে। খালিক আহমাদ নিযামীর মতে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব হতেই ভারত-আরব উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।[৫১] ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন বলেন- "হযরত ইউসূফ (আ.)-এর আমল থেকেই ভারতের সাথে আরবদের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।"[৫২] আবিসিনিয়ায় আরবদের বাণিজ্যের কথাতো সর্বজন বিদিত। খৃষ্ট জন্মের শত শত বছর পূর্ব হতেই আরবরা আন্তমহাদেশীয় বাণিজ্যের পসরা সাজিয়েছিল। আরবদেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতে। ভারতীয় উপকূলীয় বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সে সময় আরবদের বাণিজ্যিক নৌ-বহরগুলো পূর্ব দিকে সুদূর চীন পর্যন্ত পাঁড়ি দিত। আরবীয় অর্ণব পোত আরব সাগর অতিক্রম করে পারস্য উপসাগর হয়ে সিন্ধুর দেবল বন্দরে পৌঁছত। সেখান থেকে গুজরাট, কাথিওয়ার, বোম্বাই, কালিকট, রাজকুমারী ও মাদ্রাজের উপকূল হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়তো। পরে বার্মা হয়ে চীনের ক্যানটিনে গিয়ে নোঙ্গর করতো।[৫৩]

---

৫০. ব্যবসা বানিজ্য, পীর-অলীদের দাওয়াত ও মুসলমান রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি।

৫১. কে. এ. নিযামী, ডক্টর মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত 'এ্যারাব একাউন্ট অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকা।

৫২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, বাংলা ও বাঙ্গালী মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা (ঢাকা: সৃজন প্রকাশনী লিঃ, ফাল্গুন-১৩৯৭), পৃ. ৯৭

৫৩. আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন, বাংলাদেশে আরবী ও উর্দু চর্চা (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ), পৃ. ৪

খৃ. পাঁচ শতকের শেষ ভাগে খোদ মক্কার কুরাইশ বণিকরাও নৌপথে বহিঃবাণিজ্যের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে।[৫৪] ৭১২ খৃ. আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় এবং সেখানে বসতি স্থাপনের ফলে স্বভাবতই প্রাচ্য ও ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আরো সম্প্রসারিত হয়। সিংহল ও মালাবারে আরব প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। খৃ. অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক কার্যকলাপে আরবরা ছিল পৃথিবীর সেরা জাতি।[৫৫] এসময় আরব বণিক ও নাবিকগণ বাণিজ্য উপযোগী স্থান হিসেবে দক্ষিণ ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং বাংলার চট্রগ্রাম ও আরাকানে আগমন করে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলে। প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, চীনা লেখকগণ ও আবুল ফজলের বর্ণনা মতে, চট্রগ্রাম গঙ্গার মোহনার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এর (চট্রগ্রাম) অবস্থানের দরুণ আরব বণিকরা চট্রগ্রামের নাম দিয়েছিল 'সাত-আল-গঙ্গা', যা কালক্রমে চাটগাঁও বা চট্রগ্রামে রূপান্তরিত হয়।[৫৬] Robertson এর Ancient India নামক গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে- "Arabian Language was understood and spoken in almost avery seaport of any note" প্রতিটি উল্লেখ্যযোগ্য সামুদ্রিক বন্দরেই আরবী ভাষা বুঝিত ও বলিত। চট্রগ্রাম অঞ্চলের বর্তমান আঞ্চলিক ভাষার ক্রিয়া পদে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষারই অনুকৃতি; অধুনা চট্রগ্রামের বহু পরিবার নিজেদের আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করছে। তাছাড়া চট্রগ্রামের কয়েকটি এলাকার নাম যেমন আলকবণ, সুলুকবহর, বাকালিয়া ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্যেরই প্রমাণ বহন করে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা চট্রগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূল এলাকা অধিকতর আরবীয় প্রভাবযুক্ত। চট্রগ্রাম ও নোয়াখালীর স্থানীয় উপভাষায় বহু আরবী শব্দ, বাগধারা ও ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতির সংমিশ্রণ রয়েছে। এমনকি চট্রগ্রাম অঞ্চলের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বাঙ্গালী কবিদের লেখায়ও আরবী শব্দমালা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। আজো অনেক আরবীয় প্রথা, এমনকি বহু আরবী খেলাধুলা পর্যন্ত সেখানে প্রচলিত আছে।[৫৭]

তাবাকাত-ই-নাসিরীর বর্ণনা মতে, হিন্দু আমলেও বাংলার সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসস্তুপে আবিস্কৃত একটি

---

৫৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশে ইসলাম: কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, পৃ. ৩৪৫

৫৫ ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ৪০

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন আরবী মুদ্রা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ মুদ্রাটি খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খৃ. রাজত্বকাল)-এর শাসনামলে ৭৮৮খৃ./১৭২ হি.) আল-মুহাম্মদীয়া টাকশালে মুদ্রিত হয়েছিল।[৫৮] কুমিল্লার কাছে ময়নামতির ধংসস্তপের মধ্যেও কিছু আরবীয় মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে।[৫৯] এ মুদ্রাগুলো আরব বণিক অথবা ধর্মপ্রচারকগণ খৃ. অষ্টম ও নবম শতকে আনয়ন করেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। সঙ্গত কারণেই আরবী ভাষা-ভাষী প্রাচীন আরব বণিক ও নাবিকগণ প্রাচীন সিরিয়া, বাহরাইন, ইয়েমেন, জেদ্দা প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দর হ'তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উপলক্ষ্যে লোহিত সাগর, আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর পাঁড়ি দিয়ে বাহরাইন ও সিংহল হয়ে বাংলাদেশে পৌছে ব্রক্ষপুত্র নদী অতিক্রম করে চীন দেশে যাতায়াত করতো বলে অনুমান করা হচ্ছে। এভাবেই বঙ্গ দেশের সাথে আরবদের সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশের আরেকটি মাধ্যম ছিল ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অলী-দরবেশগণের অবাধ আগমন। খৃ. সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার শুরু করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর ও সংস্কারমুক্ত জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপকার। দুনিয়ার সমস্ত জাহেলী, শিরকবাদী চিন্তা-চেতনার বিলুপ্তি ঘটিয়ে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের সত্য, সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের যে গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল, জীবদ্দশাতেই তিনি তা সমগ্র আরবে কায়েম করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে রাসুলে আকরাম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফাগণের নির্দেশে দিগ্বিজয়ী সেনাপতিগণ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য পদানত করে এশিয়া ও আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে ইউরোপ ভূখণ্ডের পাদদেশ পর্যন্ত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সত্য, ন্যায় ও সাম্যের বাণী পৌছাতে সক্ষম হন। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে ইসলাম আফ্রো-ইউরোশিয়া মহাদেশের পূর্বে চীন হতে পশ্চিমে স্পেন ও পর্তুগাল এবং উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে ভারত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।[৬০]

হিন্দুস্থানের দিকে মুসলমানদের প্রথম অভিযান প্রেরণ করেন হযরত ওমর ফারুক (রা.) হি. ১৫ সালে। এ সময় বেশ কিছু মুসলিম সাধক ও ধর্ম প্রচারক ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের

---

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৫৮. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (ঢাকা: পুনর্মুদ্রণ,১৯৮৪), পৃ. ১০; K.N.Dikshit - Mamoriors of the Archaeological Survey of India, ১৯৩৮, নং ৫৫, পৃ. ৮৭

৫৯. ঋ. অ কযধহ, জবপবহঃ অৎপযধবড়ষড়মরপধষ উরংপড়াবৎরবং রহ উধংঃ চধশরংঃধহ, করাচী, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬১] এঁদের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মুহাইমিন। দ্বিতীয়বার আসেন হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত মুর্তাজা, হযরত আবদুল্লাহ ও হযরত আবু তালিব প্রমূখ। এভাবে পর পর পাঁচটি দল বাংলাদেশে আসেন।[৬২] তৃতীয় খলিফা হযরত উছমান (রা.) খিলাফতে আসীন হলে তৎকালীন ইরাকের গভর্ণর আব্দুল্লাহ এব্‌ন আমের ভারত সীমান্তের সংবাদ সংগ্রহের জন্য হাকিম ইব্‌ন্ জাব্‌লাহকে নির্দেশ দেন। ৩৯ হিজরীতে চতুর্থ খলিফাহ্ হযরত আলীর (রা.)-এর নির্দেশে হারিছ ইব্‌ন মুররা আব্‌দী সিন্ধু সীমান্তে অভিযান প্রেরণ করেন। ৪৪ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে সেনাপতি মুহাল্লাব ইব্‌ন আবু সূফরী সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ নামক স্থানে পৌঁছে যান। মুহাল্লাবের পর আবদুল্লাহ ইবন সাওয়ার, রাশেদ ইবন আমর জাদীদী, সিনান ইবন সালামাহ, আব্বাস ইবন যিয়াদ ও মুনযির ইবন জারুদ আবদী বারবার হিন্দুস্থান সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেন।[৬৩]

এ সব অভিযানে মুসলমানরা কখনো সাফল্য আবার কখনো ব্যর্থতার সন্মুখীন হলেও হিন্দুস্থান জয়ের স্বপ্ন কখনো বিস্মৃত হয় নি। কারণ হিন্দুস্থান জয়ের ব্যাপারে সাহাবী হযরত সওবান (রক্ষ) বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সা.) বিজয়ের পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে এ বলে উৎসাহিত করেছেন যে, "আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত দু'টি সেনাদলকে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি দেবেন। তন্মধ্যে একটি হল হিন্দ (ভারত) আক্রমনকারী সেনাদল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মারয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.)-এর সহযোগী সেনাদল।[৬৪]

অন্য এক বর্ণনায় খ্যাতনামা সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন – "রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদিগকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিৎ ওয়াদা দিয়েছেন, অতএব আমি যদি সে সময় জীবিত থাকি তবে অবশ্যই আমার ধন-সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না। সেখানে আমি নিহত হলে

---

৬০. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২), ইফাবা ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৯-২০

৬১. ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ৭,

৬২. ড. হাসান জামান,সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য, (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭), পৃ. ২১১, এবং সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭), খ. ২, পৃ. ৫৭-৫৮

৬৩. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৬৭

৬৪. নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ ও মুসনাদে আহমাদ, সাওবান বর্ণিত হাদীস অধ্যায়,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা লাভ করব আর যদি সহি সালামতে ফিরে আসতে পারি তবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব।"[৬৫]

মহানবী কর্তৃক ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানগণ একের পর এক ভারত অভিযান চালিয়ে যায়। ৯৩ হি. উমায়্যাহ্ খলিফাহ্ ওয়ালিদ ইবন্ আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের সময়কালে ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে মোহাম্মদ বিন্ কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু অভিযান প্রেরিত হয় এবং রাজা দাহিরকে পরাভূত করে সিন্ধু বিজয় লাভ করে।[৬৬] ৭১১-৭১৩ খৃ. সিন্ধু ও মুলতান আরবদের হাতে আসে। ৯৯৫-১০৩০ খৃ. পর্যন্ত গযনীর সবুক্তগীন ও তাঁর পুত্র সুলতান মাহমুদ সতরবার ভারত অভিযানে বের হন। সুলতান মাহমুদের সতরবার উত্তর ভারত অভিযানের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বের কাছে ভারতের সামরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যায়।[৬৭] এরি পটভূমিতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ খৃ. রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বঙ্গ বিজয় লাভ করেন। তিনি এত ক্ষিপ্রগতিতে নদীয়া আক্রমণ করেন যে, তিনি যখন রাজা লক্ষণ সেনের রাজপ্রাসাদের সিংহ তোরণে এসে উপস্থিত হন, তখন তাঁর সাথে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী ছিল।[৬৮] বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসন স্থায়ীরূপ লাভ করলেও তার প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে শাহাবুদ্দীন ঘোরী ১১৭৩ খৃ. এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন।

বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই অষ্টম শতকের মধ্যে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের উপনিবেশ ও বসতি গড়ে ওঠে। তারও আগে খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রারম্ভেই মালাবারের মুহাজির আরবরা ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর এরা এসব অঞ্চলে ইসলামের একনিষ্ঠ প্রচারকে পরিণত হন এবং স্থানীয় জনসাধারণ থেকে শুরু করে রাজ দরবার পর্যন্ত একটি নৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। যার প্রমাণ মিলে চেরর (মালাবার) রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমালের ইসলাম গ্রহণ পূর্বক স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে মক্কা গমনের মধ্য দিয়ে।[৬৯]

---

৬৫. নাসায়ী, খ. ২, পৃ. ৬২
৬৬. মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস (ঢাকা:ঐতিহ্য, ২০০২),পৃ. ৬২-৪
৬৭. এস. সি. রায় চৌধুরী, সোস্যাল, কালচারাল এণ্ড ইকনোমিক হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া (দিল্লী: সুরজিদ পাবলিকেশন্স, ১৯৪৮)
৬৮. গঁযধসসধফ গড়যড়ং অষর, ঐরংঃড়ৎু ড়ভ ঃযব গঁংষরস ড়ভ ইবহমধষ (জরুধফয: ওসধস গঁযধসসধফ ওনহ ঝধদঁফ ওংষধসরপ টহরাবৎংরঃু, ১৯৮৫), ঠড়ষ. ১, চচ.৩৫
৬৯. আব্বাস আলী খান, বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫), পৃ. ১৩-১৯

ইসলামী মিশন শুরু হওয়ার আগে শত শত বছর ধরে আরব বণিকদের সাথে স্থানীয় লোকদের মেলামেশা ছিল শুধুই বৈষয়িক। তাতে পারস্পরিক আন্তরিকতা, ভাবের আদান-প্রদান ছিল কম। ভাষার বিনিময়ও ছিল সীমিত। ইসলাম আসার পর এসব সংকীর্ণতা বিদূরিত হল। অবাধে আরব-বাঙ্গালী মেলামেশা শুরু হল। আরবের ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে হুড় হুড় করে বাংলা ভাষায় আরবী শব্দ ও আরবী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করলো।

এরপর খৃষ্টীয় নবম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে বেশ কিছু সুফি-সাধক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশে আসেন। যাদের বেশির ভাগই ছিল আরব ও ইরানীয়। হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচার করেন এবং বাংলার আনাচে কানাচে বসতিস্থাপনসহ বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করেন।[৭০] এদের মধ্যে সুলতান বায়েজীদ (মৃ. ৮৭৪ খৃ.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে এ বিখ্যাত সাধকের মাঝার শরীফ বিদ্যমান আছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।[৭১] মীর সায়্যিদ সুলতান মাহি সাওয়ার ১০৪৭ খৃ. বাংলায় আগমন করেন। বগুড়া জেলার মহাস্থানে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত। শাহ সুলতান মোহাম্মদ রুমী ১০৫৩ খৃ. তাঁর মুর্শীদ সায়্যিদ শাহ সুর্খখুলসহ ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার মদনপুরে আসেন। এখানে আজো তাঁর মাজার শরীফ বিদ্যমান। বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কিংবদন্তির নায়ক বাবা আদম শহীদ ১১১৯ খৃ. বাংলায় আগমন করেন। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ মহিউদ্দীন আবু ছালেহ আরাবী। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে এ পূণ্যাত্মার মাজার শরীফ অবস্থিত। মাজারের পাশেই বাবা আদম শহীদের মসজিদ নামে একটি জীর্ণপ্রায় মসজিদও রয়েছে। মাখদুম শাহ্ দৌলাহ শহীদ ইনি ইয়ামেনের শাসনকর্তা রাসূলে কারীম (সা.)-এর অন্যতম সাহাবী হযরত মু'আয ইব্ন জাবালের বংশধর বলে কথিত। পাবনা জেলার শাহজাদ পুরে তাঁর সমাধী অবস্থিত।[৭২] পশ্চিম বঙ্গের বধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোটের যে আঠারজন দরবেশের কাহিনী অতি প্রশিদ্ধি লাভ করেছে, মখদুম শাহ মাহমূদ গজনবী (র.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইনি 'রাহাপীর' নামে খ্যাত ছিলেন। মাহমূদ শাহ্ মাখদুম গজনবী (র.)-এর মাজার বর্দমান জেলার মঙ্গলকোটে আজো বিদ্যমান।[৭৩]

উল্লিখিত সুফী সাধকগণ বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় আসকে শুরু করেন এবং হিন্দু রাজাদের রাজত্বে দাপটের সাথে ইসলাম প্রচার করেন। অনেকে হিন্দু

---

৭০. আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা:বাংলাদেশ (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ. ২০-২১

৭১. এ. হক, বঙ্গে সুফি প্রভাব, পৃ. ১৪৭

৭২. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৭৪-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

রাজাদের সাথে সম্মুখ সমরে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁদের নির্মিত বহু খানকা, সমজিদ ও মাদ্রাসা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আজো বিদ্যমান। এদের অনেকে বহু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেন। এরা আরবী ও ফার্সী ভাষা-ভাষী হওয়ায় এদেশীয় ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাব পড়ে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। মোট কথা ১২০-৩ খৃ. বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেই এ দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিতে আরবীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গ ও বাঙ্গালাহ্ শব্দ দু'টির মূলও যে আরবী এ বিষয়টিও বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর মাধ্যমে অধ্যাপক আনিসুল হক চৌধূরী তাঁর 'বাংলার মূল' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশে যাদের দান সর্বোতভাবে স্বীকার্য, তারা হলেন মুসলিম স্বাধীন সুলতানগণ। ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত (১২০৩-১৮৩৭ খৃ.) দীর্ঘ ছয় শতাধিক কাল ব্যাপী এ দেশের স্বাধীন সুলতানগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশের সুক্ষ্ম কাজপি সম্পন্ন করেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারত বর্ষের পাঞ্জাব সিমান্তে তুর্কী এবং ইরানীরা হানা দেয়। ১২০২ খৃ. নাগাদ বহিরাগত তুর্কী সেনাদের দ্বারা বাংলাদেশ বিজিত হয়। সেমেটিক রক্তের বিজয়ী তুর্কী শাসক ও তাদের অনুগামী আরব ও ইরানের বণিক, ধর্ম প্রচারক, আলেম-ওলামা ও সুফীগণ আরবী-ফার্সী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৭৪] তুর্কীরা ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমান আর সংস্কৃতিতে ফার্সী। তাঁরা তুর্কী ভাষায় কথা বলতো, রাজনীতিতে ফার্সী এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহার করতো।[৭৫] এভাবে রাজার ভাষার প্রভাব প্রজাসাধারণের উপর পড়তে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ বাংলা ভাষার যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তা আজকের তুলনায় একটি মিশ্রভাষা বলেই মনে হবে এবং এটি যে তৎকালিন আরবী ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার ফল তাও অনিবার্য সত্য হিসেবে প্রকাশ পাবে। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে সজনীকান্ত দাস বলেছেন, এক হিসেবে ১৭৭৮ খৃ. যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখ্ছি তা দেশে মুসলমান প্রভাবের ফল।[৭৬] দীর্ঘদিন যাবৎ আরবদের সংস্পর্শে থাকার ফলে ইসলাম কবুল করে আরবী ভাষায় রচিত কোরআন-

---

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৭৪. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০২), ৩য়,সং. পৃ. ৯৭
৭৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস অধ্যয়ন এবং রাজকার্যে বাধ্যতামূলক আরবী ভাষা ব্যবহারের কারণেই আরবী শব্দাবলী মুসলিম কি অমুসলিম সকল বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার্য বুলি হিসেবে শিরায় উপশিরায় মিশে গেছে।

সাত

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'। এগুলো কোন সাহিত্যের ভাষায় রচিত হয়নি কিংবা কোন সাহিত্য সাধনার অংশও নয়। এগুলো তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পুরোহিতগণ তাদের ধর্মীয় বাণী সহজ ভাবে সহজ ভাষায় লোক সমাজে পৌঁছে দেবার নিমিত্তে লিখেছিলেন। ঐ সময়ের আর কোন পদবাচ্য না থাকার ফলে সাহিত্য সাধনার প্রথম ধাপে এ চর্যাপদগুলোর যথেষ্ট কদর ছিল। তবে এগুলোতে বহিরাগত শব্দের প্রভাব নেই বললেই চলে। মূলত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম শাসকগণের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। এর ব্যাপ্তি ঘটে চতুর্দশ শতকে এসে। এ সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের আবির্ভাব ঘটে পঞ্চদশ শতকে। ষোড়শ শতকে এসে এ সাহিত্যে আরবী ভাষার প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করে। যদিও এর উপস্থিতি শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের ঊষা লগ্ন থেকেই। এ যাবৎ আমাদের কাছে বাংলা সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলায় মুসলিম অভিযানের (১২০৩ খৃ.) সাথে সাথে আরবী শব্দতো বটেই মুসলমানী 'পুরাণ'ও বাংলা সাহিত্যে শক্ত অবস্থান করে নেয়। এরপর ধাপে ধাপে তুর্কী পেরিয়ে পাঠান এবং পাঠান থেকে মোগল পর্যন্ত সকল মুসলিম শাসকই আরবী প্রভাব পুষ্ট বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পণ্য বা শিথিলতা প্রদর্শন করেননি। এ ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকগণের সমকালিন অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়।

(ক) তুর্কী আমল:(১২০৩-১৩৫০ খৃ.)

মূলত ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ ইব্‌ন্ বখতিয়ার খিলজির (১২০১-৩ খৃ.) বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে সংস্কৃতির পালা বদল শুরু হয়। ফার্সী ছিল তাঁদের চিরাচরিত, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ভাষা; আরবী ছিল তাঁদের কোরআন-হাদীস, ফিক্‌হ-আকাইদ তথা ইসলামিক সাহিত্যের বাহন। ফলে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যেমন ফার্সী শিক্ষা ছিল অপরিহার্য তেমনি ধর্মের তাকিদে হাদীস-তাফসীর ও ফিকহ্-আকাইদ শিক্ষাও ছিল অনস্বীকার্য।[৭৭] বখতিয়ার খিলজি নদীয়ার পরিবর্তে রংপুরে রাজধানী স্থানান্তরপূর্বক এখানে বেশ কিছু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাস্থাপন করেন। এগুলো ছিল তৎকালীন

---

৭৬. আব্বাস আলী খান, বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৮০-৮৬
৭৭. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭),পৃ. ৫১৬

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সংস্কৃতির সুতিকাগার। এখানেই আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো।[৭৮] সুতরাং বখতিয়ার খিলজিই যে সর্ব প্রথম বঙ্গ দেশে আরবী শিক্ষার প্রবর্তন করেন এতে কোন সন্দেহ নেই।[৭৯]

মুসলিম শাসনের প্রাথমিক যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের অন্যতম ছিলেন কাজী রুকনউদ্দিন সমরকন্দী (র.)। তিনি ছিলেন আলী মর্দান খিলজীর (১২১০-১২১৩ খৃ.) রাজত্বকালের লক্ষণাবতীর কাজী। আলী মর্দান খিলজীর রাজত্বকালে লক্ষণাবতী শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। ফলে মুসলিম ওলামা আর পীর-মাশায়েখগণ ছাড়াও বহু হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদী, বেদান্ত ও দার্শনিক এখানে আসেন। এদের সাথে মুসলিম পণ্ডিত রুকনউদ্দিন সমরকন্দীর ধর্মীয় ও দার্শনিক আলোচনা হয়। এদের অনেকেই ইসলামের উচ্চতর ভাবধারা অনুধাবন করে মুসলমান হয়ে যান। বেদান্ত ব্রাক্ষণ অন্তনাথের বেলায়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অতঃপর ভোজর ব্রাক্ষণের লেখা 'অমৃতকুন্ড' গ্রন্থটি কাজী রুকনউদ্দীনকে উপহার দিলে তিনি গ্রন্থটি আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবীতে 'হাওফুল হায়াত' ও ফার্সীতে 'বাহরুল হায়াত' নামে গ্রন্থ দু'টির অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন।[৮০] এতে অন্যান্য জাতির জ্ঞান সম্বন্ধেও বাংলার মুসলমান পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ, ইউরোপ ও ইরানের কয়েকটি পাঠাগারে উক্ত অনুবাদ গ্রন্থটির কতিপয় পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।[৮১] 'অমৃতকুণ্ডের' অনূবাদ সূফীদের নিকট খুবই জনপ্রিয় ছিল। ইহা হিন্দু মরমীবাদ ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুদের তপস্যা এবং যোগতন্ত্রের উপর প্রামাণিক গ্রন্থ হলেও মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের নিকট উহা একটি সুপরিচিত গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ফলে গ্রন্থটি পরবর্তিকালে আরবী-ফার্সী উভয় ভাষাতেই একাধিকবার অনূদিত হয়।[৮২]

১২১৩-১২২৭ খৃ. বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খিলজী। ইনিও লক্ষণাবতীতে একটি মাদ্রাসা, একটি মসজিদ ও একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন।

ঝ. ক. ওশৎধস্ ঝঢ়বধৎ, (বফ) ঈষঁংৎধষ ঐবৎরঃধমব ড়ভ চধশরংঃধহ (খড়হফড়হ, ঙীভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু চৎবংং 1955), P.111; অথবা ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, পৃ. ১

৭৯. আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা:বাংলাদেশ (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ. ১৯
৮০. মমতাজুর রহমান তরফদার, হুসাইন শাহী বেঙ্গল (ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ. ২২১

৮১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (ঢাকা: এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), খ. ৩, পৃ. ৩৮৮
৮২. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পৃ. ১৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া তিনি বহু সংখ্যক আলেম, ফকির ও সৈয়দকে বৃত্তি প্রদান করেন।[৮৩] এরি ধারাবাহিকতায় পরবর্তী মুসলিম শাসকগণও বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অনন্যভূমিকা পালন করেন। বলবন বংশের রাজত্ব কালে দিল্লীর বিখ্যাত ফার্সী কবি আমীর খসরু দু'বার গৌড়ের রাজধানীতে আগমন করেন।

তুর্কী আমলে কোন কোন সাধক স্বয়ং খানকাহ্ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে মুসলিম বাংলার খ্যাতনামা দরবেশ ও বিদ্বান ব্যাক্তি আল্লামা শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার (মৃ. ১৩০০ খৃ.) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি বর্তমান রাশিয়ার বুখারা প্রদেশ থেকে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ও জামাতা শেখ শরফুদ্দিন আহমদ বিন ইয়াহইয়া মানেরীকে (১২৬৩-১৩৮১ খৃ.) সাথে নিয়ে ১২৭৪-৭৭ খৃ. ঢাকার সোনারগাঁয়ে এসে একটি মাদ্রাসা ও খানকা স্থাপন করেন। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, আকাইদ ইত্যাদি ধর্ম ও তত্ত্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং রসায়ন বিদ্যা, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত ইসলামী মরমীবাদের উপর মূল্যবান গ্রন্থ 'মাকামাত' এবং ফিকহ্ শাস্ত্রের উপর 'নাম-ই-হক' ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম বাংলার বিশেষ অবদান রূপে বিবেচিত।[৮৪] সোনারগাঁয়ের মাদ্রাসাটিকে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য আবু তাওয়ামাকে বাংলার ইসলামী তথা আরবী শিক্ষার পথিকৃত বলা যেতে পারে।[৮৫] মখদুম শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীও ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব ও মরমীবাদের উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন।[৮৬]

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে মাওলানা তকিউদ্দীন আরাবী আরব দেশ থেকে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাংলাদেশে আগমন করেন এবং রাজশাহী জেলার মহিসুনে শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটিকে বাংলার প্রথম ইসলামিক মাদ্রাসা বলা হয়ে থাকে।[৮৭]

---

৮৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২২
৮৪. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ১৯২
৮৫. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম , পৃ. ৯৯-১০০
৮৬. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ১১৭

৮৭. আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম , পৃ. ৯৭-১০০

Dhaka University Institutional Repository

তুর্কী আমলে বঙ্গে ইসলামের দ্বার যিনি উদ্ঘাটন করেন তিনি হলেন মখদুম শেখ জালালুদ্দীন তিবরিজী (র.) (মৃ. ১৩২৫ খৃ.)। এ পীরের বহু অলৌকিক কাহিনী হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনের রাজ সভাপণ্ডিত হলায়ূধ মিশ্রের 'শেক শুভোদয়া' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে অনেক আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।[৮৮]

এছাড়াও আরো যে সকল পীর-মাশায়েখ সে সময় বাংলায় আগমন করেন তাদের মধ্যে গাজী মুলক্ ইকরাম খান (র.) (আ. ১২১৪ খৃ.) ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (১১৪৪-১২৩৬ খৃ.)-এর শিষ্য আবদুল্লাহ কিরমানী (র.) বীরভূম জেলার খুস্তিগীরি অঞ্চলে, মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী (র.) 'রাহী পীর' (আ. ১২০২ খৃ.) বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে, শাহ সফিউদ্দীন শহীদ (র.) সপ্তগ্রামের ত্রীবেণীতে, মখদুম শাহ দৌলা (র.) (১২৫০ খৃ. জীবিত) পাবনা ও বগুড়া অঞ্চলে, সৈয়দ আব্বাস আলী মক্কী (র.) 'পীর গোরাচাঁদ' চব্বিশ পরগনার বারগুা অঞ্চলে, বদরুদ্দীন আল্লামা 'বদরশাহ' (র.) চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সুলতানুল আউলিয়া মাওলানা আতা (র.) (১৩০৩-১৩৫০ খৃ.) দিনাজপুর অঞ্চলে এবং হযরত শাহ্ জালাল ইয়ামেনী (র.) (মৃ. ১৩৪৭ খৃ.) সিলেট অঞ্চলে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে শাহজালালের অবদান অতুলনীয়। সমকালিন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন, তাঁর হাতে এদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।[৮৯] খৃষ্টীয় চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এ জায়গাটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। উল্লিখিত পীর মাশায়েখদের ধর্মীয় তৎপরতার ফলেই আরবী শিক্ষার প্রসার ছাড়াও তৎকালীন মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তক, সরকারী নথিপত্র, মুদ্রা, মসজিদ-মাদ্রাসার শিলালিপিতে আরবী ও ফার্সীর বহু নিদর্শন খুজে পাওয়া যায়। মসজিদের ফলক ও দেয়ালে কোরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী উৎকীর্ণ করা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। মুদ্রায় সন-তারিখ-স্থানসহ সুলতানের নাম-ধাম-উপাধী-গুণাবলী ইত্যাদি অংকিত হতো।[৯০]

---

৮৮. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ৯৯
৮৯. ইবনে বতুতা, 'আযায়েবুল আসফার, উর্দু অনুবাদ, খ. ২, পৃ. ৩৮৩
৯০. ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে বাংলার সুলতান ও পদস্থ ব্যাক্তির নাম বিজড়িত ১২টি শিলালিপির পরিচয় জানা যায়। এ গুলোর মধ্যে ৪টি বিহার, ২টি মুঙ্গের এবং বাকি ৬টি বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে আবিস্কৃত হয়। মধ্য যুগের প্রাপ্ত এরূপ শিলালিপির সংখ্যা দু'শতেরও অধিক। এ গুলোর সবটাই আরবী ও ফার্সী ভাষায় খোদাইকৃত। Shamsuddin Ahmed (edited) ওহংপৎরঢ়ঃরড়হং ড়ভ ইবহমধষ, ঠড়ষ, ৪, ঠধৎবহফৎধ জবংবধৎপয গঁংবঁস, জধলংযধযর, চ়-৩১৭-৩৮, চষধঃব হড়-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তুর্কী আমলে উপরোল্লিখিত বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলায় আরবী ও ফার্সী ভাষার আমদানী হয় এবং রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তা শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন হয়ে উঠে। শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-শিক্ষা-জ্ঞান-সংস্কৃতির বাহন হিসেবে সংস্কৃত, আবরী ও ফার্সী ভাষার অনুশীলন করেন। কি হিন্দু কি মুসলমান কেউ লোক ভাষা বাংলাকে গ্রহণ করেননি।[৯১] এমন কি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজারাও বাংলাদেশে মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দেখাননি। রাজ সভায় কবিরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন।[৯২]

তুর্কী আমলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিদর্শন 'শূন্য পুরাণ'। ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পণ্ডিত কর্তৃক রচিত শূন্য পুরাণে বেশ কিছু আরবী ফার্সী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উক্ত শূন্য পুরাণের অন্ত র্গত 'নিরঞ্জনের রুস্মা' কবিতায় মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশের ফলে কিভাবে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে, তার কাল্পনিক চিত্র অংকিত হয়েছে এভাবে:

ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈল পেকম্বর
আদম হৈল শূল পানি।
গণেশ হৈল কাজী কার্ত্তিক হৈল গাজী
ফকীর হৈল যত মুনি।

....

আপনি চণ্ডিকা দেবী হিত হৈলা হায়া বিবি
পদ্মা বিবি হৈলা বিবি নূর।[৯৩]

তবে আরবী-ফার্সী প্রভাবের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের চর্চা না হলেও তুর্কী বিজয়োত্তর প্রথম দেড়শ' বছরকে বাংলা ভাষার ভিত্তি গঠনের এবং সাহিত্যের পটভূমি রচনার যুগ বলা যেতে পারে।

(খ) স্বাধীন মুসলিম বাংলার পাঠান আমল: (১৩৫০-১৫৭৬ খৃ.)

'শূন্য পুরাণের' পর ১৩৫০ খৃ. থেকে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত মধ্যযুগ। ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পরিচালনায়। সে থেকে ১৫৭৬ খৃ. বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ খান কররাণীর পতন পর্যন্ত গৌড়ের দরবারে বাংলা

---

৯১. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ১০৬
৯২. সম্পাদক, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢা.বি.,জুন.২০০০, তেতাল্লিশ বর্ষ, সং.৩, পৃ. ৬৯
৯৩. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ (ঢাকা:আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৭৭), পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও সাহিত্যের কদর ছিল প্রচুর। এ সময় বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষা রাজ দরবারে প্রবেশ করে এবং স্বাধীন সুলতানদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়তে সক্ষম হয়।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীন মুসলিম বঙ্গের গোড়া থেকেই সুলতানদের বাঙ্গালী রমনী বিবাহের সুত্র ধরে বাংলা ভাষা মুসলিম রাজ অন্তপুরে প্রবেশ করতে থাকে। তার উপর গৌড়ের হেরেমে বাঙ্গালী পরিচারিকার নিযুক্তিতেও এ ভাষা রাজ পরিবারে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। শাহী দরবারে ব্যাপক সংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারী নিযুক্তিতে বাংলা ভাষা গৌড়ের শাহী দরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। তদুপরি জালালুদ্দীনের (যদু)-এর ন্যায় খাঁটি বাঙ্গালী মুসলিম সুলতানের মাতৃভাষা প্রীতি এ ভাষাকে শাহী দরবারে যে প্রতিষ্ঠা দান করে তা হোসেনী বংশের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্প ও সাহিত্য প্রীতির সাথে মিশে বাংলা সাহিত্য চর্চাকে দেশময় ছড়িয়ে দেয়।[৯৪] এভাবে বাংলা ভাষার যেমন ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে তেমনি শাহী দরবারের আরবী ভাষাও ব্যাপকভাবে বাংলায় অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে।

বাংলার স্বাধীনতার যুগে মুসলিম শাসকগণ ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। মধ্যযুগের প্রথম কবি বড়ুচণ্ডিদাস সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে (১৩৫৭-১৩৯৩ খৃ.) রাজ অনুগ্রহ লাভ করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন। এটি রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমকাব্য।[৯৫] শ্রীকৃষ্ণকীতনেই ব্যবহৃত হয়েছে সাত- আটটি আরবী ফার্সী শব্দ।[৯৬]

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯ খৃ.) পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজকে (১৩২০-১৩৮৯ খৃ.) বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কবি স্বয়ং আসতে অপারগ হলে সুলতানকে একটি গজল উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন।[৯৭]

মধ্য যুগের দ্বিতীয় কবি এবং মুসলমানী বাংলা সাহিত্যে আদি কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও সুলতান কর্তৃক অনুগৃহীত হয়েছিলেন। এ সময় শাহ্ মুহম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ইউসুফ জোলায়খা' রচনা করেন। 'ইউসুফ জোলায়খা'র কাহিনী সংগৃহীত হয়

---

৯৪. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৩৯

৯৫. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ৩য় সং, পৃ. ১১১

৯৬. শব্দগুলো হচ্ছে- কামান (ধনু),খরমুজা, মুজরিয়া, মজুর, বাকী, লেম্বু (নেবু), আফার (প্রচুর) ইত্যাদি। দ্রঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০

৯৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১; মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারিখ-এ-ঢাকা (কলিকাতা:ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৯১০), পৃ. ৩৪

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন থেকে। এ ধর্মীয় ও রম্য উপাখ্যান বাংলা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে।[৯৮] বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবির প্রথম গ্রন্থেই আরবী শব্দ ব্যবহারের বাহুল্যতা লক্ষণীয়:

কোরাণ কিতাব মধ্যে দেখিনু বিশেষ।
ইছুফ জলিখা কথা অমৃত বিশেষ।।
কহিব কেতাব চাহি সুধারস পুরি।
শুনহ ভক্ত জন শ্রুতি ঘট ভরি।।[৯৯]

এ সময় আরো অনেক মুসলমান কবি প্রেমকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে সবচে' খ্যাতনামা ছিলেন 'হানিফা ও কয়রাপরী' কাব্যের কবি সারিবিদ খান (ষোড়শ শতকে জীবিত), 'সয়ফুল মুল্‌ক্' কাব্যের রচয়িতা দোনাগাজী ও 'লাইলী-মজনু' কাব্যের প্রতিভাশালী কবি দৌলত উজীর বাহরাম খাঁ (ষোড়শ শতকের কবি) উল্লেখ্যযোগ্য।[১০০]

মুসলমান কবিগণ আরবী ও ফারসী সাহিত্যের রম্য উপাখ্যান থেকে তাদের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খৃ.) সভাকবি শেখ জৈনুদ্দীনই (পনের শতকের কবি) প্রথম কবি যিনি রাসুলের অসাধারণ ও অলৌকিক কৃতিত্ব অবলম্বন পূর্বক 'রসূল বিজয়' কাব্য রচনা করেন। তাঁর অনুকরণে অন্যান্য মুসলমান কবিগণও 'রসূল বিজয়' কাব্য রচনা করেন। এরি ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিক কাহিনী কাব্য হিসেবে সমাদৃত শেখ ফয়জুল্লাহ্ (জ. ১৫৪৫ খৃ.) কর্তৃক 'গাজী বিজয়' ও 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্য রচিত হয়। মুসলমান কবিদের এ বিজয় কাব্যগুলো বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব বিবর্তন এনে দেয়।[১০১] শেখ ফয়জুল্লাহ্ তাঁর 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যে নিরেট আরবী শব্দ 'রাজী' ব্যবহার করেছেন:

গোর্খ বিজয় আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।

---

৯৮. এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা:পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৫৫), পৃ. ১০৪
৯৯. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ , পৃ. ২০৪
১০০. এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১১৬

১০১. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ২৫৬-৫৭

খোঁটা দূরের পীর ইসমাঈল গাজী
গাজীর বিজ এ সেই মোক হইল রাজি ।[১০২]

বাংলা ভাষায় মরমী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুসলমান কবিগণ কৃতিত্বের দাবিদার। পারস্যের মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী ও অন্যান্য সুফী কবিদের 'গজলিয়াৎ' এর অনুকরণে তারা এসব 'পদাবলী' রচনা করেন। এদের মধ্যে নবদ্বীপের চাঁদ কাজী এ জাতীয় কাব্য ধারার পথিকৃত বলে স্বীকৃত।

মুসলমান কবিদের আর একটি অনবদ্য সৃষ্টি হল 'সত্যপীরের' কাহিনী ও ঐতিহ্য। শেখ ফয়জুল্লাহ্ ছিলেন 'সত্যপীর' বিষয়ক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে প্রথম বাঙ্গালী কবি।[১০৩] এ সকল কাব্যের রচনাকাল ১৫৪৫ থেকে ১৫৭৫ খৃ.-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ জাতীয় কাব্য সাহিত্য বাঙ্গালী সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল বিধায় পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর কবিগণই 'সত্যপীরের' উপর সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

মুসলমান কবিদের এ সকল অনবদ্য সৃষ্টি শিশু প্রায় বাংলা সাহিত্যকে তাদের বিষয় বস্তুর ঐশ্বর্য ও চিন্তাধারা দিয়ে সমৃদ্ধশালী করে তোলে এবং আরবী ও ফার্সী ভাষা থেকে বহু শব্দ, প্রবাদ ও ভাষা-পদ্ধতি আমদানী করে বাংলা ভাষায় এক অসাধারণ জীবনী শক্তি সঞ্চয় করেন। তাঁরা তাদের ভাষার সংগতি রক্ষার্থে এবং বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব তোলে ধরার প্রয়োজনে যথাস্থানে আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রয়োগ ঘটান। মুসলিম কবিগণ অনায়াসে আল্লাহ, খোদা, নবী, পয়গাম্বর, কোরান, হাদিস, কেতাব, আলেম, ফাজিল, রাসূলে খোদা, নূরে মোহাম্মদী, সওয়াল, জওয়াব, গুনাহ, মাফ, নেক, বদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।[১০৪] মধ্য যুগে এমন কোন মুসলিম কবি পাওয়া যাবেনা যিনি তাঁর কবিতায় সচেতন ভাবেই আরবী শব্দ ব্যবহার করেননি।

মুসলমানদের ভাষা বিষয়ক ঐতিহ্যের প্রাচুর্য এবং ইহার শক্তিশালী প্রাণ চাঞ্চল্য হিন্দুদেরকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে বাস্তবিকই কালক্রমে আরবী ও ফার্সী শব্দ এবং এর বাচ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের এরূপ একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে দাঁড়ায় যে, গোঁড়া হিন্দু কবিরাও

---

১০২. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ, পৃ. ২১৩
১০৩. এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১১৩
১০৪. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

এর ব্যবহার না করে পারেননি। কেননা তারা ঐ সকল সাবলিল ও প্রাণবন্ত শব্দ সমুহের উপযুক্ত প্রতিশব্দ অন্যত্র খুঁজে পাননি।

মোগল আমলের প্রথম শতাব্দির শেষ আটাশ বছর (১৪১৪-১৪৪২ খৃ.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় শাহী দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্বীকৃতি লাভ করে। সংস্কৃতে রচিত ধর্মকথা বাংলা ভাষায় লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকির 'রামায়ন'কে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেন এবং গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন শাহের দেয়া সম্মান সূচক খান উপাধী অর্জন করেন।[১০৫]

সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খৃ.) ছিলেন বাঙ্গালী কবিদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি মালাধর বসুকে ভগবতের বাংলা অনুবাদ করার কাজে নিয়োজিত করেন। মালাধর বসু ১৪৭৩ খৃ. থেকে ১৪৮০ খৃ. পর্যন্ত সাত বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন। তাঁর এ দীর্ঘ কাব্য রচনায় মুগ্ধ হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ বংশের শেষ সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের (১৪৮১-১৪৮৭ খৃ.) পৃষ্ঠপোষকতায় ১৪৮৫ খৃ. ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁর সুবিখ্যাত সামাজিক ইতিহাস 'মহাবংশবলী' রচনা করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সাহিত্য ইতিমধ্যে সামাজিক স্তরেও প্রবেশ করেছে।[১০৬]

এরপর হুসাইন শাহী বংশ তাঁদের রাজত্বকালের পয়তাল্লিশ বছরে (১৪৯৩-১৫৩৮ খৃ.) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যা করেছে তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ একমাত্র শাসক, যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং বাঙ্গালী কবিদের পৃষ্ঠপোষকতাদানে একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি খাঁটি আরবী হলেও বাঙ্গালী পরিবারে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় বাংলার জনগোষ্ঠীর মূল স্রোতের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এর পরিণাম হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক।[১০৭] কবি বিজয় গুপ্ত (পনের শতকের শেষ পাদের কবি)-এর 'মণষা-মঙ্গল' ও কবি বিপ্রদাস পিলিপাই (পনের শতকের শেষ দিকের)-এর 'মণষা-বিজয়' কাব্যে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের মহানুভবতার উচ্ছসিত প্রশংসা করা

---

১০৫. কাজী রফিকুল হক, বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী-তুর্কী-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান, সাহিত্য পত্রিকা (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ২০০০) তেতাল্লিশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৭০

১০৬. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ২য় সং, পৃ. ৩১

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত পাঁচালী' রচনা করেন।[১০৮] যা 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত। তাঁর আমলে চৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃ.) আবির্ভাব অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা। চৈতন্য দেব তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় 'গৌড়িয়-বৈষ্ণব-মত' প্রচার করায় বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা শুরু হয়।[১০৯] পরবর্তীতে কয়েকজন মুসলিম কবিও[১১০] বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

স্বাধীন মুসলিম বঙ্গের সাংস্কৃতিক বিকাশে একদিকে মুসলিম সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা অপরদিকে আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখদের[১১১] দলে দলে ইসলাম প্রচারের ফলে সংস্কৃতির বাহন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ করে সেকালের বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীতে ব্যাপক আরবী ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(গ) মোগল আমল (১৫৭৬-১৭৫৭ খৃ.)

পাঠান যুগের অবসানের পর ১৫৭৬ সালে বাংলায় মোগল রাজত্ব শুরু হয়। যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৭৫৭ খৃ. পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে। মোগল আমলে বাংলাদেশে ফার্সী ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রায় ১৮০ বছর ধরে বাংলার সাধারণ জনগোষ্ঠী তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফার্সী ভাষার চর্চা করতে থাকে। মুদ্রার পৃষ্ঠে ফার্সী, মসজিদ গাত্রে ফার্সী, গৃহ নির্মাণ লিপিতে ফার্সী, শাহী ফরমানে ফার্সী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফার্সী, রাজস্ব বিভাগে ফার্সী, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ আলোচনায় ফার্সী দেদার চলতে থাকে। ফলে বিদ্যাবত্তা, চাকরী-বাকরী এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও ফার্সী হয়ে উঠল।[১১২] অগত্যা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফার্সী শিখতে শুরু করল। ফার্সীর প্রভাব এতটাই সুদৃঢ় হল যে, স্থানীয় হিন্দু-

---

১০৮. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিকব ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ২৫২

১০৯. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ২য় সং, পৃ. ৩২

১১০. চাঁদ কাজী, শেখ কবীর, আফজল আলী প্রমূখ।

১১১. গৌড়ের আঁখি সিরাজুদ্দীন (মৃ. ১৩৫৭ খৃ.), পাণ্ডয়ার শেখ আতাউল হক (মৃ. ১৩৯৮ খৃ.), নূর কুতুবুল আলম (মৃ. ১৪১৬ খৃ.), হুগলীর ফুরফুরার শাহ আনোয়ার কুলী হলবী (মৃ. ১৩৭৫খৃ.), রংপুরের শাহ ইসমাইল গাজী (মৃ. ১৪৭৪ খৃ.),খুলনার খান জাহান আলী (মৃ. ১৪৫৮ খৃ.), সোনারগাঁয়ের হাজী বাবা সালেহ (মৃ. ১৫০৬ খৃ.), শ্রীহট্টের শাহ জালাল ইয়ামেনী র. (মৃ. ১৩৪৭ খৃ.), চট্টগ্রামের শাহ মুহসিন আউলিয়া (মৃ. ১৩৯৭ খৃ.), ত্রিপুরার রাস্তী শাহ (১৩৫১-১৩৮৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে), রাজশাহীর মাওলানা শাহ দৌলা (জী. ১৩১৯ খৃ.), মুর্শিদাবাদের শাহ চাঁদ প্রকাশ দাদা পীর (১৪৯৬-১৫১৯ খৃ.), সপ্তগ্রামের সৈয়দ আমুলী (মৃ. ১৫৩১ খৃ.)। (দ্রঃ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ২য় সং, পৃ. ৩৭-৩৮

১১২. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান দূরের কথা, ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীর কর্মচারীরা পর্যন্ত রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েও এদেশে আসার আগে বৃটেনে মিশনারী খুলে ফার্সী শিখলো ।[১১৩]

মোগল আমলে ফার্সী ভাষা রাজ ভাষার মর্যাদা লাভ করে । ফার্সীর প্রচলন এদেশে একটা আভিজাত্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় । সরকারী চাকরী প্রাপ্তী, সামাজিক প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভের আশায় হিন্দু-মুসলিম উভয়কেই ফার্সী ভাষা শিখতে হতো । মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবী শিক্ষা করার সামাজিক কোন প্রয়োজন হিন্দুদের ছিল না । তা সত্ত্বেও রাজানুগ্রহ ও চাকুরীর প্রত্যাশায় এবং সম্ভবত আরবী-ফার্সী ভাষার প্রাচীন ঐতিহ্য ও এর অফুরন্ত সাহিত্য ভান্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কেউ কেউ আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেছিল ।[১১৪]

সে কালের কবিগণ আরবী-ফার্সী মিশ্রিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে কাব্য চর্চা করেছেন এবং আরবী-ফার্সী-বাংলা এ তিন এলেম অত্যাবশ্যক বলেও মন্তব্য করেছেন । এ তিনের কোনটা ঘাটতি হলে তার জীবনটাই বৃথা বলে তিরস্কারও করেছেন । সতের শতকের প্রসিদ্ধ কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খৃ.) আরবী ফার্সী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যে কথা বলে গেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য–

"আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বাখান ।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান ॥
আরবী পড়িতে যদি না পার কদাচিত ।
ফারসী পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত ॥
ফারসী পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত ।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত ॥
*　　*　　*
এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার ।
নিশ্চয় তাহার 'দীন' ঘোর অন্ধকার"॥[১১৫]

তিনি দেশী ভাষা বাংলার বিরোধীদের সম্বন্ধে বেশ কড়া কথা বলেছেন–

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী ।

---

১১৩. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত , ৩য় সং, পৃ. ৪১৮
১১৪. এ, এ, এম নুরুল আলম, বাংলাদেশে আরবী চর্চার ভবিষ্যত ও প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,১৯৯৩), পয়তাল্লিশ সংখ্যা, পৃ. ১৪৮
১১৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায় ।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায় ॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি ।
দেশী ভাষা উপদেশ মতে হিত অতি ॥"[১১৬]

ফলে আরবী ও ফার্সী ভাষা মিশ্রিত বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা হল । ফলশ্রুতিতে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে, তৎসূত্রে সাহিত্যিক জীবনে বিভিন্নভাবে এর প্রভাব দেখা দিল । বাংলা ভাষা আরবী ও ফার্সী প্রভাব দুষ্ট হয়ে পড়ল । আঠারো শতকে বাংলার এরূপ ভাষা পরিস্থিতি লক্ষ্য করে হালহেড তাঁর বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮ খৃ.) বলেন, বাংলা ক্রিয়ার সাথে সর্বোচ্চ সংখ্যক আরবী-ফার্সী বিশেষ্য মিশ্রিত করে যারা কথা বলেন তাঁরাই সূচারুরূপে বাংলা বলেন বলে গণ্য করা হয় । তাঁর ভাষায়–
"At present those persons are thought to speak this Compound idiom with the most elegence who mix with pure Indian verbs the greatest number of Persion and Arabic nouns."[117]

এ শতকের দলিল দস্তাবেজে এরূপ ভাষারই প্রাধান্য ছিল । সুকুমার সেন একে হিন্দু-মুসলমানের কাজের ভাষা 'ব্যবহারিক বাংলা' বলে অভিহিত করেছেন । ভারতচন্দ্র একেই 'যাবনী মিশাল' ভাষা বলেছেন । তিনি নিজে 'আরবী-ফাসী-হিন্দুস্থানী' মিশ্রিত এরূপ ভাষাই শিখেছিলেন । রসাল ও প্রসাদগুণ সম্পন্ন না হলেও সকলে এ ভাষা বুঝে বলে তিনি দাবীও করেছেন । এ সম্পর্কে কবির উক্তি–

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী ।
উচিৎ যে আরবী ফারসী হিন্দুস্থানী ॥
পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি ।
কিন্ত সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না হবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল ।
অতএব কহি ভাষা যাবণী মিশাল ॥[১১৮]

---

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
১১৭. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খ. ২, (মধ্যযুগ), পৃ. ২০

আরবী-ফার্সী মিশ্রিত এ ভাষা সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এটাকে 'মুসলমানী বাংলা' বলে অভিহিত করলেন। তিনি বেশ জোড়ালো ভাবে বললেন– এটা বাংলার মুসলিম সমাজের কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়। এটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। তাঁর ভাষায়–

One of the features of 'Musalmani Bengali' which demonstrates its rattur artificial cheracter, is the Frequent use of Hindustani words and forms............which has no existance in the bengali as spoken by the Musalmans in the villages within the different dialectical arias. 'Musalmani Bangali' thus savours of the mixed Bangali-Hindustani-Awadhi jargon which is heard in the bagars of Calcatta among Muhamedan working classes, cabmen, petty traders and others. who speaks Calcutta Bengali and Hindustani equally badly, and inlike the Muhamedan masses in the country have no proper dialect.[119]

বাংলা কাব্যে এ ধরণের ভাষার আংশিক ব্যবহার দেখা যায় চব্বিশ পরগণার কবি বিপ্রদাসের 'মণষা-বিজয়ে' (১৪৯৫ খৃ.), বর্ধমানের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডিমঙ্গলে' (১৫৯৮ খৃ.), বর্ধমানের কবি দ্বিজ গিরিধরের 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে (১৬৬৩ খৃ.), কলকাতার কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গলে' (১৬৮৬ খৃ.), মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে, বর্ধমানের কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গলে' (১৭১১ খৃ.) এবং চব্বিশ পরগণার কবি বল্লভের 'সত্যনারায়নের পুথি'তে (১৭১৫ খৃ.)।[১২০]

---

১১৮. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ৩য় সং, পৃ. ৪০৯

১১৯. ঝঁহরঃ কঁসধৎ পযধঃঃবৎলবব, এঃযব ঙৎরমরহ ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ ঃযব ইবহমধষর খধহমঁধমব (ঈধষপঁঃঃধ. ১৯২৬), ঠড়ষ-১, চচ.২১১-১২

১২০. কধুর অনফঁষ গধহহধহ, এঃযব উসধৎমবহপব ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ড়ভ উড়নযধংর খরঃবৎধঃঁৎব রহ ইধহমষধ ঁঢ় ঃড় ১৮৫৫ (উযধশধ, ১৯৭৪), চচ. ৫০-৮

১২১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে দিল্লীতে মানসিংহ-ভবানন্দের মদ্যকার কথোপকোথনে আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানী মিশ্রিত বাংলার ব্যবহার আছে।(দ্রঃ. বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (কলিকাতা, ১৯৬৩), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

হাওড়ার ভুরসুট পরগণার কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'[১২১](১৭৫২ খৃ.) বেশ কিছু অংশ জুড়ে এ ভাষা-রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। তারও আগে হুগলীর বালিয়া হাফিজপুরের কবি শাহ্ গরীবুল্লাহ 'আমীর হামজা', 'সোনাভান'সহ সকল কাব্য সম্পূর্ণ এ রীতিতে রচনা করেন। আঠার শতকের দ্বিতীয় ভাগে তার শিষ্য ভুরসুট পরগণার উদ্না নিবাসী সৈয়দ হামযা 'জৈগুনের পুথি'তে (১৭৯৭ খৃ.) এ জাতীয় ভাষা প্রয়োগ করেন।

কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খৃ.। সে থেকে আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত 'দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের' যুগ। সে সাহিত্য মূলতঃ মুসলমানগণ কর্তৃক রচিত। শাহ গরীবুল্লাহ দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। শাহ গরীবুল্লাহ 'আমীর হামযা' পুঁথির প্রথমাংশ রচনা করেন। পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সৈয়দ হামযা পুঁথির দ্বিতীয়াংশ রচনা করেন। শাহ গরীবুল্লাহ আরও কয়েকখানি কাব্য মুসলমানী বাংলায় রচনা করেন; তন্মধ্যে 'ইউসুফ-জুলেখা' (১৭৬৫ খৃ.), 'জঙ্গনামা', 'সোনাভান'(১৭২০ খৃ.) ও 'সত্যপীরের পুঁথি' প্রধান।

শাহ গরীবুল্লাহর স্নেহ-ধন্য ছাত্র সৈয়দ হামযাও এ জাতীয় পুঁথি সাহিত্য লিখেন। তাঁর প্রথম রচনা 'মধুমালতী'(১৭৮০ খৃ.)। তাছাড়া তিনি 'আমীর হামযা' (১২০১ বাং), 'জৈগুণের পুঁথি' (১৭৯৭ খৃ.), 'হাতেম তাই' নামক বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ লিখে খ্যাতি অর্জন করেন।[১২২] আঠার শতকের শেষ ভাগ ও উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এ জাতীয় কবির সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যায়।

পুঁথি সাহিত্যের কবিগণ অবাধে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন। পুঁথি সাহিত্যকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ "মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য" বলেছেন। ১৩২৪ বাংলা সনের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন "যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।"[১২৩]

শুধু মুসলমানরাই পুঁথি সাহিত্য লিখেছেন এমনটি নয়; হিন্দুরাও এ জাতীয় সাহিত্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। রাধাচরণ গোপ নামক জনৈক হিন্দু কবির একখানা কাব্য পাওয়া যায়। কাব্যের নাম

---

১২২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খ. ২, (মধ্যযুগ), পৃ. ২১৬
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

'ইমামের কেচ্ছা'। জঙ্গনামা জাতীয় এ কাব্যটির রচনাকাল আনুমানিক আঠারো শতক। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অনেক কবিই আরবী-ফার্সী জাত শব্দ প্রয়োগ করে একটি উপভোগ্য ও রসাল সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে মেতে উঠেছিলেন।

ড. সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের ইতিহাসের রূপরেখা এভাবে দিয়েছেন– "পনের শতকের শুরুতেই বাংলা ভাষা ষোল শতকের পরিচিত রূপ ধারণ করেছিল। বাংলা ভাষার উপর ফার্সী ভাষার ঘনিষ্ঠ ও ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে এরূপ ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে পনের-ষোল শতকে ফার্সীর প্রভাব গুরুতর আকার ধারণ করতে পারেনি। সতের শতকের প্রারম্ভ কাল থেকেই বাংলা ভাষায় ফার্সীর প্রভাব গুরুতর আকার ধারণ করে এবং ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।"[১২৪]

এ প্রভাব ১৮৩৬ খৃ. তথা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সে বছর ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা রাজভাষার মর্যাদা লাভ করে। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ যখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন, তখনও ফার্সী ভাষার প্রভাব এতটুকু স্তিমিত হয়নি।

মোগল আমলের বাংলা সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র, মননশীলতা ও বিশালতার কথা চিন্তা করলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মোগল আমলকে 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করতে হয়।[১২৫] মোগল আমলে বাংলা সাহিত্যকে স্বাধীনতার যুগের কিশোর অবস্থা অতিক্রম করে বলদৃপ্ত যৌবনে পদার্পণ করতে দেখা যায়। এ সময় মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণ ফার্সী ভাষার ঘনিষ্ঠ ও গভীর সম্পর্কে এসে মুসলিম বাংলা সাহিত্যকে বিচিত্র ও বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারে পরিণত করে।

এ যুগের মুসলিম কবিরা জনগণের সাহিত্যরস, পিপাসা নিবৃত করার মানসে আরবী-ফার্সীতে লিখিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। যদিও অনুবাদের এ ধারণা কট্টরপন্থি মোল্লারা অনেক দিন যাবৎ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) যখন ফার্সীতে পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন, তখন একদল মৌলভী তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণে রক্ষা পান।[১২৬]

---

১২৪. সুকুমারসেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (কলকাতা:ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭৮), খ. ১, পৃ. ৮৫-৬

১২৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ১৬৬

১২৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, খ. ২ (মধ্যযুগ), পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পাপ, ভয় আর মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে মুসলমান কবিগণ আরব-ইরানের উপাদান ভাষান্তরের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে আলোকিত ও ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস চালিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে যাদের অবদান অনস্বীকার্য, তারা হলেন সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.), মুহম্মদ খান (১৫৮০-১৬৫০ খৃ.), শেখ মুত্তালিব (১৫৯৫-১৬৬০ খৃ.), আলাওল (আ. ১৬০৭-১৬৮০ খৃ.), আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খৃ.), হেয়াত মাহমুদ (আনু. আঠার শতকের মধ্যভাগের কবি) ও সৈয়দ নূরুদ্দীন (১৭৩০-১৮০০ খৃ.) প্রমূখ। এদের উল্লেখ্যযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে 'নবী বংশ', 'মকতুল হুসেন', কিফায়াতুল মোসল্লীন', 'ইউসুফ-জোলায়খা', 'শিহাবুদ্দীন নামা', 'সিকান্দর নামা', 'তোহফা', 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান', 'হিতজ্ঞান বাণী', 'দাকাইকুল হাকাইক' ও 'রাহাতুল কুলুব' প্রধান।

এ সময়ের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিগণ ইসলামী শরা-শরীয়ত, মুসলিম কাহিনী, মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন বা সূফিতত্ত্ব, মুসলিম প্রেমোপাখ্যান, মর্সিয়া সাহিত্য, ঐতিহাসিক কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর অসংখ্য কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে সায়্যিদ সুলতানের 'নবী বংশ', 'রসূল বিজয়', 'জ্ঞান চৌতিশা' ও 'সব-ই-মিরাজ'; নসরুল্লাহ খানের 'মুসার শওয়াল', 'শরীয়তনামা', 'জঙ্গনামা' ও 'হিদায়াতুল ইসলাম'; শেখ মুত্তালিবের 'কিফায়াতুল মুসল্লীন'; আব্দুল হাকিমের 'ইউসুফ-জুলেখা', 'নসিহতনামা', 'শিহাবুদ্দীননামা', 'নূরনামা', 'চারি-মাকাম-ভেদ', 'লালমতি-সয়ফুল মুলুক' ও 'কারবালা'; মুহম্মদ খানের 'হানিফার লড়াই', 'মকতুল হুসেন' ও 'কিয়ামাতনামা'; নওয়াজিশ খানের 'বয়ানাত' ও 'গুল-ই-বকাওলী'; হায়াত মাহমুদের 'হিতজ্ঞানবাণী', 'আম্বিয়াবাণী', 'জঙ্গনামা' ও 'সর্বভেদবাণী'; সাইয়্যেদ মরতুজার 'যোগ-কলন্দর'; শাহ গরীবুল্লার 'আমীর হামযা', 'সোনাভান', 'ইউসুফ-জুলেখা' ও 'মকতুল হুসেন'; সৈয়দ হামযার 'আমীর হামযা' (খ.২) ও 'জৈগুণের পুঁথি' এবং সৈয়দ নূরুদ্দীনের 'রাহাতুল কুলুব', 'দাকাইকুল হাকাইক', 'মুসার শওয়াল' ও 'কিয়ামাতনামা' ইত্যাদি।[১২৭] এদের এ সকল কাব্য গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আরবী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যা লক্ষণীয়।

শেখ মুহাম্মদ কবীর (ষোড়শ শতকের শেষ দিকে) সম্ভবত গৌড়ের সুলতান নাসির উদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খৃ.)-এর প্রসঙ্গে বাংলা কোন পরিভাষা ব্যবহার না করে আরবী পরিভাষা 'সুলতান' ব্যবহার করেছেন:

শেখ কবীরে ভনে বহি গুণ পামরে জানে

---

১২৭. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ১৬৭-১৭০

Dhaka University Institutional Repository

ছলতান নাছিরা শাহা ভুলিছে কমল বনে ।[১২৮]

সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃ.) তাঁর নবী বংশ কাব্যের রাসূলের অন্তিম শয্যা শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন:

আজরাইল মহামতি আইল বায়ুর গতি
রসূলের পুরীর দুয়ারে ।
রসূলের নাম ধরি ডাকি কহে ভক্তি করি
আজ্ঞা মাগে যাইতে অন্তঃপুরে ॥
পএগাম্বরে ফাতেমারে কহিলেন্ত দেখিবারে
দ্বারেত আসিছে কোন জন ।[১২৯]

কবি শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬২৫ খৃ.) তাঁর 'রাসূল বিজয়' কাব্যে স্বীয় পীর শাহাদৌলার প্রশংসায় লিখেছেন:

শাহাদৌলা পীরজান আল্লার নিজ জাত ।
ফকিরেতে দম ধরে নূরের ছিফত ॥
চারি পীর চৌদ্দ খান্দান জেই জানে ।
শরীয়ত পন্থ জান সে সকল মানে ॥
শরিয়ত তরিকত হাকিকত মারেফত ।
এই চারি মঞ্জিলে জান করে এবাদত ॥[১৩০]

আঠার শতকের প্রথম দিকের কবি নওয়াজিশ খাঁ (মৃ. ১৭৬৫ খৃ.) তাঁর 'গুলে-বকাওলী' কাব্য গ্রন্থের বন্দনা ও আত্ম পরিচয় পর্বে লিখেছেন:

তাহান যুগল সুত অতি বলবান ।
যার সঙেগ শহিদ যাইব সোর্গস্থান ॥
সেই দুইর পদে প্রণমি পুণি পুণি ।
মহরমে ফাতেআ করিব সবে গুণি ॥

---

১২৮. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ১৭০
১২৯. উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য সংকলন:গদ্য ও পদ্য, (ঢাকা:গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৮৪), পৃ. ২০৯

১৩০. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-২১৯

Dhaka University Institutional Repository

ফিরিস্তা সবের পদে করি নিবেদন ।

প্রণমি এ আদ্যে (ছিল) যত নবীগণ ॥[১৩১]

মহাকবি ও পণ্ডিত আলাওল (১৬০৭-১৬৭৩ খৃ.) তাঁর বিখ্যাত কবিতা তোহফা'য় লিখেছেন:

হীনমতি বহুমোর বৃত্তি দাগাবাজি ।

ক্ষমা দানে ফকির ফোকরা কর রাজি ॥

....

সবর শোকর প্রভু কর মোরে দান ।

এ দোন প্রসাদে পাইমু দুই কুলে মান ॥[১৩২]

কবি আবদুল হাকীম (১৬২০-১৬৯০ খৃ.) তার 'নূরনামা' কাব্য গ্রন্থের 'বঙগবাণী' নামক কবিতায় লিখেছেন:

আরবী ফারছি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ ।

দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ ॥

আরবী ফারছি হিন্দে নাই দুইমত ।

যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত ॥[১৩৩]

খৃ. সপ্তদশ শতকের আর একজন প্রথিতযশা কবি 'সৈয়দ হামযা' তার 'জৈগুন-হানিফার যুদ্ধ' কাব্যে লিখেছেন:

হইল হানিফা পরে আল্লার রহম ।

আপনা কুদরতে বন্ধ করে তারদম ॥

বাঘ বাচ্চা মারা যাবে আওরতের হাতে ।

ফতে নাহি দিব আমি আওরতের জাতে ॥[১৩৪]

---

১৩১. রিজিয়া সুলতানা, গুলে বকাওলী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭০), পৃ. ২

১৩২. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ২৪০

১৩৩. মাদ্যমিক বাংলা সাহিত্য-কবিতা (ঢাকা:বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড, ১৯৮৪), পুণর্মুদ্রণ, পৃ. ১০

১৩৪. আহমদ শরীফ, মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৩৬৯ বাং), পৃ. ২৯৯,৩০২

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ তাঁর 'মকতুল হুসেন' বা 'জঙ্গনামা' পুঁথির 'শহীদে কারবালা' অংশে লিখেছেন:

যখন বসিল কুফর ছাতির উপরে।
সের জুদা কৈল যদি এমামের তরে ॥
আরশ কোরশ লওহ্ কলম হইতে।
বেহেস্ত দোজখ আদি লাগিল কাঁপিতে ॥
আসমান জমিন আদি পাহাড় বাগান।
কাঁপিয়া অস্থির হইল কারবালা ময়দান ॥[১৩৫]

এ মধ্যযুগেই আরবী শব্দ ও রূপকল্পের ব্যবহার মুসলিম কবিদের ছাড়িয়ে ধর্মাশ্রয়ী কাব্য সাধক হিন্দু কবিদের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু কবিগণও সেই মধ্য যুগ থেকেই মুসলমান রাজ সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে, মুসলমান রাজাকে সম্বোধন করতে গিয়ে, ইসলামী ভাবধারা এবং আদর্শ এবং কুরআন বা অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থের উল্লেখ করতে গিয়ে, মুসলমান দরবেশ বা আলেমদের কথা বলতে গিয়ে, এমন কি নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনী কাব্যেও অসংকোচে আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১৩৬] যেমন–

ষোড়শ শতকের চণ্ডী মঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠতম কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর মঙ্গল কাব্যে মুসলমান প্রসঙ্গে লিখেছেন:

ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরী করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালাধরে জপে পীর পেগম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ ॥[১৩৭]

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কবি দ্বিজ লক্ষ্ণণ তাঁর সংস্কৃত আধ্যাত্ম ও অদ্ভূত রামায়ণের সংমিশ্রণে রচিত পুরামাপের রামায়ণে (১৬৫৪ খৃ.) আরবী 'বিদায়' শব্দটি প্রয়োগ করেন এভাবে :

---

১৩৫. মাদ্যমিক বাংলা সাহিত্যে-কবিতা, পৃ. ১৭
১৩৬. সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৯ বাং), শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, পৃ. ৬০
১৩৭. মাহবুবুল আলম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ১৫০

পিতৃ বোলে প্রভু রাম তুলিলেন তারে ।

বিদায় হইল গুহা প্রণমি সভারে ॥[১৩৮]

কবি মানিক রাম গাঙ্গুলী তাঁর রচনায় (১৭৮১ খৃ.) আরবী 'নকল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন :

গীত বর ধর্মের গৌরব হবে বাড়া ।

নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া ॥[১৩৯]

মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০ খৃ.) তাঁর অন্নদা মঙ্গলের একটি শ্লোকে আরবী 'মশাল' শব্দটির ব্যবহার করেছেন এভাবে:

দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায় ।

শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥[১৪০]

উল্লিখিত অসংখ্য উদাহরণ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান যে, যেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত যাত্রা শুরু সেখান থেকেই আরবীর উপস্থিতি। ফলে এ সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অজু-গোসল, আদব-কায়দা, আশরাফ-আকরাফ, আসল-নকল, আনসার, ইনসাফ, ইনসান, ইজ্জত, ইবাদাত, ঈমান, ঈদ, ওয়াসিল, উযীর, নাযীর, উকিল-মোক্তার, হাকিম-মুনসেফ, এজলাস, কলম, কিতাব, কানুন, খবর, খাস, গরহাজির, গরীব, সালাম-কালাম, জবাব, জায়েয, জাহের-বাতেন, নিকাহ-তালাক, তমীয, তা'যিম, মসজিদ-মাদ্রাসা, মাযার, দোকান, নগদ-বাকী ইত্যাকার শব্দগুলো যে আরবী ভাষার শব্দ এ কথাটিই যেন আজ আমরা ভুলতে বসেছি। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী বাদশাহ্, সুলতান ও নবাবদের দ্বারা শাসিত এ বৃহৎ বঙ্গে আরবী-ফারসী ভাষা ও সংস্কৃতির সূদুর প্রসারী প্রভাব আজ সুস্পষ্ট ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী-ফার্সী প্রভাব এবং মুসলমানদের অবদান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধূরীর (১৮৬৮-১৯৪৬ খৃ.) উক্তি এরূপ– "আমরা হচ্ছি বুদ্ধিজীবী জাত; অথচ জমি থেকে ফসল পর্যন্ত কৃষি সংক্রান্ত প্রায় সকল কথাই হয় ফার্সী নয় আরবী দ্বারা। আর জমিদারী সংক্রান্ত সকল কথাই ঐ আরবী-ফার্সীর দান। ভাষার ভিতর সংস্কৃতের লেশ মাত্র নেই। আর কর্ম জীবনের যা

---

১৩৮. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ, পৃ. ১৮৩
১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬
১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

চূঁড়া আইন-আদালত, তার ভাষাও আগাগোড়া আরবী-ফার্সী। আরজী থেকে রায়-ফয়সালা পর্যন্ত মামলার আদ্য প্রান্ত সকল কথাই বাংলা ভাষায় মুসলমানের দান। ইংরেজরা আজকাল ডিক্রি দেন বটে কিন্তু তা 'জারি' করতে হলেই ইংরেজী ছেড়ে ফার্সীর স্মরণাপন্ন হতে হয়।" (সবুজ পত্র, জৈষ্ঠ,১৩২৯, পৃ. ৬২২-২৩)[১৪১]

বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে মুসলমানী প্রভাব সম্পর্কে শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১ খৃ.)-এর অনুধাবনও উপভোগ্য। তাঁর মতে– "হিন্দুর লজ্জার সহিত মুসলমানের শরম, হিন্দুর ধনের সহিত মুসলমানের.দৌলত, ভারতীয় মাতার সহিত তুর্কীর পিতা, বাঙ্গালার ঝড়ের সহিত পারস্যের তুফান, এবং হিন্দুর হাসির সহিত মুসলমানের খুশি যেন গাড় আলিঙ্গনে মিশে গিয়েছে। মুসলমানের জোর-জুলুম এবং চালাকী ও আহমকী পর্যন্ত হিন্দুরা ত্যাগ করতে পারেনি।"(মাসিক মোহাম্মদী,কার্তিক, ১৩৩৬, পৃ. ২১-৩০)[১৪২]

ইংরেজ আমল (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃ.)

১৭৫৭ খৃ. পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভক্তির আগ পর্যন্ত এ দু'শ বছর ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য এক করুণ ইতিহাস। মুর্শিদাবাদ তার গৌরব হারাল আঠার শতকের শেষের দিকে। তখন বাংলার বড়লাট লর্ড হেস্টিংস ও লর্ড কর্ণওয়ালিস। রাজধানী স্থানান্তরিক হল মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায়। ১৭৯৩ খৃ. লর্ড কর্ণওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা চালু করলেন। ফলে মুসলমানদের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এল। অবস্থা আরো সংকটাপন্ন হল, যখন ১৮৩৭ খৃ. ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী রাজ ভাষার মর্যাদা লাভ করল। বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের জীবন-জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। রাজ্যহারা-ভাষাহারা মুসলমান বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারল না। হিন্দুরা ফার্সীর মত রাতারাতি ইংরেজী শিখে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হল। ইতোমধ্যে আঠারশো সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করলেন খৃষ্টান মিশনারীর উইলিয়াম কেরী। কেরী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ করলেন। শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক লেখা শুরু হল।

---

১৪১. এ, এ, এম নুরুল আলম, বাংলাদেশে আরবী চর্চার ভবিষ্যত ও প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণের ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী বহুল ভাষার পরিবর্তে ঘরে তৈরী সংস্কৃত ভিত্তিক নতুন বাংলা ভাষায় রচিত বইগুলো সমগ্র বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে চালু করা হল। কলকাতা মাদ্রাসার যারা মুসলমানী বাংলা ভাল মত জানতো না তাদের জন্যও বইগুলো বাধ্যতামূলক করা হল। ১৮৩৭ খৃ. এ বিষয়ে একটি সরকারী বিধানও জারি করা হল। জনশিক্ষা সাধারণ কমিটি (General committee of public instruction) নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হল।[১৪৩]

ইতিমধ্যে মার্শম্যান এবং উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষা হতে সমস্ত আরবী-ফার্সী শব্দ বাদ দেয়া স্থির করলেন। হিন্দু পণ্ডিতেরা ভাষাকে অস্বাভাবিক উপায়ে সংস্কৃত বহুল করতে লাগল। বিদ্যাসাগর ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং অন্যান্য লেখকরা এ নতুন ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য রূপ দান করতে সাহায্য করল।[১৪৪] এ অপকর্মগুলো ঘটতে লাগল বাংলাদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কর্মরত ইংরেজ তথা অবাঙ্গালী কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের নামে ১৭৯০ খৃ. লর্ড ওয়েলেসলির 'কথোপকথন' এবং নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Halhed) রচিত A Grammer of the Bengali Literature (১৭৭৮ খৃ.) সহ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু সুপরিকল্পিত পুস্তক প্রণয়নের মাধ্যমে।[১৪৫]

হেনরী-পিটার-ফ্রস্টার-কেরী চক্র বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান হিসেবে চালাতে গিয়ে বাংলায় আরবী-ফার্সীর প্রবেশাধিকার কেড়ে নিল। ইংরেজ-ব্রাহ্মণ যৌথ চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলার তুর্কী মুসলিম শাসনকালকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা; বাংলা ভাষা বিরোধী সেন রাজাদের বৌদ্ধ পণ্ডিত বিতাড়নের দায় উদোড় পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাবার মত তুর্কী বিজেতাদের উপর চাপানো; সংস্কৃতের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার শব্দের শ্রেণী বিভাজন এবং বাংলা ভাষা হ'তে ছয়শ' বছরের মুসলিম ঐতিহ্য নির্বাসন দেয়া। অথচ মোগল আমলের বাংলা ভাষার সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে সজনীকান্ত দাস বলেছেন– 'ইংরেজদের আগমন না ঘটলে আজো আমাদের "গরীবে নেওয়াজ সালামত" বলে শুরু করে "ফিদবী" বলে শেষ করতে হতো।

---

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১৪৩. আব্বাস আলী খান, বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৮০-৬
১৪৪. সৈয়দ আলী আশরাফ,বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃ. ৬২
১৪৫. আব্বাস আলী খান, বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৮০-৬

বাংলা হ'তে আরবী-ফার্সী শব্দের নিসুদন যজ্ঞে শুধু মাত্র কিছু পাঠ্য বই রচনা করেই তারা ক্ষান্ত হননি। আরবী-ফার্সীকে অশুদ্ধ ধরে শুদ্ধ পদ প্রচারের জন্য প্রমিত বাংলার কয়েকটি অভিধানও রচনা করলেন। উইলিয়াম কেরী তার ইংরেজী-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় এ সব কথা খোলাখুলি স্বীকারও করেছেন। তাদের এ শুদ্ধি অভিযান সফলও হয়েছিল।[১৪৬] কারণ তখন মুসলমানদের সার্বিক ক্ষেত্রে পিছু হটবার দিন এসে গিয়েছিল। সজনীকান্ত তার 'বাংলা গদ্যের ইতিহাস' গ্রন্থে এ চেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে বলেছেন, দশ পনের বছরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।[১৪৭] এতে করে হিন্দু পণ্ডিতেরা উল্লসিত হল সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নব প্রবর্তনের সম্ভাবনায় আর মিশনারীকুল তৎপর হল মুসলমানের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাঁকে সাহিত্য ও সঙস্কৃতির দিক থেকে নিঃস্ব করে দেয়ার পাঁয়তারায়। এই যখন বিজেতা বেনিয়াদের কাণ্ড, তখন একদল সত্যব্রতী কবি সাহিত্যিক এগিয়ে এলেন ভাষার চিরায়ত সত্য রক্ষায়। তাদের মধ্যে মুহম্মদ রিজা (১৬৯১-১৭৬৭ খৃ.), আলী রিজা (১৬৯৫-১৭৮০ খৃ.), মুহম্মদ মুকিম (১৭০০-১৭৭৫ খৃ.), মুহম্মদ আলী (১৭৭৩ খৃ. জীবিত), মুহম্মদ কাসিম (১৭৩০-১৮০০? খৃ.), সায়্যিদ নূরুদ্দীন (১৭৩০-১৮০০? খৃ.), সায়্যিদ হামযা (১৭৫৫-১৮১৫? খৃ.), হামিদুল্লহ খান (১৮০৮-১৮৭০ খৃ.) প্রমূখ উল্লেখ্যযোগ্য। এদের কাব্যে প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকরাই তাঁদের সাহিত্য কর্মে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে স্বস্তি বোধ করেছেন তা নয়, অনেক হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের মাঝেও এ প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে রামরাম বসু (১৭০৭-১৮১৩ খৃ.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খৃ.), প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) (১৮১৪-১৮৮৩ খৃ.), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খৃ.) ও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) প্রমূখ স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ খৃ.) বইটিতে তিনি বিষয়োপযোগী আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার করেছেন এবং ষড়যন্ত্র কবলিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানী উপাদান বজায় রাখার পথ সুগম করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন।

টেকচাঁদ ঠাকুর বাংলা গদ্যের ভাষাগঠন পর্বেই তাঁর রচনায় স্বভাবসিদ্ধ ভাবে সমাজের আত্মীকৃত আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দাবলী প্রয়োগ করে গেছেন। কি হাস্যরস কি করুণরস সর্বত্রই বাঞ্চিত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আলালী ভাষার প্রধান

---

১৪৬. সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য যে কথ্য ভাষার অবাধ প্রয়োগ তাঁর আরবী-ফার্সী উপাদান ব্যবহারেও একই চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮ খৃ.) গ্রন্থে তিনি আরবী-ফার্সী শব্দের রসময় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্যারীচাঁদের ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলো যেমন- অছি, অম্বুরী, আমলা, উজু, একিদা, এজেহার, এস্তাহাম, এত্তেলা, এলাজ, এলেকা, ওক্ত, ওজর, ওতন, ওয়াজিব, কবজ, কবিলা, কাওয়াজ, কুদরত, গমি, তকরার, তজবীজ, তদারক, তসবিহ্, তসবীর, তহমত, ফয়তা, ফেরেস্কা, বদিয়ত, বরাত, বাব, মকরর, মদৎ, মশগুল, মহব্বত, মাফিক, মুসাফিরি, মোনাসেব, মৌজ, মৌত, রাতিব, রেয়াত হাবেলী, হারাম[১৪৮] ইত্যাদি শব্দগুলির প্রতি তাকালেই প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বয়সে প্যারিচাঁদের কনিষ্ঠ হলেও সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন প্যারির আগে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ খৃ.) প্রকাশিত হয় প্যারিচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খৃ.) প্রকাশিত হওয়ার এগার বছর আগে।[১৪৯] কিন্তু সার্বজনীন সাহিত্য সৃজন তথা গণভাষা আরবী-ফার্সী ব্যবহারে তিনি টেকচাঁদ ঠাকুরের অনুজই রয়ে গেলেন। অর্থাৎ টেকচাঁদ যেখানে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির শুরু থেকেই সমাজের বুলিকে প্রাধান্য দিলেন বিদ্যাসাগর সেখানে তাঁর প্রথম দিকের এবং শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোতে সংস্কৃতানুসরণ করলেন। যদিও তাঁর শেষের দিকের বইগুলোর ভাষা মৌখিক বুলির মতই সরল এবং তাতে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রচুর প্রয়োগ রয়েছে। আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার বিদ্রুপাত্মক রচনাকে কত প্রাণবন্ত ও মর্মন্তুদ করতে পারে বিদ্যাসাগরের তর্কবিতর্কমূলক বইগুলো তার প্রমাণ। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের যে রীতি প্রবর্তন করে গেছেন তা আজো অনুসৃত হচ্ছে।

কোন কোন বিদগ্ধ হিন্দুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক আরবী ও ফার্সী ভাষা রপ্ত করে গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খৃ.) ও গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০ খৃ.) উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র সেন বাংলায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন।

অনেক হিন্দু পরিবারে ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অণুরাগ ছিল। যেমন, কলকাতার জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার। এ ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরই দিওয়ান-ই-হাফিজের স্বার্থক অনুবাদক। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলা হত হাফিজ-ই-হাফিজ অর্থাৎ তিনি কবি হাফিজকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

---

১৪৭. আব্বাস আলী খান, বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৮০-৬

১৪৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্যারিচাঁদ রচনাবলী (ঢাকা:কথাকলি,১৯৬৮), ভুমিকা।

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এ ভাষা অনন্য সাধারণ রূপ লাভ করে। বাংলা ভাষা বিবিধ ভাব-কল্পনার বাহন রূপে গড়ে উঠে; ভাষা হয় সংগীতময় ও সংকেতময়। ১৮০০ খৃ. হতে পাশ্চাত্য-ভাবদীপ্ত যে আধুনিক বাংলাসাহিত্য ক্রমবর্ধিত হতে থাকে, তা রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেই পূর্ণতা লাভ করে। এ দীর্ঘজীবী অমর প্রতিভাবান কবি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তিনিও তাঁর রচনায় প্রচুর পরিমাণে আরবী ও ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ হ'তে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকে বাংলা সাহিত্যে 'রবীন্দ্র যুগ' বলা হয়ে থাকে।[১৫০]

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার পূর্ণদীপ্তি যখন বিকশিত তখন বাংলার প্রায় সকল কবিই রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে রবীন্দ্র জ্যোতির তীব্র প্রভাবেও যিনি স্বকীয়তায় ও স্বমহিমায় ছিলেন সমুজ্জ্বল, তিনি হলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে বাংলা কবিতার ছন্দের যাদুকর বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ তাঁকে অমর অনুবাদক আবার কেউ কেউ অনুবাদকের অনুবাদক আখ্যা দিয়ে থাকেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম আরবী শব্দ ও রূপকল্পের নিঃসঙ্কোচ ও সফল প্রয়োগকারী। তিনি তাঁর 'কবর-ই-নূরজাহান' ও 'আখেরী' কবিতায় সর্বাধিক সংখ্যক আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী নামও ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর। ফার্সী এবং উর্দু তো আছেই। পিতামহ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের জ্ঞান-লিপ্সা তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে। ফলে পিতামহের মতো অগাধ পাণ্ডিত্য এবং শব্দ প্রয়োগের অসামান্য দক্ষতা তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাংলা সাহিত্যে সফল ভাবে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ করেন, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি সে পথে স্বাচ্ছন্দে পথ চলেন। আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার পূর্বসূরী আর একজন কবিকে অনুসরণ করেছেন, তিনি হলেন মধ্য যুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। ভারতচন্দ্র যেমন অবস্থা ও চরিত্র বুঝে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করতেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলো ঘাটাঘাটি করলেও তাই মনে হয়। আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগে সার্বিকভাবে প্রভাব পড়ে যার তিনি হলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব কালের আদর্শ পুরুষ। গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সর্বোপরি তাঁর অনুসরণ, কবিকে এরূপ শব্দ প্রয়োগে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

---

১৫০. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া সে যুগের অনেক অভিজাত হিন্দু পরিবারে ফার্সী পড়া, শেখা এবং অনুশীলন ছিল লক্ষ্যণীয়। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খৃ.), কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৪-১৯০৭ খৃ.), রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪-১৮৩৩ খৃ.), গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৫-১৯১০ খৃ.), ব্রহ্মাণন্দ, কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খৃ.), শ্রী কার্তিকচন্দ্র ঘোষ প্রমূখ বাঙ্গালী লেখক, সাহিত্যিক ও পাঠক ফার্সীর অবাধ চর্চা করেছেন এবং সে সঙ্গে তাদের লেখা কাব্য ও সাহিত্যে প্রচুর আরবী-ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। এদের প্রায় সকলেই হয় হাফিজের গজল অথবা রুবাইয়াতের অনুবাদ করেছেন নতুবা ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদ করেছেন অথবা উভয়ের গজল ও রুবাইয়াত দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়েছেন।[১৫১]

সত্যেন্দ্রনাথের ফার্সী ভাষার উপর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, যা তাঁকে অত্যন্ত সফলতার সাথে ফার্সী কাব্যানুবাদে প্রেরণা যুগিয়েছিল। মূলের ভাবকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি আরবী-ফার্সী শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। ফলে তাঁর কাব্য আরবী-ফার্সীজাত শব্দাবলীতে পরিপূর্ণ হয়েছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানিত্ব 'নিসুদন যজ্ঞে' যারা বাংলা কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ও রূপকল্প ব্যবহার করে মুসলমানী আবহকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের পরেই যার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়, তিনি হলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার। ইসলামী আবহ রক্ষায় তিনি তাঁর পূর্বসূরী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এ কথা সত্যি। তবে মোহিতলালের লেখা বিভিন্ন চিঠিতে তাঁর আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগের অনুপ্রেরণায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও ফুটে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'। এ সমিতিকে কেন্দ্র করেই শক্তিশালী মুসলমান সাহিত্যিকরা যেমন কাজী ইমদাদুল হক, কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি মোজাম্মেল হক, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, গোলাম মোস্তফা, শেখ ফজলুল করিম, লুৎফর রহমান, ওয়াজেদ আলীসহ আরো অনেকে সমবেত হয়েছিলেন। করাচি থেকে কাজী নজরুল ইসলামও কবিতা পাঠাতেন। ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাস থেকে সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশিত হয়।

---

১৫১. ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ (কলিকাতা:এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৮ বাং), পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

এ পত্রিকাতে মুসলমান লেখকদের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। সাহিত্য সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলোতে মাতৃভাষারূপে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সংকল্প ফুটে উঠে, অথচ ধর্ম ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহন-ভাষারূপে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রতিও যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার সংকল্প প্রকাশ পায়। নতুন এ পত্রিকায় হিন্দু লেখকরাও যোগ দিলেন।[১৫২] মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার এ অভিনবত্বের আয়োজন বাঙালী সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই।

এ আয়োজন আরো পূর্ণাঙ্গ হল 'মোসলেম ভারত' নামক সুবিখ্যাত পত্রিকার মাধ্যমে। 'মোসলেম ভারতে'র লেখক-পরিধি আরো বিস্তৃত হল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়সহ বিশিষ্ট হিন্দু লেখকগণ ছাড়াও তারিকুল আলম, ইমদাদুল হক, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, শেখ ফজলুল করিম, মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ ও লুৎফর রহমানসহ অনেক মুসলমান লেখকগণ নিয়মিত লেখা শুরু করলেন। 'মোসলেম ভারত' একটি উচ্চাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকায় রূপ নিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে এসে যোগ হল 'সওগাত' ও মাসিক 'মোহাম্মদী'। এ সকল পত্রিকায় শক্তিশালী মুসলমান লেখকগণ ইসলামী বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা, চরিতকাহিনী, গল্প ইত্যাদি রচনায় অগ্রসর হয়ে এলেন, তখন মোহিতলালের মত তরুণ-কবির কাছে এক নতুন কল্পনার জগত উদ্ঘাটিত হল। তাঁর কবিতায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহার এবং জীবনাবেগ এতই তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠল যে, তাতে মুসলমান লেখকদের প্রভাবই অনুমান করা যায়।

মোহিতলালের বিখ্যাত দু'টি কবিতা 'নাদিরশাহের জাগরণ' ও 'নাদিরশাহের শেষ' সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩২৫ সালের মাঘ ও ফাল্গুণ সংখ্যায়। তারও আগে ১৩২২-এর শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভারতী'তে সত্যেন্দ্রনাথের কবর-ই-নুরজাহান' এবং একই মাসে 'প্রবাসী'তে 'তাজ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। ফলে এ কবিতা দু'টির মূলে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকাও স্বাভাবিক।

ভারতীতে 'নাদিরশাহের জাগরণ' ১৩২৫-এ বেরুলেও ১৩২৭-এর কার্তিক সংখ্যায়'মোসলেম ভারতে' কবিতাটি আবার মুদ্রিত হতে থাকে। মুসলমান-পরিচালিত পত্রিকা যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, মোহিতলাল নিজে তাকে স্বীকার করে নিয়ে সে ধারাতেই কাব্যপ্রচেষ্টাকে চালিত

---

১৫২. কালিদাস রায় কবিশেখরের ও সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর কবিতা এতে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। 'মোসলেম ভারতে' তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হল। শুধু 'মোসলেম ভারতে'ই নয় 'প্রবাসী' এবং 'ভারতী'তেও মোহিতলালের ইসলামী বিষয় এবং ভঙ্গির অনেক কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে।

মোটকথা, 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রকাশের পর থেকে ইসলামী বা ফার্সী বিষয় নিয়ে মোহিতলালের কাব্যরচনার জোয়ার আসে। শুধু যে শব্দনির্বাচনেই তিনি নতুনত্বের দিকে ফিরলেন, তা নয়, জীবনাবেগের দুর্ধর্ষতা, মধ্যযুগীয় মোগল জাতির অপরিমিত শক্তি ও সৌন্দর্যলালসার কল্পনা মোহিতলালের মনে আগুন ধরিয়েছিল। এতদিন মোহিতলালের কবিতায় ছিল শান্ত ও স্নিগ্ধতা, এবার এল বলিষ্ঠতা আর উদ্দমতা।

মোহিতলালের প্রেরণার মধ্য গগনে যার দান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন 'মানসী' সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়। ইন্দুপ্রকাশ ছিলেন সদ্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী লেখক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ফার্সী সাহিত্যের পাঠক ছিলেন– তার থেকে কিছু অনুবাদও করেছেন। ইন্দুপ্রকাশ নিজেও ভাল ফার্সী জানতেন। ইন্দুপ্রকাশের সাথে বন্ধুত্বসূত্রে মোহিতলালের ফার্সী কাব্যে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। বাংলা ১৩১৫ সনে মোহিতলাল যখন লিখতে শুরু করলেন, তখন এ ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়ই তাঁকে বিভিন্ন ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সংসর্গে এসে মোহিতলাল হাফিজ, ওমর খৈয়ামসহ বিভিন্ন ফার্সী কবিদের সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়াও মোহিতলাল ছিলেন বহু পঠনশীল কবি। অতএব তাঁর পক্ষে ফার্সী কবিদের সম্পর্কে পরিচিত হওয়া এবং তাঁদের ভাব-কল্পনায় মুগ্ধ হওয়া বিন্দুমাত্র অসম্ভব ছিল না। তাঁর প্রথম দিককার সাহিত্যকৃতির মধ্যে ওমর খৈয়ামের জীবনকথা 'জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম' (মানসী, চৈত্র ১৩১৫) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

তাছাড়া তাঁর নিজের জীবনযাত্রাও তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে পারে। ১৯১৪ খৃ. মোহিতলালকে সরকারী জরীফ বিভাগের কাজে উত্তরবঙ্গের মাঠে-ঘাটে, পদ্মার চরে, গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। সে সময়ের কথা লিখতে গিয়ে মোহিতলাল বলেন-

"জীবনের সহিত রূঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির ভীষণ মধুর মূর্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এ কয় মাসেই লাভ করেছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্যজীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইতেছিল। বনে-জঙ্গলে, মাঠে ও নদীর চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁবুতেই বাস করিতাম, কোনও দিন বা বৃক্ষতলে রাত্রী যাপন করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ হইতে পাবনা-বাজিতপুর পর্যন্ত যে বিশাল চর–একবার সেখানেই সারা বছর কাটাইয়াছিলাম। জলপাইগুড়ি অবস্থানকালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে

বসিয়াছিলাম, তেমনই এক বৃক্ষছায়াহীন বালুপ্রান্তরে অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। এক কথায় বিধিবদ্ধ সমাজ জীবনের বাহিরে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যেভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং প্রকৃতির যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল–তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হয় নাই।"[১৫৩]

অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে লেখা পত্রে মোহিতলাল বলেছেন- "মরুভূমিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে আমি এক প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের, The Terrible Sahara-র চিত্র কাজে লাগাইয়াছি–দুই একটি ইংরেজী কবিতার সাহায্য লইয়াছি। কিন্তু সকলের উপরে আমার বেদুইন জীবন বোধহয় সর্বাপেক্ষা বেশী কাজে লাগিয়াছে। আমি এক সময় পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বালুচরে বৈশাখের রৌদ্রে অশ্বপৃষ্ঠে সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।"[১৫৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হল যে, সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশের পূর্বেই মোহিতলালের মন ইসলামী আবহ তথা আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত ছিল। সেই সাথে ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়ের সাহচর্য আর মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনা তাঁর নবীনতর সৃষ্টিপ্রেরণাকে আরো স্ফীত করে দিয়েছিল।

আধুনিক বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের হাতে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্য আমরা দেখেছি। তাঁদের এ সব শব্দ ব্যবহারের মূলে ছিল একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ। এঁদের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। কিন্তু মুসলিম অনুষঙ্গ চিত্রায়ণে এবং আরবী-ফার্সীজাত শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ঈর্ষণীয় সাফল্যের অধিকারী। নজরুলের হাতে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, বিপুল ব্যঞ্জনাময়, গভীর তাৎপর্যবাহী এবং বহুলাংশে সঠিক ও যথাযথ হয়েছে। নজরুল কাব্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে আরবী-ফার্সী শব্দের সুসম ব্যবহার। পয়ারের শোষণ ক্ষমতার মত নজরুলের শব্দ আত্মীকরণ ক্ষমতা অবিশ্বাস্য রকমের। উপমা সৃষ্টি, চিত্রকল্প রচনা, ভাষার সুনিপুণ রূপময় ব্যবহার এবং ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধি এত দূর যে, তাঁর সম্পর্কে কবি গুরুর নিম্নোক্ত

---

১৫৩. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল (করকাতা, ১৯৬১), পৃ. ৯
১৫৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শিলাইদহে রবীন্দ্রস্মৃতি'–প্রবন্ধ রবিপ্রদক্ষিণ (কলকাতা, ১৩৫৬বাং.), পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

উক্তিটি অকম্পিত কণ্ঠে নির্দিধায় উচ্চারণ করা যায়, "যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফুটাতে।"

নজরুলের মৌল কবি-প্রতিভার স্পর্শে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে একটি বৈচিত্রময় দিগন্ত উন্মোচন করেছে। শৈশবে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে নজরুলের আরবী-ফার্সী শিক্ষা, লেটো দলে গান বাঁধার সময় হিন্দু পুরাণ ও কল্প-কাহিনীর সাথে গভীর পরিচয় এবং করাচীর সেনানিবাসে পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে ইরানী কবিদের কাব্যপাঠ তাঁকে কবি-প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছে। ইরানী কবিদের অত্যুচ্চ কবি-কল্পনা, গভীর জীবন-দর্শন ও কাব্য-সৌন্দর্য নজরুলকে তাঁর পল্টন-জীবনেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ফার্সী-কাব্যসহ বাংলা সাহিত্যেরও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী নজরুল এসময়েই ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি ওমর ও হাফিজের শুধু কাব্যই পাঠ করেন নি, এঁদের জীবন-দর্শন, কাব্য-সৌন্দর্য এবং রচনার শিল্পরূপ সম্পর্কেও অনবদ্য আলোচনা করেছেন। তাছাড়া দেশ-বিদেশের সাহিত্য-পাঠ ও জ্ঞান-চর্চায় নজরুলের অভিনিবেশ পরবর্তীতে কবি-জীবনে এক পরম সম্পদ হিসেবে কাজে লেগেছিল। ফলে তিনি যুক্তিসিদ্ধ, মৌলিক ও অভাবিতপূর্ব আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারে নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কোন বিশেষ ভাষার শব্দরাজিকে অন্য ভাষায় প্রয়োগ করতে হলে ভাষা বিষয়ে যে প্রাজ্ঞতা ও ব্যবহারিক নৈপুণ্য প্রয়োজন, নজরুলের তা অনেকটাই ছিল। তাঁর 'কাব্যে আমপারা', 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' পাঠ করলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলা ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'কাব্যে আমপারা' প্রকাশের পূর্বে প্রকাশক মাওলানা আবদুর রহমান খান তৎকালীন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার প্রধান প্রধান মোদার্‌রেস ও ইসলামিয়া কলেজের আরবী, উর্দু ও ফার্সী বিভাগের অধ্যাপকগণের মাধ্যমে শুদ্ধতা যাচাই করিয়ে নেন।[১৫৫] টুকিটাকি সামান্য সংশোধন ছাড়া নজরুলের অনুবাদ ত্রুটিমুক্ত প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য যে, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদ সাফল্য সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "কাজীর অনুবাদ সকল অনুবাদের কাজী"।[১৫৬] দিওয়ান-ই-হাফিজের অনুবাদও সুধীমহলে স্বীকৃত। এ সব তথ্য থেকেও আরবী-ফার্সী ভাষা বিষয়ে নজরুলের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত।

---

১৫৫. মাহফুজুর রহমান, 'স্মৃতিচারণ', নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ১৩৮০ সংখ্যা।

১৫৬. সৈয়দ মুজতবা আলী, নজরুল অনুদিত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-এর ভূমিকা, নজরুল রচনাবলী, ৩য় খন্ড, নতুন সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, পৃ. ১০২৪

নজরুল-কাব্যে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারে ফার্সী সাহিত্যের প্রভাব-যেমন লক্ষণীয়, তেমনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রভাবও কম নয়। আরবী-ফার্সী শব্দ সম্বলিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী 'পুথি সাহিত্যের সাথে নজরুলের প্রত্যক্ষ ও গভীর সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্ক তাঁর মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর কবিতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, রূপকল্প সৃষ্টিতে সর্বোপরি ভাষার সুখকর বিন্যাস ও আবহ রচনায় তারই পরিচয় দীপ্ত।

নজরুল সাধারণ সার্বজনীন অনুভূতি প্রকাশের জন্য অনেক আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্রও দেখিয়েছেন। মুসলিম সমাজের প্রচলিত এমন বহু শব্দ আছে যা নজরুলের পূর্বে কেউ ব্যবহার করেন নি, নজরুলের পরেও আজ পর্যন্ত তার সার্থক ব্যবহার হয়নি। মুসলিম সমাজের প্রচলিত ভাষায় নজরুল মুসলিম মানসের পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পরিবেশের খাতিরে ও মুসলিম মানসের সংগে সংযোগের জন্য আরবী-ফার্সী বহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করা সংগত। নজরুল-কাব্য সে কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনকথা

আকাশে সূর্য যখন দীপ্যমান, তখন গ্রহ তারকার উজ্জলতা যে আলোর গভীরে ঢাকা পড়ে যায়। অবশ্য সূর্য সকলের প্রতি সমভাবে আলোর প্রসাদ বিতরণ করে থাকে। রবীন্দ্রযুগের সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তারের মধ্যে এমনি অনেক গ্রহতারা ও খদ্যোতপুঞ্জ তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অধিকতর ভাগ্যবান। এই তরুণ কবির প্রতি উদ্দিষ্ট কবিগুরুর স্নিগ্ধ স্নেহসুকোমল বাৎসল্যভাব ক্রমে আত্মীয়তার নিবিড় উষ্ণতায় পরিণতি লাভ করে।

রবীন্দ্র-স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর মানসমুকুলগুলি অংকুরিত হলেও বাক্‌প্রতিমা নির্মাণের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি এমন বিচিত্র ধরণের ধ্বনি ঝংকার ও শব্দ কুতুহলা সৃষ্টি করেছিলেন যে, তাঁর সমকালীন অনেক কবি এবং পরবর্তীকালেও কেউ কেউ সেই মোহমদির বাণীবিলাসের আওতা থেকে পুরোপুরী মুক্ত হতে পারেননি। অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও বাংলা ভাষার দৈন্যতা ঘোচাবার জন্যে এবং বাংলা কাব্যে বৈচিত্র সৃষ্টির জন্যে তিনি যে সাধনা করে গেছেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।

সত্যেন্দ্রনাথের মত ছন্দকুশলী কবি দুর্লভ। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ভাষার অপরূপ কারুকার্যতা, কড়ি ও কোমলের চিত্তগ্রাহী ধ্বনিরঙ্গ, চিত্রাঙ্গনের আশ্চর্য্য নৈপূণ্য। অকালে মৃত্যুবরণ করলেও কবিতা, অনুবাদ ও গদ্য রচনায় তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলার কাব্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। একথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের যে সকল কবি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বোধকরি সর্বাগ্রগণ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আদিনিবাস, বংশ তালিকা, অক্ষয়কুমার দত্তের 'শোভনোদ্যান' সম্পত্তির উইল, পিতার আয় রোজগার ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার :

এক

কলকাতা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শহর ও প্রধান বন্দর। ১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। পরবর্তিকালে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের রাজধানী হয়। শুধুমাত্র লণ্ডনের পরই দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত এটাকে 'সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগর' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এর নিজস্ব মার্জিত ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের জন্য কলকাতাকে 'প্রাসাদ নগরী'ও বলা হতো। বঙ্গোপসাগর

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ১৩৮ কিলোমিটার উত্তর দিকে হুগলী (ভাগীরথী) নদীর বাম (পূর্ব) তীরে অবস্থিত এটি অন্য তিন দিক থেকে অখণ্ড চব্বিশপরগণা জেলা দ্বারা বেষ্টিত ।[১]

দই

কলকাতার সম্ভ্রান্ত বংশ দত্ত পরিবারের অধঃস্তন পুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ঊনবিংশ শতাব্দির চিন্তাশীল লেখক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক অক্ষয়কুমার দত্ত[২] (১৮২০-১৮৮৬) তাঁর পিতামহ। এটা সত্যেন্দ্রনাথের কবি জীবনের গৌরব। অক্ষয়কুমারই সে যুগের একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেছিলেন এবং নবজাত গদ্য সাহিত্যের সেবা করতে গিয়ে যথেষ্ট শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন ।[৩]

এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ টাকীয় নিকটবর্তী পুড়াঁ গ্রামের সন্নিহিত গন্ধর্বপুর বসবাস করতেন। পরবর্তীতে নদীয়া (এখন বর্ধমান) জেলার অন্তর্গত পূর্বস্থলী গ্রামের কাছে চুপীতে বসবাস শুরু করেন ।[৪]

---

১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাপিডিয়া (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৩), খ. ২, পৃ-১৭৫
২. খ্রিষ্টান মিশনারী কার্যক্রম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির প্রভাবে বাংলায় যখন নীরব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন চলছিল। সে সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় অক্ষয়কুমার দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন ।একটি ইউরোপীয় সেমিনারিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজী, বাংলা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত ও ফার্সীসহ ভারতীয় ক্লাসিক্যাল ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। সেকালের অত্যন্ত প্রভাবশালী সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তাঁর পাণ্ডিত্য ও লেখক হিসেবে খ্যাতির ফলে তিনি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম সংবাদপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। অক্ষয়কুমার বহুল আলোচিত বহু গ্রন্থের প্রণেতা। দ্র. বাংলাপিডিয়া, খ. ২, পৃ. ২-৩)
৩. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ, (কলকাতা:নিতাইচন্দ্র দাস, ১৯৫৮) পৃ. ১৬
৪. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী (কলকাতা:বাক সাহিত্য প্রা. লিমিটেড, ১৯৭১), খ. ১, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

তিন

চুপীর দত্তদের যে বংশ তালিকা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

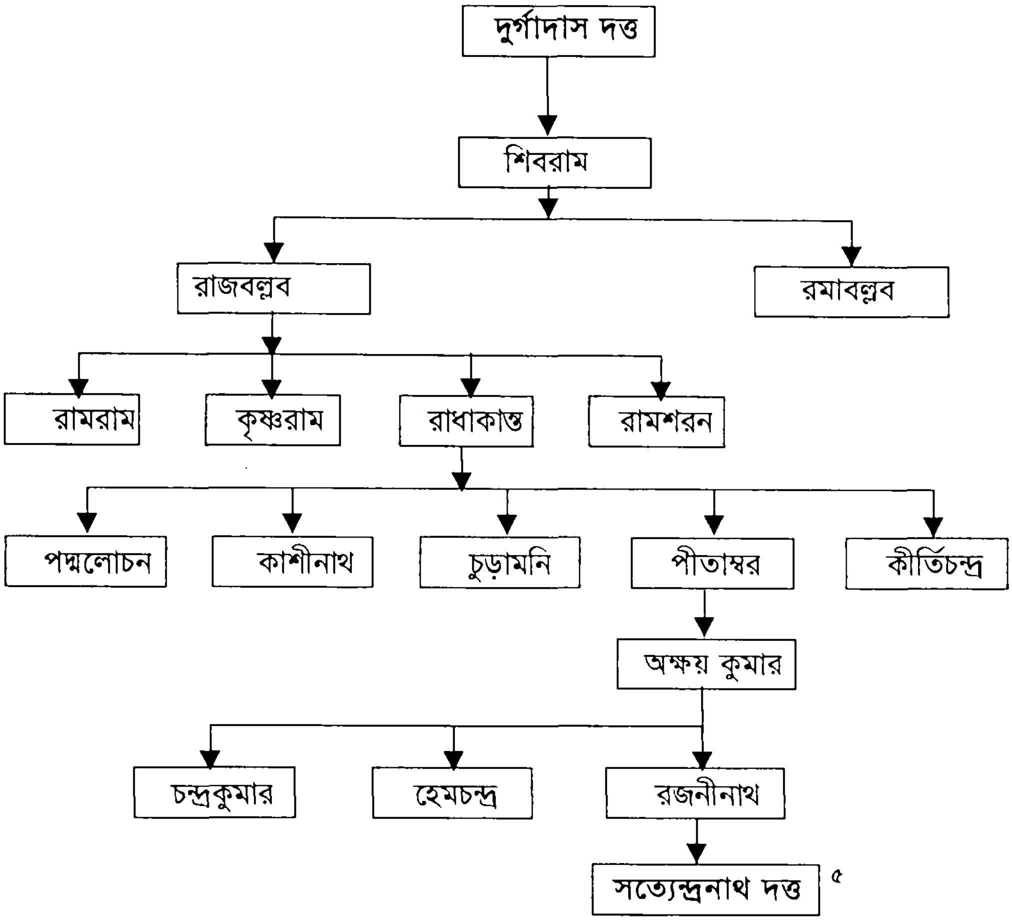

[৫]

চুপীর যেখানে তাঁদের বসবাস ছিল, তা এখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

চার

সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত কলকাতার ৪৬ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রিটে একটি বাড়ী কিনে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বালিতেও তিনি একটি ছোট্র বাড়ী কিনে তাতে বহু দুস্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া রোপন করেন। বাড়িটির নাম দেন 'শোভনোদ্যান'। দুরারোগ্য শিরঃপীড়ার আক্রমণে প্রায় শয্যাশায়ী অক্ষয়কুমার গঙ্গার তীরবর্তী ছায়াস্নিগ্ধ এ উদ্যান বাড়িতেই বসবাস করেছিলেন। কিন্তু কলকাতার ৪৬ নং ষ্ট্রিটের বাড়িটিতেই দত্ত পরিবারের শেষ জীবন

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

অতিবাহিত হয়।[৬] ১৮৮৬ সালের ২৮ মে সত্যেন্দ্রনাথের বয়স যখন চার বছর তখন তাঁর পিতামহ মারা যান।

পাঁচ

মৃত্যুকালে তিনি অনেক বিষয়-সম্পত্তি রেখে যান। তাছাড়া হিসেবী ছিলেন বলে বেশ কিছু সঞ্চয়ও ছিল। মৃত্যুর পূর্বে বাড়ী ও সঞ্চয়ের অধিকাংশই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ দত্ত এবং রজনীনাথের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে দান করে যান।[৭] উইলটি ছিল নিম্নরুপ :

"কলিকাতার নর্থ ডিবিজনের অন্তঃপতি মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রিটস্থ আমার ৪৬ নম্বরের বাটি এবং বালিগ্রামের সদর রাস্তার পূর্ব ধারে কল্যাণেশ্বর শিবের সমীপস্থ যে একখন্ড মোকররী মৌরষি ব্রক্ষত্বর জমি ও পুস্করিণী আছে। তাহা আমার কনিষ্ট পুত্র রজনীনাথ দত্ত ও পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রাপ্ত হইবেক"।[৮]

অক্ষয়কুমার দত্তের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম চন্দ্রকুমার অপরজনের নাম হেমচন্দ্র। চন্দ্রকুমার ছিলেন অপুত্রক আর হেমচন্দ্র ছিলেন চিরকুমার, সুতরাং বালি ও কলিকাতার বাড়ীর উত্তরাধিকারীও হয়েছিলেন পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ।

ছয়.

সত্যেন্দ্রনাথের মাতামহ রামদাস মিত্র ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার নিমৃতা গ্রামের অধিবাসী। রামদাস মিত্র ও বিমলা দেবীর কন্যা মহামায়া দেবীর সঙ্গে রজনীনাথ দত্তের বিবাহ হয়।[৯] অক্ষয়কুমার দত্ত যে বিশাল সম্পত্তি রেখে যান তা থেকে অর্জিত আয় এবং নিজেও হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা করে যা আয় করতেন তা দিয়ে রজনীনাথ দত্তের সংসার মোটামুটি সচ্ছল ভাবেই কেটে যেত।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম, জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ এবং শিক্ষাজীবন :

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবন তেমন ঘটনাবহুল ছিল না, যেমনটি ছিল মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ দাস, অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উনবিংশ শতকের কবি গোবিন্দদাস এবং একালের জনপ্রিয় কবি 'হাবিলদার' কাজী নজরুল ইসলামের জীবনে। এদের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মতো কোন ছোট-বড় ঘটনা সত্যেন্দ্রনাথের চল্লিশ বছরের জীবন ইতিহাসে বড় একটা

---

৬. ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড, ভূমিকা-পৃ. (গ)
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা (গ)
৮. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয় চরিত (কলিকাতা, ১২৯২ বাংলা), পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায় না। বস্তুত তাঁর জীবনকথা একটি মাত্র সরল রেখায় চিত্রিত করা যায়, যা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলা সম্ভব।

এক

উনবিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিকাল। বিংশ শতাব্দীর উষার আলো বিকিরণের অপেক্ষায়। শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বাঙ্গালী জাতির প্রাণের কবি, জ্ঞান-তাপস অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র আর রজনীনাথ দত্তের পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী, বাংলা ৩০ মাঘ ১২৮৮ শনিবার দ্বি-প্রহর রাতে সে যুগের অগ্রণী সাহিত্য সেবক মামা কালীচরণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।[১০] রাতের দ্বি-প্রহরে জন্ম গ্রহণের ফলে তাঁর বাংলা জন্ম তারিখ নিয়েও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কেউ বলেছেন দিনটি ২৯ মাঘ শুক্রবার আবার কারো মতে ৩০ মাঘ শনিবার।[১১]

দুই

অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের মত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা লেখা-পড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক সত্যেন্দ্রনাথকে তেমন কোন আকর্ষণ যোগাতে পারেনি। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে বাইরের কাব্য ও সাহিত্যাদির প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। ফলে দেখা যায়, তিনি কোন পরীক্ষাতেই তেমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

১৮৯৯ খৃ. তিনি কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে এফ এ ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৯০১ খৃ. তিনি এফ এ পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[১২] কলেজ জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন–

"তখন (১৯০৩ খৃ..) আমি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্র-সাহিত্যদর্শী অজিতকুমার চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন আমার সহপাঠি। সত্যেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার ও আমি– আমাদের তিনজনের থার্ড সাবজেক্ট

---

৯. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, খ. ১, পৃ. ২৪
১০. সনজিদ খাতুন, সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয় (ঢাকা:নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯), পৃ. ৩
১১. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থাবলী, থ. ১, পৃ. ২৩
১২. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৪

ছিল সংস্কৃত। সংস্কৃত ক্লাশে সদস্য সংখ্যা কম। সে ক্লাশে তিনজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণভাব ছিল।"[১৩]

এরপর সত্যেন্দ্রনাথ বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল বটে কিন্তু দুভার্গবশতঃ কৃতকার্য্য হতে পারেননি। তিনি পড়া-শুনা করতেন ঠিকই কিন্তু তা পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। ফলে নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী সংগ্রহে সাফল্য আসেনি। সত্যেন্দ্রনাথ পাঠ্য পুস্তকে অমনোযোগী হলেও অপাঠ্য পুস্তক কিন্তু পড়েছিলেন প্রচুর এবং আয়ত্বও করেছিলেন যথেষ্ট। তিনি বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-ভান্ডার থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, যা তাঁর কবিতা পাঠে অনুমান করা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথের বহু পঠন এবং জ্ঞানার্জনের প্রমাণ তাঁর রচনাবলী। তিনি যেখানে যা পেয়েছেন, তাই আত্মস্থ করেছেন অবলিলাক্রমে। তাঁর কাব্য-সাহিত্যে তাই ফুটে উঠেছে অত্যন্ত জোরালোভাবে । পুরনো বই সংগহের দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। তাঁর সংগ্রহের বিষয় বৈচিত্রও ছিল লক্ষণীয়। তিনি একাধিক ভাষা শিখেছেন– অনুবাদ কবিতায় তাঁর বহু ভাষার উপর অধিকার প্রকাশ পেয়েছে।[১৪]

সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও বিবাহ, কবিপত্নীর অবস্থান ও মৃত্যু :

এক

ব্যক্তিজীবনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একেবারে সাদামাঠা। অর্থোপার্জন, সাংসারিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কোনই আকর্ষণ ছিলনা। লেখা-পড়া শেষ করে তিনি মামার আগ্রহে কিছুদিন তার আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ব্যবসা বাণিজ্যে তার মন বসলো না। তিনি বলতেন, ব্যবসা তো অর্থ উপার্জনের জন্য। অর্থে আমার কি প্রয়োজন? তিনি অর্থকরি উপার্জনের পন্থা ত্যাগ করে মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রিটের দ্বিতল কক্ষে পুরোদস্তুর কবি হয়ে বসলেন।[১৫]

দই

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র, তখন তাঁর পিতা রজনীনাথ দত্ত মারা যান (১৩০৯ বাংলা)। মৃত্যুর পূর্বেই রজনীনাথ দত্ত ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে যান। ফলে সত্যেন্দ্রনাথ

---

১৩. সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-স্মৃতি (কলকাতা, ১৩৬৪ বাংলা), পৃ. ৭৮
১৪. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, থ. ১, পৃ. ২৫
১৫. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ভুমিকা-ঘ

পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মাথায় ১৩১০ সালের ৪ঠা বৈশাখ ঈশানচন্দ্র বসুর কন্যা কনকলতার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৬]

তিন

তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর। সত্যেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু হলেও কবিজায়া কনকলতা দেবী দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। মধুপুরে ধর্মাশ্রম কপিলমঠে তার বিধবা জীবন অতিবাহিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধিকা জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁদের কোন সন্তান সন্ততি ছিলনা। কনকলতা ১৯৬৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতায় পরলোক গমন করেন।[১৭]

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের প্রেক্ষাপট, বন্ধু বাৎসল্যতা, রবীন্দ্র প্রেরণা ও 'রবিমন্ডলী' :

এক

সত্যেন্দ্রনাথের জীবন ছিল ঘটনা বিরল। একান্তভাবে সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ কবি জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল ভাষা চর্চা, গ্রন্থ পাঠ এবং সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক ও কালিক প্রভাবের। কারণ, দেশ-কাল ও পরিবেশের প্রভাব মানব চিত্তের প্রসারে ও ধ্যান-ধারণার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তার সাথে যুক্ত হয় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ ও পারিবারিক ঐতিহ্য। এ সবের সমারোহে মানুষ পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য এর প্রভাব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।[১৮] কবি ও লেখকদের সারা জীবনের আরাধ্য সাধনার অর্জিত সাফল্য তার যে রচনাবলী, তাতে সে প্রভাব দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে।

সাহিত্যধারার একটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্য ও প্রথম কৈশোর অতিবাহিত করে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্ন থেকেই কবি গুরুর সান্নিধ্য তাঁকে কাব্যরসের মহাসমুদ্র সংগমে অবগাহনের অবারিত সুযোগ এনে দেয়। জন্মগত সাহিত্যবোধের অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের কাছ থেকে অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা, সাহিত্যের রসজ্ঞতা এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি পিতামহের উদ্দেশ্যে লিখেছেন–

১৬. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, খ. ১, পৃ. ২৬
১৭. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ভূমিকা-ঘ
১৮. ড. নুরুর রহমান, সৈয়দ মুজতবা আলী: জীবন কথা (ঢাকা:এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯০), পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর; গরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায় ।[১৯]

অক্ষয়কুমারের মত দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান-লিপ্সা তাঁর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। জ্ঞান-তাপসী অক্ষয়কুমার তাঁর বাড়ীতে একটি পুস্তক সংগ্রহশালা রেখে যান। এ সংগ্রহ কত বিচিত্র এবং বিশাল ছিল তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত তাঁদের পারিবারিক গ্রন্থসমূহ থেকেই বুঝা যায়। [২০] কবি সত্যেন্দ্রনাথ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রিটস্থ এ সংগ্রহশালায় নিবিষ্ট মনে সাহিত্য সাধনা করতেন। ফলে সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহের মতো জগৎ জীবনের প্রতি অমিত কৌতুহল, অন্তহীন জিজ্ঞাসা এবং মামা কালীচরণের সাহিত্য অনুরাগে সিক্ত হন। পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত গ্রন্থ পাঠ আর পারিবারিক প্রতিবেশের আনুকূল্যে প্রথম কৈশোরেই তাঁর জীবনের গতিধারা চিহ্নিত হয়ে যায়। তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। ভারতীর ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত (৩য় পৃষ্ঠায়) 'ছন্দ-সরস্বতি' প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন–

"বারো উৎরে তেরোয় পা দেয়ার মাস খানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরস্বতি স্কন্ধে এসে ভর করলো"– এ সময়ে লেখা তাঁর প্রথম কবিতা :

কি দিয়া পুজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞানহীন আমি দীন সন্তান তোমার।[২১]

এমনি গোটা আট-দশেক লাইন। সত্যেন্দ্রনাথ কবি হলেন, অবশ্য কবি চেতনার তলে-তলে বইতে লাগল বিশ্ব জ্ঞানপ্রবাহ।

দুই

স্বার্থের দ্বন্দে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হয়। হিংসা-প্রতিহিংসার জ্বালায় একে অন্যকে খুন করতেও দ্বিধা করেনা। এটা জগতের চিরাচরিত নিয়ম কিন্তু সত্যেন্দ্রজীবন বোধহয় তাঁর ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, বন্ধুসঙ্গ সকলের নিকট মঙ্গলজনক না হলেও সত্যেন্দ্রজীবন ছিল এর ব্যতিক্রম। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধুভাগ্য রীতিমত ঈর্ষারযোগ্য। তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশের ঘটনাই তার অন্যতম

---

১৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুহু ও কেকা (কলিকাতা:মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮ বাং.), পৃ. ১১২
২০. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ভূমিকা-গ
২১. ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত সত্যেন্দ্র রচনাবলী (কলকাতা: ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৬), খ. ৩, পৃ. ৪০১

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত। তাঁর গুনগ্রাহী বন্ধু সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র, 'সবিতা' মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে তাঁর কিশোর হৃদয়ে যে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল তার মূল্য অপরিসীম।[২২]

১৯০৮ সালের জুন মাসে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কার্তিক প্রেসে তখন লেখকদের যে আসর বসতো সেখানে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন সৌরন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমূখ। এরা তাকে লেখার কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল।'মানসী' পত্রিকার সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁকে শুধু তাঁর পত্রিকায় লেখার সুযোগ করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং তাঁর পত্রিকার কার্যালয়ে যে সাহিত্যের আসর বসতো সেখানেও তাঁকে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।[২৩]

সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত দুই বন্ধু সতীশচন্দ্র রায় ও অজিত চক্রবর্তী যাদের সাহিত্যিক মনোবৃত্তি নিঃসন্দেহে সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেছিল।[২৪] সতীশচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন– "সতীশচন্দ্রের কবি প্রকৃতি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ পরবর্তী বিশিষ্ট কবির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।"

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে যে দু'জন শ্রেষ্ঠ বন্ধু জুটেছিল, তাঁরা হলেন চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। উভয়ই নাম করা সাহিত্যিক। এদের সংস্পর্শে এসে সুধী সমাজে অনায়াসে পরিচিত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে তাঁর নতুন নতুন রচনা পড়ে শোনাতেন। বাংলা গদ্যের শক্তিশালী লেখক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর 'পাদচারণ' কবিতা গ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করে দিয়ে প্রমথ চৌধুরী অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। তাঁর জবাবে সত্যেন্দ্রনাথ একটি পত্র কবিতা লেখেন। কবিতাটি ১৩২৭ বাংলা সনের শ্রাবণ সংখ্যা সবুজ পত্রে মুদ্রিত হয়।[২৫] এছাড়াও 'প্রবাসী', 'ভারতী, 'সাহিত্য' 'মানসী' 'বঙ্গদর্শন' ও 'যমুনা' প্রভৃতি পত্রিকার সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।[২৬]

---

২২. সনজিদ খাতুন, সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়, পৃ. ১৬
২৩. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, খ. ১, পৃ. ২৮-২৯
২৪. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৫
২৫. সনজিদ খাতুন, সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়, পৃ. ২৭
২৬. হরপ্রসাদ মিত্র, কবি সত্যেন্দ্রনাথের কথা (শারদীয় জনসেবক, ১৩৬১), পৃ. ১১৯

তিন.

সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণার মধ্য গগনে উজ্জল জ্যোতিষ্ক হিসেবে যার পদচারণা, তিনি হলেন কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতায় এঁর প্রভাব লক্ষণীয়। যদিও পরবর্তীতে তিনি অনেকখানি স্বাধীনভাবেই লেখনী চালিয়েছেন। বাংলা ১৩১৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে বলেছেন।[২৭]

সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলেজে অধ্যয়নরত তখনি রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাত। তারপরই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ও অন্তরঙ্গদের একজন হয়ে উঠেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অসিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত বরেণ্য ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। সে আকর্ষণ পরবর্তীতে তীব্র অনুরাগে পর্যবসিত হয়। ১৯১০ খৃ. থেকে ১৯১৫ খৃ.,– এ সময়টি ছিল রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মূহুর্ত। ১৯১৫ খৃ. একবার সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-পরিবারের সঙ্গে মাস খানেকের জন্য কাশ্মীর ভ্রমণে যান।[২৮] ফলে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন, তারি' গুণে তিনি কবি-গুরুর ব্যর্থ অনুকরণ এড়িয়ে সতন্ত্র ধারায় সাধ্যানুযায়ী সাহিত্য রচনায় সক্ষম হন।

সত্যেন্দ্রনাথ কবি-গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ বিলিয়ে দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি। কবি গুরুকে কেউ কটাক্ষ করলেও তা' তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তার সম্পাদিত 'সাহিত্যে' সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ছাপিয়ে তাঁকে কবি বানিয়েছিলেন, রবীন্দ-বিরোধিতার কারণে তার সাহিত্য সংসর্গ পরিত্যাগ করতেও তিনি দ্বিধা করেননি।[২৯] শুধু তাই নয়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ বিদায়(১৯১২)' নাটকের অন্তিমকৃত্য করতে যারা অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।[৩০] এ সময় তিনি রবীন্দ্র-বিরোধীদের আক্রমণ করে স্বনামে ও বেনামে অনেকগুলো ব্যঙ্গ কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। যা কালোত্তীর্ণ হয়ে কাব্যাদর্শে পরিণত হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন সময় নবকুমার, কবিরত্ন, ত্রিবিক্রমবর্মণ, বস্তুতান্ত্রিক চুড়ামণি, কলমগীর, সলিলোল্লাস, সাতরা প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করে প্রবন্ধ রচনা করেন।

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
২৮. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৭
২৯. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ভুমিকা-চ
৩০. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, খ. ১, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব জগৎ রবীন্দ্রনাথকে চিনতে দেরী করলেও সত্যেন্দ্রনাথ কিন্তু চিনতে দেরী করেননি। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ কবি গুরুকে সংবর্ধনার আয়োজন করেন। ১৯১২ সালের ২৮ জানুয়ারী কলিকাতার 'টাউন হলে' সংবর্ধনা সভায় সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'কবি-প্রশস্তি' (জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমারে করি গর্ব) হস্তিদন্তের পুঁথিতে খোদাই করে কবিকে উপহার দেন।[৩১] ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করার আগেই তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করে সত্যেন্দ্রনাথ দেশবাসীর পক্ষ থেকে কর্তব্য পালন করেছিলেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের সংবাদ কলকাতায় পৌছলে সত্যেন্দ্রনাথ উল্লাসে ফেটে পড়েন।[৩২] শান্তি নিকেতনে এ উপলক্ষ্যে কবিকে দেয়া সংবর্ধনায় যে অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করা হয় সত্যেন্দ্রনাথ তার 'মুসাবিদা' করেন এবং অভিনন্দনের পর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'আভ্যুদয়িক' (রবির অর্ঘ পাঠিয়েছ আজ ধ্রুবতারার প্রতিবেশী) কবিতাটি পাঠ করে শুনান।[৩৩]

চার

১৯১৯ খৃ. রবীন্দ্র অনুরাগী তরুণ লেখকেরা 'রবিমন্ডলী' নামে একটি সাহিত্য সংস্থা গড়ে তোলেন। 'রবিমন্ডলী' নামটি সত্যেন্দ্রনাথের দেয়া নাম। কবিগুরু ভক্ত চারুচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন, অসিতকুমার হালদার, প্রেমাম্বুর আতর্থী, নরেন্দ্রদেব, সূধীররায় চৌধুরী প্রমূখ এর উদ্দোক্তা। 'রবিমন্ডলী'র প্রথম অধিবেশন বসে সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে। সত্যেন্দ্রনাথ এ অধিবেশনে তাঁর 'ধুপের-ধোয়ায়' নাটিকাটি পড়ে শোনান।

গুরুর প্রতি শিষ্যের যেমন ভক্তির অন্ত নেই, শিষ্যের প্রতিও গুরুর স্নেহের কোন কমতি ছিলনা। সত্যেন্দ্রনাথকে কবি-গুরু পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। নিজ সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় তিনি এতটা বেদনাভিভূত হননি, যতটা হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু সংবাদে। তাঁর মর্মবেদনার অনুপম দৃষ্টান্ত কবিকে উৎসর্গ করে লেখা তার 'পূরবী' নামক অপূর্ব কবিতাটি। যা আজো কাব্য প্রেমিকদের হৃদয়ের তন্ত্রীকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু ও স্মৃতিচারণ :

এক

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৩২. হেমেন্দ্রকুমার রায়, যাঁদের দেখেছি (কলকাতা, ১৩৫৯), ২য় পর্ব, পৃ. ৫০
৩৩. ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বোলপুরে রবীন্দ্র সংবর্ধনা, 'মানসী' পৌষ-১৩২০, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম-মৃত্যু সবই স্রষ্টার বিধান একথা সত্যি কিন্তু কোন কোন মৃত্যু এমন যা মানুষ সহজে মেনে নিতে পারেনা। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুও ছিল তেমনি বাংলার সাহিত্যাঙ্গনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। পূর্বেই বলেছি, সত্যেন্দ্রনাথ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রিটে অক্ষয়কুমারের রেখে যাওয়া গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সমুদ্রে ডুবে থাকতেন। তাঁর এই অতি পঠনের ফলে অল্প বয়সেই দৃষ্টি শক্তি আশংকাজনকভাবে ক্ষীণ হয়ে যায়। একই অভ্যাসের জন্য পিতামহের মতো তিনিও শিরঃপীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। দৃষ্টিশক্তি বাঁচানোর নিস্ফল চেষ্টায় ডাক্তারের পরামর্শে লেখা পড়াও ছেড়ে দেন। এদিকে সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল ছিলনা।

১৯২২ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে বন্ধুদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ হুগলী জেলার জিরেট–বলাগড়ে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ী যান। সেখানে তিনি সদ্য লেখা 'জৈষ্ঠ্য মধু' কবিতাটি বন্ধুদের পড়ে শোনান।[৩৪] কলকাতা ফিরে কবি জ্বর ও পৃষ্ঠব্রনে আক্রান্ত হন। ২৫ জুন ১৯২২ ইং বাংলা ১৩২৯ সালের ১০ আষাঢ় রাত ২টা ৩০মিনিটে সত্যের পুজারী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "অনাগত যুগের সাথেও ছন্দে ছন্দে নানা সূত্রে" যে নিবিড় বন্ধন রচনা করেছিলেন, সে বন্ধন ছিন্ন করে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।[৩৫] এ দুঃসংবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আত্নীয় বিয়োগের চেয়েও তীব্র বেদনা অনুভব করেন।

403660

দুই

১৯২২ সালের ৯ জুলাই কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, সেদিন শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি পাঠ করে শোনান সেটি তাঁর 'পূরবী' গ্রন্থে স্থান করে নিয়েছে। সেদিনের স্মৃতি-চারণ সম্পর্কে সূধীরচন্দ্র সরকার লিখেছেন– "আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনে এতটাই অভিভূত হয়েছিলাম যে, সে দিন সত্যেন্দ্রনাথের সেই স্মরণ সভায় কোন রেজুলিউশন নেয়া বা কমিটি গঠন হয়নি। শ্রোতামন্ডলী কবি গুরুর কবিতা শুনে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বাড়ী চলে গেল। এ রকম শোকপূর্ণ সভা আমি আর কখনো দেখিনি।"[৩৬]

সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

কবি সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কবিতার মধ্যে তাঁর চঞ্চলতা প্রকাশ পেলেও কথা-বার্তায় তিনি ছিলেন একেবারে শান্ত স্বভাবের। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর উক্তি–

---

৩৪. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৩
৩৫. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ভুমিকা-ছ
৩৬. সুধীর চন্দ্র সরকার, আমার দেশ আমার কাল, কলিকাতা, পৃ. ৬১

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

"তাঁর মত মিতভাষী লোক আমাদের বাচাল জাতির মধ্যে অল্পই দেখা যায়। আমি তাঁকে কখনো তর্কে লিপ্ত হতে দেখিনি। যদিও তাঁর সম্মুখে কখনো কখনো আমরা মহাউত্তেজিত ভাবে তর্ক করেছি।"[৩৭]

হৃদয় বৃত্তির দিক থেকেও তিনি ছিলেন চাঁপা স্বভাবের। সমাজের নানা অন্যায় অবিচার তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিত। বালক বয়সে মায়ের সাথে একাদশী করতে গিয়ে বিধবাদের দুঃখ-দুর্দশার যে চিত্র তিনি উপলব্ধি করেছিলেন [৩৮] তা থেকে তিনি সকল অত্যাচারের বিরোধী হয়ে উঠেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বজাগ হৃদয়ের অধিকারী। পৃথিবীর কোথাও অসাধারণ মহৎ কিছু ঘটলে তা তাঁর অন্তরে নাড়া দিত। টাইটানিক জাহাজ ডোবা, ম্যাকসুইনির প্রায়োপবেশন, টলষ্টয়ের গৃহত্যাগ, ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা, এগুলো তাঁকে বিচলিত করতো।[৩৯]

তাঁর অন্তরে ভালবাসার গভীরতা ও তীব্রতা ছিল সীমাহীন। হিন্দু- মুসলমানের বিরোধ তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করতো। সে যুগের হিন্দু- মুসলিম মিলনকামী মহাপুরুষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অন্যতম। 'কুহু ও কেকা'র "ফুল-শির্ণি" কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।[৪০] মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি। মহাত্মা গান্ধীকে যারা বিশ্বাস করতেন না তাদের তিনি ভৎসনা করতেও দ্বিধা করতেন না।

সত্যেন্দ্রনাথ যা কিছু সত্য বলে জানতেন, তার অন্যথা কিছুতেই স্বীকার করতেন না। যেমনটি ঘটেছিল ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের (মৃ. ১৮৫০ খৃ.) বেলায়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল তা তাঁর পরম পুজণীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও পরিবর্তন করতে পারেননি। তাঁর কাছে যা অসত্য–তা শ্রদ্ধা ভালবাসার দোহাই ও মানে না। তাঁর নিষ্ঠা সকল ক্ষেত্রে সমান ছিল।

নারীদের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অন্ত ছিলনা। নারী সত্যেন্দ্রনাথের চোখে মহিমাময়ী দেবী, মায়ের জাতি।[৪১] মায়ের জাতীর উপর সমাজের যে উৎপীড়ন তার বিরুদ্ধে তিনি সমানে কলম চালিয়েছেন। শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। ব্যক্তি জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ নাস্তিক হিসেবে পরিজ্ঞাত ছিলেন।[৪২]

---

৩৭. প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ, 'সবুজ পত্র' (কলিকাতা, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২৯),পৃষ্ঠা-৬৩০
৩৮. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা-৬
৩৯. সাচুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র পরিচয়, 'প্রবাসী' কলকাতা, শ্রাবণ-১৩২৯,পৃষ্ঠা- ৫৯০
৪০. সনজিদ খাতুন, সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা-৭
৪১. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপধ্যায়, সত্যেন স্মরনে, 'ভারতী'-১৩২৯, পৃষ্ঠা-৪০২
৪২. চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র পরিচয়, 'প্রবাসী'-১৩২৯ শ্রাবণ, পৃষ্ঠা-৫৯০

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে কখনই জড়িত ছিলেন না। তদুপরি বিংশ শতাব্দির যাবতীয় আন্দোলন তথা বঙ্গ-ভঙ্গ থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলন কোনটাই তাঁর চোখ এড়াতে পারেনি। 'গিরিরাণী' ও 'কয়াধু' কবিতা তার প্রমাণ।

সত্যেন্দ্রনাথ চারিত্রিক ও সাহিত্যিক উভয় গুণেই ছিলেন গুণান্বিত। তাবৎ সাহিত্য সমাজ আর পাঠক সমাজের মাঝে তিনি যে সমাদৃত ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা বিষয়ক একটি প্রস্তাব বিপুল উৎসাহের সাথে আলোচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এ থেকেই আমরা তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাহিত্যকর্ম

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের যে সকল কবি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন, তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বোধ করি সর্বাগ্রগণ্য। রবীন্দ্র-প্রতিভার তেজদ্বীপ্ত আলোক রশ্মিতে অনেক কবির আত্ম-পরিচয়ের অপমৃত্যু ঘটলেও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি নজরুল ছিলেন অনন্য সাধারণ মৌলিকত্বে স্ব-মহিমায় সু-প্রতিষ্ঠিত। কারণ কবি ও কবিতা সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব এমন একটি ধারণা বদ্ধ মূল ছিল যে তা থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে কখনো বিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলতেন-

"বাংলাদেশে মাত্র আড়াই জন সত্যিকার কবি জন্মেছেন, তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র (মৃ.১৮৯৪ খৃ.) এক, রবীন্দ্রনাথ (মৃ. ১৯৪১ খৃ.) এক আর মাইকেল (মৃ. ১৮৭৩ খৃ.) আধ",[৪৩] গোটা ইউরোপের মধ্যে তিনি গেটে (১৭৪৯-১৮৩২ খৃ.), ভিক্টর হুগো (মৃ.১৮৮৫ খৃ.), শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃ.) ও শেলী (১৭৯২-১৮২২ খৃ.)কে কবি বলে স্বীকার করতেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের (১৭৭০-১৮৫০ খৃ.) মত কবিকে তিনি কবি বলেই মানতেন না। এ ব্যাপারে কবিগুরু ও তাঁর মত পাল্টাতে পারেননি। আমেরিকার হুইটম্যান (মৃ.১৮৯২ খৃ.) ও লংফেলো (মৃ. ১৮৮২ খৃ.)কে তিনি কবি বলে স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন-

"ওদের দেশেতো দু'টি মাত্র কবি, একজন লংফেলো আর একজন হুইটম্যান, একজনের ছন্দ মেলেছে তো ভাব জোটেনি অপরজনের ভাব জুটেছে তো ছন্দ জোটেনি। দু'য়ের সমন্বয় না হলে কি কবি হওয়া যায়"? [৪৪] দু'য়ের সমন্বয় থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্রাউনিং (১৮১২-১৮৮৯ খৃ.)কে বড় কবি বলে স্বীকার করতেন না। সুতরাং তিনি যখন কবিতা রচনা করেছেন তখন এ রকম দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই তা লিখেছেন। অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও বাংলা ভাষায় দৈন্যতা ঘোচাবার জন্যে এবং বাংলা কাব্যে বৈচিত্র সৃষ্টির জন্যে তিনি যে সাধনা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয়।

বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথই একমাত্র কবি যিনি অনুবাদ কাব্যে নিজস্ব ভূবন সৃষ্টিতে ছিলেন স্বপ্রতিভ। ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র, ভাষায় যাদুকর, ও অনুবাদকের শিরোমণি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গদ্য-পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভাষান্তরের যে অনুপম কীতি স্থাপন করেছেন, উপমহাদেশের কোন কাব্য

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০

Dhaka University Institutional Repository

সাধকের পক্ষে বোধকরি এতটা সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ভাবের সাথে মূলের সম্পর্ক রেখে এমন নিখুঁত ভাবে অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেছেন, কোন পাঠক সহজে তা অনুধাবনে সক্ষম নয়। তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে বলা হয়- "লেখক মহাশয় এ গুলিকে অনুবাদ বলিয়া ছাপিয়া না দিলে কেহই তরজমা বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।[৪৫] সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার পাশাপাশি কিছু গদ্য রচনাও পরিদৃষ্ট হয়। তবে সে গুলো খুবই সামান্য। এক্ষেত্রে কিছু অনুবাদের সংশ্লিষ্টতা আছে। তবে রচনার মান তাঁর কাব্য প্রতিভার মতই ঔজ্জ্বল্যের দাবী রাখে।

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক কবিতা ও কাব্য গ্রন্থ :

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্য-জগতের এক মহা দিকপাল। রবীন্দ্র-কালের কবি হয়েও তিনি ছিলেন আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। স্বকীয় কল্পনা ও বর্ণনায় আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। পিতামহের পান্ডিত্যের দীপ্তি তাঁর মাঝে সঞ্চারিত ছিল। অর্জিত জ্ঞানকে গানে পরিণত করার এক প্রাণান্ত প্রচেষ্ঠা ছিল তাঁর কাব্যে। বৈজ্ঞানিক ঋজুতা, মুক্তির সাজ-সজ্জা এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর আস্তিক্যবাদী সহিষ্ণুতা, এ সবের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর কৈশোরের কবিতাসমুহে।

বারো বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম কবিতা রচনা করেন। (জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে) তাঁর 'স্বর্গাদপী গরীয়সী' (বাংলা ১৩০০ সনে রচিত) প্রথম সার্থক কবিতা। কবিতাটি সনেট জাতীয়। বয়সের তুলনায় রচনাটি বেশ পরিচ্ছন্ন।[৪৬]

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কাব্য গ্রন্থের নাম 'সবিতা'। যা ১৯০০ সালের ১৩ জুন প্রকাশিত হয়।[৪৭] কাব্যখানি অতি ক্ষুদ্র এবং এর যথার্থতা নিয়ে কবির মনেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রীতিতে লেখা কবিতাগুলো সূর্যের বন্দনা ছাড়াও কিছু স্বদেশিক ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

এর প্রায় পাঁচ বছর পর বঙ্গ-ভঙ্গের উত্তেজনার সময় ১৯০৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় তাঁর 'সন্ধিক্ষণ' কাব্য গ্রন্থটি। এটি তৎকালীন স্বদেশী সভায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। 'সবিতা' ও 'সন্ধিক্ষণ' কাব্যগ্রন্থ দু'টি পরবর্তীতে 'বেণু ও বীণা' ও 'হোমশিখায়' অন্তর্ভূক্ত হয়। 'বেণু

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুস্তক সমালোচনা, 'তীর্থরেণ', প্রবাসী ১৩১৭ আশ্বিন, পৃ. ৬১৯

৪৬. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ভুমিকা-জ

৪৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালা-র 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' পুস্তিকায় বলেছেন-"ছাত্রাবস্থায় ১৯০০ সালে সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক 'সবিতা' গোপনে মুদ্রিত হয়। এর দু'বৎসর পর তিনি মাসিক পত্রে সর্ব প্রথম আত্ম প্রকাশ করেন।সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে' (ফাগুন ১৩০৮) তাঁহার 'দেখিবে কি' ভোল্টেয়ার হইতে কবিতা মুদ্রিত হয়।"
কিন্তু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 'বিদায়-আরতী'র ভুমিকায় 'কবি পরিচিতি' (পৃ-১৬৩) তে বলেছেন- "তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকালিন সাপ্তাহিক 'হিতৌষী' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা ছাপা হয়।"

ও বীণা' প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এবং 'হোমশিখা' প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালের ১১ অক্টোবর। প্রথম দিকের এ গ্রন্থগুলোর মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ নিজস্ব স্বরূপ ও রীতিতে সচেতন হন। কবিতাগুলোতে কবি সাম্য সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছেন, নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন, মানবতার কল্যাণ স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন।[৪৮] যদিও এ সময়কার কবিতাগুলো ছন্দে যথেষ্ট দুর্বল ও অপরিণত। বাক-রীতিতে বৈচিত্র ও অভিনবত্বের চমক শুন্য। 'বেণু ও বীণা'র বহু কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব চোখে পড়ে। 'বেণু ও বীণা' প্রকাশের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাধুবাদ লাভ করেছিলেন। এ সকল কবিতা প্রথমে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় ছাপা হয়। গ্রন্থটিতে মোট পঁচাশিটি কবিতা আছে।

বাংলা ১৩০০ থেকে ১৩০৮ দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে রচিত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দীর্ঘ কবিতাগুলোকে সঞ্চিত করে সত্যেন্দ্রনাথ 'হোমশিখা' (১৯০৭ খৃ.) প্রকাশ করেন। এ সময় রসিক মহল ও পাঠক মহলে তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ কবি হিসেবে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেন।

'হোমশিখা'র কবিতাগুলোতে সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মনস্কতা ফুটে উঠেছে। তিনি তথ্যের মূল সন্ধানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার বলেন- 'সত্যেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিকের মত জীবনের সর্বত্র তথ্যের সত্যতা খুজিয়াছিলেন'।[৪৯] গ্রন্থটিতে মোট কবিতার সংখ্যা আট।

১৯১১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের-ফসল' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর আগে কবিতাগুলি 'ভারতী' (বৈশাখ ১৩১৭), 'প্রবাসী' (জৈষ্ঠ ১৩১৭), 'প্রবাসী' (আষাঢ় ১৩১৭), 'প্রবাসী' (চৈত্র ১৩১৭), 'ভারতী' (চৈত্র ১৩১৭), 'ভারতী' (বৈশাখ ১৩১৮) ও 'ভারতী' (শ্রাবণ ১৩১৮) প্রকাশিত হয়েছিল। 'ফুলের ফসল' গ্রন্থে 'কিশোরী'র বর্ণনাতে তাঁর মৌলিক কল্পনা ফুটে উঠেছে। এই কিশোরীর রূপে সব কিছু বিহ্বল। তাঁর 'জলচুড়িটি', 'আলতা-পরা' চরণ, 'গঙ্গাজলী ডুরে' আর 'নীলাম্বরি', 'সিঁথির সিঁদূর', 'সিদূর টিপ আর খয়ের টিপ', 'কানের দুল' ইত্যাদি কবিতা পৃথিবীতে সৌন্দর্যের লহর তুলে।

১৯১২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর 'কুহুওকেকা' কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।[৫০] গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে এর কিছু কবিতা 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সাহিত্য' 'বঙ্গদর্শন' এবং আরো কিছু পত্রিকায়

---

৪৮. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, খ. ১, পৃ. ৪

৪৯. মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ,'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', পৃ. ২২৯

৫০. ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের বর্ণনানুযায়ী (সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, পৃ. ৩৮) কুহু ও কেকার প্রকাশ কাল-১৯১১ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়েছিল। তবে বেশীর ভাগ কবিতাই নতুন। গ্রন্থটিতে একশত দশটির মত কবিতা আছে। 'কুহুওকেকা' কবিতার মাধ্যমে কবি জগতকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। জগতের মানুষের হাসি-কান্না,ও সুখ-দুঃখের ছবি এঁকেছেন। বাস্তবতায় 'কুহুওকেকা' যেমনি বসন্ত ও বর্ষার আগমনী বার্তা দিয়ে মানব চিত্তে প্রফুল্লতার প্রসাদ বিলিয়ে দেয়, তেমনি মানব মনের আশা-আকাংখা, হর্ষ-বিষাদ, হাসি-কান্না ও মিলন-বিচ্ছেদের বাণী দিয়ে কবি জগৎ সংসারে প্রীতি ও স্মৃতিকে একই অনুভূতিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলির লিখন' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২২ আগষ্ট ১৯১৪ খৃ.। গ্রন্থটিতে মোট সতেরটি কবিতা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রেমের মহত্ব বুঝেছিলেন বলেই "তুলির লিখন" কবিতাগুলোতে তিনি প্রেমের আলোকসম্পাত করে কলুষ পংকিল জীবনকেও সহনীয় করে তুলেছেন। 'শোভিকা', 'বিষকন্যা' তাঁর এ জাতীয় কবিতা। তাঁর কিছু কবিতায় ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'শবাসীন', 'শোভিকা', 'বিষকন্যা' ও 'যশমস্ত' কবিতাগুলি স্মরণ করা যেতে পারে।

কবির "অভ্র-আবীর" কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৬ মার্চ ১৯১৬ খৃ.। কবিতাগুলোতে কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। নিচু-বর্ণের প্রতি উচু-বর্ণের ঘৃণা ও বিবেচনাহীন দুর্ব্যবহারকে উপলব্দি করেছেন। বর্ণভেদের মত সাম্প্রদায়িকতাকেও তিনি ঘৃণা ভরে উপেক্ষা করেছেন। 'জাতির পাতি', 'আভ্যুদয়িক' ইত্যাদি কবিতায় তারই প্রমাণ মেলে। তাঁর 'মৃত্যু স্বয়ম্বর' 'সমাজমান্য গুন্ডামি' 'কসাই হাট' ও 'সমাজ সাপ' কবিতাগুলোতে চির অবহেলিত বাঙ্গালী নারীর কথা তুলে ধরা হয়েছে।[৫১] তাছাড়া কবি 'নির্জলা একদশী', 'যমুনার জল', জন্মাষ্টমী', 'মহা সরস্বতী' ও 'পরশ' কবিতার মাধ্যমে মানবত্ব, ধর্মবোধ ও সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

১৯১৭ খৃ. জানুয়ারী মাসে তাঁর কাব্যগ্রন্থ "হসন্তিকা" প্রকাশিত হয়। "হসন্তিকা"র বেশীরভাগ কবিতাই হাস্যরস জাতীয়। এ সম্পর্কে তাঁর উক্তি-

'রঙ্গে ব্যঙ্গে কোলাকোলি,
আরামে আর আঁচে।' (হসন্তিকা: হসন্তিকা)

তবে তাঁর 'ব্যঙ্গ' কবিতায় কারো প্রতি কটাক্ষ নেই। কিছু কবিতায় দাম্পত্য জীবনের কথা আলোচিত হয়েছে। 'নাক ডাকার গান', 'জবান-পচিশী' এ জাতীয় কবিতা। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা 'কুক্কুট পাদ মিশ্র'

---

৫১. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৫১

কবিতায় 'আঁচ' আরামপ্রদ হয়নি, যদিও 'রাজা ভড়ং' 'হু' কবিতার মধ্যে কিছু আরামের আয়োজন আছে। আরাম আর আঁচের চমৎকার সমন্বয় আছে-'শ্রী শ্রী টিকিমন্ডল', 'সিগার সঙ্গীত' 'মদিরা মঙ্গল' 'আদর্শ-বিষয়ের কবিতা' ও 'বিশ্ব কর্ম্মার প্রতি' ইত্যাদি কবিতায়।[৫২] সত্যেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ রচনার বিষয় ছিল সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য এবং স্বদেশ। দুঃখ-দুর্দশার হিম তাড়না থেকে আত্নরক্ষার জন্য কবিতায় দেশবাসীকে দিয়েছিলেন এই অগ্নিপাত্র 'হসন্তিকা আঙারধানী'।[৫৩]

সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর এক বছর পর (১৯ আক্টোবর ১৯২৩) তাঁর "বেলাশেষের গান" কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের 'দিল্লীনামা' কবিতাতে তিনি ইতিহাসের অনেক কিছুর আভাষ দিয়েছেন। তিনি 'অর্ঘপঞ্চক' ও 'আখেরী' কবিতায় ধর্মবোধের বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশ হিতৈষীদের আত্নত্যাগ, ধৈর্য ও সাহস এবং আত্নবিশ্বাসপূর্ণ কর্মের প্রতি 'গান্ধিজী', 'বিধানদাতা' কবিতায় শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। 'বাঙ্গালী পল্টনের গানে' ও 'সালতামামী'তে স্বাধীনতার আনন্দ এবং নৈরাস্যের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে।

'বিদায় আরতি' কাব্যগ্রন্থটি ২ মার্চ ১৯২৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। এটি একটি বিবিধ ভাব ও স্বাদের কবিতা সংগ্রহ। তিনি তাঁর 'কয়াদু' ও 'গিরিরাণী' কবিতার মাধ্যমে প্রহ্লাদের জননীর মনোব্যথা এবং গিরিরাণীর ক্ষোভের মধ্য দিয়ে বিদেশী পিষ্ঠ-ভারতের মর্মজ্বালা ফুটিয়ে তোলেছেন। 'নবজীবনের গান', 'পাতিল প্রমাদ', ও 'সেবাসাম' কবিতায় বর্ণভেদ প্রথার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাঁর 'চরকার গান'ও 'নবজীবনের গানে' দেশবাসীর প্রতি স্বপ্রতিষ্ঠার আহ্বান রয়েছে। 'জলচর ক্লাবের জলসা'য় কবি রঙ্গ কৌতুকের চমৎকার উপভোগ্যতাকে ফুটিয়ে তোলেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার প্রিয় কবি। তাঁর স্ব-প্রকাশিত কবিতাসমুহের রসাস্বাদন থেকে কাব্যানুরাগীরাা বঞ্চিত হবেন তা, কি করে হয়? কবি বন্ধু স্বর্গত সুধীরচন্দ্র সরকার কবির যশ কীর্তিব দীপশিখা লোক সমক্ষে তুলে ধরার মানসে নিজ প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে কবির কাব্যগ্রন্থসমুহ থেকে বড়দের জন্য 'কাব্য-সঞ্চয়ন' (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০) প্রকাশ করেন। 'কাব্য সঞ্চয়ন' গ্রন্থটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেয়া নাম। এর কিছু কাল পরে ছোটদের জন্য 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা' নামক বইটিও (১৯৪৫ সালে) প্রকাশ করেন।[৫৪] 'সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা' বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

---

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৫৩. ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, পৃ. ২১১
৫৪. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ :

যে কাজটির জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ কাব্য জগতে আপন মহিমায় সমুজ্জল তা হল তাঁর অনুবাদ কবিতা। ছন্দের অসাধারণ কারুকার্য, বাক্‌নির্মিতের অভাবনীয় চমক, রূপের-দীপ্তি ও ভাবের-গভীরতা তাঁর অনুবাদ কবিতাকেও মূলের মত রমণীয় করে তোলেছে। বোধকরি বাংলা সাহিত্যে কবি রবিন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই একমাত্র কবি যিনি আধ্যাত্ম-তত্ত, দার্শনিক-তত্ত, সাহিত্য-তত্ত, দেশ-প্রীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, হাস্য-রস, প্রেম, নারী-বন্দনা, বাৎসল্যরস, নীতিকথা, সামাজিক বৈষম্য, চরিত্রপুজা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের উপর অনুবাদ করেছেন।[৫৫] এক ভাষার শব্দ, ব্যঞ্জনা, রুপকল্প, ঐতিহ্য ও মানসিকতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে ফুটিয়ে তোলা দু:সাধ্য। তাও তিনি অতি নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করেছেন। তিনি দেশ- বিদেশের বহু ভাষা আয়ত্ব করেছেন এবং অবলীলাক্রমে সে ভাষার কবিতা বাংলায় কাব্যানুবাদ করেছেন। তাঁর ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, জার্মান, ফরাসী ইত্যাদি ভাষার উপর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।'ফরাসী ভাষা জানা থাকাতে য়ুরোপীয় সাহিত্যের সকল মহলের চাবি যেন তাঁর (সত্যেন্দ্রনাথের) হাতের মুঠোয় ছিল'।[৫৬] তাঁর ফারসী শিখার সাক্ষী চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রী অমল হোম।[৫৭] কবি নিজেও তাঁর 'তীর্থ সলিলে'র ভূমিকাতে স্পষ্টই বলেছেন- "এ পুস্তকে প্রকাশিত সমস্ত কবিতাই নানা দেশের, বিভিন্ন যুগের বিচিত্র কবিতার পদ্যানুবাদ, ক্ষেত্র বিশেষে অনুবাদের অনুবাদ। সকল স্থলে মূলের ছন্দ রাখিতে পারি নাই; তবে মূলের ভাব অক্ষুণ্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতেন যে, তিনি পৃথিবীর কবি। পক্ষান্তরে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা যায় যে, তিনি পৃথিবীর কবিতার অনুবাদক কবি। দেশ বিদেশের কবিদের চিত্ত-ফুল-মধু নিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'মধুচক্র'। 'তীর্থ-সলিল' পড়ে রবীন্দ্রনাথ কবিকে লিখেছিলেন-

"মূলের রস কোন মতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার লেখাগুলি মূলকে বৃন্ত স্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদে বিশেষ গৌরবই তাই- তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নতুন কাব্য"।[৫৮]

---

৫৫. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৪১-১৪২
৫৬. ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৫
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৫৮. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৫

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে আড়ষ্টতা নেই। অনুবাদ হলেও সেগুলি নতুন সৃষ্টি। 'তীর্থ-রেণু' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ কবিকে একপত্রে লিখেছিলেন– "তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তী। আত্মা একদেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা শিল্প কার্য নহে, সৃষ্টি কার্য"।[৫৯]

১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'র ৬৮২ পৃষ্ঠায় 'রাজা ও রাখাল' নামে সত্যেন্দ্রনাথের একটি নাট্য কাব্য প্রকাশিত হয়। এটি খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বের লেখা রাজা সলোমনের 'song of songs' অবলম্বনে রচিত। এর অনুবাদটিও ছিল স্বচ্ছন্দ।[৬০]

সত্যেন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'বন্দিদেবতা' ১৩২০ আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। 'বন্দীদেবতা' পাঠ করে 'পরিচয়' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে কবি সৈয়দ আলী আহ্সান বলেন -

"রূপ ও রীতিতে এই রূপান্তরিত কবিতাটি সম্পূর্ণ নতুন বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। মূল কবিতাটি বাংলা অনুবাদের মধ্যে যেন নবজন্ম লাভ করিয়াছে।............ইহাকে অনুবাদ না বলিয়া মৌলিক সৃষ্টি আখ্যা দিতে ইচ্ছা হয়।"[৬১]

'ভারতী' ১৩২২, আশ্বিন সংখ্যার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় সত্যেন্দ্রনাথের 'শক্র' নামের আর একটি নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়। একটি মাত্র পত্র ছাড়া পুরো কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। সাবলিল রচনা ভঙ্গির গুণে নাটকটি মূলের মতই রোমাঞ্চকর হয়েছে।[৬২]

উপরোক্ত সকল মনীষীদের মন্তব্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হল যে, ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে শৈল্পিক ও অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বেদব্যাস (খৃ.পূ ১৬০০-১৫০০), বাল্মীকি, কালিদাস, দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খৃ.), হোমার (খৃ. পূর্ব আট/নয় শতাব্দীতে বিদ্যমান), শেক্সপীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃ.), গেটে (১৭৪৯-১৮৩২ খৃ.), হুগো (১৮০২-১৮৮৫ খৃ.), বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪ খৃ.), হেঙজু (ইনি জাপান দেশের একজন প্রাচীন কবি), হাফিজ (মৃ. ১৩৯০ খৃ.), স্যাফো (খৃ. পূ. ৬৩০-৫৭০), অবৈয়ার (ইনি দাক্ষিণাত্রের একজন স্ত্রী-কবি, বিদ্যাবতী বলে খ্যাতি আছে), খুসহাল (ইনি একজন আফগান সর্দার। কবি এবং ভারত সম্রাট শাহজাহানের বন্ধু ছিলেন।), টেনিশন (১৮০৯-১৮৯২ খৃ.), ওমর খৈয়াম (১০৫৯-১১২৩ খৃ.), ভল্টেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খৃ.), হায়েন (১৭৯৯-১৮৫৬ খৃ.), শেলী (১৭৯২-১৮২২ খৃ.), সা'দী (মৃ. ১২৯২ খৃ), কীট্‌স

---

৫৯. সনজিদ খাতুন, সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা-২৭৫
৬০. সনজিদা খাতুন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃষ্ঠা-১৪৬
৬১. সৈয়দ আলী আহসান, 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ পরিচয়', ১৩৪৮ পৌষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৫১২
৬২. সনজিদা খাতুন, সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়' পৃষ্ঠা-২৮০

Dhaka University Institutional Repository

(১৭৯৫-১৮৩১ খৃ.), বার্নস (১৭৫৯-১৭৯৬ খৃ.) ও বেরাজ্যাঁরের (১৭৮০-১৮৫৭ খৃ.) মত বিখ্যাত কবিদের কবিতা অনুবাদ করে মাতৃভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু' ও 'মণি-মঞ্জুষা' অনুবাদ কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে পাঠক মহলে স্বীকৃত। 'তীর্থ সলিল' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর। গ্রন্থটিতে প্রায় একশত পয়ষট্টিটি কবিতা আছে। 'তীর্থরেণু' ও 'মণি-মঞ্জুষা' কাব্যানুবাদ গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০ আর ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫-তে। 'তীর্থরেণু'র কবিতার সংখ্যা প্রায় দুইশ' চারটি আর 'মণি-মঞ্জুষা'য় কবিতার সংখ্যা একশত বায়ান্নটি। গ্রন্থগুলোতে ভিন্ন ভাষাভাষী বিখ্যাত কবিদের কবিতার সার্থক অনুবাদ হয়েছে। শেক্সপীয়রের কবিতা অবলম্বনে 'বনচ্ছায়া', কবি হাফিজের কবিতার কাব্যানুবাদ 'প্রিয়া যবে পাশে', ফরাসী গাথা অবলম্বনে 'মল্লদেব', ভিক্টর হুগোর কাব্যের অনুবাদ 'সংকেত গীতিকা,' লতাঞ্চার কাব্যানুবাদ 'নস্য' এবং রেক্সফোর্ড এর কবিতা অবলম্বনে 'চিঠি,' সে সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Mother এর 'মৃত্যুরূপা মাতা' অনুবাদে কবিতার মৌলিকতাই যেন ফুটে উঠেছে।[৬৩] এসব কবিতা ভুলে থাকা কঠিন। শেলীর Lines to an Indian Air অবলম্বনে 'মিলন সংকেত' এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতা The Reverie of poor Susan-এর অনুবাদ 'দিবা-স্বপ্ন' সুইনবার্ণের কবিতা Love at sea অবলম্বনে 'সাগরে প্রেম' সত্যিই অপূর্ব।[৬৪]

'মণি-মঞ্জুষা'র কাব্যানুবাদগুলি রসভোগের দিক থেকে বিচিত্র ও বিস্ময়কর। এখানে তিনি শুধু ভারতীয় ভাষাই নয়, আরবী ও ফার্সীসহ আরো কিছু প্রাচ্য ভাষা এবং এর ছন্দ-কলা-কৌশল মাতৃভাষার মতই আয়ত্ব করেছেন। ফলে ভারতের বৈদিক সাহিত্য, মধ্যযুগীয় ভক্তি সাহিত্য, জাপানী কবিতা, ফরাসী, জার্মান, কালিদাস, ভাস, বামন প্রভৃতি এ কালের ও সেকালের দেশী-বিদেশী কবি ও কবিতার পরিচ্ছন্ন অনুবাদ যেন শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে।[৬৫]

সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য :

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একজন অসাধারণ কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্য অনুবাদক। এ কথাগুলি হয়তো অনেকেই জানেনা। তিনি যে একজন কুশলী গদ্য রচয়িতা ছিলেন, তা তাঁর নিম্মোক্ত রচনাবলী থেকেই অনুমান করা যায়।

---

৬৩. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ভূমিকা-ন
৬৪. ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ (কলকাতা, ১৩৬৮ বাংলা), পৃ. ২৭
৬৫. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড- ৩, ভূমিকা-ঘ

সত্যেন্দ্রনাথের 'জন্মদুঃখী' উপন্যাসটি 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হবার পর ২০ জুলাই ১৯১২ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। দুঃখজনক যে, এটি তাঁর কোন মৌলিক রচনা নয়। তবে অনুবাদ গ্রন্থ হলেও ভাষাশৈলির দিক থেকে উপন্যাসটি সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। নরওয়ের বিখ্যাত উপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার 'Jonas lie' জোনাস লাই-এর লিভস্লাভেন উপন্যাসের গল্প অবলম্বনে এটি রচিত। 'জন্ম দুঃখী' মৌলিক উপন্যাসের মতই সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে লেখা। সমালোচক সত্যব্রত শর্ম্মা এই গ্রন্থের সমালোচনায় ('ভারতী ১৩১৯, আশ্বিন, পৃ. ৬৭০) বলেছেন– "বর্ণনা ভঙ্গিতে বৈচিত্র ও মাধুর্য আছে। নায়ক নায়িকা বিদেশী না হলে এটা সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা কিনা তা নিয়েই পাঠক মহলে দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ার সম্ভাবনা ছিল"।[৬৬] উপন্যাসের নায়ক নিকোলার সামান্য জীবনের তুচ্ছ আশাও কিভাবে ব্যর্থ হল এবং শেষ পর্যন্ত খুনের দায়ে কিভাবে অন্ধকার কারাগারে বন্দী থাক্‌তে হল, তারই শোচনীয় কাহিনী এই বিদেশী উপন্যাসের মূল আখ্যান।[৬৭]

'রঙ্গমল্লি' নাটকটিও সত্যেন্দ্রনাথের একটি নাট্যানুবাদ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী। 'প্রবাসী' ১৩২২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'রাজা' ও 'বিচিত্রা,' ১৩৩৭ সালে আশ্বিন সংখ্যায় 'নাথু সর্দার' নামেও দু'খানি নাট্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক 'ধুপের ধোয়ায়' প্রকাশিত হয় ১২ জুলাই ১৯২৯।[৬৮] এটি দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমান নিয়ে লেখা হাস্যরস মিলনাত্মক নাটক। ১৯১২ সালে সত্যেন্দ্রনাথের 'চীনের ধুপ' নামক একমাত্র প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। মহাচীনের প্রধান দু'জন আচার্য লাও-ৎজু ও কনফুশিয়াসের উপদেশ, আদেশ ও দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা সম্বলিত কিছু তত্ত্ব-কথা দিয়ে বইটি সাজানো হয়েছে। বইটিতে চীন দেশের ঋষি ও মনীষীদের ভাব সুস্পষ্ট। কঠিন ভাবগুলিকে সহজ, সরল ও সুমধুর ভাষায় প্রকাশ করে সত্যেন্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী'[৬৯] পুস্তকটির কথা না বললেই নয়। বইটিতে তিনি বাংলা ছন্দের রূপ, প্রকৃতি ও কলা পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। 'ছন্দ-সরস্বতী'ই বাংলা সাহিত্যে প্রথম

---

৬৬. সনজিদা খাতুন,সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়, পৃ. ৪০৮
৬৭. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-৩, ভুমিকা-ঠ
৬৮. টিকা– ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সংকলিত, বেঙ্গল লাইব্রেরী মুদ্রিত পুস্তক তালিকা অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর প্রকাশকাল নির্দেশে 'ধুপের ধোয়ায়' নাটিকাটির প্রকাশকাল দিয়েছেন-১২ই জুলাই ১৯২৯ কিন্তু ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র তাঁর 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ' গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন– 'ধুপের ধোয়ায়' (নাটিকা) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তাঁর (সত্যেন্দ্রনাথের) মৃত্যুর কয়েকদিন পর। সে অনুযায়ী গন্থের প্রকাশ কাল হয় বাংলা-১৩২৯, ইংরেজী-১৯২২
৬৯. টিকা– ১৩২৫ বাংলা সনের বৈশাখ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

বস্তুগত ছন্দ শাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা'।[৭০] মৌলিক তথ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ এই প্রবন্ধটি ছন্দোবিদ্ মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

উল্লিখিত গদ্য সাহিত্য ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা হিসেবে 'তেহাই' নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। 'বারোয়ারী' নামক একটি উপন্যাস ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ২৯-৩২ পরিচ্ছেদগুলি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত। 'ডঙ্কানিশান' উপন্যাসটি সত্যেন্দ্র-প্রতিভার একটি উজ্জল দিক। একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের যতগুলো গুণ আছে তার সবগুলোই এর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। দূর্ভাগ্য, উপন্যাসটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেন– 'সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দির আদর্শ উপন্যাস হইত'।[৭১] সত্যেন্দ্রনাথের আরো যে কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলো 'কর্ম্মীজনের মনের কথা'[৭২] 'ভাবুকের নিবেদন'[৭৩] 'আভিজাত্যের নির্ভর ভিত্তি'[৭৪] এবং হযরত মোহাম্মদ (স.) এর বাণী সঞ্চয়ন 'মহা পুরুষের উক্তি'[৭৫] ইত্যাদি।

---

৭০. ডক্টর অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-৩, ভূমিকা-ড
৭১. রাখালদাস বন্দেপাধ্যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'প্রবাসী' মাঘ- ১৩৩০, পৃ. ৪৫৩
৭২. 'প্রবাসী', বৈশাখ- ১৩২০, পৃ. ৭৫
৭৩. 'প্রবাসী', ফাল্গুণ- ১৩১৮, পৃ. ৪৫২
৭৪. 'প্রবাসী', ভাদ্র- ১৩২০, পৃ. ৫৮৮
৭৫. 'প্রবাসী', আষাঢ়-১৩১৯, পৃ. ৩০১

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

	গ্রন্থের নাম	প্রকাশ কাল
১.	সবিতা (কবিতা)	১৩ জুন ১৯০০
২.	সন্ধিক্ষণ (কবিতা)	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
৩.	বেণূ ও বীণা (কবিতা)	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৬
৪.	হোমশিখা (কবিতা)	১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৭
৫.	তীর্থ সলিল (কাব্যানুবাদ)	২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৮
৬.	তীর্থ রেণু (কাব্যানুবাদ)	১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১০
৭.	ফুলের ফসল (কবিতা)	১২ সেপ্টেম্বর ১৯১১
৮.	জন্মদুঃখী (কাব্যানুবাদ)	২০ জুলাই ১৯১২
৯.	কুহু ও কেকা (কবিতা)	১০ সেপ্টেম্বর ১৯১২
১০.	চীনের ধূপ (গদ্য)	৫ অক্টোবর ১৯১২
১১.	রঙ্গমল্লী (অনুদিত নাটক)	৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৩
১২.	তুলির লিখন (কবিতা)	২২ আগষ্ট ১৯১৪
১৩.	মণি মঞ্জুষা (কাব্যানুবাদ)	২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৫
১৪.	অভ্র আবীব (কবিতা)	১৬ মার্চ ১৯১৬
১৫.	হসন্তিকা (কবিতা)	জানুয়ারী ১৯১৭
১৬.	বারোয়ারি (উপন্যাস)	২ মে ১৯২১
১৭.	বেলা শেষের গান (কবিতা)	১৯ই অক্টোবর ১৯২৩
১৮.	বিদায়-আরতি (কবিতা)	২ মার্চ ১৯২৪
১৯.	ধূপের ধোঁয়ায় (নাটক)	১২ জুলাই ১৯২৯
২০.	কাব্য সঞ্চয়ন (কবিতা সংকলন)	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০
২১.	সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা (কাব্য সংকলন)	১৯৪৫ খৃ.[৭৬]

৭৬. সনজিদা খাতুন, সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়, পৃ. ৪৪০-৪১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

মোহিতলাল মজুমদারের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোহিতলালের জীবনকথা

বাংলার কাব্যতরণীখানি যখন নবীন উৎসাহের জোয়ারে ভাস্‌তে ভাস্‌তে খণ্ডতা, দীনতা ও সংকীর্ণতার চোরাবালিতে আট্‌কে গিয়ে ব্যর্থ আক্রোশে শুধুই আন্দোলিত হচ্ছিল, সে সময় জীবনসত্যাভিমূখী কবি-দৃষ্টি ও বিশ্ব রহস্যানুগত ভাব ও কল্পনার আবেশে রুদ্ধ তরণীখানি পুনরায় শাশ্বত সৌন্দর্য পারাপারের গভীর সমুদ্রে ভাসমান করার জন্য যিনি কঠিন হাতে মাস্তল ধরেছিলেন তিনি হলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার। এখানেই মোহিতলালের কবি-প্রতিভার দুর্লভ মহিমার স্বাক্ষর নিহিত।

রবিন্দ্র-প্রতিভার ভরা জোয়ারের কালেই (ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ পাদ হ'তে বিংশ শতাব্দির প্রথম পাদ পর্যন্ত) কাব্যক্ষেত্রে মোহিতলাল মজুমদারের আত্মপ্রকাশ। ফলে কাব্য জীবনের প্রারম্ভে তাঁকেও রবীন্দ্রিয় ভাব ও ভাষার জাদুমন্ত্রে আভিভূত হতে দেখা যায়। যদিও পরবর্তীতে তাঁর বস্তু সচেতন কবি-দৃষ্টি, তাঁর বুদ্ধিবাদ মননশীলতা, তাঁর কাব্যের নাটকীয় উপাদান, ও কাব্যের ভাস্কর্যোপম গঠন তাঁকে কবি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্য দান করেছে।[১] মোহিতলাল স্বকীয়তায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হলেন। এ স্বকীয়তার জন্য কেউ কেউ তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী কবি বলেও অভিহিত করল। অন্যদিকে নবীণদের কাছে তিনি 'আধুনিকতার পূরোধা' বনে গেলেন। "কল্লোল" গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন– "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা বনে করতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম, মনে হয় যজন যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম, আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা, সংস্কাররাহিত্য তা' আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জান্‌তেন না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম। তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্ত ছিল"।[২]

রসগ্রাহী সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন– "আমাদের তরুণ বয়সে, যখন আমরা রবীদ্রোহিতার প্রয়োজনীয় ধাপ্‌টি পার হচ্ছিলাম, তখন যে দু'জন কবিকে আমরা তখনকার মত

---

১. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী ,১৩৭৯), পৃ. ১১
২. ড. কথাকলি সেনগুপ্ত, মোহিতলাল কবিতাপাঠ (কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০১),পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

গত্যন্তর খুজে পেয়েছিলাম। তাঁদের একজন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আর একজন 'বিস্মরণী'র মোহিতলাল।"[৩]

বাংলাদেশে মোহিতলাল কবি অপেক্ষা সমালোচক হিসেবেই সমধিক খ্যাত। তাঁর সমালোচনা কর্মের পরিধি যেমনি বিস্তৃত, তেমনি সারগর্ভ। তদুপরি শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্বের দিক দিয়ে তাঁর কবি-সত্তা, সমালোচক-সত্তা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, মোহিতলালের সমালোচকরূপে অসামান্য খ্যাতির মূলে তাঁর সৃষ্টিশীল কবিসত্তার প্রভাবই ক্রিয়াশীল ছিল বেশী। সমালোচনা জিনিসটা হচ্ছে সম্যক আলোচনা, যার জন্য চাই সমগ্র সৃষ্টি। যা সৃষ্টির অন্তরে প্রবেশ করে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ উভয়ই তুলে ধরতে পারে। তাই জ্ঞানের গভীরতা, সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি না থাকলে কোন ক্রমেই সমালোচক হওয়া যায় না।[৪] সৃষ্টিশীল সমালোচক সৃষ্টি মূল্য উপলব্ধি করে পাঠককে রসাস্বাদনে সাহায্য করে, সুসাহিত্যের প্রতি রুচি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগায় এবং লেখার মান ও মানসিকতার সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। সমালোচক শুধু পাঠকদেরই পথ নির্দেশক নন, লেখকদেরও অন্তরঙ্গ বন্ধু। কার্লাইলের ভাষায়- 'Criticism stands like an interpreter between the inspired and the uninspired'[৫] এ দিক থেকে মোহিতলাল যথার্থ সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসমুহ অধ্যয়ন করে তাঁদের মহৎ ও মহান ভাবের অনুপম সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য উপলব্দির মাধ্যমে সে ভাবের বাণীরূপ নির্মাণের জন্য ভাষা, ছন্দ, উপমা, অলংকার ও প্রতীকাদি প্রয়োগের সম্যক ধারণা লাভ করে সৃষ্টিশীল সাহিত্য নির্মাণ করেছিলেন। ফলে তাঁর সাহিত্য কালজয়ী সাহিত্যের রূপ লাভ করেছিল। সাহিত্য ব্রতের প্রতি এমন অবিচল নিষ্ঠা আর সাধনার নজির সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। সাহিত্যকর্মকে তিনি ছেলেখেলার মত মনে করতেন না। এমনকি যশ, খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের উপায় হিসেবেও চিহ্নিত করেননি। সাহিত্য চর্চা ও কাব্যানুশীলনকে তিনি তপস্যা চর্চার মতই পবিত্রকর্ম বলে মনে করতেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাণাধিক ভালবেসে আপন বিবেক-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানকর্মের যা কিছু অমূল্য সম্পদ সবই কাব্যলক্ষীর চরণে নিঃশেষে সমর্পণ করে জীবনের দায় মুক্ত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাব্য-সত্তা ও সমালোচনা-সত্তা দু'টিই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছিল। এ যেন

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৪. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল (কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৬১ খৃ.), "সমালোচক মোহিতলাল", পৃ. ১২৮
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাথু আর্ণল্ডের প্রতিকৃতি। টি.এস. ইলিয়ট তাঁর উভয় সত্তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন– "The two directions of sensibility are complementary; and so sensibility is rare, unpopular and desirable, it is to be expected that the critic and the creative artist should frequently be the same person."[৬] সৃষ্টির আনন্দে কবি হিসেবে তিনি যেমন পূর্ণ, তেমনি সমালোচক হিসেবেও অনুভাবকে রুদ্ধ না করে মনকে স্ববসে রাখার কঠোর আত্মশাসনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

মোহিতলাল মজুমদারের বংশ মর্যাদা :'পিতৃকূল' ও 'মাতৃকূল', পিতার আয়রোজগার ও উদাসীনতা, সম্পত্তির মালিকানা লাভ

এক

হুগলি নদীর ঠিক পশ্চিম তীরে অবস্থিত হুগলি জেলা পশ্চিম বাংলার একটি শিল্প নগরী এবং জেলার প্রধানকেন্দ্র। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজদের দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত। ১৫৭৮ খৃ. পেড্রো ট্যাভার্সের নেতৃত্বে একটি ফিরিঙ্গি প্রতিনিধি দল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) সাথে সাক্ষাত করে বাংলায় পর্তুগিজদের জন্য একটি শহর স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন। তারি আলোকে ১৫৭৯ খৃ. হুগলিতে পর্তুগিজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৯৯ খৃ. এখানেই একটি গ্রামে বিখ্যাত অগাস্টান গীর্জা নির্মিত হয়।[৭] এই হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে ছিল মোহিতলালের পিতৃকুলের বাস। পিতামহ কুলপদবী সেন ছিলেন রাঢ়ীয় বৈদ্য। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার ও মাতার নাম হেমমালা দেবী। পিতা নন্দলাল ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৮-১৯২০ খৃ.) নিকট জ্ঞাতি ভাই অথ্যাৎ মোহিতলালের প্রপিতামহ এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের পিতামহ সহোদর ভাই। দেবেন্দ্রনাথ সেনের পিতারও পূর্ব উপাধি ছিল মজুমদার।

---

৬. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ১২৯
৭. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা পিডিয়া (ঢাকা:বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খ. ১০, পৃ. ৪৮৫-৮৬

দুই

মোহিতলালের মাতৃকুলের বসবাস ছিল নদীয়া জেলার কাঁচড়া পাড়া গ্রামে। কবির মাতামহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্তপার্ষদ শিবানন্দ সেনের সাক্ষাৎ বংশধর এবং কবি ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়। সুতরাং সাহিত্য সাধনার রক্তগত অধিকার নিয়েই মোহিতলালের জন্ম।

তিন

পিতা নন্দলাল মজুমদার ছিলেন ইংরেজী ও ফার্সী সাহিত্যের সুপণ্ডিত। পেশায় কবিরাজি (আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি) হলেও কবিস্বভাব ও কাব্যপ্রীতি ছিল সহজাত। পিতার আয় রোজগার নিতান্তই কম ছিল বলে সংসারের অবস্থাও ভাল ছিল না। তাছাড়া কবির পিতা ছিলেন সংসার বিরাগী, আত্মভোলা, সদানন্দ পুরুষ। মাঝে মাঝে কাউকে না বলে উধাও হয়ে যেতেন। হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হতেন।[৮] পিতার এহেন সংসার বিষয়ে অনাসক্তি এবং কাব্য রসিকতা পুত্র মোহিতলালের জীবনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে মা হেমমালা দেবী ছিলেন অতিশয় অভিমানিনী, স্পর্শকাতরতা এবং পর দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিতা। মায়ের এ অভিমান প্রবণতা, স্পর্শকাতরতা ও মানবপ্রেম পুত্রের চরিত্রেও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সংসারের শতকষ্টেও মায়ের মুখের হাসিটি কখোনো মিলিয়ে যেতনা। মোহিতলালকেও এর জন্য কোন দিন নিরানন্দ হতে দেখা যায়নি।

নন্দলালের ছিল দুই সংসার। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কোন সন্তানাদী ছিলনা। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্মে ,এ ছেলেই কবি মোহিতলাল।[৯] কবির পিতা যেমন তাঁর পিতামহের একমাত্র সন্তান, কবিও তেমনি তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র।

চার

মোহিতলালের কোন মামা ছিলনা। মাতামহের দু'জন কন্যা সন্তান ছিল। কবির জননী ছিলেন সবার ছোট। সুতরাং মাতামহের কাঁচড়া পাড়ার সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন কবি মোহিতলাল।[১০]

---

৮. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ৪
৯. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৩২
১০. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ৩-৪

Dhaka University Institutional Repository

মোহিতলালের জন্ম ও শিক্ষা জীবন (স্কুল ও কলেজ) এবং বিবাহ :

এক

মোহিতলালের জীবন একটা মধ্যবিত্ত ঘরের সাদামাঠা জীবন যেমন কাটে তেমন। সেখানে নেই কোন রোমান্স আর নেই কোন নাটকীয়তা। আছে শুধু আশা ভঙ্গের এক বৈচিত্রহীন জীবনালেখ্য। মধ্যবিত্ত জীবনের বিফলতা এবং অসম্পূর্ণতার মধ্যেই তিনি অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। এবং বাস্তব জীবনের দুঃখ-বেদনাকে অন্তর্জীবনের সম্পদ হিসেবে কাজে লাগিয়ে তিনি কাব্য ও সমালোচনা জগতে এক নক্ষত্রসম অবস্থান নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছেন। এ মহান কবি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর, বাংলা ১২৯৫ সালের ১২ কার্তিক শুক্রবার রাত ৮.১৫মি. নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।।[১১]

দুই

সদানন্দ পিতার অসচ্ছল সংসারে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত মোহিতলাল মায়ের কড়া শাসনে বেড়ে উঠেছিলেন ঠিকই কিন্তু বিধিবদ্ধ পাঠ-প্রণালীর প্রতি তিনি একেবারেই নিষ্ঠাবান ছিলেন না বলে ছাত্র হিসেবে তেমন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। তবে অত্যন্ত ধী-শক্তি আর স্মরণশক্তি বলে সে যুগের অতি কঠিন পরীক্ষাতেও তিনি কোনদিন অকৃতকার্য্য হননি। পিতার অব্যবস্থিত চিত্ততার জন্য মা হেমমালা দেবী কবিকে তার নিজ মাতুলালয় হালিশহরে পাঠিয়ে দেন। সেখানে কবি দশ বৎসর একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর নিজগ্রাম বলাগড়ে ফিরে এসে বলাগড় স্কুলে পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের পর ১৯০৪ খৃ. এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেন।[১২]

মোহিতলাল ছিলেন আশৈশব সাহিত্যানুরাগী। পিতা-মাতার কঠোর শাসনের মধ্যেও মোহিতলাল বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম বর্হিভূত সাহিত্যানুরাগী পিতার অনেক পুস্তক গোপনে অধ্যয়ন করে ফেলেন। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি 'কৃত্তিবাসী-রামায়ন' ও কাশীরাম দাসের (আনু. ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত) 'মহাভারত' পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। নয় বছর বয়সে রমেশচন্দ্রের (১৮৪৮-১৯০৯ খৃ.) ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলি সমস্তই পড়ে শেষ করেছিলেন। এ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪ খৃ.)'কপাল কুন্তলা'র অধিকাংশই কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। বারো, তেরো বছর বয়সেই মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৩ খৃ.)

---

১১. ডঃ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৩২
১২. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ (কলকাতা:ভারবি, ১৯৯৭), পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

'মেঘনাদবধ কাব্য' নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯ খৃ.) 'পলাশীর যুদ্ধ' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩ খৃ.) 'রানা প্রতাপ' এবং রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১ খৃ.) 'গল্পগুচ্ছ' -এর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। শুধু তাই নয়, এ সব লেখার ধ্বনি সম্পদে সমৃদ্ধ অংশগুলো সবই মুখস্ত করে ফেলেন।[১৩]

সে সময়কার কথা তিনি এ ভাবে লিখেছেন–"তখন আমার বয়স পনের/ষোল। তারও আগে নিতান্ত বালক বয়সে আমার মধ্যে কাব্য প্রীতি জন্মে। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল কুন্ডলা', নবীনসেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে আন্দোলিত করল। বাংলা সাহিত্যের নব উৎসব প্রাঙ্গনে আমরা তরুণরা এসব নিয়ে মেতে উঠলাম"।[১৪]

বিদ্যালয় জীবনে অপাঠ্য পুস্তক পাঠের আগ্রহ ছাড়া তাঁর আরো দু'টি বিষয় উল্লেখ করার মত ছিল। একটি হল পেন্সিলের রেখায় চিত্রাংকন ও মাটির পুতুল তৈরীর নৈপুণ্যতা অপরটি হল কাঁচা হাতের কবিতা লেখার আগ্রহ। আন্তমিল যুক্ত ছোট ছোট কবিতা লিখে এগুলো মাসিমা ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের কন্যাদের শুনাতেন। কোন কোন সময় জ্ঞাতি ভাই রাধিকা প্রসাদ মজুমদারকেও শুনাতেন। শুধু তাই নয়, কবিতাগুলোর অর্থও তিনি তাদের কাছে মনযোগ সহকারে ব্যাখ্যা করতেন। চিত্রাংকন, মৃত্তিকার সাহায্যে মূর্তি নির্মাণ আর কবিতা লেখার উৎসাহ এসবই ছিল তার ভাবী কবি জীবনের সুস্পষ্ট সংকেত।[১৫]

স্কুলের পড়া শেষ করে মোহিতলাল কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। থাকেন কলকাতায় দেবেন্দ্রনাথ সেনের গোয়াবাগানের বাড়িতে। ১৯০৬ খৃ. তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন এফ. এ. পরীক্ষায় সাতটি বিষয় পড়তে হত– সেগুলো হল ইংরেজী, গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও সংকৃত। ১৯০৮ খৃ. তিনি বি.এ. পাশ করেন। বি.এ. ক্লাশে তাঁর পাঠ্য ছিল সংস্কৃত, ইংরেজী ও দর্শন। এ বিষয়ে তাঁর মনে একটা গর্ববোধও ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন– আমি Mukherjee's Graduate নই। তিনি তৎকালীন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক এন. এন ঘোষের গৌরব করতেন। তাঁর ইংরেজী বিদ্যার খ্যাতি কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে প্রসিদ্ধ ছিল। বি.এ. পাশের পর তিনি ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে এম. এ ক্লাশে ভর্তি হন। সাথে সাথে আইন বিদ্যাও পড়তে থাকেন। কিন্তু পাষণ্ড দরিদ্রতা কবিকে তাঁর

১৩. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৩৩
১৪. ড. কথাকলি সেনগুপ্ত, মোহিতলাল কবিতাপাঠ, পৃ. ২
১৫. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৩৩-৩৪

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে দিলনা। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে লেখা পড়ার ইতি টানতে হল।[১৬] সজনীকান্ত দাস লিখেছেন– "ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষা দিবার বাসনা তাঁহার অনেক দিন ছিল, তিনি পড়া ছাড়েন নাই। এ সময়ে তখনকার কৃতি ছাত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের সাহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে মোহিতলালের যে অধিকার জন্মে, তাঁহার সাহিত্য জীবনে তাহাতে তিনি বিশেষভাবে লাভবান হইয়াছেন"।[১৭] সুশীলকুমার দে-র সাথে মোহিতলালের সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল। তিনি তাঁর 'স্বরগরল' কাব্যখানি সুশীলকুমারকে উৎসর্গ করেন।

তিন

যে বছর তিনি বি.এ. পাশ করেন সে বছরেই বারাকপুর নিবাসী রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা তরুলতা দেবীকে (১৮৯৫-১৯৯০ খৃ.) বিবাহ করেন।[১৮] মোহিতলালের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত মধুর। দাম্পত্য জীবনের রসের মাধুর্য-সম্বলিত বহু কবিতা তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ছড়িয়ে আছে। তাঁর ১৩২৬ সালের 'ভারতী'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'সে' নামক দীর্ঘ কবিতাটি দাম্পত্য মধুর রসে পূর্ণ।

মোহিতলাল মজুমদারের কর্মজীবন : হাওড়ার সালকিয়ার হাই স্কুল, কলকাতার তালতলা হাই স্কুল, উত্তরবঙ্গে কাননগোর চাকুরী, কলকাতার নেবুতলা স্কুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজে শিক্ষকতা

এক

একটা স্বপ্নের মত মোহিতলালের কলেজ জীবন কেটে গেল। নিদারুণ অর্থ কষ্টে পড়ে লেখাপড়ার ইতি টেনেছেন। এখন প্রয়োজন অর্থোপার্জনের। এ অর্থোপার্জন তথা জীবিকা নির্বাহের জন্যই চাকুরী বা অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন। দরিদ্রের নিষ্পেষণে অতিষ্ট হয়ে হাতের সামনে ঠিক করে নিতে হল একটা সামান্য বেতনের চাকুরী। এ চাকুরী জীবনও ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর। যেখানে ছিল বিফলতা আর কাঁধবদলের পালা। জীবিকার্জনের সব ক'টা জানালা বন্ধ হলে মানুষ বাধ্য হয়ে যে চাকুরী নেয় সেই শিক্ষকতার চাকুরী নিলেন তিনি। যেখানে সম্মান আছে কিন্তু অর্থ নেই।

---

১৬. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ৫
১৭. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০
১৮. ড. কথাকলি সেনগুপ্ত, মোহিতলাল কবিতাপাঠ, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

কর্মস্থল হাওড়ার সালকিয়ার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়। তাও আবার একজনের বদলিতে। তবে এখানের শিক্ষকতা কাল যে ক্ষণস্থায়ী ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

দুই

১৯১০ সালে মোহিতলাল হাওড়ার সালকিয়ার ছেড়ে শিক্ষকতার স্থায়ী চাকুরী নিয়ে কলকাতার তালতলা হাই স্কুলে যোগদান করেন। এ সময় তার ছাত্র ছিলেন পরবর্তী কালের বিখ্যাত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি মোহিতলালের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করলেন এভাবে–

"১৯১০ সালে আমি পুরাতন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। পুজার ছুটির পর স্কুল যখন খুলিল, তখন আমাদের হেড মাষ্টার একদিন কোট-প্যান্ট পরিহিত একটি যুবককে লইয়া ক্লাশে আসিলেন ও বলিলেন, ইনি আমাদের নতুন ইংরেজীর শিক্ষক।"[১৯]

তরুণ যুবক মোহিতলাল কালো হলেও দেখতে সুন্দর ছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহ ও পরিশ্রম করে ছাত্রদের পড়াতেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Autobiography of on unknown India (১৯৫১ খৃ.) গ্রন্থে তাঁর জীবনে মোহিতলালের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন–

"I Remember him as something more than one of my teachers, for as Mr. Mohitlal Mazumder, the distingueshed contemporary poet and critic, he exerted a very strong and benificial influence on my later life. He introduced me to the literary society of Calcutta and made a writer of my almost by man force" (P. 289).

মোহিতলালের কাছে তাঁর ঋণ ও প্রভাবের কথাগুলো তিনি মুক্তকণ্ঠে নানাজনের কাছে সশ্রদ্ধ চিত্তে বলেছেন– "আমি শিক্ষায় মোহিতবাবুর ছাত্র আর সাহিত্য সেবায় তাঁহার শিষ্য। লেখক হিসেবে মোহিতবাবুর কাছে আমার ঋণ পরিশোধ করিবার মত নয়। তাঁহার শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত আমাকে পরজীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যে সাহিত্য-প্রীতি আমার জীবনে উচ্ছলিত সুখ আনিয়া দিয়াছে তাহার মূলে আমার পিতা- মাতা ভিন্ন আছেন মোহিতলাল [২০] 'The Illustrated

---

১৯. দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রতিভা (কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, ১৯৮২), 'মাষ্টার মশাই', পৃ. ২

২০. সাপ্তাহিক বসুমতী, জানুয়ারী ১২- ১৯৬৮ সংখ্যা

Weekly of India' সাপ্তাহিকের ৯, এপ্রিল ১৯৬১ সংখ্যায় তিনি তাঁর সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। প্রবন্ধের নাম 'Mohitlal Mazumder'।

তিন

১৯১৪ খৃ. মোহিতলাল শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দিয়ে উত্তরবঙ্গে সরকারী জরীপ বিভাগে কাননগোর চাকুরী নিয়ে চলে যান। এখানে এসে তাঁর নতুন উপলব্ধি ঘটলো এ ভেবে যে, শিক্ষকতা করেও সাহিত্য জগতের সঙ্গে যে নিবিড় যোগসুত্র ছিল আস্তে আস্তে তা ভাটা পড়ে আসছে। তাছাড়া সরকারী এ চাকুরীতে নেই কোন স্থিতিশীলতা, আজ রাজশাহী তো কাল জলপাইগুড়ী, পরশু লটবহর নিয়ে শিলাইদহ। শিলাইদহে আবার প্রচণ্ড রোদে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো। তদুপরি নেই কোন স্থায়ী বাসস্থান। এ যেন ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিবিনা এক রুক্ষ যাযাবর জীবন।

এ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা কবি এভাবে লিখেছেন- "জীবনের সহিত রুঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির ভীষণ মূর্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এই কয় বৎসরেই লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্য জীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইতেছিল। বনে,জঙ্গলে, মাঠে, নদীর চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁবুতেও বাস করিতাম, কোনও দিন বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ হইতে পাবনা-বাজিতপুর পর্যন্ত যে বিশাল চর–একবার সেখানে সারা বৎসর কাটাইয়াছিলাম। জলপাইগুড়ি অবস্থান কালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, তেমনই বৃক্ষছায়াহীন বালুপ্রান্তরে অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। এক কথায় বিধিবদ্ধ সমাজ জীবনের বাহিরে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যেভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং প্রকৃতির যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল–তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হয় নাই।"[২১]

মোহিতলালের তিন বছরের সরকারী চাকুরীর রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু অর্জনের ক্ষেত্রে কম ছিল না। কারণ কল্পনা প্রবণ কবি তপ্ত মধ্যাহ্নে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে নিজেকে মনে করতেন এ বুঝি আরব বেদুঈন। এ স্মৃতিকে আশ্রয় করে তিনি 'বেদুঈন' 'নাদিরশাহের জাগরণ, নাদিরশাহের শেষ' ইত্যাদি বিখ্যাত কবিতাগুলো রচনা করেছেন।

---

২১. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

তথাপি মোহিতলালের এ জীবনটা ভাল লাগলনা। তিনি দেখলেন এখানে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনার কোন ফুরসৎ তো নেইই বরং এ জীবনের সাথে পাকাপাকি বাসা বাঁধলে তাঁর সাহিত্য জীবনের বিচ্ছেদ অনিবার্য। এর চেয়ে ভাল শিক্ষকতা। টাকা পয়সা কম, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নাই বা র'ল তাতে কি? অমৃতের স্বাধ তো পাওয়া যাবে!

চার

অনেক ভেবে চিন্তে, সাহিত্য রসবোধের মুদিরা সঞ্চালনের তীব্র আকাংখা নিয়ে কবি আবার নেবুতলা লেনস্থ কলকাতা হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন (১৯১৭ খৃ.)। মুজাফফর আহমেদ সাহেব 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতি কথা' গ্রন্থে অবশ্য এ সম্পর্কে বলেন যে, "তিনি ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। স্কুলের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী আর সদস্য ছিলেন কৃষ্ণপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও জ্যোতিপ্রসাদ সর্বাধিকারী। ঐ সময় তিনি স্কুলের কাগজপত্র ঘেটে দেখলেন যে মোহিতবাবু ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিংবা সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন না।"

মোহিতলাল এ সময় ৯০নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের তিনতলায় একটি ছোট্ট চিলে কোঠার মত খুপরি ঘরে থাকতেন। কবিপত্নী থাকতেন ব্যারাকপুরে। স্কুল ছুটির পর কবি বহুবাজার এলাকায় কোন না কোন সুহৃদের বাড়ীতে অথবা এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করে সন্ধ্যায় সাহিত্য আড্ডায় হাজিরা দিতেন। এ সময় বন্ধু হিসেবে জুটে গেল বাড়ীর নীচ তলায় কবিরাজ জীবন কালীবাবু। 'বাংলা ও বাঙ্গালী' নামক বইখানী (১৩৫৮ বাং.) তিনি তাঁর নামে উৎস্বর্গ করেন। বন্ধুত্ব গড়ে উঠার পর তিনি অন্য কোথাও আড্ডা না দিয়ে জীবনকালীবাবুর দোকানে এসে সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় মশগুল হতেন। আমহার্স্ট স্ট্রীটে থাকা কালীন কবির 'স্বপন-পসারী'র বহু কবিতা লেখা হয় এবং ১৯২১ খৃ. তা প্রকাশিতও হয়। পরবর্তীতে তিনি আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে বাদুড়বাগান লেনের মেসে এসে উঠেন।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য আলোচিত ঘটনা হল মোহিতলালের সাথে কাজী নজরুল ইসলামের মনোমালিন্য, যা ছিল কিনা সাহিত্যিক সমাজে কিংবদন্তিতুল্য। নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের প্রথম সাক্ষাত পরিচয় হয় এভাবে– একদিন করুণানিধানের বাসায় মোহিতলাল 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পান। মলাটের আরবী নক্সার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতাটি। যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি নজরুলের সব ক'টি কবিতা পড়ে উচ্চকিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেন। এরপর 'মোসলেম ভারতে' মোহিতলাল 'বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত' জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি লেখেন। চিঠিটা ছাপা হয় ১৩২৭-এর ভাদ্র সংখ্যায়। চিঠিতে লেখেন–

"যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহু দিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে এ কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী– এক কথায়, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যে তাহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে, তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালীর 'সারস্বত মন্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ' জানাইতেছি এবং আমার বিশ্বাস প্রকৃত সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক-সাধারণের পক্ষ হইতেই আমি এই সুখের কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।"[২২]

চিঠিটি পড়ে উৎসাহিত হয়ে তরুণ কবি একদিন গান গাইতে গাইতে মোহিতলালের বাসায় এসে উপস্থিত হন। নজরুলের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে কবি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মোহিতলাল প্রাণান্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, শেলি (১৭৯২-১৮২২ খৃ.), কীট্স (১৭৯৫-১৮২১ খৃ.) ও ব্রাউনিঙের (১৮১২-১৮৮৯ খৃ.) ভাল ভাল ইংরেজী কবিতাগুলোও তাঁকে পড়ে শুনাতেন ও ব্যাখ্যা করতেন এবং সাহিত্যিক মজলিশ ও গানের আড্ডায় তাঁকে নিয়ে যেতেন।

অনুজের মত প্রীতি আর স্নেহ দিয়ে বড় কবি বানানোর অদম্য স্পৃহা নিয়ে তিনি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন[২৩] এবং সাহিত্যিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৩২৮ এর কার্তিক সংখ্যায় 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত 'বিদ্রোহী' কবিতা সেই গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে ইতি টেনে দেয়। কারণ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় মোহিতলালের 'আমি' কবিতার প্রচ্ছন্ন ছাপ ও প্রেরণা বিদ্যমান থাকলেও নজরুল তা অস্বীকার করে বসেন। শুধু তাই নয়, 'ধুমকেতু' অফিস অথবা নজরুলের বাসায় মোহিতলাল তার সাথে দেখা করতে গেলেও নজরুল তার সাথে পূর্ববৎ সেই মাধুর্য-সম্পর্ক দেখালেন না।[২৪] স্বভাবতই মোহিতলাল ক্ষুব্ধ হন।

---

২২. আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলালের পত্র গুচ্ছ (কলকাতা:জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯ পৃ. ২
২৩. প্রবাসি'র ১৩৩০, আষাঢ় সংখ্যায় 'কবি বিদ্রোহীর প্রতি' কবিতা লিখে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন।
২৪. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কতিপয় তরুণ ২৬ জুলাই ১৯২৪ 'শনিবারের চিঠি' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল গদ্যে-পদ্যে লোকের নামে ফুটকি কেটে তাঁকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখা। আর নিছক আমোদ-ফুর্তি চরিতার্থ করা। মোহিতলাল ও নজরুলের সম্পর্কের টানাপড়েনের সুযোগে সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'তে 'বিদ্রোহী' কবিতাকে বিদ্রুপ করে 'ব্যাঙ' শীর্ষক একটি কবিতা বেনামে প্রকাশ করেন। নজরুল কবিতাটিকে মোহিতলালের রচনা বলে ভুল করলেন। এবার স্বয়ং নজরুল মোহিতলালকে লক্ষ্য করে 'সর্বনাশের ঘন্টা' কবিতাটি ১৩৩১ সালের কার্তিক সংখ্যা 'কল্লোলে' লিখলেন। যদিও নজরুল গুরুর প্রতি যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারেই লিখেছিলেন। কবিতাটি দেখে মোহিতলাল অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন এবং ৮ কার্তিক ১৩৩১, মোহিতলাল অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় নজরুলকে 'দ্রোণগুরু' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতায় আক্রমণ করেন। এর পরের সংখ্যায় 'চামার খায় আম' বেনামীতে একটি ও পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় 'রুবাইয়াৎ-ই-চামার খায়-আম' নামে কিছু ব্যাঙ্গ কবিতাও লিখেন। যে মোহিতলাল নজরুলকে গভীরভাবে ভালবেসে তাঁর দুর্দমনীয় প্রাণশক্তির প্রশংসা করে স্বপন-পসারীর 'বাধন হারা' কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই মোহিতলাল নিজের সঙ্গে নজরুলের কবি প্রতিভার তুলনা করে তাঁকে নির্মম ভাষায় কটাক্ষ করলেন বিস্মরণীর 'সুইনবার্ণের অনুসরণে' কবিতা লিখে। নজরুলের সঙ্গে বিরোধ মোহিতলালের জীবনে একটি চরম দুঃখজনক ঘটনা। এ ব্যাপারে সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমারকে লেখা চিঠিটি নিম্নরূপ–

"নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌণব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহার একাধিক কারণ আছে; আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় Shock–তাহার পরিমাণ বা গভীরতা অন্যে বুঝিবে না। যদি আমার 'স্মৃতিকথা' লিখিয়া যাইতে পারি, তবে তাহার একটি বড় অধ্যায় হইবে ওই কাহিনী।"[২৫]

বিরোধ হলেও কাজীর কবিতা মোহিতলালের প্রিয় ছিল। যখন তখন তিনি নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবির সঙ্গে যাই হোক, তার কবিতাকে তিনি ভালবাসতেন। উৎকৃষ্ট কবিতা তার মাতৃভাষার সম্পদ। বাংলা সাহিত্যকে যখন ভালবেসেছেন তখন ঐ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানানো যে তাঁর নিত্যপুজার অর্ঘ্য।[২৬]

কবিপত্নী তরুলতা দেবীর স্মৃতিতে মোহিতলাল ও নজরুলের তিক্ততা সম্ভবত বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। তরুলতা দেবীর ভাষ্য মতে– "নজরুল বড় ভাইয়ের মত মোহিতলালকে শ্রদ্ধা করতেন।

২৫. আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ. ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের বাড়ীতে এসেছেন, আপনজনের মত ভাত খেয়েছেন, তরুলতা নিজ হাতে রান্না করে পরিবেশন করেছেন।"[২৭]

১৯২৪ খৃ. মোহিতলাল বাদুড়বাগানের মেস ছেড়ে ৯৩/১, মানিকতলা স্ট্রিটে পত্নিকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। মোহিতলালের সাংসারিক জীবন সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২ খৃ.) তাঁর 'আত্মস্মৃতি' (খ. ১) গ্রন্থে লিখেছেন–

"অত্যন্ত এঁদো গলিতে একটি জীর্ণ বাড়ি। তেতলায় দুইটি মাত্র ঘর। আর একটি নাম মাত্র রান্না ঘর। দুইটি ঘরের মধ্যে একটিকে ঠাকুর ঘর বলিলেও চলে। সেইটি 'ম' বাবুর বৈঠকখানা। তাঁহার আদরের পলা 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াই আমাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। 'ম' বাবু তাহাকে কোলে লইয়া আমাকে তাহার কাকা বাবু বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। এবং গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো আজ আমাদের অতিথিশালা সরগরম। আমরা বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। বাড়ির চতুর্দিকের জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম। এই দুস্থ পরিবারের ঘাড়ে বোঝা হইয়া থাকা! 'ম' বাবু বলিলেন 'ভায়া' গিন্নী রান্না করুক, ততক্ষণে আমরা একটু কাব্য চর্চা করি। খুকি ঘুমিয়েছে। তিনি তাঁহার দস্তরপত্র টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। 'ম' বাবু ৪৫ টাকা মাহিনার সামান্য স্কুল মাষ্টার; মাসে ১৫ টাকা তাহার ঘর ভাঁড়াতেই লাগে। আজ মাসের ২৯ তারিখ, কাল হয়ত কি করিয়া রান্না চড়িবে তাহার ঠিক নাই। সেই লোক একটি স্থায়ী অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্বেগে কবিতা শুনাইতে বসিলেন"।[২৮]

পাঁচ

জীবনের কোন বিশেষ ঘাটে মোহিতলাল বেশী দিন নোঙ্গর ফেলে অবস্থান করতে পারেননি। ছুটেছেন এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে। নিরাশার দোলাচলে জীবনের সিংহভাগ অতিক্রম করে জীবন তরী এসে ভিড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৮ খৃ. জুলাই মাস। বন্ধু সুশীলকুমার দে'র[২৯] আনুকূল্যে মাত্র বি.এ. পাশ হওয়া সত্তেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে নিয়োগ লাভ করেন মোহিতলাল।

---

২৬. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ২৬

২৭. ড. কথাকলি সেনগুপ্ত, মোহিতলাল কবিতাপাঠ, পৃ. ৫

২৮. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ৩০-৩১

২৯. শিক্ষাবিদ ও গবেষক, ১৮৯০ এর ২৯ জানুয়ারী কলকাতায় তাঁর জন্ম। পিতা সতীশচন্দ্র দে ছিলেন সিভিল সার্জন। সুশীলকুমার দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে বি, অনার্স ও এম,এ পাশ করেন এবং লণ্ডন স্কুল অফ অরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ থেকে ডিলিট ডিগ্রী অর্জন করেন (১৯১১)। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। ১৯১৩-১৯২৩ প্রায় ১০ বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমে ইংরেজী বিভাগের রিডার ও পরবর্তিতে সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একাধিকবার কলা অণুষদের ডীনের দায়িত্ব পালন করেন। (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলা পিডিয়া (ঢাকা: বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি,২০০৩), খণ্ড-১০, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯১২-১৩ খৃ. 'বীরভূমি' পত্রিকায় লেখার সুত্র ধরে ড. সুশীলকুমার দে'র সাথে মোহিতলালের পরিচয়। সুশীলকুমার দে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে এতটাই নিঃসংশয় ছিলেন যে প্রথাগত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে[৩০] তিনি তাঁর নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। কর্মজীবনে মোহিতলাল তাঁর সে আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন সমালোচনা, সাহিত্য ও সৃষ্টিশীল অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। অধ্যাপনাকে তিনি পাণ্ডিত্যে, বৈদগ্ধে, দার্শনিকতায় ও পরিবেশন নৈপুণ্যে শিল্পকর্মে পরিণত করেছিলেন।

মোহিতলালের যে মনীষা পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব তাঁকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে জনপ্রিয়তা দেয়নি– অধ্যাপনা জীবনে কিন্তু সে গুণগুলিই তাঁকে অনন্যসাধারণ কৃতি অধ্যাপকে পরিণত করেছিল। বাক ভঙ্গীর অনন্যতা, জলধগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং গভীর অন্তরদৃষ্টি সহকারে বিশ্লেষণ তাঁকে অসাধারণ ছাত্র প্রিয় করে তুলেছিল। মোহিতলালের শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে তাঁরই কৃতি ছাত্র শ্রী পৃথীশ নিয়োগীর মন্তব্য–

"অধ্যাপনার ব্যাপারে অন্যান্য অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর মিল ছিলনা। বইখানি যে পাঠ্য, এ থেকে যে বিদ্যালয়ের প্রশ্ন আসবে এবং সে প্রশ্নের জবাব লিখতে হবে–সে দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি পড়াতেন না। কবিসুলভ একটি অখণ্ড ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে তিনি গ্রন্থের মর্মলোকে প্রবেশ করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সমালোচনাচ্ছলে তিনি তাঁর বিভিন্ন সৌন্দর্যরসের দিকটা শতদল পদ্মের এক একটি পাপড়ির মতো মেলে ধরতেন। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের ত্রীবেণী অঙ্গনে অবগাহণ করে আমরা ধন্য হতাম। গুরুশিষ্যের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে সাহিত্যের সেই রসাস্বাদন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগুলোকে সুধাস্নাত করে রাখত। তাঁর অধ্যাপনা ছিল সৃষ্টি"।[৩১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগে মোহিতলাল এক সাহিত্যিক পরিবেশ পেলেন বটে কিন্তু বাংলা ভাষায় সমালোচনা সাহিত্যের তীব্র অভাব অনুভব করলেন। বাংলা বইয়ের অভাবে তাঁর নিজের কষ্ট হলেও ছাত্রদের কষ্ট হচ্ছিল বেশী। মোহিতলাল তাঁর 'সাহিত্য কথা'র মুখবন্ধে বলেন– "ইরেজীর মত উৎকৃষ্ট সমালোচনা গ্রন্থ সাহিত্যের নানাবিধ ইতিহাস যতদিন সূলভ না হইতেছে, ততদিন ছাত্রগণকে ঐরূপ পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া তোলা দুস্কর।..........এ অভাব দুর করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রীর ব্যবস্থা করিলেই চলিবেনা। তৎপূর্বে এরূপ পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এবং আবশ্যকিয় গ্রন্থ-প্রণয়নের উৎসাহ ও সাহায্য দান করিতে হইবে।.................বাংলা ভাষায়

---

৩০. প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত ছাত্রকে শিক্ষক হিসেবে না নিয়ে মাত্র তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত মোহিতলালকে শিক্ষক নিয়োগ করেন।

৩১. আচার্য মোহিতলাল: 'শনিবারের চিঠি', ভাদ্র সংখ্যা ১৩৫৯ বাং.

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবে সাহিত্যের স্বরূপ ও সাহিত্য বিচারের মূলসুত্র বুঝিয়া লইবার জন্য ছাত্রগণকে প্রচুর পরিমাণে ইংরেজীর সাহায্য লইতে হইবে"।[৩২] ফলে মোহিতলাল কবিতার রাজপথ ছেড়ে সমালোচনার দুরূহ দুর্গম পথে একক যাত্রা শুরু করলেন। এ সময় তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের সুপ্ত বাসনাগুলো ফল্গুধারার মতো বিকশিত হয়ে উঠল।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আন্দোলন, গতি পরিবর্তন, প্রধান সাহিত্য সাধকদের সাহিত্যকীর্তির পরিচয়-সম্বলিত প্রবন্ধ, প্রসঙ্গকথা স্বনামে, বেনামে, নামহীনভাবে অবিরত চিঠিতে লিখ্তে লাগলেন। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের যে তীব্র অভাব তিনি অনুভব করেছিলেন তাকে স্বকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বিরামহীন কলম চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর এ অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞান সম্মত রূপ পরিগ্রহ করে। সাহিত্যের সুচিতা ও আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে সমালোচনার যে 'স্কুল' তিনি স্থাপন করেন সেখানে একাই তিনি কাণ্ডারীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কাজেই সাহিত্য সাধনার রম্যকানন তাঁর কাছে বিপদ সংকুল সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিণত হলো।

মোহিতলালের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ষোলটি বছর অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে কেটেছিল। যে অভাব তাঁকে সারাটা জীবন তাঁড়া করে ফিরেছিল, এ সময় কিছুটা হলেও তা থেকে নিস্কৃতি পেয়েছিলেন। তাছাড়া অসংখ গুণগ্রাহী ছাত্র তাঁকে খ্যাতি ও সম্মান দিয়ে অঞ্জলী ভরে দিচ্ছিল– এতো মোহিতলালের পরম পাওয়া। যদিও মরণব্যাধি টাইফয়েড তাঁর দু'কন্যার জীবনপ্রদীপ কেড়ে নিয়ে কিছুদিনের জন্য তাঁর মনের বাগানকে বিসন্নতার কালিমায় ঢেকে দিয়েছিল।

মোহিতলাল নীলক্ষেতের বাংলোতে সাহিত্য বিষয়ক সংলাপ ও সাহিত্যালোচনায় মশগুল থাকতেন আর সুযোগ পেলে নিজের গোলাপ বাগানের পরিচর্যা করতেন। গোলাপ চাষে বিশেষজ্ঞ বলেও তাঁর একটি খ্যাতি ছিল। তিনি তাঁর বাগানে আশি রকমের গোলাপ ফুটিয়েছেন বলে দাবী করতেন। কোন সাহিত্যিক বন্ধু অথবা কোন ছাত্র তাঁর সাথে সাহিত্যালোচনা করতে গেলে তিনি তাকে গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ব সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিয়ে বুঝাতেন এবং বিভিন্ন গোলাপের রঙের ও পাপড়ির যে কি সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাও তিনি বুঝানোর চেষ্টা করতেন।[৩৩]

---

৩২. মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্যকথা (হাওড়া:বঙ্গ ভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৬ বাং.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১

৩৩. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৯

মোহিতলাল ঢাকায় অবস্থানকালে একরকম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মনে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বসমাজ ও পরসমাজ– সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রভাব মুক্ত হয়ে আত্ম-সাধনার সত্য মন্ত্রটিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছিলেন।[৩৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায়ের কালে তাঁর সম্মানে আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনায় তিনি যে ভাষণ দেন তাতে তাঁর মনের অভিব্যক্তিটি এভাবে প্রকাশ পায়। মোহিতলাল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে ৫৫ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

ছয়

মোহিতলাল জীবন সায়াহ্নে এসে নিদারুণ অর্থ কষ্টে পড়েন। শরীরের অবস্থাও ভাল যাচ্ছিল না। ফলে জীবিকার প্রয়োজনে তাঁকে অসুস্থ শরীরে বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশ সংস্কৃতি ভবনে অধ্যাপনার কাজ করতে হয়েছে। ১৯৫০ খৃ. গিরিশ সংস্কৃতি ভবনে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে বেসরকারী স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ খোলা হলে মাত্র ১৫০/= টাকা বেতনে মোহিতলাল এ বিভাগে যোগ দেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ কলেজের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন।

মোহিতলালের শেষ জীবন: নিদারুণ অর্থ কষ্ট, বাঙ্গালীর অবক্ষয় ভাবনা, শারীরিক অসুস্থতা ও ইহধাম ত্যাগ

এক

পৃথিবীতে এমন অনেক মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের অভাব ছিল নিত্যসঙগী। যদিও অভাব তাদের কাঙিক্ষত লক্ষ্যে পৌছতে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বরং অভাবই তাঁদেরকে মহামানব হবার পথ নির্দেশ করেছিল। মোহিতলাল তাঁদেরই একজন। এম. এ. পাশ করার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রতা আর তাঁকে সামনে এগুতে দিলনা। কলকাতার শিক্ষকতা জীবনে অর্থের অভাবই তাঁকে সাহিত্যগোষ্ঠী থেকে অন্তত তিন বছরের জন্য বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। দবিদ্রতার তাড়া খেয়েই তিনি কলকাতা থেকে পাড়ি জমালেন ঢাকায়। এখানে এসে সাময়িক আর্থিক দৈন্যতা ঘোচাতে সক্ষম হলেও কোন কালেই লক্ষীর আশির্বাদ পেলেন না। অভাবের সঙ্গে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হল। চাকুরী করে অর্থ সঞ্চয় করতে পারেননি। অপরদিকে প্রকাশকরা ঠকিয়েছেন; নিয়ম মাফিক টাকা দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে থেকেও উদ্বৃত্ত কিছুই থাকতোনা।

---

৩৪. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অপরের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে তাঁকে। শেষ জীবনে তাঁকে বাসাও বদল করতে হয়েছে অনেকবার। ঢাকা থেকে এসে কিছুদিনের জন্য বারাকপুরে অতঃপর বাগনানে। তারপর শেষ জীবন কাটে বড়িশায়। তাছাড়া শারীরিক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত নাজুক। তার উপর বাঙ্গালীর অবক্ষয় ভাবনা দুঃসপ্নের মতো তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তাঁর মনের সরলতা ও সজীবতা এ সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে জন্য অপ্রকৃতিস্থের মতো তিনি সে কালের ছাত্র, অধ্যাপক বন্ধু ও সাহিত্যিকদের যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, তাতে তার মনের ঐ জ্বালা ও ক্ষোভ মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে জীবনকালী রায়কে লেখা চিঠিতে মোহিতলাল বলেন– "মস্তিস্কের দুর্বলতা, শ্লেস্মার প্রকোপ এবং পরিশেষে পাকস্থলির বিকলতা–এই তিন ব্যাধির মিলিত আক্রমণে আমি ক্রমেই নির্জিব হইয়া পড়িতেছি। অথচ সংসারের কোন ব্যবস্থাই হইয়া উঠিলনা। আটটি বালকও শিশুর যে কি হইবে তাহা জানিনা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যও একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"[৩৫]

১৯৪২ সালের ১৫ মে অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতিকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন– "আমার অনেকগুলি পুস্তক (গদ্য-পদ্য) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা দ্বারা আমি কিছু মাত্র আর্থিক লাভবান হই নাই। তাহাতে দুঃখ নাই;............আজ রোগজীর্ণ শরীরে এবং জীবনে কিছু সঞ্চয় করিতে না পারার ফলে ভবিষ্যতের ভাবনা হইয়াছে; চাকুরীও আর বেশী দিন করিতে পারিবনা।............আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে, যে বইগুলি আমার সাধনার ফল, পুজার নির্মাল্য– কোথায় কাহার কাছে কত মূল্যে বিক্রয় করিব– সে চিন্তা অনিবার্য হইয়াছে; ইহাই আমার জীবনের বড় পরাজয়।"[৩৬]

অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতিকে তিনি আরও লেখেন– "আমি চিরদিন লক্ষীছাড়া হয়েই রইলাম। যখন ১০০ মাসিক উপার্জন ছিল তখনও যে অবস্থায় ছিলাম; আজ ৪০০ মাইনে পেয়েও সে অবস্থা ঘোচেনি। কেবল একটু ভাবনা হয়..........স্বাস্থ্য ভেঙ্গেছে, বয়স বাড়ছে– অনেকগুলি নাবালক ছেলে মানুষ করতে হবে।"[৩৭]

১৯৪৩ সালের ১৩ নভেম্বর বঙ্কুবিহারী মাইতিকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন– "বড় বিপন্ন হইয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি। আমি যে বড় দুঃসময়ে পড়িতেছি তা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। ভগবানের দয়ায় এ পর্যন্ত আপনাদের সাহায্যে অনেক সংকট উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এখনো নানা

৩৫. আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ,পৃ. ১৭৬
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
৩৭. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

কারণে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আপনার নিকটে আবদার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই বলিয়াই, আপনি যদি কিছু করিতে পারেন, সেই আশায় লিখিতেছি।"[৩৮]

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দেও তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হলো না। এ সময় তিনি হীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে লেখেন- "আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি বড় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে আর কত দিন চলিবে? সর্ববিষয়ে অতিশয় Unsettled অবস্থায় আছি। নানা দুঃশ্চিন্তায় অবসন্ন হইতেছি। মন ভাল করিবার উপায় নাই।"[৩৯]

দুই

মোহিতলালের এত অভাব অনটনের মধ্যেও বাঙ্গালীর অবক্ষয় ভাবনা তাঁকে দুঃসপ্নের মত পেয়ে বসেছিল। তিনি বাঙ্গালীর অধঃপতনের চিত্র প্রত্যক্ষ করে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কাব্য, সমালোচনা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গালীকে উদ্ধার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। তিনি উনিশ শতকীয় আদর্শে বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে উম্মত্ত আশা ক্রমশ দুরাশায় পর্যবসিত হতে লাগল। তিনি বলে উঠলেন- "বাংলার নাভিশ্বাস উঠেছে, তার সর্বাঙ্গে অক্লিষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সত্যই বাংলার নিকটে শমন আমারও 'নিকট শমন'-একথা গর্জন করেই বলে যাচ্ছি।"[৪০]

১৯৪২ সালের ৩০ আগষ্ট অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতিকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন- "দেশের ও জাতির বড় দুর্দিন যাইতেছে। আমি আজীবন চেষ্টা করিয়া আমার সকল শক্তি নিঃশেষ করিয়া এবং সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া এ যাবৎ বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারি নাই।........সত্যকে, ন্যায়কে আমি প্রাণপনে ধরিয়া রাখিয়া যাইলাম। আমার কেহ বন্ধু নাই! আত্মীয় নাই! আমার শত্রু অনেক! আমাকে সকলে ভয় করে, কেহ স্নেহ করেনা; আমাকে সর্ব প্রকারে বঞ্চিত ও আমার প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য সকলেই উৎসুক।.........কাহারো মনোরঞ্জন করি নাই বলিয়া আমার জীবদ্দশায় আমাকে কেহ আমার প্রাপ্য দিলনা- যাহা দেয় তাহা বাধ্য হইয়া।"[৪১]

২৩ মার্চ ১৯৪৫ সালে বাগনান থেকে লেখা চিঠিতে মোহিতলাল অনেক আক্ষেপ নিয়ে মাণিকচন্দ্র দাসকে লিখেন- "মনুষ্য সমাজ ও মনুষ্য জীবন নষ্ট হইয়া গেল-সম্মুখের প্রায় দুই পুরুষ

---

৩৮. আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ. ১৯০
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৪০. ১৩৫৯ ভাদ্র সংখ্যা "শনিবারের চিঠি'তে কবি শেখর কালিদাস রায়ের "চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল" প্রবন্ধে উদৃত অংশ
৪১. আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ. ১৮৪-১৮৫

জগৎ ধর্মহীন হইয়া থাকিবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের কাল শেষ হইয়াছে–আমি গত যুগের একটা জঞ্জালরূপে এখনো টিকিয়া আছি। কাঁহারো সঙ্গে আমার বনিবে না। আমাকে কেহ বুঝিবেনা।"[৪২]

১৪ মার্চ ১৯৪৬ সালে বাগনান থেকে তিনি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে বলেন, "বাংলার শ্বাশত সাধনার ক্ষেত্রে আমার মত ত্যাগী তপস্বী আর কেহ নাই। সমগ্র জাতির হইয়া আমিই অগ্নিহোত্র একা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলাম আর কেহ নাই– কেহ নাই! ইহাও আমার আত্মশ্লাঘা নয়, বড় দুঃখের কারণও বটে; যদি মরিবার আগে দেখিয়া যাইতাম আর একজনও এই অগ্নিহোত্রের ভার লইবে!"[৪৩]

তিন

মোহিতলাল নিদারুণ অর্থ কষ্ট আর বাঙ্গালীর অবক্ষয় ভাবনায় যতটা না বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তার চেয়ে বেশী ভেঙ্গে পড়েছিলেন শারীরিক অসুস্থতার জন্য। ১৯৪২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী হীরণ বন্দোপাধ্যায় কে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন– "গত ৪/৫ মাস যাবৎ কলকাতা হইতে ফিরিয়া আসার পরেই আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি।...........শীতের সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরনো ব্যাধি হাঁপানি ও কাশি আরও বাড়িয়াছে। প্রায় দুই মাস আমি Chronic Bronchitis ও Blood Pressure-এর চাপে এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, উঠিতে, বসিতে, হাটিতে কষ্ট বোধ হইত"।[৪৪]

১৯৪৪ সালের ১৯ জানুয়ারী অধ্যাপক অক্ষয় সেনশর্মাকে লিখেন– "আমি অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি। এজন্য চিঠি পত্র লেখাও নিয়মিত পারি না। য়ুনিভার্সিটির বাকী দাসত্বকাল লইয়াও বড় বিপন্ন হইয়াছি– আবারও ৩ মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছি। এবার এত অসুস্থ্য হইয়া পড়িয়াছি যে, রীতিমত শংকিত হইয়াছি"।[৪৫]

১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে লেখা চিঠিতে বলেন– "আমার শরীর আগের চেয়ে খারাপ। Blood Pressure বেড়েছে। মাঝে একটা Stroke-এর মতো হয়েছিল"।[৪৬]

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১
৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

চার

মোহিতলাল আর্থিক অনটন, বাঙ্গালীদের অবক্ষয় ভাবনা আর শারীরিক ব্যাধি এই তিন শক্তির সম্মিলিত নির্যাতনে মানষিক ভারসাম্যটুকুও হারাতে বসেছিলেন। বিশেষ করে অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁকে লেখালেখির উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়েছিল। অর্থাভাবের কারণে বিশ্রাম করার অবকাশটুকুও পাননি।

পাঁচ

১৯৫২ সালের ৫ জুলাই বঙ্গবাসী কলেজে তিনি এম. এ.-র শেষ ক্লাশটি নেন। ক্লাশের পর বিশ্রাম কক্ষে অধ্যাপকদের বলেছিলেন– "আমি আর তোমাদের বোধ হয় বেশী দিন বিরক্ত করব না"।[৪৭] ১০ জুলাই তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন– বুকে ও পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালেন– 'করণারী থ্রম্বসিস'। উন্নত চিকিৎসা ও সেবা দরকার অথচ বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও দু'টি ছেলে গুরুতর অসুস্থ্য। সুতরাং ভক্তছাত্র ও বন্ধুদের প্রচেষ্টায় তাঁকে শেঠ সুখলাল করণারী হাসপাতালের মেকেঞ্জী ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হলো। হাসপাতালের উন্নত চিকিৎসার সময়টুকু আর বাকী রইল না, ২৬ জুলাই ১৯৫২ শনিবার রাত ৯.১৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দুঃখ-দারিদ্র-অভাবের তাড়না কোন কিছুই তাঁর তীব্র সাহিত্য পিপাসাকে নিবৃত করতে পারেনি। তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য, বাঙ্গালী জাতিকে ঊনিশ শতকীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্বীয় জীবনকে উৎস্বর্গ করেছেন। বাঙ্গালী জাতিকে মননশীল কাব্য ও সাহিত্য উপহার দেয়ার জন্য পারিপার্শ্বিক সকল বাঁধাকে অতিক্রম করেছেন। আত্ম-প্রত্যয়ে উজ্জল, গূঢ় গভীর ভাবনায় প্রদীপ্ত, বুদ্ধি ও মনীষার দীপ্তিতে শানিত আত্মাভিমানের প্রচ্ছন্ন বেদনায় রক্তিম এবং স্বীয় বোধ ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় মত পোষণকারী কবি-ব্যক্তিত্ব মোহিতলালকে যে স্বাতন্ত্রতা দান করেছে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ,নেই। এ যেন আদর্শহীন, নিষ্ঠাহীন ও প্রাত্যহিকতার মালিন্যে এক নতুন আলো।

৪৭. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্যকর্ম

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবন-কৈশোরে পা রেখে মানুষ যখন নিজেকে চিনতে শুরু করে, তখনি ভাবি জীবনের অস্ফুট দর্পণে তাঁর জীবন রেখা নির্ধারিত হয়ে যায়। তবে জীবনকালের প্রভাব আর পারিবারিক প্রেক্ষাপট তার শেকড়কে আরো মজবুত করে তোলে। লক্ষ্যহীন জীবন কাণ্ডারিহীন তরীর মত। তাই কবি মোহিতলালের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনি জীবন তরীর লক্ষ্য নির্ধারণ করেই অন্তহীন সাগরে পাঁড়ি দিয়ে অবশেষে কুলের নাগাল পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে এ জীবন তরী যে কত বন্ধুর পথ অতিক্রম করেছে তারও কোন ইয়ত্তা নেই।

মোহিতলালের কাব্য ও সাহিত্যিক জীবনের প্রেক্ষাপটঃ সাহিত্যিক সমাজের অনুপ্রেরণা, পত্রিকার সম্পাদকগণের সহযোগিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ

এক

মোহিতলালের কাব্য ও সাহিত্যিক জীবনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাঁকে কাব্য জীবনের গতি নির্ধারণে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল পারিবারিক প্রভাব। এ ক্ষেত্রে কবির পিতা নন্দলালের কথাই ধরা যাক। তিনি ছিলেন তৎকালীন ইংরেজী ও ফার্সী সাহিত্যের একজন পণ্ডিত। পেশায় কবিরাজ হলেও তাঁর মধ্যে কবি স্বভাব ও কাব্যপ্রীতি বিদ্যমান ছিল। সুতরাং মোহিতলালের মানস-প্রকৃতির উন্মেষ ও সাহিত্য সাধনায় পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ, পিতারই কবি-স্বভাব ও কাব্য-প্রীতি তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলা সাহিত্যের সেবায় তিনি যে পিতার কাছে ঋণী একথা অকপটে স্বীকারও করেছেন।

সাহিত্য সাধনা ছিল মোহিতলালের জন্মগত অধিকার। কবির পিতামহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত পার্ষদ শিবানন্দ সেনের সাক্ষাৎ বংশধর। ঐ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেনই শ্রীচৈতন্যের কৃপায় বাল্যকালেই কবিত্ব শক্তি লাভ করে 'কবিকর্ণপুর' উপাধী প্রাপ্ত হন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশও তাঁর মাতুল বংশেরই এক শাখা। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন নন্দলাল মজুমদারের জ্ঞাতি ভাই। সুতরাং পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় বংশের দিক থেকেই কবির কাব্য মোহনার ধারা বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৮-১৯২০ খৃ.) প্রভাব ছিল অপরিসীম। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের রূপতান্ত্রিকতা, বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন-প্রীতি, বাংলাদেশ ও তার সকল বিষয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ, বাস্তব-নারী আশ্রিত প্রেমের বিচিত্রতা এবং দেবেন্দ্রনাথের রূপসুন্দর দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-বিগলিত অন্তর মোহিতলালের কর্মজীবনে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[৪৮] দেবেন্দ্রনাথের বহু শব্দ ও ক্রিয়াপদ মোহিতলালের কাব্যে লক্ষণীয়।

মোহিতলাল স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতা মেট্রোপলিটন ইনিস্টিটিউটে ভর্তি হয়েই দেবেন্দ্রনাথের গোয়া বাগানের বাড়ীতে অবস্থান নেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর কবিতায় এতটাই গভীর ছিল যে, সে প্রভাব তাঁর প্রসিদ্ধতর কবিতাগুলোকেও পায়াভারি এবং গুরুপাক দিয়েছে।[৪৯] মোহিতলাল ১৯১২ খৃ. দেবেন্দ্র-স্তুতি সম্বলিত ষোলটি চতুর্দশপদি কবিতাকে 'দেবেন্দ-মঙ্গল' নাম দিয়ে কবির নামে উৎস্বর্গ করে অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মোহিতলালের কাব্যে রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের যে তীব্র প্রভাব ছিল তা অনস্বীকার্য। তাঁর জন্মকালে রবীন্দ্রনাথই ছিল কাব্য জগতের মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রকাব্য-সৌরমণ্ডল। এই সৌরমণ্ডলে অবস্থিত অধিকাংশ ভক্ত-কবি রবীন্দ্রসূর্যের সঞ্জীবন রসে এমনই তন্ময় ছিলেন যে, নিজেদের স্বকীয়তা প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনই মনে করেননি। সে কালের তরুণচিত্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে ছিল মুগ্ধ বিবশ। বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সুর্যের মহিমার কথা মোহিতলাল স্মরণ করেছেন এভাবে–

"তখন ১৯০৫-৬ খৃ.; রবীন্দ্রনাথ 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক, আমরা তখন কলেজে বিদ্যার্থী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের বাণী হৃদয়ঙ্গম করা তখনকার তরুণদের সাধনার বিষয় ছিল। সারা বাংলা জুড়িয়া সমগ্র শিক্ষাভিমানী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রবীন্দ্রনাথের আসন তপোবণ বেদিকার অপেক্ষাও উঁচু ও পবিত্র ছিল।..............সেই কালে রবীন্দ্রনাথকে সূর্য অপেক্ষাও জ্যোতিষ্মান এবং তারকার চেয়েও সুদূর বোধ হইত। মনে হইত, এই কবির অভ্যুদয়ে চিরকালের জন্য বাঙলা সাহিত্যের আদর্শ স্থির হইয়া গেল; সাহিত্যসাধনাই ধর্ম সাধনার স্থান অধিকার করিবে, উৎকৃষ্ট রসবোধের সাহায্যে বাঙালীর মন উদার হইবে, জাতীয় জয় যাত্রার পথে বাঙালী দীর্ঘকালের

---

৪৮. মোহিতলাল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন..

৪৯. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খ. ৫, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পাথেয় সঞ্চয় করিবে। তাই সেদিন সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের পরমতম সাধনা বলিয়া মনে হইয়াছিল"।[৫০]

প্রথম যৌবনে দেবেন্দ্রনাথ সেনের সাহিত্য-আসরের সভ্য থাকাকালীন মোহিতলাল ছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী। মানসীর দলে থাকাকালীনও তিনি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। তারপর 'ভারতী'র বৈঠকেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-অনুগত। ১৯১৯ খৃ. অবধি তাঁকে রবীন্দ্র-কাব্যের নিগুঢ় রসজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ হিসেবেই দেখা যায়। কিন্তু 'স্বপন-পসারী' বের হবার কয়েক মাস পূর্ব হতেই হঠাৎ করে রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে তাকে ভিন্নমত পোষণ করতে দেখা গেল।[৫১] 'শনিবারের চিঠি'র দলে যোগ দিয়ে তিনি পুরোপুরি রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে উঠেন। কাব্য বিচারে তিনি পঞ্চাশ উত্তীর্ণ রবীন্দ্র কাব্যকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখলেন না। তিনি বঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আসনে মাইকেল (১৮২৪-১৮৭৩ খৃ.) ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪ খৃ.)কে বসানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।[৫২] তাঁর রণমঞ্চ হল 'শনিবারের চিঠি'। কেননা অতি আধুনিকেরা ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

গোয়াবাগানে দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাড়িতে থাকাকালীন কবির পরিচয় ঘটে করুণানিধানের[৫৩] সঙ্গে। করুণানিধান আর দেবেন্দ্রনাথ সেন এ দু'জনের সুবাদেই মোহিতলাল কলেজ জীবনেই সেকালের সাহিত্য সমাজে যাতায়াতের সুযোগ পান। করুণানিধান মোহিতলালকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনের সাহিত্যিক আড্ডাতে নিয়ে যেতেন। এ আড্ডাতেই তাঁর পরিচয় ঘটে 'ভারতী', 'মানসী', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'যমুনা' ও 'অর্চনা' প্রভৃতি সেকালের সুপরিচিত সাহিত্য পত্রিকার লেখকদের সাথে। যাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ খৃ.), বনোয়ারীলাল গোস্বামী, ব্যেমকেশ মুস্তফী (১৮৬৮-১৯১৬ খৃ.), অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম।[৫৪] এ সম্পর্কে তাঁর কৃতি ছাত্র, সুপরিচিত লেখক শ্রীনীরদ চৌধুরী লিখেছেন– It was reported that he moved in literary circles and Contributed to magazines. সম্ভবতএ সময় থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। এ সময়ের প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন কবিতা 'স্বর্গারোহণ' ১৯০৭ খৃ. 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

---

৫০. ১৩৩৫ সালের 'শনিবারের চিঠি' অগ্রহায়ন সংখ্যায় প্রকাশিত মোতিলালের প্রবন্ধ 'আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম দ্রষ্টব্য

৫১. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খ. ৫, পৃ. ২৮৭

৫২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা পিডিয়া, খ. ১০, পৃ. ৪০৮

৫৩. করুণানিধান (১৮৭৭-১৯৫৫) রবীন্দ্র-অনুবর্তী কবি রূপেই পরিচিত। ইনি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিও ছিল তার অচলা ভক্তি। মোহিতলালের সঙ্গে এ কবির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁর বিখ্যাত 'বিস্মরণী' কাব্যখানি 'করুণানিধান'কে উৎস্বর্গ করে মোহিতলাল গুরুর প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য জীবনে মোহিতলালের আর একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথকে মোহিতলাল নানা সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে দেখেছেন। তাঁর প্রধান কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ১৯১৪ খৃ.-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের প্রভাব মোহিতলালের প্রথম জীবনের কাব্যে দেখা যায়। বাংলা কাব্যে বিদেশী শব্দ, বিশেষ করে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের প্রেরণা মোহিতলাল সত্যেন্দ্রনাথ থেকেই পেয়েছিলেন। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের বাস্তব জীবনপ্রীতি মোহিতলালকে গভীরতর জীবন-ভাবনায় নিক্ষিপ্ত করেছে এমন বলা চলে।

রবীন্দ্রযুগের একজন বিখ্যাত কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে মোহিতলালের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। অক্ষয়কুমার বড়াল ইংরেজ কবি ফিট জেরাল্ডের অনূদিত উমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎগুলি বঙ্গানুবাদ করেছিলেন 'পান্থ' নাম দিয়ে। কবিতাগুলোর বহু অংশ মোহিতলালের কণ্ঠস্থ ছিল। ১৩১৫ বাংলা 'মানসী' চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' শীর্ষক মোহিতলালের প্রবন্ধে 'পান্থ' কবিতার বহু উদ্বৃতি আছে। মোহিতলাল কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের একজন পরম ভক্ত ছিলেন।[৫৫]

মোহিতলাল নিজে তাঁর কাব্য ভাবনার উপর তাঁর পূর্ববর্তী আর একজন বাঙ্গালী কবির প্রভাবকে স্বীকার করতেন, তিনি হলেন গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮ খৃ.)। তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা কাব্যের ভোগবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অবদানের কথা মোহিতলাল বারবার স্বীকারও করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন মহত্তর প্রতিভার অধিকারী হয়েও বিহারীলালকে (১৮৩৫-১৮৯৪ খৃ.) গুরু বলে স্বীকার করেছেন। মোহিতলাল কিন্তু গোবিন্দদাস সম্পর্কে তেমনটি করেননি। অনাহারে, অর্ধাহারে কবি গোবিন্দদাস যখন মৃত্যু শয্যা হতে–

'ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিও মঠ,
এখন আমি ক্ষুধার জ্বালায় করছি যে ছটপট'

লিখেছিলেন, তখন মোহিতলাল বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কলকাতায় একটি সভা করে কিছু সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। মোহিতলাল গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ 'প্রেম ও ফুল' কে আশ্রয় করে 'স্মরগরল' কাব্য

৫৪. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০
৫৫. ১৩৩৪ বাংলা 'প্রবাসী' আষাঢ় সংখ্যায় 'বিস্মরণী'র আলোচনায় মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. সুশীলকুমার দে জানিয়েছেন যে মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় কবি ছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল।

গ্রন্থে একটি দীর্ঘ কাহিনী কাব্যকে 'প্রেম ও ফুল' নামে চিহ্নিত করেছেন অথচ এর জন্য গোবিন্দচন্দ্র দাসের নিকট কোন ঋণ স্বীকার করেননি।[৫৬]

মোহিতলাল উপরোল্লিখিত কবিদের প্রেম-ভালবাসা, অনুরাগ-প্রেরণা সকলি পুঞ্জীভূত করে সকলের অজান্তে কাব্যের একটি স্বতন্ত্রধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কাব্যে আরবী-ফার্সীর প্রভাব, ইসলামিক জীবন ও বাঙ্গালী জীবনের বৈশিষ্ট্যতা নিজস্ব আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আরব বেদুঈনদের মরু জীবনকে কল্পনায় অবগাহন করে তিনি যে কবিতাগুলো লিখেছেন, তাতে তাঁর উত্তর বঙ্গের পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বালুচরে বৈশাখের রোদ্রে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সজনীকান্ত দাস মোহিতলালের জীবনচিত্র রচনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

"এই তিন বৎসরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, মানুষ ও প্রকৃতির সহিত তাঁহার মুখোমুখি পরিচয় তাঁহার সাহিত্য জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মোহিতলালের কবিতায় ভীষণ-মধুরের যে দ্বন্ধ, প্রকৃতি-পুরুষের যে সংঘর্ষ দেখিতে পাই, তাহার উৎস এইখানে।"[৫৭]

মোতিলালের জীবনের একটি কঠিনতম অধ্যায় ছিল তাঁর দু'কন্যার মৃত্যু। তৎকালীন মরণব্যাধি টাইফয়েডের আক্রমণে বড় মেয়ে উৎফলার মৃত্যুর মাত্র দশ দিনের মাথায় ছোট মেয়েটিও জ্যৈষ্ঠার অনুগমন করলে মোহিতলাল উম্মাদের মত হয়ে যান। কবির ছাত্র শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন–

"দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যুর কথা যখন তিনি জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার শোকোন্মত্ত মূর্তির দিকে তাকাইয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই"। তাঁহার চোখ সেদিন অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। কণ্ঠস্বরে যেন সেদিন অগ্নি নির্ঘোষিত হইল– "ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই"। তাঁর সে দিনের সে উন্মত্তরূপ হৃদয়ে সংহত হয়ে তাঁর পরবর্তী জীবনের ধ্যান-ধারণায় যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা অনেকেরই হয়তো জানা নেই।[৫৮]

মোহিতলালের কাব্যে ইংরেজী রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব যেমন সুবিদিত, তেমনি আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের প্রভাবও ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ফার্সী ভাষার পোষকতা পেয়েছিলেন খোদ

৫৬. ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ১২-১৩
৫৭. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০-১১
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃদেবের কাছ থেকে। তাঁর পিতা ছিলেন ফার্সী কবিতার রসিক পাঠক। এছাড়া তাঁর ছাত্র জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়ের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে মোহিতলালের কাব্যে আরবী, ফার্সী ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও খুব ভাল ফার্সী জানতেন। তাঁর 'স্বপন-পসারী' কাব্যের কয়েকটি কবিতা ফার্সী কাব্য থেকে নেয়া। তবে প্রত্যক্ষ প্রভাব অবশ্যই সত্যেন্দ্রনাথের।

মোহিতলাল এক সময় ছিলেন 'ভারতী' গোষ্ঠীর সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। থাকতেন ২৭নং বাদুড়বাগান লেনের চেট্রি একটি মেসে। সন্ধ্যে হলেই তাঁকে দেখা যেত ভারতীর আসর, গজেন ঘোষের আড্ডা, যমুনা কার্যালয়, মোসলেম ভারত অফিস, দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ী অথবা করুণানিধানের বাসায়। 'ভারতী'র তৎকালীন সম্পাদক মণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের সাথেও তাঁর ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তিনি ছিলেন তাঁর সাহিত্য জীবনের একজন মস্তবড় সহায়ক। 'হেমন্ত-গোধুলী' কাব্যখানি তিনি তাঁকে উৎস্বর্গ করেন।[৫৯]

দুই

'ভারতী'তে থাকাকালীন মোহিতলালের মধ্যে কবি হিসেবে একটি আত্মপ্রতীতিবোধ ও চেতনাবোধ জন্মে। 'ভারতী'র পাতায় তাঁর বেদুঈন, পাপ, নাদিরশাহের জাগরণ ও নাদিরশাহের শেষ প্রভৃতি কবিতা বেরুলে তাঁকে প্রচণ্ডভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর হাবিলদার কবি নজরুলের সাথে বিরোধকে কেন্দ্র করে এক প্রকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'শনিবারের চিঠি' ও 'প্রবাসী'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এ সময় তিনি 'নব্যভারত', 'কল্লোল', 'কালীকলম', 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। এসব পত্রিকায় লেখার সুত্র ধরে শরৎচন্দ্র চট্রপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রমূখ সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর যে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়, তাই তাঁর কবি জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 'স্বপন-পসারী'র অনেক কবিতায় নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব বিদ্যমান।[৬০]

মোহিতলালের সাহিত্য জীবনের প্রেরণার মধ্যগগনে যার আসন দেবতুল্য তিনি হলেন তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু ড. সুশীলকুমার দে। ইংরেজী সাহিত্যে এম,এ ডিগ্রীধারী সুশীলকুমার ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী। ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের যে প্রভাব মোহিতলালের কাব্যে পড়েছিল তার মূলে ছিল সুশীলকুমার দের সাথে তাঁর সে সময়ের বন্ধুত্ব। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন–

---

৫৯. আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, পৃ. ১৪
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

"ইংরেজীতে এম, এ পরীক্ষা দেবার বাসনা তাঁহার অনেক দিন ছিল; তিনি পড়া ছাড়েন নাই। এই সময়ে তখনকার কৃতি ছাত্র শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে-র সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে মোহিতলালের যে অধিকার জন্মে , তাহার সাহিত্যিক জীবনে তাহাতে তিনি বিশেষ লাভবান হইয়াছেন।"[৬১] দু'জনের বন্ধুত্ব আজীবন অটুট ছিল। মোহিতলাল 'স্মর-গরল' কাব্যখানি সুশীলকুমারকে উৎস্বর্গ করেন।

তিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সাথে মোহিতলালের কাব্য জীবনের তেমন গভীর কোন সম্পর্ক নজরে পড়েনা। এ সময় তিনি বিশেষ অনুরোধ অথবা সৌজন্যমূলক দু'চারটি কবিতা লিখেছেন বলা যায়। তবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের যে দুর্দমনীয় প্রতিভা মোহিতলালের জীবনে 'ভারতী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ পেয়েছিল তার একটা পূর্ণাঙ্গ অবয়ব অন্তত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মোহিতলাল ঢাকা এসে সুন্দর একটি সাহিত্যিক পরিবেশ পেলেন। নীলক্ষেতের বাড়িতে ছাত্র ও বন্ধুদের নিয়ে তিনি সাহিত্যিক আড্ডা গড়ে তোললেন। সেখানে শুধু স্থানীয় সাহিত্যানুরাগীরা নয়, কলকাতা থেকেও অনেক বড় বড় সাহিত্যিককে সেখানে হাজির হ'তে দেখা যেত। মোহিতলালের এক ছাত্র সরল গুহ এ সম্পর্কে বলেন–

"পৌঁছে গেলাম মোহিত বাবুর সাহিত্যিক আড্ডায়। সে আড্ডায় আমি ছিলাম একজন নগণ্য শ্রোতা। শুধু আমি কেন, এ আড্ডায় অনেক হোমরা-চোমরাদের দেখেছি। সবাই শ্রোতা। বক্তা একমাত্র মোহিতলাল।[৬২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন মোহিতলাল একজন বিদগ্ধ সমালোচক রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁর সাহিত্য সাধনার। ১৩৪৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি পাটনার পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গ সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৩৪৭-এর আষাঢ়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের সাহিত্য সভার সভাপতি হন। একই সালে তিনি ব্রাক্ষণবাড়ীয়া সাহিত্য সভার বার্ষিক শরৎ-স্মৃতি অধিবেশনের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। বাংলা ১৩৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী পদক দানে সম্মানিত করেন। বাংলা ১৩৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপর

---

৬১. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০
৬২. ড. কথাকলি সেনগুপ্ত, মোহিতলাল কবিতাপাঠ, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতা দেন। বাংলা ১৩৫৮ সালে নদীয়া জেলার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। জীবনের শেষ পর্বে দেশের বহুস্থান থেকে মোহিতলালকে সভাপতি করার ডাক আসলেও অভিমানী মোহিতলাল দেশ তাঁকে যথাযথ সম্মান দেখাচ্ছে না এ কল্পিত বেদনায় মনে মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে অর্থ সংকট তাঁকে নিপীড়ন করলেও সাহিত্যের রসবোধ থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। এটাই তাঁর সাহিত্য জীবনের সার্থকতা।

মোহিতলালের কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ :

মোহিতলাল মজুমদারের বয়স মাত্র উনিশ; সবেমাত্র মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, এ সময় তাঁর প্রথম[৬৩] দু'টি কবিতা গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকার ১৩১৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় বের হয়। কবিতা দু'টির নাম 'জীবন ও মৃত্যু'। মোহিতলালের কবি জীবনের ঊষালগ্নেই জীবন ও মৃত্যুর কথা কবির কাব্যে উপাদান হয়েছে। বাংলা ১৩১৫ সালে বি. এ. পাশ করার পর অর্থাভাবে তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলে সে কালের 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় মোহিতলাল তাঁর পত্রিকায় লেখার সুযোগ পান। বাংলা ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ সময় তিনি 'সুন্দর', 'নির্মাল্য', 'তন্দ্রাতুর', 'সূর্য্যাস্ত', 'কবি কাহিনী', 'আলোজ্বালা' 'দু'টি চোখ', 'মৃত্যু' ও 'সুন্দর' ইত্যাদি কবিতাগুলো লিখেন। কবিতাগুলো ভাব ও ভাষায় রবীন্দ্র কাব্যের পাশে যে নিতান্তই ম্লান ও মৌলিকতায় অনুজ্জল- এতে কোন সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে কবির চিত্তে সুন্দর তৃষ্ণার জাগরণ, বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতি কবির সুগভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং মানবজীবন, মানবভাগ্য ও মৃত্যু সম্পর্কে কবির সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে।

দেবেন্দ্রমঙ্গলঃ

অতঃপর ১৩১৯ সালের ১লা কার্তিক মোহিতলালের 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'[৬৪] পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। এতে মোট ষোলটি চতুর্দশপদী আছে। সবগুলো পদই দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রশস্তি নিয়ে লেখা।

---

৬৩. ১৩১৪ সালের কার্তিক (৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকায় 'জীবন ও মৃত্যু' শীর্ষক মোহিতলালের দুটি চতুর্দশপদী বের হয়। এর আগেও তিনি কবিতা লিখেছেন এবং বলাগড় নিবাসী তাঁর বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ ও আত্মীয় রাধিকাপ্রসাদ মজুমদারকে পাঠ করে শুনাতেন। বাড়ির মেয়েদেরকেও এসব কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু অপরিণত সে সব লেখা ছাপা হয়নি। এজন্য এ কবিতা দু'টিকে প্রথম কবিতা বলা হয়েছে। (দ্রঃ ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, পৃ. ৩৪)

৬৪. ১৩১৯ সালের ১লা কার্তিক 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' প্রথম প্রকাশিত হয়। এত মোট ষোলটি চতুস্পদী আছে। পুস্তিকাটির মূল্য ছিল এক আনা এবং এতে কবির নাম ছিল মোহিতমোহন মজুমদার। পুস্তকটি দীর্ঘদিন দুস্প্রাপ্য ছিল। বর্তমানে এটি ভারবি প্রকাশিত 'মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন কবির নিকটাত্মীয়। কিন্তু আত্মীয়তার সূত্রেই তাঁর এ প্রশস্তি এমনটি নয়। বরং দেবেন্দ্রনাথের রূপরসস্নিগ্ধ কবিতা পাঠে বিশেষত তাঁর সনেট রচনার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েই তরুণ কবি মোহিতলাল 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' লিখেছিলেন। তবে 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'এ মূলত দেবেন্দ্র-প্রভাবই লক্ষণীয়।

স্বপন-পসারীঃ

'স্বপন-পসারী' কবি মোহিতলাল মজুমদারের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থ হিসেবে 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' পুস্তকের মর্যাদা না পেলেও 'স্বপন-পসারী' কিন্তু তা পেয়েছে। এটি কবির বিকাশপর্বের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বাংলা ১৩২৮ সালের (১৯২২ খৃ.) শ্রীপঞ্চমীর দিনে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'তোমাকে' খুব সম্ভবত কবির সহধর্মিনীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মোহিতলাল নিজেই লিখেছেন– "প্রথম বয়সের রচনা হইতে ইহাতে একটিও নাই। গত দশ বৎসরে যাহা লিখিয়াছি তাহার মধ্যে যাহা মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারি কতক বাদ দিয়া বাকি রচনাগুলি একত্র করিয়া দিলাম।"[৬৫] এ কাব্যের কবিতাসমূহ কবির তেইশ থেকে তেত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা এবং কবিতাগুলোর অধিকাংশই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

'স্বপন-পসারী' প্রকাশের পূর্বে কবি তিন বছর সরকারী চাকুরী করেন। বাংলা ১৩২১ সালে তিনি কানুনগোর চাকুরী নিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। এ চাকুরী জীবন তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে এক মূল্যবান সম্পদ।[৬৬] মোহিতলাল নিজে এ কালের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

"জীবনের সহিত রুঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির ভীষণ মূর্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এই কয় বৎসরেই লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্য জীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইতেছিল। বনে,জঙ্গলে, মাঠে, নদীর চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁবুতেও বাস করিতাম, কোনও দিন বা বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ হইতে পাবনা-বাজিতপুর পর্যন্ত যে বিশাল চর–একবার সেখানে সারা বৎসর কাটাইয়াছিলাম। জলপাইগুড়ি অবস্থান কালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, তেমনই বৃক্ষছায়াহীন বালুপ্রান্তরে অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। এক কথায় বিধিবদ্ধ সমাজ জীবনের বাহিরে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যেভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং প্রকৃতির যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম

---

৬৫. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৯
৬৬. মোহিতলাল মজুমদার, রবি-প্রদক্ষিণ (শিলাইদহে রবীন্দ্র-স্মৃতি) পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল–তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হয় নাই।”[৬৭]

এ জীবন-অভিজ্ঞতার ফলেই 'বেদুইন', 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ' প্রভৃতি 'স্বপনপসারী'র বিখ্যাত কবিতাগুলো মোহিতলালের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। 'বেদুইন', 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ', 'ইরাণী', 'অঘোর-পন্থি' এ কয়েকটি কবিতা বলিষ্ঠ ও দুরন্ত জীবন পিপাসার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। 'বেদুইন'[৬৮] শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি মোহিতলালের এক অনবদ্য সৃষ্টি। রূঢ় রুক্ষ বালুচরবাসী বেদুইনদের মৃত্যুভয়হীন উত্তেজনা-উদ্বেল স্বাধীন যাযাবর জীবনরস তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

চাকরী জীবন মোহিতলালকে কাব্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, এ ভাবনায় তিনি বাংলা ১৩২৪ সালে চাকরী ছেড়ে পুনরায় শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন। বাংলা ১৩২৫ সালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে পরিচিত হয়ে তিনি 'ভারতী'তে যোগ দেন। সে সুবাদে পরিচয় ঘটে করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম প্রমূখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সাথে। বালুচরে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের সাথেও তার পরিচয় নিবিড় হয়। এ জন্যই 'স্বপন-পসারী'র বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মোহিতলালের 'অঘোরপন্থী', 'দিলদার', 'গজলগান', 'হাফিজের অনুসরণে' কবিতাগুলো ভোগবাদমূলক কবিতা হিসেবেই আলোচিত। তথাপি ওমর খৈয়ামী সুরে কামনার রসে মত্ত হবার মধ্যে কবির বলিষ্ঠ জীবন তৃষ্ণাও উপেক্ষিত হয়নি। শেষের তিনটি কবিতার ছন্দে ও ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাব স্পষ্ট।

দেবেন্দ্রমঙ্গলে' কবির রূপ, সৌন্দর্যপিপাসা জীবন ও মৃত্যুচেতনা, প্রকৃতিপ্রীতি এবং আস্তিক্যবোধের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি 'স্বপন-পসারী'তে এসে তার সাথে জগৎ ও জীবনের বহু বিচিত্র বিষয়ের সচেতনতা যুক্ত হয়েছে। এখানে কবি জগৎ ও জীবনকে রোমাঞ্চের রঙে অনুরঞ্জিত করে স্বপ্নের রঙে রঙিন করে দেখার কবিস্বভাবটি ফুটিয়ে তোলেছেন। আর ঠিক এ কারণেই কবি

---

৬৭. 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ সাল মাঘ সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে কবির মন্তব্য।

৬৮. ২০.৩.১৯৪২ খৃ. ঢাকা থেকে লিখিত একখানা চিঠিতে অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে মোহিতলাল লিখেছিলেন– ''বেদুইন' এর জীবন ও মরুভূমির চিত্র আমি নানাস্থান হইতে প্রায় বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়াছি। তবে উহার প্রধান কল্পনা-উৎস ছিল Monier William Jones কৃত Desert of Arab' নামক গ্রন্থের আরবী কবিতার ইংরেজী অনুবাদ।.......মরুভূমিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে আমি এক প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের The Terrible Saharaর চিত্র কাজে লাগাইয়াছি–দুই একটি ইংরেজী কবিতার সাহায্য লইয়াছি। (দ্রঃ আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দাস সংকলিত ও সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

মোহিতলাল এ কাব্যে মুখ্যত স্বপনব্যাপারী। 'স্বপন-পসারী'র রোমান্টিক কল্পনায় দুঃখের কোন সুর নেই। নেই জগতের রহস্যচিন্তায় ডুবে থাকা মন। তাইতো কবি বলেন– 'স্বপন-পসারী'ই আমার কবিজীবনের পূর্ণযৌবনকাব্যের Romantic প্রবৃত্তির উচ্ছল-উৎসার হইয়া আছে–অনেকের মতে উহাই আমার শ্রেষ্ঠকাব্য।'

ভাষা ও ভাবের দিক থেকে 'স্বপন-পসারী' পূর্ববর্তী কবিতাগুলো অপেক্ষা অনেক পরিণত। এখানে কবি দুরন্ত ও বলিষ্ঠ জীবন-পিপাসা ও ভোগকামনা বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক অনুভুতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাব গৌণভাবে ক্রিয়াশীল থাকলেও তাঁর বলার ভঙ্গীতে স্বাতন্ত্রভাব লক্ষণীয়। রূপসৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা, মৃত্যুভাবনা এবং জগৎবিষয়ক চিন্তায় ক্ষীণ দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবর্তে নিপতিত হলেও প্রাণধর্ম ও যৌবনরসসিক্ত দৃষ্টির সাহায্যে তিনি সে সংশয়ের জালকে এড়িয়ে গেছেন। এ কাব্যে মোহিতলালের বস্তু-আশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকলেও তার উপর কল্পনা ও স্বপ্নমায়ার কিঞ্চিৎ আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। যৌবনকালের মনের রঙ, হৃদয়ের উত্তাপ, চোখের তন্দ্রালু নেশা, ও প্রাণের স্বপ্নরস এ কাব্যে মোহিতলালের কবি চেতনাকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করেছে। রোমাঞ্চের এ আলো 'স্বপন-পসারী'র প্রতিটি কক্ষে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে। বাংলা ১৩৪৮ সালে কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সে স্মৃতিকেই স্মরণ করে লিখেছিলেন–

> "আজ সে পূর্ণিমা নাই, নাই সেই ফাল্গুণের ফাগে-রাঙা অসীম ভূবন,
> বিভোর যাহার রূপে ভরেছিনু একদিন পসরায় রঙিন স্বপন।"[৬৯]

বিস্মরণীঃ

'স্বপন-পসারী'র পাঁচ বছর পর ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর রাতে মোহিতলালের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী' প্রবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত। 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই 'ভারতী', 'প্রবাসী' ও 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশকাল অনুযায়ী কবিতাগুলোকে না সাজিয়ে অনেকটা ভাবগত ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবি এগুলোকে কাব্যে সন্নিবেশিত করেন। সর্বমোট পঁচিশটি কবিতা 'বিস্মরণী'তে স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলো কবির তেত্রিশ থেকে আটত্রিশ বছরের মধ্যে রচিত।

---

৬৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'স্বপনপসারী' "উৎসর্গ কবিতা" সংযোজন ১৯৪২ খৃ. (ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ), পৃ. ১৫১

'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থে যেমন ক্লান্তি ও বিষাদের কবিতা আছে, তেমনি আছে বলিষ্ঠ জীবনের কবিতা। 'স্পর্শরশিক', 'মোহমুদগর', 'পান্থ' তিনটি কবিতাই মোহিতলালের জীবন দর্শনের বিশিষ্টতার জন্য বিখ্যাত। কবি কীটস্ বলেছিলেন- Oh for a life of sensation rather then of thought-মোহিতলালও তেমনি 'স্পর্শরশিক' কবিতায় প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জগতের রসিকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। মোহিতলালের বর্ণনায় তীব্রতা বেশী-কীটসের অনুভূতি প্রশান্ত স্নিগ্ধ। মোহমুদগরেও কবির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ-বৈরাগ্যবিলাসীদের প্রতি তিনি কঠিন ভর্ৎসনা করেছেন। প্রথম দু'টি কবিতার মতো 'পান্থ' কবিতাতেও কবির নিরঙ্কুশ জীবনভোগের বাসনা ব্যক্ত হয়েছে তবে তার সাথে যুক্ত হয়েছে দার্শনিক প্রত্যয়।

'কালাপাহাড়' মোহিতলালের একটি সুপরিচিত কবিতা। ইতিহাসের কালাপাহাড়কে কবি এখানে নব মানবতাবাদের রূপময় প্রতীকরূপে উপস্থাপন করেছেন। অন্ধ জড় ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারকে ভেঙ্গে নতুন মানব সমাজ গড়বার জন্যই যেন কালাপাহাড়ের আবির্ভাব। 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর' মোহিতলালের একটি নাট্য কবিতা। কবিতাটি তাঁর পূর্বলিখিত 'শেষশয্যায় নূরজহান'-এর সম্পূরক। কবি নিজেও তাই মনে করতেন-

"নূরজহান ও জহাঙ্গীর" কবিতাটি আমার পূর্বলিখিত "শেষশয্যায় নূরজহান" কবিতার companion piece। দুটো কবিতা একসঙ্গে পড়লে এ কবিতার বিশেষত্ব আরো বেশী করে ফুটে উঠবে। বোধ হয়-সেটা ছিল Reflective Lyrical এটা হয়েছে Dramatic Passionate।"[৭০]

প্রেম, বিরহ, ব্যথা, বেদনার ভিতর দিয়ে যে জীবন-তিতিক্ষার প্রবলতা, এ রূপসৃষ্টি দিয়ে মোহিতলাল তাঁর অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। 'বিস্মরণী'র আরেকটি বিখ্যাত নাট্যকাব্য 'মৃত্যু ও নচিকেতা'। এ কবিতায় নচিকেতার মৃত্যুর অনুভূতি বোঝাবার জন্য কবি অনেকগুলো সঙ্কট মুহূর্তের ছবি এঁকেছেন। প্রাচীন অরণ্য জীবনের বর্ণনার প্রত্যক্ষতায় ছবিগুলো অপূর্ব। 'বিস্মরণী'র 'কন্যা-শরৎ', 'শিউলির বিয়ে', 'ঘুঘুর ডাক', 'বাদলরাতের গান' এবং 'মাধবী' কবিতায় মোহিতলালের প্রকৃতি চেতনা স্পষ্ট। 'কন্যা-শরৎ' কবিতায় শরৎকন্যার সাজ সজ্জার কথা বলতে গিয়ে কবি শরতের দুপুর, সন্ধ্যা, আকাশ, আলো, শিউলি ফুল, লক্ষীপূজা-সব কিছুকেই শরৎকন্যার বিচিত্র মর্জি বা খেলার অঙ্গরূপে কল্পনা করেছেন। 'শিউলির বিয়ে' কবিতায় কবি আমাদের পল্লী জীবনে কুলীন বাপের বাড়িতে বিবাহযোগ্যা নারীর চিত্তে স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচনের যে হাওয়া বইছিল তারই একটি

---

৭০. আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দাস সংকলিত ও সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

অপরূপ দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। মাটির বুকের শিউলি আকাশ বুকের জ্যোৎস্নাকে গ্রহণ করেনি। কবিতাটির মূলদেশে একদিকে যেমন কবির কাল-সচেতনতা অন্যদিকে তেমনি মৃত্তিকাপ্রীতি লক্ষণীয়।

'বিস্মরণী' কাব্যের সুচনাতেই মোহিতলাল কবি করুণানিধান বন্দোপাধ্যায়কে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। বিভিন্ন কারণে এ অগ্রজতুল্য কবির সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। করুণানিধানের একনিষ্ঠ বাণীচর্যা, সস্নেহ আলাপচারিতা, অনুপম চরিত্রমাধুর্য এবং তাঁর কাব্যগত সপ্নরস মোহিতলালকে বিমোহিত করেছিল। 'সত্যেন্দ্র-বিয়োগে' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় শ্বাসাঘাত ছন্দে বাংলাকাব্যে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন।

'বিস্মরণী'র বহু কবিতায় মোহিতলালের মৃত্যু-চিন্তার পরিচয় বহন করে। 'মৃতপ্রিয়া', 'পথিক', 'নবতীর্থঙ্কর' ও 'পান্থ' কবিতায় তাঁর মৃত্যুভাবনার আংশিক এবং 'মৃত্যুশোক' ও 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায় পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। দেহ বন্দনার চূড়ান্ত পরিচয় আছে 'মৃত্যুশোক' কবিতায়। দেহান্তে কিছুই যে থাকেনা, দেহ চেতনাই যে জগৎ ও জীবনকে রমণীয় করে রাখে একথা এ কবিতায় উচ্চকণ্ঠে বলা হয়েছে। দেহগত জীবনের প্রতি নিঃসীম মমতায় নিবিড় এবং মহার্ঘ দেহের এমন অপরূপ প্রশস্তি-স্পন্দিত কবিতা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দূর্লভ।

স্মর-গরলঃ

'বিস্মরণী'র দশ বছর পর ১৩৪৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯৩৬ খৃ.) কলকাতার রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ থেকে 'স্মর-গরল' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ড. সুশীলকুমার দেকে উৎসর্গীকৃত। বাংলা ১৩৩৪ সাল পর্যন্ত এ কাব্যের কবিতাগুলো নিয়মিতভাবে 'কালিকলম', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা' ও 'কল্লোলে' বের হয়েছিল। এ ছাড়াও অনিয়মিতভাবে 'উত্তরা', 'বঙ্গশ্রী' ও 'প্রগতি' পত্রিকায় এর কিছু সংখক কবিতা বের হয়। মোহিতলালের আটত্রিশ থেকে আটচল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে 'স্মর-গরলে'র কবিতাগুলো লিখিত। 'স্মর-গরল' কাব্যে সনেটসহ মোট একচল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে।

'স্মর-গরলে'র বহু কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ অপেক্ষা মননের আতিশয্য, সমালোচকসূচক তর্কবিতর্ক, তত্ত্বরস রসিকতা, জাতির অধঃপতন ভাবনা–প্রভৃতি নানা স্থলে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভাষা ও স্টাইলের দিক থেকে কবি স্বপ্রতিষ্ঠ হলেও 'স্মর-গরল' যে সুখপাঠ্য নয় একথা স্বীকার্য। তাঁর চিন্তা ও ভাবনা এখানে পরিণত, বক্তব্য বুদ্ধিদীপ্ত বা তত্ত্বভিত্তিক। কিন্তু 'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী'র মতো অতটা মর্মস্পর্শী নয়। 'স্মর-গরলে' কবি দেহ ও আত্মা, কাম ও প্রেম, বাস্তব ও আদর্শ, সৌন্দর্য ও প্রেম, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোগ ও ত্যাগ–প্রভৃতি চিরকালীন জীবন সমস্যার

Dhaka University Institutional Repository

অনুশীলনকেই পবিত্রকর্ম বলে স্থির করলেন। মোহিতলালের দেহাত্মনির্ভর ভোগ বা জীবনবাদের মূলেও সৌন্দর্য ও প্রেম চেতনা একই সাথে সক্রিয়। তাঁর 'মিলনোৎকণ্ঠা', 'শেষ আরতি' ও 'রতি ও আরতি'-এ তিনটি কবিতায় বাস্তব কল্পনার সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বমুক্তির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'বিদায়বাসনা', 'বসন্তবিদায়', 'শেষশিক্ষা', 'নিশি-ভোর' ও 'নির্বাণ' কবিতায় কবির যৌবনাবসানের বেদনা ও হাহাকার ধীরে ধীরে চরমে উঠেছে এবং তাঁকে ঘোরতর নৈরাশ্যবাদী করে তোলেছে। পক্ষান্তরে তাঁর 'দিনশেষে', 'একআশা' ও 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় সেই হতাশার দ্বন্দ্বকে জয় করার চেষ্টা আছে। 'বিদাযবাসনা', 'বসন্তবিদায়' ও শেষশিক্ষা'-এ তিনটি কবিতাতেই যৌবন হারানোর ব্যথায় কবিচিত্তের আক্ষেপ চরমভাবে ফুটে উঠেছে। এ আক্ষেপের সুরে 'বসন্তবিদায়' কবিতাটিও মর্মস্পশী।

'নিশি-ভোর' প্রকৃতিপ্রীতি কবিতা হিসেবে অপরূপ। কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রের ছায়ায়-আলোয় রাত্রির অনবদ্য রূপসৌন্দর্য এখানে উদ্ভাসিত। ছায়াময়ী রাতের সে রূপের মায়ায় কবি সারারাত কাটিয়েছেন। তার শিথিল হাতে রজনীগন্ধার সুবাসও তিনি তন্দ্রাভরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তখন যে তাঁর যৌবন ছিল। আজ আর সে যৌবন নেই, নেই সে ছায়া, সে রূপ, সে অজানার মোহ, সে অভিসারিকার আকর্ষণ-কিছুই নেই। আজ পড়ন্ত যৌবনে কবি 'নিশি-ভোর' হবার দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

তাঁর এ দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের পরিচয় তাঁর 'চৈত্ররাতে' ও 'বিদায়' নামক সনেট দু'টিতেও বিধৃত হয়েছে। যৌবন অপগমের এ বেদনা ও হাহাকার আরো চরমে উঠেছে তাঁর 'নির্ব্বাণ' নামক কবিতায়। যৌবনের এ বিচিত্র রসকলায় যে কবি এতকাল মুখর ছিলেন, সহসা সেই অতি প্রিয় যৌবনের চির বিদায়ে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়বেন এটা কী করে হয়? সহসা হতাশার নিরন্ধ্র অন্ধকারে তিনি একটুখানি আলোকের রেখা দেখতে পেলেন। ক্রমে তাঁর বেদনার্ত হৃদয় আশ্বস্ত হয়ে উঠল-যা তাঁর 'দিনশেষে', 'এক আশা' ও 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর 'নিশান্তে'[৭১], 'নিশুতি'[৭২] ও 'পৌর্ণমাসী' নামক সনেটগুলোতেও দ্বন্দ্ব বা সংকটমুক্ত কবির পরিবর্তিত মনোভাবের স্বাক্ষর রয়েছে।

'বিস্মরণী'র চেয়ে 'স্মর-গরলে' মোহিতলালের প্রকৃতি ভাবুকতা অনেক বেশী গাঢ়। অবশ্য প্রকৃতি ভাবনার আগের বৈশিষ্ট্যগুলো এ কাব্যেও বর্তমান ছিল। তবে কবির ভাব-গভীরতা এবং ভাষা

---

৭১. ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় 'নিশান্তে' কবিতাটির নাম ছিল 'ভোরের আলো'।
৭২. ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় 'নিশুতি' কবিতাটির নাম ছিল 'জ্যোৎস্না নিশুতি'।

Dhaka University Institutional Repository

ও স্টাইলের অতিশয় সমৃদ্ধি এ কবিতাগুলোতে বিশেষ মহার্ঘতা দান করেছে। মানব জীবন বা মানব সংসারের অতি পরিচিত চিত্রের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে 'স্মর-গরল'এর 'বনভোজন', 'পৌর্ণমাসী', 'নিশুতি' ও চাঁদের বাসর' কবিতায়। কবির মানসপ্রকৃতির চমৎকার প্রতিবিম্বন লক্ষ্য করা যায় 'শ্রাবণশর্ব্বরী', 'বসন্ত বিদায়', 'নিশি-ভোর', 'চৈত্ররাতে' ও 'বিদায়'[৭৩] কবিতায়। 'কবিধাত্রী' কবিতায় মোহিতলাল স্বীয় জন্মভূমি অর্থাৎ পল্লী-বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমস্তই মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছেন।

'স্মর-গরল' কাব্যের 'শরৎচন্দ্র'[৭৪], 'রূপার্ট ব্রুক', 'বিবেকানন্দ', 'জন্মাষ্টমী', 'কবিবরণ' ও 'সত্যেন্দ্রনাথ' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তির মহৎ কীর্তি, উন্নত পৌরুষ ও গৌরবময় জীবনাদর্শের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পূর্ববর্তী কাব্যের মতই জাগ্রত আছে। 'বুদ্ধ' কবিতাতে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব-বিকাশ এবং পরিণামের ইতিহাসকে কবি আশ্চর্যভাবে নিজের জীবন দর্শনের সাথে মিলিয়ে কাব্যরূপ দিয়েছেন। জাতির শোচনীয় অধঃপতন ও সর্বাত্মক অধোগতির একটি চিত্র একালে তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল। বাংলাদেশের চতুর্দিকে অসত্য, অনাচার, দুর্নীতি ও অসুন্দরের প্রেতনৃত্য লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং দেশ ও জাতির অতীত কৃষ্টি ও গৌরবময় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে তিনি নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। 'বিবেকানন্দ', 'জন্মাষ্টমী' ও 'কবিবরণ'–এ তিনটি কবিতায় সে সব মনোভাবই স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে।

'স্মর-গরল' কাব্যে কবির বিভিন্ন প্রবনতাগুলোর ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পূর্বোক্ত কাব্যের মৃত্যুভাবনা ও জন্মান্তর বিশ্বাস তাঁকে আর পীড়িত করেনি। কবির বহুঘোষিত দেহাত্মনির্ভর ভোগবাদ বা জীবনবাদ, যা 'বিস্মরণী'তে নতুন তাৎপর্য মণ্ডিত করেছিল এবং মনে দ্বন্দ্বের সূচনা করে চির-অতৃপ্তির বোধকে জাগ্রত করেছিল–তার পূর্ণ পরিণতি এ কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির ব্যক্তিপূজার প্রবণতাটি এ কাব্যে জাতির অবক্ষয় ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নতুনত্ব লাভ করেছে। পূর্ববর্তী কাব্যের প্রকৃতি ভাবুকতা 'স্মর-গরলে' ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করেছে। এ কাব্যে যৌবন হারানোর ব্যথা ও জাতির অধঃপতনের দুর্ভাবনা–এ দুই নতুন দ্বন্দ্ব তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছে। প্রথম ভাবনা থেকে মুক্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনি অনেকখানি আশ্বস্থ হয়েছেন কিন্তু দ্বিতীয় ভাবনাটি প্রবলতর না হলেও কবিমনকে নৈরাশ্যপীড়িত করেছে।

৭৩. ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় 'বিদায়' কবিতাটির নাম ছিল 'শেষ বাসর'।
৭৪. ১৩৩৪ 'কালিকলম'র ভদ্র সংখ্যায় 'বিদায়' কবিতাটির নাম ছিল 'শরৎচন্দ্রের প্রতি'।

হেমন্ত-গোধূলীঃ

'স্মর-গরল' কাব্যের পাঁচ বছর পর ১৩৪৮ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯৪১ খৃ.) 'হেমন্ত-গোধূলী' প্রকাশিত হয়। বাগ্দেবীর চরণে এ কাব্যখানিই মোহিতলালের শেষ অর্ঘ্য। কবিতাগুলো কবি কর্তৃক দু'টি পৃথক পর্যায়ে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল। তাই এতে মৌলিক ও অনুবাদ উভয় শ্রেণীর কবিতা লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদ কবিতাগুলো 'স্বপন-পসারী'র কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে রচিত। মৌলিক কবিতার কিয়দংশ 'স্মর-গরল' এর কালে লিখিত। এ ব্যাপারে কবি বলেন–"যে সকল কবিতা পূর্বে লিখিত হইলেও প্রকাশিত অথবা সুপ্রচারিত হয় নাই এবং আরও যেগুলি প্রায় সর্বশেষের রচনা, সেগুলিকে এ পুস্তকে সঞ্চয় করিলাম।"[৭৫]

'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশের পূর্বেই মোহিতলাল বাংলাদেশে সমালোচকরূপে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিলেন। তাঁর সমালোচনার প্রসিদ্ধ কয়েকখানি গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। 'স্মর-গরলে'র কালেই তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। এখন তা আরো ক্ষীণতর হয়ে রুদ্ধ হবার উপক্রম হল। 'স্মর-গরলে'র কালে জাতির যে অবক্ষয় বেদনা কবিকে পীড়িত করেছিল, একালে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। কাব্যচর্চা অপেক্ষা জাতির জীবন-মরণের ভাবনাই কবিকে সমধিক চঞ্চল করে তুলল।

এ কাব্যের 'নাগার্জুন', 'প্রেতপুরী' ও 'শরাবখানা'–এ তিনটি কথিত মাদকাপূর্ণ কবিতা ছাড়া আর কোন কবিতাতেই মহাকাব্যিক কল্পনা, কঠিন সংহত প্রকাশ-ভাষা, সেই গাম্ভীর্য তত্ত্বপ্রবণতা নেই। এ কাব্যের কবিতাগুলো নিভৃত কবিকণ্ঠের আত্মগুঞ্জন। এখানে কবি নিজের জীবনের অতীত সুখ-দুঃখ বেদনারই রোমন্থন করে চলেছেন। এ জন্য এ কাব্যের লিরিক সুর বিশুদ্ধ একতন্ত্রী। 'স্বপন-পসারী'তে কবি জীবন ভোগের উল্লাসে আত্মহারা। 'হেমন্ত-গোধূলী'তে এসেছে কিছু নির্লিপ্ততা ও প্রশান্তি। 'স্বপন-পসারী'র বৈচিত্রও এতে নেই। কবি তাঁর চারটি কাব্যের বিবর্তন-ধারার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

'স্বপন-পসারী' হইতে 'স্মর-গরল' পর্যন্ত ঐ Romantic এবং Classical দুই ধারার যুগ্মস্রোত লক্ষ্য করা যাইবে। 'স্বপন-পসারী'তে Romantic এর প্রাধান্য, 'স্মর-গরলে' Classical এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা; 'বিস্মরণী'তে দুই-এরই একটা সাম্যভাব। 'হেমন্ত-গোধূলী'তে কবির ব্যক্তিগত

---

৭৫. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, ভূমিকা, পৃ. ৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপরিচয়-উহা অতিশয় Lyrical ; যদিও উহার ভাষা ও রচনাভঙ্গিতে সেই Classical সংযম অতিমাত্রায় লক্ষিত হইবে।'[৭৬]

'হেমন্ত-গোধূলী' কাব্যটি কবি তাঁর যৌবন কালের প্রিয় সুহৃদ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। 'স্বপন-পসারী' কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই এ বন্ধুর আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। বিচিত্র ঘটনাবর্তে পতিত হয়ে সে বন্ধুর কথা একরূপ ভুলেই গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে 'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল' কাব্য একে একে বের হয়ে গেল। জীবনের নানা ব্যস্ততায় কবি আর পেছনের দিকে তাঁকাবার সুযোগ পেলেন না। এরি মধ্যে বন্ধুও পরপারে চলে গেল। 'হেমন্ত-গোধূলী' কাব্যখানি প্রকাশকালে কবির সে স্মৃতিময় অতীত তাঁকে আকর্ষণ করলো। অতীতের সে বিস্মৃতপ্রায় রাজ্যের বন্ধু মণিলালকে স্মরণ করে পরম আনন্দ লাভ করলেন।

'বিস্মরণী', 'স্মর-গরলে'র পর 'হেমন্ত-গোধূলী' পড়লে মনে হয়, জীবনে যে ঝড় এসেছিল, এবার সে ঝড় থেমে গেছে-ঔদ্ধত্য-অবিনয় আর নেই। মোহিতলালের চিত্তে এসেছে গভীর পরিবর্তন। যৌবনের মতো বসন্ত-প্রকৃতিতে চিত্তে বিরহ জাগে না-তাঁর চিত্তে সে আকণ্ঠ দুরন্ত পিপাসাও আর নেই। 'হেমন্ত-গোধূলী'র প্রকৃতি মূলত শান্ত রসাশ্রিত। প্রকৃতিকে অবলম্বন করে কবি প্রধানত শান্তির বারিই পান করেছেন। 'বালুকা-বাসর', 'গঙ্গাতীরে', 'প্রকাশ', 'বধূবাসন্তী', 'বাংলার ফুল' ও 'কাল-বৈশাখী' কবিতায় মোহিতলালের প্রকৃতি ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী কাব্যে ব্যক্তি প্রশস্তিমূলক কবিতায় জাতির দুর্গতি-বেদনা যুক্ত হয়ে কবিচিত্তে যে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল, 'হেমন্ত-গোধূলী'র কতকগুলি কবিতায় সে দ্বন্দ্বকে তীব্রতর হতে দেখা যায়। তাঁর 'মধুউদ্বোধন', 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'ফেরদৌসী', 'রবির প্রতি', 'বনস্পতি' ও 'অন্তিম' কবিতায় কবি মনের ঐ বিষাদক্লিষ্ট ভাবনাটি লক্ষ্য করা যায়। এগুলোতে শুধু দ্বন্দ্বের তীব্রতা নয়, দ্বন্দ্বমুক্তির আভাসও রয়েছে।

'হেমন্ত-গোধূলী'র আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বিদেশী কবিতার অনুবাদ। মোহিতলাল প্রচুর বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে যেমন সুপরিচিত কবি আছেন, তেমনি আছেন অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত কবি। এ কাব্যের অনেকটাই জুড়ে আছে অনুবাদ কবিতা। সব কবিতাই উৎকৃষ্ট মানের তা হয়তো নয়। তবে রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মতই সংস্কারমুক্ত হয়ে তিনি এ অনুবাদে

---

৭৬. আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দাস সংকলিত ও সম্পাদিত মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

হাত দিয়েছেন। মোহিতলালের নিজস্ব ষ্টাইলে রচিত কবিতা–অনুবাদের গন্ধ কোথাও নেই। কবিতার শিরোনামগুলোও মৌলিক বলে পাঠকের মনে হবে।

'হেমন্ত-গোধূলী'র কাব্য কবি চিত্তের পূর্ণ পরিণতি ও প্রশান্তির কাব্য। ভাবে ও ভাষায় কাব্যটি অন্য কাব্যগুলো থেকে স্বতন্ত্র। 'বিস্মরণী' ও 'স্মর-গরলে' স্টাইলের যে আভিজাত্য এবং মননের যে দীপ্তি, এখানে তা অনুপস্থিত। 'হেমন্ত-গোধূলী'তে মোহিতলালকে তাঁর কাব্যজীবনের সকল দ্বন্দ্ব সংকট থেকে মুক্ত হতে দেখা যায়। জাতিগত ভাবনার দ্বন্দ্বটি এ কাব্যে তীব্রতম হলেও কবি চিত্তের অতিপ্রবল আশাবাদের দ্বারা তাকে জয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'হেমন্ত-গোধূলী'র পরে কবির চিত্তে সে আশাবাদ ক্ষীণ হতে থাকে। আর সে কারণেই কাব্যে সমন্বয়ের রাজ্য লাভ করলেও আস্তে আস্তে সে রাজ্যটি থেকে নির্বাসিত হতে থাকেন। অতঃপর তিনি কাব্য সাধনা ত্যাগ করে বাঙ্গালীর সর্বাত্মক উন্নতি সাধনে রাজনীতির আসনে নেমে আসেন। দ্বিখণ্ডিত বাংলার উন্নতি, কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যনীতি, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের বিষময় ফল, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সর্বনাশা পরিণতি, জাতি ও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য ঋষি অরবিন্দের সাধনা, নেতাজীর জীবন-মহাকাব্যের মহিমা–প্রভৃতি বিষয় আলোচনার জন্য তিনি 'বঙ্গদর্শন'[৭৭] ও 'বঙ্গ ভারতী'[৭৮] পত্রিকাকে আশ্রয় করেন। যথার্থ মৃত্যুর পূর্বেই মোহিতলালের কবিসত্তা মৃত্যুবরণ করল। তারপর সমালোচকসত্তা ও জাতি-ভাবনার উদগ্রতায় কিছুকাল তাঁর সাহিত্যসাধনার জের চলেছে বটে, কিন্তু সেখানে কবি মোহিতলাল নেই–আছে শুধু তার বিগত বৈভবের মধুময় স্মৃতি।

রূপকথা:

বাংলা ১৩৫২ সালে (১৯৪২ খৃ.) মোহিতলালের কিশোর কাব্য 'রূপকথা' প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তিনি অমিয়া ও অরুণাকে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটির ভূমিকাতে মোহিতলাল বলেন–"....এই কবিতাগুলি ঠিক শিশুপাঠ্য নহে; ইহাদের কাব্যরস কিশোর বা বালক মনের উপযোগী। ভাব ও ভাবনার যেটুকু প্রসার ইহাতে আছে তাহা অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ এবং ভাষা

---

৭৭. ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ মাসে মোহিতলালের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি বের হয়। অদ্ভুত সম্পাদনা কৃতিত্বের সাথে মোহিতলালের উৎকট বাঙালীপ্রীতি এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। দু'বছর পর আর্থিক কারণে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদর্শ -অনুসৃতির প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

৭৮. ১৩৫৯ সালের বৈশাখ মাসে মোহিতলালের সম্পাদনায় 'বঙ্গভারতী' পত্রিকা বের হয়। মাত্র তিন মাস সম্পাদনা করার পর ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে মোহিতলালের মৃত্যু ঘটে। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পক্যে 'আমাদের কথা' অংশে প্রথম সংখ্যায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন–"বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকা বের হয়, ইহার উদ্দেশ্য তাহার বিপরীত বলিলেও হয়।......ইহার দৃষ্টি থাকিবে মুখ্যত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি, বিশ্ব বা ভারতের দিকে নয়।"

ও কুত্রাপী কঠিন নহে; এজন্য কাব্যরসপিপাসু কিশোর ও কিশোরীদের হাতে আমি এই ক্ষুদ্র কবিতা-গুচ্ছ নির্ভয়ে তুলিয়া দিলাম।"[৭৯]

ছন্দ-চতুর্দশী:

মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দশী' গ্রন্থটি ১৩৫৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তিনি কবি দেবেন্দ্রনাথ স্মরণে উৎসর্গ করেন। এ কাব্যের সমস্ত সনেট কবির পূর্বে প্রকাশিত 'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলী' থেকে সংকলিত।

মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা:

'মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা' ৭ আষাঢ় ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'স্বপন-পসারী' থেকে শুরু করে 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল', 'হেমন্ত-গোধূলী'–এ চারখানি কাব্যগ্রন্থেরই বাছাই করা স্বরচিত ও অনূদিত কবিতা সংগ্রহিত হয়েছে বলে ভূমিকাতে বলা হয়েছে। ভাব ও ভঙ্গির প্রচুর বৈচিত্র এ সব কবিতায় বর্তমান। তা সত্বেও মোহিতলালের অসাধারণ কবিসত্তার স্বাক্ষর তাঁর প্রতিটি কবিতার মধ্যেই প্রস্ফুটিত।

মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা:

'মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা' চৈত্র ১৩৭৬ সালে (মার্চ ১৯৭০ খৃ.) প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক ড. ভবতোষ দত্ত। গ্রন্থটির ভূমিকাতে সম্পাদক লিখেছেন–"নিজের কবিতা সম্পর্কে মোহিতলাল বলতেন, তার চারখানি কাব্যই সমান মূল্যবান। তাদের মধ্যে সংকলিত সব কবিতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। তিনি লিখেছেন অনেক কবিতাই, ভবিষ্যত পাঠকের জন্য স্থায়িত্ব দিয়েছেন সামান্যই। মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা বাছাই করবার সময়ে কবির সতর্ক বাণী মনে পড়ে।"

এতক্ষণ মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসত্তা নিয়ে আলোচনা করা হল। মোহিতলাল জীবনের সুচনা কাব্যচর্চা দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবে। রবীন্দ্রযুগের প্রোজ্জ্বল ভাবপরিমণ্ডলে অবস্থান করে কবি হিসেবে তিনি আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী সমালোচনার রীতি প্রবর্তিত করে তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথের প্রদর্শক হয়েছেন। পাশ্চাত্য ভাবধারাকে যেমন তিনি

---

৭৯. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, ভূমিকা, পৃ. ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

জহ্নুমুনির মত নিঃশেষে পান করেছেন তেমনি ভারতীয় ভাবধারা বিশেষ করে বাঙ্গালী মানসকে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের জারক রসে বিশোধিত করে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন ।

মোহিতলালের সমালোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার বিষয়বস্তু নয় । তাই এ বিষয়ে আলোচনা না বাড়িয়ে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল ।

সত্যেন্দ্রনাথের পুস্তকাকারে প্রকাশিত রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

	গ্রন্থের নাম		প্রকাশ কাল
০১.	দেবেন্দ্রমঙ্গল (কবিতা)	...	প্রথম প্রকাশ, ১লা কার্তিক ১৩১৯
০২.	স্বপন-পসারী (কবিতা)	...	প্রথম প্রকাশ, শ্রীপঞ্চমী ১৩২৮
০৩ .	বিস্মরণী (কবিতা)	...	প্রথম প্রকাশ, শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৩
০৪.	স্মর-গরল (কবিতা)	...	প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
০৫.	আধুনিক বাংলা সাহিত্য (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৪৩
০৬.	সাহিত্য কথা (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, জৈষ্ঠ ১৩৪৫
০৭	বঙ্কিম স্মৃতি (সংকলিত ও সম্পাদিত)	...	প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৪৬
০৮.	হেমন্ত-গোধূলী (কবিতা)	...	প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৪৮
০৯.	বিবিধ কথা (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৪৮
১০.	বিচিত্র কথা (প্রবন্ধঃ সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৪৮
১১.	সাহিত্য-বিতান (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৪৯
১২.	কাব্য-মঞ্জুষা (সংকলিত ও সম্পাদিত)	...	প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৪৯
১৩.	বাংলা কবিতার ছন্দ (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৫২
১৪.	বাংলার নবযুগ (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, শ্রীপঞ্চমী ১৩৫২
১৫.	রূপকথা (কিশোর কাব্য)	...	প্রথম প্রকাশ, ১৩৫২ বাংলা
১৬.	জয়তু নেতাজী (নিবন্ধঃ সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩
১৭.	কবি শ্রীমধুসূদন (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, ১৬ কার্তিক ১৩৫৪

Dhaka University Institutional Repository

	গ্রন্থের নাম		প্রকাশ কাল
১৮.	অভয়ের কথা (সংকলিত ও সম্পাদিত)	...	প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৫৪
১৯.	সাহিত্য বিচার (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৫৪
২০.	দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)	...	প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৭ খৃস্ট্রাব্দ
২১.	বঙ্কিম বরণ (নিবন্ধঃ সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, ১৬ কার্তিক ১৩৫৬
২২.	রবি-প্রদক্ষিণ (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৫৬
২৩.	বিদেশী ছোটগল্প সঞ্চয়ন (অনুবাদ)	...	প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৫৭
২৪.	কাব্য-মঞ্জুষা (সংকলিত ও সম্পাদিত)	...	প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৫৭
২৫.	শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ১৩৫৭
২৬.	জীবন-জিজ্ঞাসা (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, ২৮ আষাঢ় ১৩৫৮
২৭.	ছন্দ-চতুর্দশী (কবিতা)	...	প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৮
২৮.	বাংলা প্রবন্ধ ও রচনারীতি (নিবন্ধ)	...	প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৫৮/১৯৫১খৃ.
২৯.	বাংলা ও বাঙ্গালী (প্রবন্ধঃ সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৫৮
৩০.	বিদেশী প্রবন্ধ সঞ্চয়ন (অনুবাদ)	...	প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৫৯
৩১.	কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য (১ম খণ্ড)	...	প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৫৯
৩২.	কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র কাব্য (২য় খণ্ড)	...	প্রথম প্রকাশ, বাংলা ১৩৬০
৩৩.	মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা	...	প্রথম প্রকাশ, ৭ আষাঢ় ১৩৬৩
৩৪.	বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৫৫
৩৫.	কাব্য-চয়নিকা (দেবেন্দ্রনাথ সেন)	...	প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৬
৩৬.	কাব্য-চয়নিকা (অক্ষয়কুমার বড়াল)	...	প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৬
৩৭.	মোহিতলাল কাব্য সম্ভার (গ্রন্থাবলী)	...	প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৭
৩৮.	মোহিতলাল মজুমদারের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৭৬
৩৯.	বীরসন্যাসী বিবেকানন্দ (সমালোচনা)	...	প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৬৯[৮০]

৮০. আজহার উদ্দীন খান রচিত 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল' গ্রন্থের 'গ্রন্থ পরিচয়' অধ্যায় থেকে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

এর বাইরেও মোহিতলালের বহু কবিতা ও প্রবন্ধ অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে এবং কিছু কিছু প্রকাশিত রচনা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় নি। সবগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশিত করলে এখনো স্বাচ্ছন্দে তিন-চারখানি গ্রন্থ বেরুতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

কবি নজরুল ইসলামের জীবনকথা

এক

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়–অণ্ডাল থেকে গৌরাণ্ডি পর্যন্ত ব্রাঞ্চ রেল লাইন চলে গেছে, তারই শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি স্টেশন–চুরুলিয়া। উত্তরে অজয় নদের সুবিস্তীর্ণ বালুচর আর কাশবন ঘেরা সৈকতভুমি। ওপারে –বীরভূম। দক্ষিণে কয়লাখনি আর লৌহ-ইস্পাতের কল-কারখানা-সমাস্তীর্ণ জনবহুল সুবিস্তৃত শিল্পাঞ্চল রাণীগঞ্জ আর আসানসোল। পশ্চিমে স্বাধীন ভারতের অন্যতম কীর্তি দামোদরের দুরন্ত বন্যাপ্রতিরোধ 'মাইথন'। সুবিস্তীর্ণ জলাধার আর জল-বিদ্যুত কেন্দ্র। পূর্বে পলাশরাঙ্গা প্রান্তরের পাশে শাল তাল তমাল আর হরীতকীর বন। এরই মাঝখানে ছোট্ট একটি গ্রাম চুরুলিয়া। এই গ্রামেই রাজা নরোত্তম সিংহের গড় আর পীরপুকুরের পাশে মাটির প্রাচীর ঘেরা ছোট্ট ঘরে[১] ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ মে মোতাবেক বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ[২] মঙ্গলবার বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি ও অনন্যসাধারণ রূপকার, বাংলার গৌরব, অপরূপ সুরস্রষ্টা, অভিনব গীতিকার, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। সূফি জুলফিকারের মতে– নজরুলের জন্মদিন ১১ বৈশাখ।[৩] কবির পূর্বপুরুষগণ পাটনার অধিবাসী ছিলেন এবং সম্রাট শাহ্ আলমের সময় পাটনার হাজীপুর থেকে চুরুলিয়া এসে বসবাস শুরু করেন।[৪] বাদশাহী আমলে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ বিচারকের কাজ করতেন বলে এ নিয়ে তাঁর যথেষ্ট গৌরব ছিল।[৫] তাঁর পিতার নাম কাজী ফকীর আহমদ এবং পিতামহের নাম কাজী আমিনুল্লাহ। কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন এবং মাতামহের নাম মুন্‌শী তোফায়েল আলী। তাঁদের বাড়ীর পূর্ব পাশে ছিল রাজা নরোত্তম সিংহের গড় আর দক্ষিণ পাশে ছিল 'পীর-পুকুর'। কথিত আছে যে, হাজী পাহলোয়ান নামক এক জবরদস্ত ফকির ঐ পুকুরটি খনন করেন বলে তার নাম হয়েছে 'পীর-পুকুর'। পীর-পুকুরের পূর্বপাড়ে পাহলোয়ান শায়ের মাজার এবং পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ। কবির পিতা-পিতামহ আজীবন ঐ মাজার-শরীফ ও মসজিদের তত্ত্বাবধান করে গেছেন।

---

১. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজি নজরুল ইসলাম (কলকাতা: সঙস্কৃতি পরিষদ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, ১৯৫৭), পৃষ্ঠা-১
২. আ.ফ.ম ইসহাক, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা-১
৩. গোলাম মঈনুদ্দীন, কবি ফররুখ: ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা-৩-৪
৪. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ (ঢাকা:নজরুল ইন্সিটিউট, কবি ভবন,১৯৮৯),পৃষ্ঠা-২০
৫. কবি ফররুখ: ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন , পৃষ্ঠা-৪

Dhaka University Institutional Repository

দুই

নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদের ঔরসে সাত ছেলে আর দুই মেয়ে জন্মিলেও জ্যৈষ্ঠ পুত্র কাজী সাহেবজানের পর চার ছেলে মারা যায়। অতঃপর নজরুলের জন্ম হলে কবির পিতা তাঁর নাম রাখেন দুখু 'মিয়া'। পাড়া পড়শীরাও তাঁকে এনামে ডাকতো। অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁর বাল্যজীবন কেটেছিল। অন্তিমকালেও তাঁর অবিচ্ছিন্ন কতগুলো দুঃখ কষ্টের ফিরিস্তি খুঁজে পাওয়া যায়। মূলতঃ 'দুখু মিয়া' নামটি তাঁর জীবনের সাথে স্বার্থকভাবে মিশে গিয়েছিল।[৬]

তিন

১৯০৮ খৃ./ ১৩১৪ সালের ৭ চৈত্র নজরুলের আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। নজরুল তখন গ্রামের মক্তবের ছাত্র। পিতৃ বিয়োগের ফলে অভাবের সংসারে নজরুলের লেখাপড়ায় প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটে। ১৯০৯ খৃ. / ১৩১৬ বাং. ১০ বৎসর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে প্রাইমারী পরীক্ষায় পাশ করেন। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সে বয়সেই তাঁকে জীবিকা নির্বাহের তাকিদে উক্ত মক্তবে[৭] শিক্ষকতার দায়িত্ব নিতে হয়। সে-সময় আশে-পাশের পল্লীতে মোল্লাগিরি করে দু'পয়সা রোজগার আর মাঝে মাঝে মাজার শরীফের খাদেমগিরি ও মসজিদের ইমামতিও করতেন। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক তথা মক্তব ও মাদ্রাসার সংস্পর্শই নজরুলকে ধর্মপ্রাণ হতে সহায়তা করেছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রথম বয়সে রচিত 'সালেক' গল্প ও 'মুক্তি' কবিতা এবং শেষ দিকের রচনাসমুহে তাঁর সে আধ্যাতিকতা বাল্যের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।[৮]

চুরুলিয়া গ্রামের মক্তবের শিক্ষক নজরুলের পিতৃব্য (বাবার চাচাত ভাই) মৌলভী কাজী বজলে করীম ছিলেন ফার্সী ভাষার সুপণ্ডিত। তিনি কাব্যও চর্চা করতেন। তার কাছেই নজরুল আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষালাভ করেন এবং তারই অনুপ্রেরণায় নজরুল বাল্যবয়সে আরবী-ফার্সী-উর্দু মিশ্রিত 'মুসলমানী বাংলায়' পদ্য রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হন। সেকালে ঐ অঞ্চলে 'লেটো নাচ' নামক এক ধরনের যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিল। কবির পিতৃব্য কাজী বজলে করিম এবং কাজী ফজলে আহমদ ছিলেন স্থানীয় লেটো দলের ওস্তাদ। মাত্র ১২ বছর বয়সেই নজরুল লেটোগানের দলে যোগ দেন এবং লেটোদলের জন্য 'শকুনিবধ',

---

৬. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃষ্ঠা-২০-২১

৭. ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চুরুলিয়া নজরুল একাডেমী উক্ত মক্তবটিকে নজরুল বিদ্যাপিঠ নামে একটি বিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রায় অর্ধ ডজন প্রকল্পের মধ্যে নজরুল বিদ্যাপীঠ প্রকল্পটি অন্যতম প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে চুরুলিয়ায় একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও একটি কলেজ আছে। দ্রঃ, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ সম্পাদিত কাজীর সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল (ঢাকা:নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৩৯৭),পৃষ্ঠা-৯

Dhaka University Institutional Repository

'মেঘনাদবধ', 'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশাহ', 'চাষার সঙ' প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন[৯] এবং বহু মারফতী, পাঁচালী ও কবিগান রচনা করে 'ছোট ওস্তাদজী' খ্যাতি অর্জন করেন।[১০] তাঁর তৎকালীন রচনায় উর্দু-ফার্সী মিশ্রিত ঘরোয়া বাংলা ভাষার প্রাচুর্য দেখলে মনে হয় যেন তাঁর মুসলমানী পুঁথি ও মারফতী গানের সংস্পর্শ লাভের সুযোগ হয়েছিল। তাঁর সে সময়ের 'চাষীর গীত' নামক কবিতায় ইসলামী আহকাম ও ঈমানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।[১১] লেটোদলের অভিজ্ঞতা বালক কবিকে পূর্ণ কবিত্বের যাত্রাপথে সহায়তা করেছিল।

চার

লেটোগানের দল ত্যাগ করে নজরুল ১৩১৮ বাং. / ১৯১১ খৃ. বর্ধমানের মাথরুন নবীন চন্দ্র ইন্সটিটিউশনে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। নজরুলের নম্রপ্রকৃতি ও সম্ভ্রমবোধ সহজেই শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়েই জীবিকার তাকিদে নজরুলকে স্কুল ত্যাগ করতে হল।[১২] নজরুলের মাঝে ছিল অর্থাভাবের তীব্র যন্ত্রণা। একদিকে তাঁর বেসামাল উচ্ছৃংখল জীবন অন্যদিকে পারিবারিক অভাব অনটন কবি-মাতাকেও অসহ্য করে তোল্ল। একদিন ক্ষণিক উত্তেজনা বশতঃ মা তাঁকে বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতে বললেন। অভিমানী বালক শুন্যহাতে চড়ে বসলেন রানীগঞ্জের রেলগাড়ীতে। অবশেষে বিনা টিকেটে ভ্রমণের দায়ে ধরা পড়লেন জনৈক রেলগার্ডের হাতে। এ শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্য তাঁকে বিনা বেতনে দু'মাস বাবুর্চী হিসেবে চাকুরীও করতে হয়েছে। একদিন টেবিলের উপর একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি রেখে বালক নজরুল অজানার পথে বেরিয়ে পড়েন। অবশেষে ঘুরে ঘুরে আসানসোলের এক রুটির দোকানে[১৩] মাসিক ১ টাকা বেতনে চাকুরী নেন। অধিক রাত পর্যন্ত দোকানে কাজ করার পর নিকটবর্তী থানার প্রশস্ত বারান্দায় ঘুমাতেন। নীরব রাতে মায়ের কথা আর গাঁয়ের স্মৃতি নজরুলকে পেয়ে বসতো। তিনি মধুর সুরে প্রাণ ভরে গান করতেন। রাতের নীরবতা ভেদ করে তাঁর এ হৃদয় নিংড়ানো গান দূরে বহুদূরে ছড়িয়ে যেত।

---

৮. Hunter W.W, Indian Musalman (Lahor,1964), page-120

৯. আবদুর কাদির, নজরুল প্রতিবার স্বরূপ (ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট, ১৯৮৯), পৃ.৯১, আঃ মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ.১৮৪

১০. গোলাম মঈনুদ্দীন, কবি ফররুখ: ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন, পৃষ্ঠা-৫, আঃ হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাঃ বিঃ, ১৩৮১ বাং,পৃ.৪

১১. অসমাপ্ত, কবিতা দেখে তোলতে হবে

১২. আবদুল কাদির, নজরুল-জীবনের এক অধ্যায়, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ সম্পাদিত কাজির সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল (ঢাকা:নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৩৯৭বাং), পৃষ্ঠা-৩২

১৩. কবি পরিবারের লোকদের মতে রুটির দোকানটির নাম এম. এ বাক্স এণ্ড সান্স। মালিকের বাড়ী হুগলী। (দ্রঃ মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ সম্পাদিত কাজির সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, পৃষ্ঠা-১০

Dhaka University Institutional Repository

আসানসোল থানার জনৈক দারোগা কাজী রফিজ উল্লাহ্‌ একদিন অফিসের কাজ সেরে অধিক রাতে বাসায় ফিরছিলেন। নজরুলের গান তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধের মত আকর্ষণ করলো। তিনি রোজ এসে তাঁর গান শুনে অধিক রাতে বাড়ী ফিরতেন। দারোগা-পত্নী তাকে প্রত্যহ দেরী করে বাড়ী ফেরার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে এ অদ্ভুত ছেলেটির কথা ব্যক্ত করেন। নিঃসন্তান মহিলার প্রাণে মাতৃস্নেহের উদয় হল। তিনি নজরুলকে বাড়ীতে ডেকে আনেন এবং ছেলেটির লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেন।

পাঁচ

কাজী রফিজউল্লার বাড়ি ছিল ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর সিমলা গ্রামে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে দারোগা সাহেব নজরুলকে নিয়ে স্বগ্রাম কাজীর সিমলায় চলে আসেন এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ীর যুবক কাজী ইসরাইলের সাথে নজরুলকে ময়মনসিংহ শহরে সিটি স্কুলে পাঠিয়ে দেন।[১৪] জায়গীরের অভাবে নজরুলকে সিটি স্কুলে ভর্তি করানো গেল না। অতঃপর পাঁচ মাইল দূরবর্তী দরিরামপুর হাইস্কুলে[১৫] তাঁকে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। ত্রিশালের অধিকাংশ বৃদ্ধ লোকের মতে নজরুল ইসলাম দরিরামপুরে ৭ম শ্রেণীর মাঝামাঝিতে এসে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ৮ম শ্রেণীর শেষের দিকে সবার অলক্ষে কোথায় যেন চলে যান। মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে নজরুল এখানে 'ফ্রি ষ্টুডেন্টশীপ' ও পেয়েছিলেন। ক্লাশে তাঁকে প্রায়ই অন্য মনস্ক দেখা যেত। ১৯১৪ খৃ. সদ্য বি.এ পাশ করা শ্রী মহিমচন্দ্র খাননবিশ দরিরামপুর হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তিনি নজরুলের ক্লাশে ইংরেজী ট্রান্সলেশন শিক্ষা দিতেন। নজরুলকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে প্রথমে সে হক্‌চকিয়ে উঠতেন। পুনরায় বলা হলে তিনি ঠিকই সঠিক জওয়াব দিতেন। ক্লাশে অন্য মনস্ক হলেও স্কুলের নাটকে,বিতর্কে, আবৃতিতে ও রচনা প্রতিযোগিতায় বরাবরই অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার ও প্রশংসা পেতেন। এসব কারণেও শিক্ষকরা নজরুল ইসলামকে খুব ভাল বাসতো। বিতর্কে ও রচনায় নজরুল প্রায়ই এমন সব অস্বাভাবিক শব্দ ব্যবহার করতেন যে, ছাত্র শিক্ষক সকলেই সে ভাল বাংলা জানেন বলে বলাবলি করতো। নজরুলের আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ রীতি সংস্কৃত পণ্ডিত মশাই পছন্দ করতেন না বলে একদিন ক্লাশে কিছুটা তর্কও হয়েছিল।[১৬]

---

১৪. ডক্টর আলী নওয়াজ, ময়মনষিংহে বালক নজরুল, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজুল্লাহ সম্পাদিত কাজির সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, পৃষ্ঠা-১২

১৫. নজরুল যখন ঐ স্কুলে ভর্তি হন তার কিছুদিন পূর্বেই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৩ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অল্পকালের মধ্যেই বেশ জমে উঠেছিল। নজরুলের ছাত্রাবস্থায় স্কুরের ছাত্র সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশত। স্কুলটি আজো বিদ্যমান। তবে তা এখন 'নজরুল একাডেমী' নামে পরিচিত।(দ্রঃমোহাম্মদ মাহ্‌ফুজুল্লাহ সম্পাদিত কাজির সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, পৃষ্ঠা-১৬

১৬. ডক্টর আলী নওয়াজ, ময়মনষিংহে বালক নজরুল, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজুল্লাহ সম্পাদিত কাজির সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, পৃষ্ঠা-১৮

কাজীর শিমলা থেকে দরিরামপুর স্কুল প্রায় পাঁচ মাইলের পথ; সেই দূর পথ পায়ে হেটে নজরুল প্রত্যহ স্কুলে যেতেন। সেই প্রবাসে পলাশ-শিমুল শোভিত পথের সবুজ সৌন্দর্য কিশোর কবির মনে নিবিড় দোলা দিয়ে যেত। স্কুলের অদূরে ঠুনি ভাঙ্গা কাঠের পুল। তার পাশেই বটগাছের ডালে বসে নজরুল আপন মনে একাকী বাঁশী বাজাতেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অদম্য কিন্তু স্কুলের বিধিবদ্ধ নিয়মকে তিনি মেনে নিতে পারেননি বলেই বার বার হয়েছেন পলাতক। ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এসে নজরুল ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল-রাজ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সে বছরই হাফিজ নুরুন্নবী নামক জনৈক ভদ্রলোক সে স্কুলের ফার্সী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসেন। নুরুন্নবী একজন উর্দু সাহিত্যিক ও ছিলেন। তারই আগ্রহে নজরুল সংস্কৃত ছেড়ে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফার্সী নেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে ফার্সী শিখেন। এ সময় নজরুল রায় সাহেব এম চ্যাটার্জির ফুল বাগানের পাশে মাটির দেয়াল ঘেরা একটি ছোট্ট ঘরে বাস করতেন। ক্লাশের First boy হওয়ার কারণে তাঁর স্কুলের বেতন, থাকা-খাওয়া সবই ছিল ফ্রি, তাছাড়াও রাজবাড়ী থেকে মাসিক ৭ টাকা বৃত্তি পেতেন। এ সাত টাকায় তাঁর চা-নাস্তা কাপড়-চোপড় হয়েও মাসে যা কিছু বাঁচতো তা দিয়ে ছোট ভাই কাজী আলী হোসেনের পড়ার খরচ চালাতেন।[১৭]

ছয়

রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে এসেই নজরুল অনেকটা স্থির হলেন; তাঁর বিদ্যানুশীলন ও কাব্যচর্চা দু'টোই চলতে লাগ্ল সমান তালে। এ সময় রায়সাহেবের দৌহিত্র স্বনামধন্য কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। সমবয়সী দু'জন একই স্কুলে একই ক্লাশে পড়তেন। নজরুলের উচ্ছল-প্রাণতা, উন্নত রুচী ও সহিঞ্চু স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে শৈলজানন্দ অচিরেই তাঁর একনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠলেন। সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে এ বন্ধুত্ব আরো গাঁঢ় হতে লাগল।

ছাত্র জীবনেই নজরুল সর্ব প্রথম 'রাজার গড়' ও 'রাণীর গড়' শীর্ষক দু'টি কবিতা লিখেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন খ্যাত কাব্য 'করুণ গাথা' 'বেহাগ-বেদন' ও 'চড়ুই পাখীর ছানা' শীর্ষক কবিতা সে সময়েই রচনা করেন।[১৮] সেই সুকুমার বয়সেই নজরুল বাংলার এই তিনটি মূল ছন্দ আয়ত্ত করে ফেলেছেন এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

---

১৭. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃষ্ঠা-২৪

Dhaka University Institutional Repository

সাত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বছরে ১৯১৭ খৃ. দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন ষান্মাসিক পরীক্ষার প্রাক্কালে ইংরেজ ও জার্মানদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে নজরুল বন্ধু শৈলজানন্দসহ ৪৯ বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করেন। বার্ষিক পরীক্ষার পরই তাদের যাত্রা করতে হল কলকাতায়। রিক্রুটিংকালে শৈলজানন্দের যুদ্ধ গমনে বাধা পড়লে নজরুল এতে মোটেও বিচলিত বা নিরুৎসাহিত হলেন না। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে লাহোর হয়ে সোজা চলে গেলেন নওশেরওঁয়ায়। সেখানে তিন মাস প্রশিক্ষণ লাভের পর করাচী বন্দরের পূর্ব-উপকণ্ঠে গানজা লাইনে নিজ কোম্পানীতে সৈন্যদের ব্যারাকে চলে যান। সৈন্য দলে প্রভূত কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই নজরুল 'ল্যান্সনায়ক', 'কোয়ার্টার মাষ্টার', ও 'হাবিলদার' পদসমুহে উন্নীত হন। ১৯১৭ খৃ. থেকে ১৯১৯ খৃ. পর্যন্ত এ তিন বছর নজরুল সেনাবাহিনীতে কাটান। এ সময় একদিকে যেমন তাঁর বিদ্রোহী সত্তার উন্মেষ ঘটে ; অপরদিকে তাঁর সাহিত্যিক জীবনেরও সূচনা হয়। সেনানিবাসের সামরিক জীবন নজরুলকে স্থিরভাবে সাহিত্য সাধনা ও কাব্য চর্চার অবারিত সুযোগ এনে দেয়। হাবিলদার নজরুলের লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। অসামান্য প্রতিভা আর শিল্প সমৃদ্ধ সাহিত্য-গুণে নজরুল আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য চর্চার ধারা ছাত্র জীবনের মত সৈনিক জীবনেও অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলতে লাগল। তিনি বাঙালী পল্টনে মুসলমান সৈনিকদের তদারকীর জন্য নিয়োজিত মৌলবী সাহেবের কাছে 'দিওয়ানে হাফিজ' ও 'মসনভী-রুমী' নামক বিখ্যাত ফার্সী কাব্য গ্রন্থাদি পাঠ করে এক মহৎ জীবনের সন্ধান লাভ করেন।

আট

করাচী সেনানিবাস থেকে প্রেরিত হাবিলদার নজরুল ইসলামের লেখা সর্ব প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬-এর জৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়।[১৯] এরপর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'মুক্তি' নামক প্রথম কবিতাটি। এ ছাড়াও নজরুলের স্বামীহারা (গল্প-১৩২৬ বাং.), কবিতা সমাধি (১৩২৬ বাং.), তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা (প্রবন্ধ-১৩২৬ বাং.), হেনা (গল্প-১৩২৬ বাং.), আশায় (১৩২৬ বাং.), ব্যথার দান (গল্প-১৩২৬ বাং.), মেহের নিগার (গল্প-১৩২৬ বাং.), ঘুমের ঘোরে (গল্প-১৩২৬ বাং.) নামক বিভিন্ন গল্প ও কবিতা সে সময়ে এ-দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২০] লেখাগুলো সে সময় বেশী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি,

---

১৮. Nahru jawahar lal, The discovery of India (Calcutta, 1946), page-352
১৯. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম (ঢাকা:নজরুল ইনস্টিটিউট,১৯৮৮), পৃ.১৭
২০. ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা:ষ্টুডেন্ট ওয়েজ,১৯৬৮), খ. ৩, সং. ১, পৃ. ৪৪৭

Dhaka University Institutional Repository

কেননা সে সময় এ সব পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা খুব বেশী ছিল না; কিন্তু লেখাগুলো যাদের চোখে পড়েছিল তাঁদের বেশ একটু চমক লেগেছিল।[২১] করাচীতে থাকাকালেই তিনি 'দিওয়ানে হাফিজের' মূল ছন্দের অনুকরণে আটটি গজল বাংলায় অনুবাদ করেন। পরিণত বয়সে এসে নজরুল 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম'-এর মূল ফার্সী থেকে বাংলায় অনূবাদ করেন। যদিও নজরুল পাঠক মহলে প্রথমে প্রধানতঃ 'গল্প লেখক' রূপেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

নয়

১৯২০ সালের জানুয়ারির দিকে কবি নজরুল কয়েক দিনের ছুটি পেয়ে বাড়ি এসে কলকাতার ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের বাড়ির দোতলায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে আসেন এবং সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশকের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করেন যে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে গেলে তিনি কলকাতায় ঐ অফিসে এসে উঠবেন। সে মোতাবেক মার্চ, ১৯২০ সালে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে দেয়া হলে নজরুল কলকাতাস্থ বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে উঠেন। পরবর্তি দু'তিন মাসের মধ্যে কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ধারাবাহিকবাবে নজরুলের 'বাঁধন হারা' উপন্যাস এবং মে, ১৯২০ সংখ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'শাতিল আরব' প্রকাশিত হয়। বাং. ১৩২৭ সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র এক বছরের মধ্যেই নজরুলের সাহিত্য সাধনা ও কবি কীর্তির পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠে। তিনি কবিতা, গল্প, গান, উপন্যাস, ও অনুবাদ কবিতা সৃষ্টিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন। এ সময় কবির কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'বোধন', 'শাতিল আরব', 'বাদল প্রাতের শরাব', 'আগমনী', 'খেয়াপারের তরণী', 'অবেলায়', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খৃ. মরহুম এ. কে. ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা থেকে সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়; যার মূখ্য সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয় নজরুলের উপর। 'মুহাজিরীন' হত্যার জন্য দায়ী কে? শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে জানুয়ারি ১৯২১ সালে উক্ত পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

দশ

১৯২১ সালের মার্চ-এপ্রিলের দিকে নজরুল তাঁর কলকাতার বন্ধুদের না জানিয়ে অকস্মাৎ 'ভিশ্তি বাদশাহ্' 'বাবর' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা মরহুম আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামে চলে আসেন। সে সময় তিনি তাঁর 'ছায়ানট' কাব্যের 'পাপড়ি খোলা', 'অ-বেলায়', 'হার মানা হার', 'মানস-বধূ', 'বিধুয়া', 'অনাদৃত', বিদায়-বেলায়', 'হারা-মণি', 'বেদনা অভিমান', 'পথিক প্রিয়া প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। বাং. ১৩২৮ সনের ৩রা আষাঢ় আলী আকবর খানের ভাগিনী নার্গিস আরা খানমের

---

২১ নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশিত কবি নজরুল (কলকাতা:ইণ্ডিয়ানা, ১৯৫৭), পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

সাথে নজরুলের প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় কিন্তু বিয়ের আসরে কাবিনের শর্ত নিয়ে মনমালিন্যের দরুণ বিয়ের রাতেই নজরুল শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করে কুমিল্লার কান্দির পাড় ইন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের বাসায় চলে যান। ১৯২১ সালের ২১ জুন তারিখে নজরুল কান্দিরপাড় থেকে এক পত্রে আলী আকবর খানকে লেখেনঃ "বাকী উৎসবের জন্য যত শীগ্‌গির পারি বন্দোবস্ত করব।" কিন্তু বাকি কাজটুকু আর সম্পন্ন হয়নি। কান্দিরপাড় অবস্থানকালে তিনি লেখেন তাঁর বহুল আলোচিত কবিতা 'বিজয়িনী'। এটি তাঁর পত্নী মিসেস প্রমিলা নজরুলকে উদ্দেশ্য করে লেখা। ১৯২১ সালের ৮ জুলাই নজরুল মোজাফফর আহমেদের সাথে কলকাতায় ফিরে যান এবং জুলাই-নভেম্বরের মধ্যে 'বিষের-বাঁশী', 'আনোয়ার পাশা', 'কামাল পাশা' 'রণভেরী' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। এরপর বাং. ১৩২৯ সনের বৈশাখে রচনা করেন 'প্রলয়োল্লাস', জৈষ্ঠে 'শায়ক-বেঁধা পাখি', আষাঢ়ে স্তব্ধ বাদল' ইত্যাদি। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি তাঁর সর্ব শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা করেন, যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা কার্তিক (১৩২৮ বাং.), সাপ্তাহিক 'বিজলী' (২২ পৌষ ১৩২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালের মে-জুন নাগাদ নজরুল স্বল্পকালের জন্য মাওলানা আকরাম খাঁর দৈনিক 'সেবক' পত্রিকায় কাজ করেন। ইংরেজী ১৯২২ সালে নজরুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়। এরপর বাং. ১৩২৯ সনের ৩রা কার্তিক মোতাবেক ১৯২২ সালের নভেম্বরে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' প্রকাশিত হয়। অগ্নি-বীণার 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'ধুমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণভেরী', 'শাত-ইল আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' প্রভৃতি কবিতাগুলো ১৯২০ খৃস্টাব্দের আযাদী ও খেলাফত আন্দোলনের আবহাওয়ায় লেখা। সারা দেশে তখন জনজাগরণের জোর হাওয়া বইছিল। সেই দেশব্যাপী গণ-বিক্ষোভের দিনে নজরুল হয়ে উঠলেন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ চারণ-কবি। সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে তিনি গাইলেন মুক্ত জীবনের গান।

এগার

১৯২২ খৃ. নজরুলের অপর বিপ্লবী উদ্দম হল ৩২ নং কলেজ স্ট্রিট থেকে অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধুমকেতু' প্রকাশ। বিশের দশকে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর সশস্ত্র বিপ্লববাদের পুনরাবির্ভাবে 'ধুমকেতু' পত্রিকার যথেষ্ট অবদান ছিল। এক কথায় পত্রিকাটি হয়ে উঠল সশস্ত্র বিপ্লবীদের মুখপত্র। ১৯২২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর-'ধুমকেতু'র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি। উক্ত কবিতাটি এবং একটি মেয়ের রচনা 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' প্রকাশের অপরাধে 'ধুমকেতু'র সে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্তসহ নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয় এবং ১৩ নভেম্বর ১৯২২ সালে তাঁকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নেয়া হয়। বিচারাধীন বন্দি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারী নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে যে জবানবন্দি প্রদান করেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা 'রাজবন্দির জবানবন্দি' নামে সাহিত্য মর্যাদা পেয়ে আসছে। ১৯২৩ সালের ৮ জানুয়ারি বিচারের রায়ে নজরুল এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। জেলে থাকাকালীন নজরুলের 'শিকল পরা গান', 'সুপার বন্ধনা', 'ইন্দুপ্রয়াণ', 'পউস', 'পথহারা', 'দোদুল দুল', 'অবেলার ডাক', 'সমর্পন', 'ব্যথার দান', 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', 'অভিশাপ', 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'আশান্বিতা', দোলন চাঁপা' প্রভৃতি কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হুগলী জেলে থাকাকালীন রাজবন্ধিদের প্রতি ইংরেজ জেল-সুপারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে নজরুল ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট পালন করেন। সে সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন।[২২] কারাভোগের পর ১৯২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেই তিনি সোজা চলে আসেন কুমিল্লায়।

বার

'অগ্নি-বীণা'র বিদ্রোহী কবি দেশবাসীকে বিদ্রোহের উত্তাপে উজ্জিবীত করার জন্য ইংরেজী ১৯২৩-২৪ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রতিটি জেলা, শহর ও পল্লী অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তাঁর আবৃত্তি, সংগীতে প্রতিটি সভা মুখরিত হয়ে উঠে। "বলবীর বল উন্নত মম শির", "শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল", 'কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট" প্রভৃতি আবৃত্তি ও গীত, বক্তৃতায় দেশবাসী যেন তাদের বহু বছরের সুখ নিদ্রা হতে জেগে উঠলো এবং সকলেই পরাধীনতার শৃংখল মোচনের কথা নতুন করে ভাবতে শুরু করলো।[২৩]

১৯২৩ সালের অক্টোবরে (বাং. ১৩৩০ সালের আশ্বিনে) নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতির কবিতার প্রথম সংকলন 'দোলন-চাঁপা' প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের ১১ ফাল্গুন মেদিনীপুর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আমন্ত্রণে নজরুল মেদিনীপুর যান; তথায় ১২ ও ১৩ ফাল্গুন নজরুলকে সাহিত্য পরিষদ ও মহিলাদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সেখান থেকে তিনি 'সমস্তিপুর' যান। সমস্তিপুরের ট্রেন-পথে নজরুল রচনা করেন 'রৌদ্র-দগ্ধের গান'। বিহারের 'সমস্তিপুরে' বাংলা ১৩৩১ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেক ১৯২৪ সালের ২৫ এপ্রিল শুক্রবার বাদ জুমা' শ্রীযুক্তা গিরিবালার দেবীর কন্যা আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নজরুল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে

---

২২. গোলাম মঈনুদ্দীন, পুর্বোক্ত, পৃ-৮
২৩. অশোক কুমার মিত্র, নজরুল প্রতিভা পরিচিতি (ঢাকা: বাণী ভবন, ১৯৬৯), পৃষ্ঠা-১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

হুগলির মহিয়সী নারী মিসেস এম রহমান বিবাহপুর্বে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় কলকাতার ৬নং হাজী লেনের বাড়িতে।

তের

বিয়ের পর নজরুল সপরিবারে হুগলীতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এ সময় তাঁকে নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। এত দুঃখ কষ্টেও তাঁর কাব্যচর্চা ব্যাহত হল না। তিনি রচনা করলেন 'সুব্হ-উম্মেদ', 'মুক্তিকাম', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'আশুপ্রয়াণ গীতি', 'অশ্বিনীকুমার', 'সব্যসাচী', 'ঝড়', 'ফাল্গুনী', 'বিদায় স্মরণে', 'গোকুল নাগ', 'চরকার গান', 'কৃষাণের গান', 'নকীব', 'সাম্য' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাসমূহ। ১৯২৪ সালে ১০ আগষ্ট নজরুলের গান ও কবিতা সংকলন 'বিষের-বাঁশী' এবং একই মাসে 'ভাঙ্গার গান' প্রকাশিত হয়। দু'টি গ্রন্থই ঐ বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অকাল মৃত্যুতে (১৬ জুন, ১৯২৫) কবি তাঁর স্মরণে 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

এ সময় নজরুলকে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও অনুষ্ঠানে যোগদান করে স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান গেয়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়। ১৯২৫ খৃ. শেষ দিকে নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি কুমিল্লা, মেদিনীপুর, হুগলী, ফরিদপুর, বাঁকুড়াসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য হওয়া ছাড়াও শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের জন্য 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল' গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর নজরুলের সম্পাদনায় স্বরাজ পার্টির মুখপত্র 'লাঙ্গল' পত্রিকা বের হলে প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় 'কৃষাণের গান'। মাত্র পাঁচ মাস পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

চৌদ্দ

১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারী নজরুল হুগলী ছেড়ে সপরিবারে কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস শুরু করেন। সে বছর ফেব্রুয়ারিতে কৃষ্ণনগরে লেবার-স্বরাজ পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল তাঁর উদ্বোধন করেন "শ্রমিকের গান"– 'ধ্বংশ পথের যাত্রী-দল' গানটি গেয়ে। ২ এপ্রিল ১৯২৬ শুক্রবার থেকে কলকাতার রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে নজরুল তাঁর 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গানটি লিখেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গানটি প্রথম গাওয়া হয় কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে। ১৯২৬ সালের জুনের শেষ দিকে নজরুল মাদারীপুরে ধীবর-সম্মেলনে যোগ দিতে শ্রীহেমন্ত কুমার সরকারকে সাথে নিয়ে ঢাকা আসেন এবং ২৭ জুন রবিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম হলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' এক বৈঠকে ভাষণ দেন। এ বৈঠকে তিনি 'কাণ্ডারী হুশিয়ার', 'আমরা ছাত্রদল', 'কৃষাণের গান' প্রভৃতি গণজাগরণমূলক গান গেয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দেন।

২ জুলাই ১৯২৬-এ নারায়ণগঞ্জে অবস্থানকালে নজরুল তাঁর 'অভিযান' কবিতাটি রচনা করেন। ২৭ জুলাই চট্টগাম ভ্রমণকালে লিখেন 'সিন্ধু-হিন্দোল' ও 'অনামিকা' কবিতাদু'টি। ২৮ জুলাই লিখেন 'গোপন প্রিয়া'। তাঁর 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই সে সময়ের লেখা। ১৯২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নজরুলের দ্বিতীয় ছেলে বুলবুলের জন্ম হয়। তার নামানুসারে নজরুলের প্রথম গজল-গানের বইয়ের নামকরণ করা হয় 'বুলবুল'। ১২ আগষ্ট, ১৯২৬ সালে মুজাফফর সাহেবের সম্পাদনায় 'লাঙ্গল' 'গণবাণী'তে রূপান্তরিত হলে উহাতে নজরুলের বহু গান, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদের সদস্য পদের জন্য নজরুল পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।[২৪] তাঁর মতো নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষে ব্যয়বহুল নির্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাজিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এ উপলক্ষ্যে পূর্ববাংলায়, বিশেষত ঢাকা বিভাগে ব্যাপকভাবে সফর করেন।

১৯২৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ দিকে নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী', 'কামাল পাশা', 'মোহররম' প্রভৃতি কবিতা আবৃত্তি করেন। সেদিন তাঁর ভাষণ ও আবৃত্তি শুনে বিপুল সংখ্যক শ্রোতা 'মারহাবা' 'মারহাবা' ধ্বনিতে এবং ঘন ঘন করতালিতে সম্মেলনস্থল মুখরিত করে তোলে। বাং. ১৩৩৪ সনের আষাঢ় মাসে কলকাতা থেকে মোহাম্মদ আফজালুল হক সম্পাদিত মাসিক 'নওরোজ' পত্রিকায় নজরুলের 'কুহেলিকা'র প্রথমাংশ এবং 'ঝিলিমিলি' ও 'সেতুবন্ধ' নাটিকা দু'টি প্রকাশিত হয়। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা বেরুবার পর 'নওরোজ' বন্ধ হয়ে গেলে 'কুহেলিকা'র বাকী অংশ ধারাবাহিক ভাবে 'সাপ্তাহিক সওগাতে' ছাপা হয়। তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি 'সওগাতে' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ছাপা শুরু হয়ে ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় শেষ হয়। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নজরুল 'মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের' দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তাঁর সুবিখ্যাত 'চল চল চল, উর্ধ গগনে বাজে মাদল' গানটি গেয়ে।[২৫] গানটি তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তৎকালীন হাউজ-টিউটর মরহুম অধ্যাপক আবুল হোসেন সাহেবের বাসায় বসে

২৪. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম (ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃষ্ঠা-১০
২৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেছিলেন ।[২৬] সে সময় শ্রী সুরেশচন্দ্র মৈত্র ও অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও সখ্যতা গড়ে উঠে।

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে সুরমা ভ্যালী ছাত্র সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে সিলেট যান। এ বছরই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে।

১৯২৯ খৃ. গোড়ার দিকে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতা ফিরে যান। ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে কবিকে কলকাতা এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এ উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনন্য ভূমিকার জন্য কবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।

১৯৩০ সালে ৭ অথবা ৮ মে (বৈশাখ, ১৩৩৭) নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বুলবুলের রোগশয্যা পাশে বসে নজরুল মূল ফার্সী থেকে রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের কাব্যানুবাদ করেন। এ সময় তাঁর 'প্রলয় শিখা' ও 'চন্দ্র বিন্দু' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে বৃটিশ সরকার কর্তৃক তা বাজেয়াপ্ত হয়। বিচারে কবির ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ সালের ৪ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত অনুসারে নজরুল মুক্তিলাভ করেন।[২৭]

১৯৩১ খৃস্টাব্দে নজরুল সিনেমা ও থিয়েটারের জগতে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি বিষ্ণুর ভূমিকায় অভিনয়সহ 'ধুপছায়া' চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। ১৯৩১-এর জুন মাসে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহানআরা চৌধুরীর সাথে দার্জিলিং ভ্রমণে যান, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলের সাক্ষাৎ হয়। ১৯ ডিসেম্বর কলকাতার রঙ্গমঞ্চে নজরুলের 'আলেয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে নজরুল স্বদেশী 'মেগাফোন কোম্পানীতে যোগদান করেন। নভেম্বরে (৫ ও ৬ তারিখে) সিরাজগঞ্জ বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩২ সালে তিনি কলকাতার 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে'র পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

১৯৩৩ খৃ. নজরুল 'আমপারার কাব্যানুবাদ' করেন। অতঃপর তাঁর 'সুরলিপি', 'সুরমুকুর', 'গানের মালা', 'গীতি শতদল' প্রভৃতি গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ খৃ. তাঁর 'ধ্রুব' ছায়াছবি মুক্তি লাভ করে।

১৯৩৬ খৃ. নজরুল ফরিদপুর জেলা মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

---

২৬. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃষ্ঠা-১৮
২৭. ড. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা: মুক্তধারা, ফরাসগঞ্জ, ১৯৮৩), ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৫-৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ খৃ. নজরুল কলকাতার ওয়ালেছ মোল্লা ম্যানসনের ঈদ প্রীতি সম্মেলনে 'সাহিত্যে জীবন ও যৌবন' শীর্ষক প্রবন্ধের উপর দীর্ঘ ভাষণ দেন।

১৯৩৮ খৃ. কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ', 'মালিহা' ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ২১ জুন, ১৯৩৮-এ কবির অভিনিত 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। গান ও সুরারোপ করেন কবি নিজেই। অতঃপর 'বিদ্যাপতি' চলচ্চিত্রের জন্য গান ও কাহিনী রচনা করেন। এ বছরেই তিনি 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার কার্যালয়ে জন সাহিত্য সংসদের উদ্বোধন করেন।

১৯৩৯ খৃ. 'সাপুড়ে' চলচ্চিত্রের কাহিনী ও গান রচনা করেন। এ বছরেই কবি-পত্নী প্রমিলা দেবী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বাঁচার আশা ছিল না। কোনক্রমে বেঁচে গেলেও সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান।

১৯৪০ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র ঈদ-প্রীতি সম্মেলনে কবি নজরুল গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ১৯৪০ সালের অক্টোবরে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের দলের মুখপত্ররূপে নব পর্যায়ে দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হলে আবারো নজরুলকে এর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এ বছরের শেষদিকে কবি নজরুল শেষবারের মত ঢাকায় আসেন এবং বনগ্রাম পাকিস্তান ক্লাবে বক্তৃতা করেন। ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪০ ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০ সালে নজরুল স্বদেশে ফিরে গিয়ে কলকাতা মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেনঃ "আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর কামনা আমার নেই।"

১৯৪১ সালের ১৬ মার্চ যশোরে বনগাঁ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেন ঃ "আমি কবিযশঃপ্রার্থী হয়ে জন্মগ্রহণ করিনি; আমি আমার অস্তিত্বকে, আমার শক্তিকে খুজতে এসেছিলাম পৃথিবীতে–তাঁর দেখা পেয়েছি, তাঁ পরমসুন্দর নয়নের পরম প্রসাদ পেয়েছি, এ কথাই যেন আমার ফিরে পাওয়া বেনুকায় গেয়ে যেতে পারি।" ৫ এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির 'রজত জুবিলী' উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ অভিভাষণে কবি বলেন ঃ "যদি আর বাঁশী না বাজে, আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন; মনে করবেন ঃ পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এ ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।" ২৫ মে, ১৯৪১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের' উদ্যোগে কলকাতার ডেন্টাল কলেজ হল প্রাঙ্গণে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে কবির ৪৩তম জন্মোৎসব পালিত হয়।

পনর

১৯৪২ সালের ১০ জুলাই নজরুল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য ১৮ জুলাই তাঁকে প্রথমে মধুপুর ভর্তি করানো হলো। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় কিছুদিন কলকাতার লুম্বিনী পার্ক মানষিক হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হলো। এদিকে কবিরাজী এবং হোমিওপ্যাথি মতেও চিকিৎসা চললো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। আস্তে আস্তে কবির স্মৃতিশক্তি, বাকশক্তি ও সম্বিত হারিয়ে যেতে লাগলো। ৭ অক্টোবর, ১৯৪২ লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যর্থ হলে কবিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন করা হয়। ১৯৪৫ সালে কবিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

১৯৫২ খৃ. কলকাতা মির্জাপুরস্থ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'কে নজরুল পাঠাগারে রূপান্তরিত করা হয়। এ পাঠাগারের উদ্যোগে সে সময় নজরুলের চিকিৎসার জন্য যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন শ্রীঅতুল গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কালিদাস রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, মাণিক বন্দোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুফী জুলফিকার আলী, সজনীকান্ত দাসসহ আরো অনেকে।[২৮]

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে 'নজরুল নিরাময় সমিতি' কর্তৃক কবিকে স্বস্ত্রীক রাঁচীর মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। চার মাস চিকিৎসার পর অপরিবর্তিত অবস্থায় দেশে ফিরে আসেন। অতঃপর ১৯৫৩ সালের ১০ মে মাসে আবারো 'নজরুল নিরাময় সমিতির' উদ্যোগে নজরুলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লণ্ডন পাঠানো হয়। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসায় ব্যর্থ হলে ৭ ডিসেম্বর কবিকে ভিয়েনা নিয়ে যাওয়া হয়। ভিয়েনায় বিশ্ববিখ্যাত বিশেষজ্ঞ প্রফেসর হ্যান্স হফ কবিকে সযত্নে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ এ মর্মে অবহিত করেন। ইউরোপ ও লণ্ডনে কয়েক মাস চিকিৎসার পর ব্যর্থ মনোরথ হয়ে অবশেষে ১৫ ডিসেম্বর ভোর বেলা তাঁরা কলকাতা ফিরে আসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কবিকে যে জাহাজে করে বোম্বাই থেকে ইউরোপে নেয়া হয়েছিল সে জাহাজের সকল যাত্রীই জাতীয় কবির রোগ মুক্তির জন্য সাহায্য তহবিলে চাঁদা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সমুদ্র পথে জাহাজে যে সকল বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, সেখানে কবির রচিত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে'

---

২৮. আতাউর রহমান, নজরুল কাব্য সমীক্ষা (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬) ৩য় সং, পৃ. ৭

গানটি সমবেত কণ্ঠে সর্বভাষাভাষী নাবিকগণ গেয়েছিল। এতে মানসিক বিকারগ্রস্থ কবিও যেন আনন্দিত বোধ করেছিলেন।[২৯]

১৯৬০ খৃ. নজরুলকে ভারত সরকার 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬২ সালের ৩০ জুন কবি-পত্নী প্রমিলা নজরুল মারা যান। তার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাকে নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়াতে দাফন করা হয়।

ষোল

পাক-ভারত আযাদী লাভের পর নজরুলের জন্য পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় সরকার কর্তৃক মাসে দুইশত টাকা করে বৃত্তি বরাদ্ধ করা হয়, এবং কলকাতা পৌর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কবি-পরিবারের বসবাসের জন্য কলকাতার গোবরা অঞ্চলে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট মঞ্জুর করেন। তাছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় কবির বসবারের জন্য কলকাতায় ১০ কাঠা জমি ও গৃহনির্মাণের জন্য দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ১৯৬৯ সালের ২৭ জানুয়ারি কলকাতার রাজ্যপাল ভবনে (Governor's House) পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (Governor) শ্রীধর্মবীর কবিপুত্র সব্যসাচীর হাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে জমির দানপত্র প্রদান করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় স্বয়ং এক হাজার টাকা গৃহনির্মাণ তহবিলে দান করেন।[৩০] ১৯৬৯ খৃ. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রদান করে।

সতর

১৯৭২ সালের ২৪ মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম শেখ মজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কবির পুত্রবধূ উমা কাজীসহ কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন এবং কবির ভরণ-পোষণসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সরকার বহন করেন। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫ সালে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ উল্লাহ বঙ্গভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য নজরুলকে ডি-লিট ডিগ্রী প্রদান করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'একুশে পদকে' সম্মানিত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগষ্ট (বাং. ১৩৮৩ সনের ১২ ভাদ্র) রোববার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে ঢাকার পি. জি হাসপাতালে মানবতাবাদী দরদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্তেক.াল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৩৫ খৃ. কবির রচিতঃ

---

২৯. অশোক কুমার মিত্র, নজরুল প্রতিভা পরিচিতি, পৃ.২৭
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই,

যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'

আকুতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের উত্তর পাশে একুশবার তোপধ্বনির মাধ্যমে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে দাফন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জানাজায় ও দাফন অনুষ্ঠানে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম এবং তিনবাহিনীর প্রধানসহ সর্বস্তরের জনতা অংশগ্রহণ করেন। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান নজরুলের বিখ্যাত সঙ্গীত 'চল্, চল্, চল্, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' গানটিকে ঈষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের রণ-সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্ম

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং একবারেই অভাবিতপূর্ণ ব্যাপার। রাবীন্দ্রিক কাব্যের সৌরমণ্ডলে বাংলা সাহিত্যের কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কেহ স্বতন্ত্র আসন দাবী করতে পারে, একথা কোন বাঙ্গালী তখন ভাবতেও পারতো না। অথচ নজরুল ইসলাম যেন এক দিনে বিনা নোটিশে 'বিদ্রোহী' নামক একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ হতে একটি স্বতন্ত্র আসন দাবী করে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মৃদু মধুর গুঞ্জন ধ্বনিতে মুখরিত বাংলায় নজরুল ইসলাম যখন অদ্ভূত জোড়ালো ভাব ও ভাষায় 'বিদ্রোহী' প্রকাশ করলেন, তখন মহাযুদ্ধের কামানের গর্জনের ন্যায় যে গম্ভীর বজ্র নিনাদ শুনা গেল, তাতে ভাব বিহ্বল বঙ্গ সচকিত চিত্তে বুঝল ও বিস্মিত নয়নে দেখল যে বাংলা সাহিত্যাকাশে হঠাৎ একটি ধুমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে।

নজরুলের আবির্ভাবে বাংলার গণমানুষ তাদের আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল, আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হল, জাতীয় জীবনের উদ্গাতারূপে তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নজরুলের সাহিত্য সাধনায় নতুন রূপ ও অভিনব মূর্তি ধারণ করল। বাংলা ভাষায় এক নব্য ইসলামী-সাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত হল। আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগ করে, ইসলামী ভাবধারার আবহে, মুসলিম উপমা-উৎপ্রেক্ষার আমদানী করে নজরুল এমন এক সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, যা আজো নানাভাবে অনুকরণ হচ্ছে এবং যার অনুরণন আজো ধ্বনিত হচ্ছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী। নজরুল একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সুরশিল্পী, সঙ্গীত রচয়িতা, ঔপন্যাসিক, গাল্পিক ও নাট্যকার। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে বিশেষ করে বাংলা কাব্যে তিনি বৈচিত্র ও অভিনবত্ব এনেছেন। স্বীয় কাব্য সাহিত্যকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে নিয়োজিত করেছেন। করাচীর বাঙ্গালী পল্টনে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটলেও কিশোর বয়সেই তাঁর সে প্রতিভার দ্বীপ্তি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নজরুল কিশোর বয়সে পল্লীর লেটোদলের সংস্পর্শে এসে 'চাষার সঙ', 'শকুনি-বধ', 'দাতাকর্ণ', 'মেঘনাদ বধ', 'রাজপুত্র', 'কালিদাস', 'বাদশাহ আকবর' ও 'বন্দনাগীতি' ইত্যাদি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন।[৩১] নজরুল যখন সিয়ারসোল হাই স্কুলের ছাত্র, (১৯১৫-১৬ খৃ.) তখনই তিনি 'রাজার গড়', 'রাণীর গড়', 'বেদনবেহাগ', 'করুণগাঁথা' ও 'চড়ুই-পাখির ছানা' প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন।

---

৩১. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ৯১, আঃ মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম, পৃ.১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

করাচীর সেনানিবাসে বিকশিত তাঁর অসামান্য সাহিত্য প্রতিভার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। করাচী থেকে প্রেরিত তাঁর গল্প, কবিতা ও উপন্যাস এ দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সেদিনের রচনায় বাংলার আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-ঝরণা, বন-বনানী বিচিত্র সুরে ও সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠে। পল্টন জীবনেই নজরুল 'রিক্তের বেদন' ও 'বাঁধনহারা' রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩২৬ (১৯১৯ খৃ.) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৩২৭ সালের বৈশাখ-চৈত্র (১৯২০-২১ খৃ.) এ এক বছরের মধ্যে নজরুল কবিতা, গান, গল্প, পত্রোপন্যাস ও অনুবাদ-কবিতা রচনায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি কবিতা–যেমন 'বোধন' ও 'শাতিল আরব' মোসলেম ভারত পত্রিকার ১৩২৭ সালের জৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'বাদলপ্রাতের শরাব' আষাঢ় সংখ্যায়, 'আগমনী', ও 'খেয়াপারের তরণী' শ্রাবণ সংখ্যায়, 'কোরবানী' ভাদ্র সংখ্যায়, 'মোহররম', 'অবেলায়', ও 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম' আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ফলে নজরুল বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী হন।[৩২] কবিতাগুলো বাংলা সাহিত্যে এত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন যে, এর কারণেই 'বিদ্রোহী' বা 'কামালপাশা' প্রকাশের পূর্বেই নজরুলকে যথাযোগ্য মর্যাদার অধিকারী করে। এর জন্য নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও 'মোসলেম ভারত পত্রিকা'র কাছে অনেকাংশে ঋণী।

প্রথমদিকে নজরুলের কবিতা অপেক্ষা ছোটগল্পের দিকেই পাঠকের আকর্ষণ ছিল বেশী। নজরুলের সর্ব প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' জৈষ্ঠ্য, ১৩২৬ 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়।[৩৩] ১৩২৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা সওগাতে নজরুলের 'স্বামীহারা' ছোট গল্প, আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতা-সমাধি', কার্তিক সংখ্যায় 'তুর্কী মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রবন্ধ, পৌষ সংখ্যা প্রবাসীতে 'আশায়' কবিতা, মাঘ সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় 'ব্যথার দান' ও 'মেহেন নিগার' গল্প এবং কার্তিক সংখ্যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'হেনা' গল্প প্রকাশিত হয়। তা ছাড়াও ১৩২৭ সালের বৈশাখ থেকে কার্তিক এ সাত সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'বাধনহারা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তাই পাঠক মহলে নজরুল 'গল্প লেখক' হিসেবেই প্রথম পরিচিতি লাভ করেন।[৩৪]

---

৩২. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, পৃ. ১৭
৩৩. আ.ফ.ম ইসহাক, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান , ১৯৮৭), ৩য় সংখা, পৃষ্ঠা-৯-১০
৩৪. আবদুল কাদির, নজরুল পরিচিতি (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮), পৃ. ২৯২
৩৫. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ২৬-২৭,

Dhaka University Institutional Repository

গণ মানুষের মুক্তির প্রচেষ্টায়, শাসক ও শোষকের নির্যাতন বর্ণনায়, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার চিত্রাঙ্কনে, জাতীয়তা বোধের উন্মেষ সাধনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির নিরিখে কাব্য রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে ভরিয়ে তুলেছেন। ফরাসী লেখক ভল্টেয়ার ও রুশোর সাহিত্য দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও লেখনীর মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানকে অনুপ্রাণিত করেন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানান। ইসলামী ঐতিহ্য পূণপ্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম জাতিকে অণুপ্রাণিত করেন। মানুষের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম তথা মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে কবিতা লিখেন। এ জন্য তাঁকে 'গণমানুষের কবি'ও বলা হয়।

শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, পরাধীনতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষকে মুক্তি সংগ্রামের আহবান জানিয়ে তিনি রচনা করেন 'যুগবাণী', 'রুদ্রমঙ্গল', 'দুর্দিনের যাত্রী', 'দুরন্ত পথিক', 'অগ্নি-বীণা' 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', 'প্রলয়শিখা', 'জিঞ্জির' নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতা ও গানে পশ্চাদপদ, কুসংসকারাচ্ছন্ন, হীনমন্য, লক্ষভ্রষ্ট ও নিরাশার আঁধারে আচ্ছন্ন বাঙ্গালী মুসলমানের মনে আশার আলো ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে মুসলিম রেঁনেসার অগ্রদূতও বলা যায়।

তাঁর কবিতায় প্রথম মহাযুদ্ধের বিভীষিকা, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের ছাপ পড়েছে। খিলাফত আন্দোলন কালে রচিত কবিতাসমুহ যেমন-'রণভেরী', 'কামালপাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'রীফ সর্দার' আমানুল্লাহ প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে স্বৈরাচারী রাজশক্তি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদের আহবান জানিয়েছেন।[৩৫] ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের আহবান জানিয়ে তিনি রচনা করেন 'মানুষ', 'ফরিয়াদ', 'কৃষকের ঈদ', 'শ্রমিক-মজুর-কৃষাণের গান', 'চোর-ডাকাত', 'রাজা-প্রজা' প্রভৃতি গান। ইসলামী ঐতিহ্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন 'শাতিল আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহররম'ও 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে।

বাংলা ১৩২৫ থেকে ১৩৪৮ পর্যন্ত এ বাইশ বছর নজরুলের সাহিত্য জীবন। এ ক্ষুদ্র সময়ে নজরুল রচনা করেন আঠারটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি গল্পের বই, তিনটি নাটক, একটি ছোটদের নাটক, চারটি প্রবন্ধের বই ও চৌদ্দটি গানের বই। ১৯৪২ খৃ. দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত সে কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী তাঁর সাহিত্যকর্ম প্রকাশের বাহনরূপে কাজ করেছে। সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের মাসিক 'সওগাত', বাকেরগঞ্জের কবি মোজাম্মেল হকের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের 'মোসলেম ভারত', শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল

Dhaka University Institutional Repository

হকের পৃষ্ঠপোষকতায় 'দৈনিক নবযুগ', শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির সাপ্তাহিক 'লাঙল', মোঃ আফজালুল হকের মাসিক 'নওরোজ', মাওলানা আকরাম খাঁর মাসিক 'মোহাম্মদী', কবি আবদুল কাদিরের 'জয়তী' এবং খোদ নজরুল ইসলামের সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল' পত্রিকায় নজরুলের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, পত্রোপন্যাস ও গান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

নজরুলের কবিতা সমাজের দর্পন। সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা, আশা-আকাঙ্খার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তৎকালীন উপমহাদেশের চলমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব তাঁর কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। পারিবারিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের প্রভাবও লক্ষণীয়। কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। ঐতিহ্যগত ভাবেই নামাজ, রোজা ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের অনুসারী পরিবার হিসেবে কাজী পরিবার স্বীকৃত। তাঁর বাল্যকালের রচিত কবিতায় ইসলামী ভাবধারার প্রতিফলন রয়েছে।

সমকালীন স্বদেশী আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রের ছাপও তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন 'কৃষকের গান', 'শ্রমিকের গান', 'চরকার গান', 'ভাঙ্গার গান', 'ধুমকেতু', 'আনন্দময়ীর আগমনে', 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'জাতের নামে বজ্জাতি', 'রাজবন্ধীর জবানবন্ধী', 'রৌদ্রদগ্ধের গান', 'সাম্যবাদী', 'চিত্তনামা', ফরিয়াদ' ও 'সর্বহারা' এ জাতীয় কবিতা।

ইসলামী সাম্যবাদের অনুপ্রেরণায় কবি রচনা করেন 'নকীব', 'সুবহে উম্মীদ', 'উমর', 'খালেদ', 'জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'অগ্র-পথিক', 'ঈদ-মোবারক', 'খোশ-আমদেদ', 'তরুণের গান' ইত্যাদি জাগরণমূলক গান ও কবিতা। রচনা করেন হামদ্, না'ত ও অসংখ্য ইসলামিক গান। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত 'মরু-ভাস্কর' এবং পবিত্র কোরআনের বাণী 'কাব্যে আমপারা' রচনার মধ্য দিয়েও তাঁর কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিখ্যাত ফার্সী কবি হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের কাব্যের অনুবাদ করেছেন 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' নাম দিয়ে। তাছাড়াও অসংখ্য 'ভক্তিমূলক গান', 'মরমী গান' ও 'শ্যামাসঙ্গীত' রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে ঈর্ষণীয় সাফল্য এনে দিয়েছেন।[৩৬]

আগেই বলেছি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় নজরুলের 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। রাণীগঞ্জের এক মৌনী ফকিরের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কবিতাটিতে নজরুলের আধ্যাত্মিক অলৌকিক শক্তির প্রতি প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটি ছাপা হওয়ায়

৩৬. শাহাবুদ্দীন আহমদ, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, পৃ. ১১৭-১২১

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল অত্যন্ত খুশি হন এবং সম্পাদকের বরাবর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একখানা পত্র[৩৭] লেখেন। নজরুলের দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতা 'কবিতা-সমাধী'। এটি একটি ব্যঙ্গ কবিতা, যা ১৩২৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। তাঁর পরবর্তী কাব্য 'দিওয়ানে হাফিজ', ফার্সী কাব্যগ্রন্থের ভাব অবলম্বনে নজরুল এটি কাব্যানুবাদ করেন। কবিতাটি ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'আশায়'[৩৮] শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

'অগ্নি-বীণা'

কবি নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সুচনা করে। 'অগ্নি-বীণা' নজরুলের প্রথম উদ্দীপনামূলক কাব্য। এতে সর্বমোট বারটি কাব্য সংকলিত হয়েছে। সংকলিত কাব্যগুলোর মধ্যে 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিনী মা', 'আগমনী' ও 'ধুমকেতু' এ পাঁচটি কবিতায় হিন্দু ঐতিহ্য এবং 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'রণ-ভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবাণী' ও 'মোহররম' এ সাতটি কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য প্রাধান্য পেয়েছে। মুসলিম ঐতিহ্যবাহী কবিতাগুলোতে ত্যাগ ও বীরত্ব, আত্মদান ও আত্মমর্যাদা, শক্তি ও সাধীনতার যে রূপ অতীতের গৌরবময় দিনগুলোতে ইসলাম স্থাপন করেছিল, তা অতি সুন্দর ও বলিষ্ঠ ভাষায় কবি কাব্যরূপ দান করেছেন। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশেষ কোন ঐতিহ্যের পরিচর্যা অপেক্ষা ঐতিহ্যের মিশ্রণ অধিক লক্ষণীয়। এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় পৌরাণিক, সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের মাহাত্ম উদ্ঘাটনের রূপকে স্বদেশ,সমাজ ও জাতির মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা হয়েছে। যে সব কবিতায় কবির আত্মস্ফূর্তি (বিদ্রোহী) বা প্রকৃতির মাহাত্ম্য (প্রলয়োল্লাস) বর্ণিত হয়েছে, সে সব কবিতাতেও মানব সমাজের সংকট উত্তোরণের প্রয়াস মুখ্য। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রতিটি কবিতাই দীর্ঘ, আবেগ প্রধান এবং নাটকীয়।

'শাত-ইল-আরব' কাব্যে কবি প্রাচীন আরব ও ইরাকের মুসলিম বীরত্বের স্মৃতিকে রোমন্থন করেছেন এবং আরব-বীরদের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা দান করে বাঙ্গালী মুসলিম তরুণ সমাজকে আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা দান করেছেন।

'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি ইসলাম ধর্মীয় ভাবধারার একটি অতি মনোরম রচনা। সত্যকে ও পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলাকে যাঁরা আশ্রয় করে আছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই এ ঘোর বিপদ সঙ্কুল

---

৩৭. মুজাফ্ফর আহমদের লেখা 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থের ২৯ থেকে ৩১ পৃষ্ঠায় পত্রটির হুবহু কপি ছাপানো আছে। পত্রটি তৎকালিন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের নামে পাঠানো হয়েছিল। ফলে পত্রটি তাঁকে পড়তে দেয়া হলে ভুলক্রমে তা তাঁর কাগজ-পত্রের সঙ্গে ঢাকায় চলে আসে। যার ফলে পত্রটি ঢাকা হতে প্রথম ছাপা হয়ে থাকবে বলে অনেকের ধারণা। (দ্র.মুজাফ্ফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৭), ৩য় প্রকাশ, পৃ. ২৮-২৯

৩৮. আবদুর কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), খ.৩, পৃ. ৫০৬

ভব-সমুদ্র নিরাপদে পার হবেন, এ কথাই কবি জোর দিয়ে বলার চেষ্ঠা করেছেন। কবি দ্বীন ইসলামকে একটি তরীরূপে এবং ইসলামের চার খলীফাকে মাল্লারূপে কল্পনা করেছেন।

'কোরবানী' কবিতায় নজরুল কোরবানীকে 'হত্যাযজ্ঞ' নয়, বরং 'সত্যগ্রহ' এবং শক্তি ও কল্যাণ লাভের উপায় রূপে আখ্যায়িত করেছেন। বিদ্রোহী কবি, সাম্যের কবি নজরুল একদিকে যেমন অত্যাচার অবিচারে ব্যথিত হয়েছেন অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'কোরবানী'কেও একান্তভাবে সমর্থন করেছেন। কারণ, এরমধ্যে যে আত্মোৎসর্গের আহবান আছেতা সাধারণ স্বার্থান্বেষী মানব সমাজের বোধগম্য নয়।

'মোহররম' কবিতায় কবি নজরুলের সার্থক চিত্র বর্ণনার মধ্যে আমরা যেন তেরশত বছর পূর্বের মরু-রণাঙ্গনের এক বাস্তব চিত্র দেখতে পাচ্ছি। জুলুমের মোকাবেলা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই ইসলামের বিধান, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। যেখানে অত্যাচার, জুলুম সেখানেই প্রযোজন আছে ইসলামী বীর সৈনিকের শহীদের–একথাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বার বার।

'কামালপাশা' কবিতায় কবিকে তুর্কী বীর কামাল পাশার 'স্বার্ণা' বিজয়ে সমগ্র জাতির সাথে গৌরবান্বিত হতে দেখা যায়। এ বিজয়ে কলকাতার রাজপথের মিছিলে কবি গাইলেন 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।' এ আনন্দোল্লাস ধ্বনির মাধ্যমে কবি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন। দেশের মুক্তির জন্য কামাল পাশার ন্যায় বীরের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন।

'রণ-ভেরী' কবিতায় ইসলামকে রক্ষা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কবির আন্তরিক আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে। সত্য ও ন্যাযের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা জন্য কবি মুসলমানদের আহবান করেছেন। আল্লার পথে দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গ করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব, এরি রণধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি দুনিয়ার সকল অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, অকল্যাণ ও অধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে আত্মবিশ্বাসে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন–"বল বীর–

বল উন্নত মমশির"
শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির![৩৯]

মুসলমান এক আল্লার কাছে ছাড়া কারো কাছে কখনো মাথানত করেনা। তিনি তাঁর কবিতার মধ্যদিয়ে এ দেশের পরাধীন কৃষক-শ্রমিক, মেহনতি মানুষ তথা সমগ্র দেশবাসীর উপর সাম্রাজ্যবাদীদের সীমাহীন

---

৩৯. আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

উৎপীড়ন, অবিচার ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জনমনে ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ফলও হয়েছিল তাই, 'বিদ্রোহী' প্রকাশের সাথে সাথে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের আগে ভারতবাসীর কণ্ঠে এত 'সুস্পষ্ট বলিষ্ঠতা' তারা আর কখনো দেখতে পায়নি। 'বিদ্রোহী' যেন অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা।

'প্রলয়োল্লাস' কবিতার মধ্য দিয়ে কবি পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে উদার সাম্যনীতির ভিত্তিতে নতুন সমাজ বিনির্মাণে দেশ সেবকগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন।

'ধুমকেতু' কবিতায় নজরুল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে , সামাজিক অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। তাঁর মতে বিপ্লবেই প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করা যায়। 'ধুমকেতু' কবিতা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মহাবিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে।

'রক্তাম্বরধারিনী মা' কবিতায় কবি নিপীড়িত জাতিকে জাগানোর চেষ্টা করেছেন এবং শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন।

'দোলন চাঁপা'

কবি নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দোলন চাঁপা' বাংলা ১৩৩০ সনে (১৯২৩ খৃ.) প্রকাশিত হয়। নজরুলের প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক প্রথম কাব্যগ্রন্থ এটি। গ্রন্থটিতে মোট একুশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলোতে তাঁর প্রেম, ভালবাসা, কামনা, বাসনা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'দোলন চাঁপা'য় প্রমিলা বা দোলনা দেবীর সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক অন্যতম মূখ্য আবেগ। 'দোলন চাঁপা' বর্ষার জনপ্রিয় ফুল। নজরুল কাব্যের নামকরণে উক্ত পুষ্পটিকে ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, প্রথমত দোলন চাঁপা প্রকৃতির একটি সুন্দর উপহার, দ্বিতীয়ত দোলন চাঁপার সুবাস, তৃতীয়ত কবির প্রেমিকা দোলন দেবীর দোলন চম্পা-কান্তি থেকে এ নামের উৎপত্তি। 'দোলন চাঁপা'র 'পূজারিণী' কবিতায় আমরা কবিকে প্রেমের পরিণত ও সার্বজনীন আবেগের পরিচর্যা করতে দেখি। প্রেমের সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অনুভূতি হৃদয়ে যে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে , দেহে যে জ্বালা ধরায় তার অনাবিল প্রকাশ 'দোলন চাঁপা'র ঐ সব কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'বিষের-বাঁশী'

কবি নজরুলের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' বাংলা ১৩৩১ সনে (১৯২৪ খৃ.) প্রকাশিত হয়। 'বিষের বাঁশী' কাব্যের অনেক কবিতাই কবির বন্দি ও অনশন জীবনের সৃষ্টি–তাই সে অভিজ্ঞতার ছোঁয়া ঐ গ্রন্থসমূহের কবিতাবলীকে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও জ্বালাময় করেছে। 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থে সর্বমোট সাতাশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ছ'টি কবিতা ইসলামিক ভাব ও বিষয়ভিত্তিক, অবশিষ্ট সব ক'টিই গান। 'বিষের বাঁশী' কাব্যের মূল চালিকা শক্তি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশ শাসনের কবল থেকে নিপীড়িত মাতৃভূমিকে মুক্ত করা।

'বিষের বাঁশী' কাব্যের সর্বপ্রথম কবিতা 'উদ্বোধন' ১৩২৭ সালের বৈশাখ (এপ্রিল, ১৯২০) সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। অত্র কবিতায় কবি পৃথিবীর অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষগুলো যাতে নিজ শক্তি সামর্থ ও সাধনাবলে অত্যাচার, নিপীড়ন ও বঞ্চনাকে বিদূরিত করতে পারে এবং পৃথিবীতে উন্নত জাতিরূপে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে বিশ্ববিধাতার কাছে সে শক্তিই কামনা করেছেন।

'বোধন' কবিতাটি ১৩২৭ সালের জৈষ্ঠ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। এটি বিখ্যাত কবি 'দিওয়ানে হাফিজ শিরাজীর' একটি বিখ্যাত গজল অবলম্বনে রচিত। এখানে কবি অন্ধকার কুপে পরিত্যক্ত হযরত ইউসুফ (আ.)কে প্রাপ্তির ন্যায় ভারতবর্ষের হারানো স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রাপ্তির কল্পনা করেছেন। কবি এও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)এর ন্যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও একদিন না একদিন পুনরুদ্ধার হবেই।

'বিষের বাঁশী' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম'। 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' শীর্ষক এ দু'টি কবিতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)এর জন্ম এবং ওফাত নিয়ে লেখা। কবিতা দু'টোতে সমকালীন ঘটনাবলীর ছাপ সুস্পষ্ট। এখানে কবি মুসলিম তরুণদের ইসলামী ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনপ্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন। যে মুসলিম জাতি একদিন সমগ্র বিশ্ব শাসন করেছে, তারা আজ নিঃস্ব, অসহায়, এ কথা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি মহানবীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরাধিনতার শৃখল মোচনে এগিয়ে আসার জন্য সকলকে আহবান জানিয়েছেন।

'সেবক' কবিতায় কবি অন্যায় ও অসত্য, নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগের জন্য বীর যুবাদের এগিয়ে আসার এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শোষকদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার উদাত্ব আহবান জানিয়েছেন।

'বিষের বাঁশী'র কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'বন্দি-বন্দনা'। এটি খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্দনাগীতি। কবিতাটিতে স্বাধীনতা সগ্রামীদের ভয় ও শঙ্কা মোচনের অভয়বাণী বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। 'বন্দি-বন্দনা' ছাড়াও 'বন্দনা গান', 'মুক্তি সেবকের গান', 'শিকল পরার গান', 'যুগান্তরের গান', 'চরকার গান', 'বিজয় গান', 'মরণ-বরণ', 'জেল-সুপার বন্দনা' ইত্যাদি কাব্যগানগুলো নজরুরল খিলাফত আন্দোলন তথা অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিক্ষরা দিনগুলোতে রচনা করেন। ১৯২৩ খৃ. হুগলী জেলে থাকাকালিন কবি 'শিকল পড়া ছল' ও 'জেল সুপার বন্দনা' রচনা করেন।

'জাতের নামে বজ্জাতি' শীর্ষক কবিতাটি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ বৈষম্য রীতির বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করে লেখা কবিতা সমূহের অন্যতম কবিতা। এ কবিতার মাধ্যমে কবি হিন্দু সম্প্রদায়ের জাত বিচারের হীনমন্যতাকে বিদ্রুপ করেছেন এবং ইসলামের সাম্যনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

''বিষের-বাঁশী' গ্রন্থের 'জাগৃহী', 'তুর্যনিনাদ', 'অভয় মন্ত্র', 'ঝড়' ইত্যাদি কাব্যসমুহে কবি পরাধীন ভারতের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনাসহ তা থেকে মুক্তির সর্বাত্মক প্রচেস্টা চালানোর আহবান জানিয়েছেন। 'ঝড়'কে নজরুল বিপ্লবের প্রতীকরূপে চিত্রিত করেছেন। 'ঝড়', 'বিদ্রোহ', ধুমকেতু', 'প্রলয়োল্লাস' সবক'টি কবিতাই সমগোত্রীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে ঘিরে লেখা।

'বিষের-বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই বিপ্লবাত্মক এবং বৃটিশ বিরোধী। ফলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতদসত্ত্বেও বইটির প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা কোন অংশেই বন্ধ করতে পারেনি।

'ভাঙ্গার গান'

কবি নজরূল ইসলামের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙ্গার গান' বাংলা ১৩৩১ সালে (১৯২৪ খৃ.) প্রকাশিত হয়। 'ভাঙ্গার গান' কাব্যগ্রন্থটি 'অগ্নি-বীণা' ও 'বিষের-বাঁশী'র সমপর্যায়ের এবং 'বিদ্রোহী'র সমসাময়িক ১৯২২ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে রচিত। এ গ্রন্থে মোট এগারটি কবিতা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে 'ভাঙ্গার গান', 'জাগরণী', 'জেল সুপার বন্দনা', 'আগুপ্রয়াণ' ও 'শহীদী ঈদ' উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি কবিতায় কবি ঔপনিবেশিক শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহবান জানিয়েছেন। কবির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ শাসনের মূলোৎপাটন করা। তাঁর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র দেশবাসী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে এবং অসহযোগ আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলে। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কবিকে কারারুদ্ধ এবং ১৯২৪ খৃ. ১১ সেপ্টেম্বর কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

এ দেশের স্বাধীকার আন্দোলনে নজরুলের কাব্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাজ করেছে। তাঁর প্রথম দিকের 'বিষের-বাঁশী', 'ভাঙ্গার গান', 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থগুলো সারা বাংলার আকাশে বাতাসে এক অনাগত বিপ্লবের শাণিত শিহরণ সঞ্চারিত করে দেয়। "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর এক হাতে রণতূর্য।" এ বিপ্লবী ধ্বনি দিয়ে তিনি তৎকালিন স্বৈরাচারী বৃটিশ শাসক সম্প্রদায়কে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। ১৯২১ খৃ. ১৭ নভেম্বর ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের 'ভারত ভ্রমণোপলক্ষে' এ দেশে হরতাল পালনকালে কুমিল্লা শহরে মিছিলে যোগ দিয়ে কবি কাঁধে হারমোনিয়াম নিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'জাগরণী' শীর্ষক গানটি গেয়ে বেড়ান। তখন নজরুলের সঙ্গে ছিলেন শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীহেমেন্দ্র ভট্টাচার্য। গানটির শুরু ছিল এভাবে–

ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!

গানটিতে নিম্মলিখিত ছত্রগুলোও ছিল।

সর্বনাশ! সর্বনাশ!
আসিছে তাদেরি রাজকুমার
ওগো নির্ভিক পুরবাসী আজ খুলোনা দ্বার।[৪০]

'মিলনগান' গীতি কবিতায় কবি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারের আহবান জানিয়েছেন। ভারত উপমহাদেশের অধিবাসীদের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনৈক্যের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীযে নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানোর সুযোগ পেয়েছে, এ কথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি সকলকে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান।

'শহীদী ঈদ' নজরুলের ইসলামী আদর্শে রচিত অনবদ্য কাব্য। তিনি ইসলামের অনুসারীদের অতি কঠোর ভাষায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস এবং আত্মত্যাগের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি ঈদ-উল আযহা উপলক্ষে পশু কোরবানীর পরিবর্তে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য জীবন কোরবান করার উদাত্ত আহবান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

'ছায়ানট'

নজরুল ইসলামের পঞ্চম কাব্রগ্রন্থ 'ছায়ানট' বাংলা ১৩৩১ সালে (১৯২৪ খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট পঞ্চাশটি কবিতা ও গান সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'বিজয়িনী', 'বেদনা অভিমান', 'নিশীথ প্রীতম', 'অ-বেলায়', হার-মানা-হার', 'চিরন্তনী প্রিয়া', 'পরশপূজা', 'অনাদৃতা', 'শায়ক বেঁধা পাখী', 'হারামনি', 'মানস-বধূ', 'বিদায়-বেলায়', 'দুরের বন্ধু', 'মনের মানুষ', 'প্রিয়ার রূপ', 'স্তব্ধবাদল', 'পূবের হাওয়া', 'আলতা স্মৃতি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থের অধিকাংশ গানই প্রেমমূলক।

'ছায়ানটে' সংকলিত অনেকগুলো কবিতায় নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক আর কিছু কবিতায় প্রমীলার সঙ্গে পূর্বরাগ ছায়াপাত করেছে। 'ছায়ানটে'র কবিতাবলীর সুর ছায়ানট রাগিনীর মতই করুণ ও বেদনাবিধুর। নজরুলের কৈশোর-প্রেমের স্মৃতি, দেওঘরের ভাল লাগার ক্ষণিক মুহূর্ত, দৌলতপুরে নার্গিসের সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদের আনন্দ ও বেদনা এবং সবশেষে প্রমীলার সাথে পূর্বরাগের সুর, সব মিলিয়ে 'ছায়ানট'এর কবিতাগুলোর আবেগ ও অভিজ্ঞতা অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশে সজীব। প্রেমের পরিণত ও সার্বজনীন আবেগের পরিচর্যা দেখা যায় 'ছায়ানট'এর 'চৈতী হাওয়া' কবিতায়।

নজরুল অতন্ত্র প্রেমের পূজারী। প্রেমের স্মৃতি তাঁর দৃষ্টিতে অক্ষয় ও অমর। প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন মানব-স্বভাবের এক দুর্মর ব্যাপার। তাঁর কবিতায় এ স্মৃতিরোমন্থন প্রতিমা রূপ ধরে এসেছে, অতীত হয়ে উঠেছে জীবন্ত অশ্রুদীপ্ত। এসব ক্ষেত্রে কবিতা কেবল কবির ব্যক্তি জীবনের রোজনামচা নয়, বরং হৃদয়ানুভূতির বিচিত্র ভাবের দ্যোতক। প্রেমের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম অনুভূতি হৃদয়ে যে বিচিত্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, দেহে যে জ্বালা ধরায়, তার অনাবিল প্রকাশ তাঁর ওসব কবিতা।

নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি চেতনাবিচ্ছিন্ন নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই একাকার। প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি প্রকৃতিতে সমর্পিত। 'ছায়ানটের' কোন কোন কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির এ একাকার রূপ প্রত্যক্ষ করার মত। সমাজ সচেতন নজরুল যখন প্রেম ও প্রকৃতির অঞ্চলতলে ধরা পড়েন, তখন তিনি হয়ে পড়েন ভাবপ্রবণ, তাঁর হৃদয় তখন উদাস হয়ে পড়ে। তাঁর হৃদয়ানুভূতিতে প্রেমিকা তখন পূজারিণী ও জীবনদেবী আর প্রেমিক পূজারী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এতকিছুর পরেও নজরুলের প্রেমে আছে বিষণ্নতা, আছে নিঃসঙ্গতা, আছে বেদনাবোধ। তাঁর প্রেমের কবিতায় যেমন আছে বেদনা-কাতরতা তেমনি আছে ঈর্ষার জ্বালা। প্রেমিকার ছলনা-প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা ও নীচুতা নজরুলের দৃষ্টি এড়ায় না। নারীর ঔদাসীন্য ও নির্মমতা কবিকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। তাইতো প্রেম সম্পর্ক্যের মধ্যে এলেই নারীর প্রতি তাঁর সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও অনীহা জেগে ওঠে।

---

৪০. মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা (ঢাকা: মুক্তধারা, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩২৪-২৫

'পুজারিণী' কবিতায় নারীকে তিনি 'লোভী, 'অতিলোভী', 'ছলনাময়ী', 'মায়াময়ী' ও 'মায়াবিনী' বলে ভর্ৎসনা করেছেন।

'পূবের হাওয়া'

নজরুলের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পূবের হাওয়া' বাংলা ১৩৩২ সালে (১৯২৫ খৃ.) প্রকাশিত হয়। মাত্র বারটি প্রণয়মূলক গীতিকাব্য দিয়ে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। এরমধ্যে 'বাদল-প্রাতের শরাব', 'আশা', 'মানিনী', 'বে-শরম', 'সোহাগ', 'শরাবন তহুরা', 'বিরহ বিধূরা' ও 'প্রণয় নিবেদন' ইত্যাদি প্রধান। 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য দিক হল হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে মদ ও প্রণয়ীকে নিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত রাত্রী যাপনের আনন্দঘন পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলা।

কবি নজরুলের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'সাম্যবাদী' পৌষ, ১৩৩২ (ডিসেম্বর ১৯২৫ খৃ.) সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট এগারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'সাম্যবাদী', 'সাম্য', 'মানুষ', 'পাপ', 'মিথ্যাবাদী', 'রাজাপ্রজা' ও 'কুলিমজুর' ইত্যাদি প্রধান। সাম্য, সমতা, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব কবিতাগুলোর মূলমন্ত্র। 'সাম্যবাদী' কবিতাসমূহে শ্রেণী-বৈষম্য বা শ্রেণী-সঙগ্রামের তুলনায় সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে সমতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে অধিক, যে সাম্যের চেতনা বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দর্শন থেকে উৎসারিত নয়।যার উৎস সাধারণ মানবিকতাবোধ থেকে। 'সাম্যবাদী' কবিতার বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে, শ্রেণী চেতনামূলক কবিতা ঐ তালিকায় বিশেষ নেই, আল্লাহ বা ধর্মকে নাকচ করারও কোন প্রয়াস নেই, বরং বাউল সাধকের মত মানবধর্মের প্রবণতা সেখানে পরিলক্ষিত। 'সাম্যবাদী' কবিতাসমূহে মূলত মানুষের ধর্মীয় ব্যবধান দূরিকরণের কথা বলা হয়েছে। মানুষের হৃদয়কেই শ্রেষ্ঠ ভজনালয়, শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ও সাধারণ সাধনার পাদপীঠরূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

'সাম্যবাদী' ও 'সাম্য' কবিতাদ্বয়ে কবি মানুষের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা বলেছেন এবং অনাচার, অবিচার ও বৈষম্যহীনতার বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করেছেন। জন্মগতভাবে দুনিয়ার সকল মানুষ সমান। ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, আমীর-ফকীর, সাদা-কালো, আশরাফ-আতরাফ সকলেই এক আল্লার সৃষ্ট। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই; জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিভেদ বাঞ্ছনীয় নয়, এ কথাই 'সাম্যবাদী' কবিতায় দৃঢ়ভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের মর্যাদা অপরিসীম। মানুষের অস্তিত্ব না থাকলে দুনিয়াতে যুগে যুগে নবী-রাসুলদের আগমন

Dhaka University Institutional Repository

ঘটতো না এবং ঐশীগ্রন্থেরও প্রয়োজন হতোনা। সুতরাং বর্ণ, ভাষা ও জাতিগত প্রথার বিলোপ সাধন করে মানব কল্যাণে ব্রতী হওয়ার উদাত্ব আহবান জানান।

'ইশ্বর' কবিতায় কবি পরম আরাধ্য সত্তার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুসন্ধানের প্রেরণা জুগিয়েছেন। নজরুল নিজ অস্তিত্বমাঝে স্রষ্টাকে খুজতে বলেছেন। আকাশে-পাতালে, পাহাড়ে-জঙ্গলে স্রষ্টাকে অনুসন্ধান না করে নিজ আত্মার মাঝে তাঁকে অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

'নারী' কবিতায় তিনি নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে সম অধিকার প্রদানের কথা বলেছেন। ইসলাম নারী ও পুরুষকে পরস্পরের সম্পূরক ও আবরণ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইসলাম নারীরে যে সকল অধিকার প্রদান করেছে তা বাস্তবায়নের আহবান জানিয়েছেন। জগতের সকল কল্যাণে নারীও সমান অংশীদার এ কথা তিনি জোর দিয়ে বলেছেন।

বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তাঁর করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।[৪১]

'পাপ' কবিতায় কবি পাপকে ঘৃণা করতে বেলেছেন, পাপীকে নয়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে তো পাপ প্রবণতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সে পাপ করবে আবার অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে। নজরুল মনে করেন, আদম থেকে শুরু করে এ জগতের সকলেই পাপ করেছে এবং প্রতিনিয়ত করছে। এ পাপ পঙ্কিল জগতে 'হারুত' 'মারুত' ফেরেশতাদ্বয়ও পাপ করেছে এ ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ জগতের পাপী-তাপীদের কেউ হয়তো আমার ভাই নয়তো বোন। অতএব পাপী বলে কাউকেই ঘৃণা করা উচিৎ নয়।

'সর্বহারা'

এরপর নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থ বাংলা ১৩৩৩ সালে (১৯২৬ খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির দু একটি কবিতা ছাড়া অধিকাংশই গান। প্রতিটি কবিতা ও গানে রয়েছে এ দেশের মাটি ও মানুষের আশা-আকাংখার তীব্র প্রতিফলন। তুলনামূলকভাবে 'সর্বহারা' গ্রন্থে শ্রেণী-চেতনা স্পষ্ট; তিনি সেখানে কৃষক, শ্রমিক, ধীবর প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য গান রচনা করেছেন। 'সাম্যবাদী'র মরমী চেতনা 'সর্বহারা'তে সংগ্রামী চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

৪১. কাজী নজরুল ইসলাম, 'সাম্যবাদী', "নারী", আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী (ঢাকা:কেন্দ্রীয় বাংলা ইন্নয়ন বোর্ড,১৯৬৭), খ.২, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

'সর্বহারা' কাব্যে কবি নীল সামিয়ানার নীচে অবস্থানরত একই আলো-বাতাসে গড়া মানুষের মধ্যে বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ দেশের শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন কামনা করেছেন।

নজরুল ভাগ্য বিড়ম্বিত, শোষিত, বঞ্চিত কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে সক্রিয় হবার আহবান জানিয়ে রচনা করেন 'কৃষাণের গান'। আধুনিক সভ্যতা ও স্থাপত্যের নির্মাতা শ্রমিক-মজুরদের আর্থিক দৈন্যতা লাঘবে অনুপ্রাণিত করেন 'শ্রমিকের গানে'। ১৮ মার্চ ১৯২৬ খৃ. ফরিদপুরে জেলে ও মৎসজীবীদের সম্মেলনে তিনি 'ধীবরদের গান'টি আবৃত্তি করেন। তেমনিভাবে ছাত্রদের সম্মেলনে আবৃত্তি করেন 'ছাত্রদলের গান'। এভাবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও আশা-আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করে নজরুল তাঁর কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

সর্বহারা কাব্যগ্রন্থের অন্যতম গান 'কাণ্ডারী হুশিয়ার'। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২ এপ্রিল শুক্রবার থেকে কলকাতার রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে এর ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করে নজরুল গানটি লেখেন। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী-সঙ্গীত হিসেবে গানটি প্রথম গাওয়া হয়। 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' নজরুলের একটি শ্রেষ্ঠ জাগরণী গীতি। এ গানের উদাত্ত-সুরে দুর্যোগ রাতের আহবান বেজে উঠে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুদ্ধ সমুদ্র, স্ফীত কল্লোল, ছিন্নপাল, দিশেহারা নাবিকের ছবি–যথাযথভাবে এ গানে ফুটে উঠেছে।

'ফরিয়াদ' কবিতায় কবি নজরুল পৃথিবীর সর্বহারাদের দুঃখ-দুর্দশা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য আর বিভেদ নীতির প্রতি লক্ষ করে মহান স্রষ্টার কাছে ফরিয়াদ করেছেন। অন্যায়, অবিচারের প্রতিকারের জন্য স্রষ্টার কাছে ফরিয়াদ করেও শেষ পর্যন্ত প্রতিকারের উপায় মানুষের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

নজরুলের সাহিত্য, জীবনাদর্শ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে যে সকল বিরূপ মন্তব্য ও সমালোচনা ঝড় উঠেছিল, কবি 'আমার কৈফিয়ৎ' নামক কবিতায় অপূর্ব ভঙ্গিতে সে সকল সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন। অস্থিরতার মধ্যেও এ কবিতায় তিনি তাঁর নিরপেক্ষ স্বরূপ ধরতে পেরেছেন। এ কবিতায় হাস্য-কৈতুক-মিশ্রিত কবির আত্মসমালোচনা সত্যি উপভোগ্য। কৈতুক দিয়ে শুরু হলেও কবিতাটির শেষ বিদ্রোহের অগ্নিভাষণে।

'চিত্তনামা'

নজরুলের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তনামা', যা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে ১৯২৬ খৃ. প্রকাশিত হয়। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের অনন্য অবদান ও ভুমিকার

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতি স্বরূপ নজরুল এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। বইটিতে 'অর্ঘ', 'অকাল-সন্ধ্যা', 'সান্তনা', 'ইন্দ্রপতন' ও 'রাজ-ভিখারী' শিরোনামে পাঁচটি কবিতা স্থান পেয়েছে।

'ফণি-মনসা'

'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৩৪ সালে (১৯২৭ খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট তেইশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'দীল-দরদী', 'সত্য-কবি', 'সব্যসাচী', 'পথের দিশা' ও 'সাবধানী ঘন্টা' ইত্যাদি। 'ফণি-মনসা'র স্মরণীয় কবিতাগুলোর মূলে আছে সাময়িকতার প্রেরণা। 'ফণি-মনসা' কাব্যে দেশের পরাধীনতার পটভূমিকায় হিন্দু ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক বিভেদ কবির মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষে যেন কবির এক স্বপ্নসৌধ ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে। তাই হতাশা ও নেরাশ্য কোন কোন কবিতায় ছায়াপাত করেছে যা নজরুলে আগে কখনো দেখা যায়নি।

'প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়' কবিতাটিতে দ্রুত পলায়মান সময়ের গতিচিত্র ফুটে উঠেছে। চলমান সময়ের সাথে গতি রেখে চলার নামই প্রগতি। অতীতের মায়ায় অন্ধ হলে সমাজ জীবনের গতি ব্যাহত হবে এ কথাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন নজরুলের শ্রদ্ধেয় কবি। তাঁর 'খাঁচার পাখি' শীর্ষক কবিতা পড়ে নজরুল রচনা করেন 'দীল-দরদী'। এ কবিতাটিতে চির-নিঃসঙ্গ কবিপ্রাণের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নজরুল কবিতাটি রচনা করেন। কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশে নজরুল অব্যর্থ উপমা ও রূপক প্রয়োগ করেন।

নজরুল বিরোধী কবি গোষ্ঠী মোহিতলাল-সজনীকান্ত প্রভৃতি কবির উদ্দেশ্যে কবি 'সাবধানী ঘন্টা' বাজালেন 'কল্লোল' পত্রিকায়। 'সাবধানী ঘন্টা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্য ও শিল্পের পূজারীদের কবি সমাজ জীবনের অসন্তোষ ও বিদ্রোহের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বললেন।

'ঝিঙেফুল'

নজরুলের 'ঝিঙেফুল' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৩৩ সালে (১৯২৬ খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট চৌদ্দটি শিশু-কিশোর কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'খুকি ও কাঠবিড়ালী', 'খোকার খুশি', 'খাঁদু-দাদু', 'মা', 'খোকার বুদ্ধি', 'খোকার গল্প বলা', 'লিচুচোর' প্রধান।

'সিন্দু-হিন্দোল'

বাংলা ১৩৩৪ সালে (১৯২৭ খৃ.) নজরুলের 'সিন্দু-হিন্দোল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মোট কবিতার সংখ্যা উনিশ। অধিকাংশ কবিতাই ১৯২৬ খৃ. কবির বরিশাল ও চট্রগ্রাম সফরকালে

রচিত। গ্রন্থখানি হাবিবুল্লাহ বাহার ও তাঁর বোন শামসুন্নাহারের নামে উৎসর্গীকৃত। এ গ্রন্থের স্মরণীয় কবিতাসমূহের মধ্যে রয়েছে 'সিন্ধু', 'গোপন প্রিয়া', 'অনামিকা', 'বিদায় স্মরণে', 'পথের স্মৃতি', 'দারিদ্র', 'চাঁদনী-রাতে', 'অভিযান', 'ফাল্গুণী' ও 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জির' ইত্যাদি।

'সিন্দু-হিন্দোল' কাব্য গ্রন্থের মূল ভাব প্রেম-বিরহ। নজরুলের প্রেমের কবিতায় অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধা আর উদগ্র কামনার দীর্ঘশ্বাস বা রক্তিম বেশের ছোঁয়া অনুভব করা যায় 'সিন্দু-হিন্দোল'এর কোন কোন কবিতায়। তবে এ সব ক্ষেত্রে সে আবেগ প্রকৃতির রূপকে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 'সিন্ধু' কবিতাসমষ্টি। 'সিন্ধু', 'দারিদ্র', 'অনামিকা'–কবিতাত্রয় নজরুল কাব্যের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বিশেষভাবে 'অনামিকা'র কবি-মানসের চির-অতৃপ্ত তৃষ্ণার প্রকাশ চির কালের জন্য স্থায়ী হয়ে থাকবে। নজরুল এক সজ্ঞাতীত, জ্ঞানাতীত হৃদয়াকুতির অতৃপ্তী ও বেদনা প্রকাশ করেছেন এ কবিতায়। কোন আদর্শ প্রিয়াকে, অনামিকাকে কামনা বাসনার সীমিত গণ্ডীর মধ্যে পাওয়ার জন্যে কবিকে ক্রন্দনরত, চির-বিরহী হতে দেখা গিয়েছে।

কবি-জীবনের প্রথম পর্যায়ে ঝড় ও নাগের মধ্যে নজরুল তাঁর বিদ্রোহী স্বরূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। এবার তাঁর হাতে মৈত্রীর রাখী বাঁধলেন সিন্ধু ও নদী। নজরুল তাঁর অস্থির ও দুর্দম সত্তার দোসর খুঁজে পেয়েছেন সমুদ্রের মধ্যে। সমুদ্র নজরুলের দৃষ্টিতে চির-বিরহী। সমুদ্রের কল্লোল ও স্রোত যে আলোড়ন সৃষ্টি করে কবির দৃষ্টিতে তা বিরহজনিত।

'সিন্দু-হিন্দোল' গ্রন্থের 'মাধবী প্রলাপ', 'ফাল্গুণী', 'রাখি-বন্ধন', 'চাঁদনী রাতে' কবিতাসমূহে কবি প্রকৃতির এক ইন্দ্রিয়ঘন রূপ অঙ্কিত করেছেন। প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে কবির মানস-নির্ভর না হলেও প্রকৃতির বৈচিত্র কবিচিত্ত ও চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। 'চাদনী-রাতে' কবিতায় কবি এক জ্যোৎস্নালোকিত রাতের ছবি ফুটিয়ে তোলেছেন। আকাশ-রাণীর বাসর-রাতের ইঙ্গিত রয়েছে এ কবিতকায়। 'সপ্তর্ষির তারা পালঙ্ক', 'নীহার নেটের কবিতা মশারি', 'আকাশ-দ্বারী', 'কালপুরুষ', 'মঙ্গল তারার মঙ্গল-দ্বীপ', 'শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু' প্রভৃতির দ্বারা কবি একটি চিত্তগ্রাহী চিত্র-জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। আকাশের এমন মনোরম চিত্র বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন।

'সিন্ধু' নজরুলের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা। এ কবিতায় সিন্ধুর বিশালতা, বৈচিত্র এবং মানব স্বভাবের সাথে তার সাদৃশ্য ধরা পড়েছে। সিন্ধুকে কবি প্রেমিক পুরুষে রূপান্তরিত করে চাঁদকে সিন্ধুর প্রিয়ারূপ কল্পনা করেছেন। কারণ সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার সাথে চাঁদের সম্পর্ক রয়েছে। সমুদ্র ও চাঁদ দু'টি বিপুল সত্তার মধ্যে আকর্ষণ চলছে হাজার হাজার বছর ধরে অথচ কেউ কাউকে ধরতে পারছে না। এ বিরহ বেদনাই 'সিন্ধু' কবিতার উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

'দারিদ্র' নজরুলের এক অনুপম কবিতা। দারিদ্রের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা কিভাবে মানব জীবনের রস ও সৌন্দর্যকে ধ্বংশ করে কবি তাই বর্ণনা করেছেন। দারীদ্রের সুতীব্র জ্বালা কবিতাটিতে দিয়েছে আগুনের লেলিহান জ্বালা। দারীদ্রের আঘাতে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা অবনমিত হয় নি, বরং দারিদ্র তাঁকে দিয়েছে 'দুরন্ত সাহস' এবং 'উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি'। কবির বীণা যে তরবারিতে পরিণত হয়েছে তার কারণ দারিদ্রের 'দুঃসহ দাহন'।

'অভিযান' কবিতায় অভিযাত্রীকে নবজীবনের প্রতিষ্ঠায় নবউদ্যমে ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সম্মুখে অগ্রসর হবার আহবান জানিয়েছেন।

'জিঞ্জির'

কবি নজরুল ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'জিঞ্জির' বাংলা ১৩৩৫ সালে (১৯২৮ খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট ষোলটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলো হচ্ছে– 'সুবহ্ উম্মীদ', 'নকীব', 'খালেদ','অঘ্রাণের সওগাত', 'মিসেস এম রহমান', 'খোশ আমদেদ', 'নওরোজ', 'ভীরু', 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'অগ্রপথিক', 'আমানুল্লাহ', 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়?', 'এ মোর অহংকার', 'বার্ষিক সওগাত', 'উমর ফারুক'।

'জিঞ্জির' গ্রন্থের মৌল আবেগ মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম জগতের অতীত ও সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকে বর্তমানকে উদ্দীপ্ত করা, জাগ্রত করা, মহিমান্বিত করা। স্বদেশ ও স্বজাতির পরাধীনতার, কুসংস্কারের, ধর্মান্ধতা, কাপুরুষতার, হীনমন্যতার জিঞ্জির বা শৃংখল ছিন্নকরা। তাই ইসলামের বীর পুরুষদের পরিচয় 'জিঞ্জির' গ্রন্থে যেমন জীবন্ত, নজরুলের অন্য কোন গ্রন্থে তেমনটি নেই। ইসলামের ঐতিহ্য, গৌরব আর ইতিহাসকে অপর কোন গ্রন্থে এমন বিশদ ও বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করেন নি। এ কাব্যে আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহারের যে ঐতিহ্য নজরুল সৃষ্টি করলেন পরবর্তীকালে তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। 'জিঞ্জির' আধুনিক বাংলা কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য রূপায়নের ধারার পধ-প্রদর্শক।

ইসলামের সত্যিকার প্রাণশক্তি গলতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকার। এ সাম্য ও গণতন্ত্রের জয়গান নজরুলের ইসলামী গান ও কবিতার বৈশিষ্ট্য। তাঁর দৃষ্টিতে ঈদুল ফেতর সাম্যের বিধান[৪২], খালেদ বিশ্বের মজলুম মানুষের নেতা[৪৩], খলিফাতুল মোসলেমীন উমর ফারুক (রা.) 'মানব

---

৪২. ঈদ্-অল-ফেতর আনিয়াছে তাই নব বিধান
ওগো সঞ্চয়ী উদ্বৃত্ত যা করিবে দান–
(দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিঞ্জির', "ঈদ মোবারক", আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুলরচনাবলী, খ.২, পৃ. ১৬৯

৪৩. খালেদ! খালেদ! ভাঙ্গিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজলুম!–
(দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিঞ্জির', "খালেদ", আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুলরচনাবলী, খ.২, পৃ. ১৪৪

৪৪. মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিক'[৪৪], আমানুল্লাহ বিশ্ব-কাবার-মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক-কবি[৪৫] কবির হৃদয়াবেগ, অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনার সঙ্গে মানবতার সমন্বয়গুণে এ সব সাময়িক ও স্থানিক বিষয়েও চিরন্তন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। 'খালেদ', 'উমর ফারুক', 'আমানুল্লাহ', 'মিসেস এম রহমান', 'চিরঞ্জীব জগলুর', 'সুবহ্ উম্মীদ' প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচারের বাণী, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও সংগ্রামের প্রেরণা।

'সুবহ্ উম্মীদ' কবিতাটি খিলাফত আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্যান-ইসলামী ভাবধারায় রচিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের মুসলমানদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দীপনা দেখে কবি আনন্দিত হয়ে উঠেন। 'সুবহ্ উম্মীদ' কবিতায় অধঃপতিত মুসলমানদের উত্থানের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর মদিনায় হিজরতের পর মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী রেনেসাঁর জোয়ার বইলেও ভারত উপমহাদেশে তা ছোঁয়া লাগেনি। 'সুবহ্ উম্মীদ' কাব্যে মধ্যদিয়ে তিনি সর্ব শক্তিমান আল্লার কাছে এ দেশবাসীর জাগরণ কামনা করেছেন। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নজরুলের উদ্দীপনার সার্থক রূপায়ন 'সুবহ্ উম্মীদ'।

'নকীব' শীর্ষক কবিতায় কবি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহবান জানিয়ে স্বাধীন মুক্ত জীকন গড়ার ডাক দিয়েছেন। 'নকীব' অর্থ 'সুসংবাদ ঘোষক'। কবি দুর্বল, অসহায়, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ভাগ্যাহত জনগণকে আত্মচেতনায় উজ্জিবিত করার জন্য এমন একজন নকীবের আগমন প্রত্যাশা করেছেন।

'জিঞ্জির' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'খালেদ' অগ্রহায়ন ১৩৩৩ (ডিসেম্বর ১৯২৬) সংখ্যার 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। 'খালেদ' কবিতায় একাধারে অভিব্যক্ত হয়েছে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের (মৃ.২২/৬৪২) বীরত্ব, ঔদার্য এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিজয় অভিযান; আধুনিক যুগের মুসলিম জগতের দুঃখ-দুর্দশা এবং তাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রয়াস। নজরুলের দৃষ্টিতে খালেদ শুধু মুসলমানদেরই রণ-ইমাম নন, তিনি মজলুম মানুষের সেনাপতি। খালেদের ন্যায় যোগ্য সাহসী নেতার অভাবেই মুসলিম সমাজের এ দুর্দশা ও লাঞ্ছনা। ইসলামের আবির্ভাব কাল এবং খালেদের বীর চরিত্র প্রকাশে নজরুলের

তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরিগো সর্বদাই!
(দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিঞ্জির', "ওমর ফারুক",আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, খ.২, পৃ. ১৮৭

৪৫. তুমি আসনি ক' দেখাতে তোমায়, দেখিতে এসেছ সকলেরে!
চলেছ পুণ্য সঞ্চয় লাগি' বিপুল বিশ্ব কাবা হেরে'
হে মহাতীর্থ-যাত্রা-পথিক! চির-রহস্য-ধেয়ানি গো!
ওগো কবি! তুমি দেখেচ যে কোন অজানা লোকের মায়া-মৃগ?
(দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিঞ্জির', "আমানুল্লাহ", আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, খ.২, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ও ছন্দ অভিনব ওজস্বিতা এবং গতিশক্তির পরিচয় দিয়েছে। 'খালেদ' কবিতাটিতে স্বাধীনতার কামনা অধিকতর স্পষ্ট। খালেদের আদর্শনিষ্ঠা অপেক্ষা প্রবলতর বীরত্ব।

'উমর ফারুক' কবিতাটি মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)এর মহৎ গুণের বর্ণনায় মুখর। খলিফা উমর (রা.) নবী বা পয়গাম্বর না হলেও তিনি ছিলেন মহামানব–এবং নির্যাতিত মানুষের বন্ধু। তাই কবির দৃষ্টিতে তিনি অধিকতর শ্রদ্ধার্হ ও প্রিয়। খোদায়ী বিধান বাস্তবায়নে উমর ছিলেন আপোষহীন। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচারের বাণী তারই কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। ভৃত্যকে উষ্ট্রের পিঠে চড়িয়ে নিজ হাতে উটের রশি টেনে তিনি যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, তা ইসলামের শিক্ষার ফল। তাঁর সুবিচার সর্বজন বিদিত। তাঁর সুবিচারের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বীয় পুত্র আবু শাহমা-র বিচার। 'উমর ফারুক' কবিতার মাধ্যমে কবি একজন আদর্শ মানুষ এবং আদর্শ শাসকের চরিত্র ফুটিয়ে তোলেছেন।

'জিঞ্জির' গ্রন্থের 'চিরঞ্জিব জগলুল' ও 'মিসেস এম রহমান'–এ দু'টো শোক কবিতা। 'চিরঞ্জিব জগলুল' কবিতাটি মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের নিঃস্বার্থ নির্ভীক সিপাহসালার জগলুল পাশার মৃত্যুতে রচনা করেন। কবিতাটিতে প্রাচীনতম সভ্যতা ও ঐতিহ্যের লীলাভূমি মিশর এবং তার উদ্ধারকর্তা বীর সন্তান জগলুল পাশার মাহাত্ম ও অবদানের কথা বলা হয়েছে। আজকের মিশরের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামকে তিনি অতীতের বনি ইসরাইলদের মুক্তি কামনার সাথে এক করে দেখার চেষ্টা করেছেন। কবিতাটির মাধ্যমে পরাধীন ভারতের আত্মকলহরত চেতনাহীন ভারতবাসীকে তিনি বিদ্রুপের কশাঘাত করেছেন।

'মিসেস এম রহমান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবির ব্যক্তিগত বেদনা, মিসেস এম রহমানের মহিমাময়ী চরিত্র এবং তৎসঙ্গে নারীর অধিকারবোধ। মিসেস এম রহমান কেবল একজন জননী ছিলেন না, তিনি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতও ছিলেন।

'আমানুল্লাহ' কবিতায় কবি নজরুল আফগানিস্থানের বাদশাহ আমানুল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'আমানুল্লাহ' কবিতায় বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের দৈন্য-দুদশা ও গণতান্ত্রিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। আমানুল্লাহ সেনাবাহিনীর সমর্থনে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন পক্ষান্তরে নজরুল গণতন্ত্রকামী ও সাম্যবাদী। সুতরাং বাদশাহ আমানুল্লাহকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা তাঁর আদর্শবিরোধী। সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে তিনি স্বীয় মনের স্ববিরোধীতা বুঝতে পারেন।

কবি বলেন–

আমানুল্লার করি বন্দনা, কাবুল রাজার গাহি না গান'

Dhaka University Institutional Repository

মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানব জাতির অসম্মান![৪৬]

১৯২৬ খৃ. আমানুল্লাহ 'বাদশাহ' উপাধী লাভ করেন। নতুন বিধান জারী করেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত সংস্কার সাধন করেন। হাবীবুল্লাহ খানের নেতৃত্বে উপজাতীয় বিদ্রোহে আমানুল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত হন।

'জিঞ্জির' কাব্যের কবিতা 'নওরোজ' ও 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়' দু'টিই যৌবনের আনন্দ গানে পূর্ণ। 'নওরোজ' কবিতাটিতে কবি মোগল যুগের নওরোজ উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন। নওরোজ উৎসব মূলত মোগল হেরেমের রাজপুরুষ ও রাজমহিষীদের মন দেয়া নেয়ার উৎসব। 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়' কবিতাটিতে বন্ধনহীন আনন্দমূখর জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। 'বেহেশত' বলতে কবি যুবক-যুবতীর আনন্দ উৎসবের মেলাকেই বুঝাতে চেয়েছেন।

'জিঞ্জির' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'ঈদ মোবারক' ইসলাম ও মুসলিম সমাজ বিষয়ক। 'ঈদ মোবারক' কবিতায় কবি ঈদের আনন্দ ও ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের কাব্যিক প্রকাশ ফুটিয়ে তোলেছেন। ঈদের শিক্ষা হচ্ছে–সকল মুসলমান পরস্পর ভাই; ছোট-বড়, ধনি-নির্ধন কোন ভেদাভেদ নাই। ইসলামী সমাজে শ্রেণী বৈষম্যের কোন স্থান নেই। রাজা আর প্রজা সকলি সমান। শাসক জনগণের সেবকরূপে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে এটাই কবির কামনা। ইসলামী নীতির কাব্যিক রূপায়নে সার্থক 'ঈদ মোবারক'।

'চক্রবাক'

কবি নজরুলের 'চক্রবাক' কবিতাটি বাংলা ১৩৩৬ সনে (১৯২৯ খৃ.) প্রথম প্রকাশিত হয়। 'চক্রবাক' নজরুলের প্রেমের কবিতা সংকলন। এতে মোট বাইশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'ওগো চক্রবাকী', 'তোমারে পড়িছে মনে', 'এ মোর অহংকার', 'হিংসাতুর', 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ', '১৪০০ সাল', 'কর্ণফুলী', 'শীতের সিন্ধু' ও মিলন মোহনায়' প্রধান। 'চক্রবাকের' রোমান্টিক বিষণ্নতা প্রেম ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করে উৎসারিত হয়েছে। এ কাব্যেও প্রেম ও প্রকৃতি একাকার। কবি প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া বা না পাওয়া প্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করেন। 'চক্রবাক' কাব্যে চট্রগ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। পুবাক তরুর সারি, সিন্ধু, কর্ণফুলী, ও গিরি-পাহাড় এ কাব্যের পটভূমিকা।

বিরহী চক্রবাক বিরহী প্রেমিক-হৃদয়ের প্রতীক। 'চক্রবাকের' কবিতাগুলো বিরহের করুণতায় অশ্রুসিক্ত। স্নেহ-ভিখারী প্রেম–প্রত্যাশী একটি দরদী মনের শূন্যতায় হাহাকার 'চক্রবাক'এর প্রতিটি ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে। বিরহের বেদনায়, প্রেমের স্পর্শে এবং প্রকৃতির মায়ায় কবির উদ্যাম প্রাণচাঞ্চল্য শান্ত,

৪৬. কাজী নজরুল ইসলাম, 'জিঞ্জির', "আমানুল্লাহ", আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুলরচনাবলী, খ.২, পৃ. ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। 'চক্রবাক'এর সমস্ত কবিতায় চলেছে বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন। কবির হৃদয়-চক্রবাক ফেলে আসা দিনের পিছনে বার বার ধাবিত হয়েছে। যে আঘাত দিয়েছে, যে বঞ্চনা করেছে, যে তাকে বিস্মৃত হয়েছে–সে নিষ্ঠুরতাকে কবি অশ্রুঅর্ঘে পুজা করেছেন।

সমাজ-সচেতন ও বিদ্রোহী নজরুল 'চক্রবাকে' অনুপস্থিত। এখানে তিনি নিঃসঙ্গ, বিরহী, বেদনার্ত। নজরুল বিদ্রোহী হলেও রোমান্টিক। অপূর্ণতার অতৃপ্তি রোমান্টিক কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অভিযোগ ও অনুনয়ের বেদনা চক্রবাকের সুরে ছন্দে একটি ঔদাস্যের মন্থরতা মাখিয়ে দিয়েছে। প্রত্যাখ্যাত রিক্ত মনের জ্বালা অসহায়তার ভারে ক্লান্ত। চক্রবাকের ছন্দের তানে সে ক্লান্তির লক্ষণ স্পষ্ট।

নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৬ সালে (১৯২৯ খৃ.)। এতে মোট চব্বিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলোর মধ্যে 'সন্ধ্যা', 'তরুণ তাপষ', 'তরুণের গান', 'চল্ চল্ চল্', 'ভোরের সানাই', 'ভোরের পাখি', 'যৌবন জল-তরঙ্গ', 'জীবন-বন্ধনা', 'জাগরণ', 'রীফসর্দার', "বাংলার আজিজ" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নির্ভীক যৌবন ও অপরাজেয় মানুষের বন্দনা-গান 'সন্ধ্যা'। অধিকাংশ কবিতাই মাতৃভূমির স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে রচিত। কবি পরাধীন দেশ ভারতকে সন্ধ্যার অন্ধকারের সাথে তুলনা করে এর অবসান কামনা করেছেন। কবিতাগুলোর মধ্যে উপনিবেশবাদীদের বিতাড়ন, অন্যায়-অনাচার-নিপীড়ন ও বৈষম্য দূরীকরনের জন্য শক্তি ও সাহসের অনুপ্রেরণা দান করেছেন। এ অনুপ্রেরণার মূলে ছিল তরুণ-যুবাদের জাগিয়ে তোলা এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত হানা।

তরুণদের প্রতি নজরুলের আস্থা ও ভালবাসা ছিল গভীর। তাদের নির্ভীকতা এবং নিঃস্বার্থতাকে তিনি বিপ্লব-কর্মের উপযোগী বলে মনে করেছেন। তাই তাদের বার বার আহবান জানিয়েছেন নিপীড়িত মানুষের পক্ষে সংগ্রামের জন্য। তারুণ্য বলতে কবি বয়সের সীমাকেই বুঝাতে চান নি। তার দৃষ্টিতে সাহস, শক্তি, উদ্যম, আকাংখা, গতিশীলতা আর মানবতাই হল তারুণ্য। 'তরুণ তাপষ', 'আমি গাই তারি গান', 'জীবন-বন্দনা', 'ভোরের পাখি', 'যৌবন জলতরঙ্গ', 'যৌবন', 'তরুণের গান', 'চল্ চল্ চল্'–প্রভৃতি কবিতা ও গানে কবি যুব শক্তিকে বিদ্রোহের আহবান জানিয়েছেন। 'চল্ চল্ চল্' কবিতাটি নজরুল মাঘ ১৩৩৫/ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে ছাত্রদের সম্মেলনে আবৃত্তি করেন।

'আমি গাহি তারি গান' এবং 'জীবন বন্দনা' এ দু'টি কবিতায় নজরুল অপরাজেয় মানব-শক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আধুনিক যুগে যারা শাস্ত্রের কঙ্কাল, যারা অজানাকে জানার জন্য সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে ছুটে চলেছে, যারা অকারণ বিপ্লবে প্রাণ উৎসর্গ করছে, যারা নতুন নতুন আবিস্কারের নেশায়

Dhaka University Institutional Repository

তপস্যামগ্ন, কবিকণ্ঠ তাদের বন্দনা গানে মুখর। 'রীফ সর্দার', 'শরৎচন্দ্র', 'বাংলার আজিজ', 'তর্পণ','সুরের দুলাল'–কবিতাসমূহে যথাক্রমে মরক্কোর নেতা আবদুর করিম, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রামের স্কুল ইনস্পেক্টর খান বাহাদুর আবদুর আজিজ বি. এ, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং দিলীপ কুমার রায়ের উদ্দেশ্যে রচনা করেন। এ সব কবিতায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের মাহাত্ম ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য যথার্থরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

'প্রলয়-শিখা'

'প্রলয়-শিখা' কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৩৭ সালে (১৯৩০ খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট বিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ছয়/সাতটি গানও রয়েছে। 'প্রলয়-শিখা' গ্রন্থের কবিতাসমূহের মধ্যে 'প্রলয়-শিখা', 'হবে জয়', 'পূজা অভিনয়', 'যৌবন', 'চাষার গান', 'জাগরণ', 'রক্ততিলক' অন্যতম। কবি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরণের মুহূর্তে 'প্রলয়-শিখা' উদ্গীরণ করেন। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কবি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশ্য 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তির শর্তানুসারে তিনি কারাদণ্ড থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। জনগণের বিদ্রোহ আর বিপ্লব প্রয়াসকেই কবি 'প্রলয়-শিখা' বলতে চেয়েছেন। 'প্রলয়-শিখা' গ্রন্থে সমকালীন দেশ-কাল বিশেষত স্বদেশের সমসাময়িক রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ছায়াপাত করেছে।

মুক্তিকামী মানুষকে কবি আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন তাঁর 'হবে জয়' কবিতায়। মানুষের মঙ্গলকামী মহাপুরুষেরা যুগে যুগে উৎপীড়িত হয়েছে ঠিক কিন্তু তাই বলে অগ্রগতির প্রয়াস কোন কালেই স্তব্ধ হয়নি । 'পুজা-অভিনয়' কবিতায় কবি হিন্দুদের পূজাকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করেছেন। 'জাগরণ' কবিতায় তিনি দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাগরণের আহবান জানিয়েছেন এবং পরাধীন ঘুমন্ত স্বজাতিকে জাগানোর ব্যর্থ চেষ্টার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন।

'প্রলয়-শিখা'র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিংশ শতাব্দী'। এখানে নজরুলের বিপ্লবী মনোভঙ্গি পুরাতন পচা অতীতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। আধুনিক যুগের তরুণদের স্বদেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সর্বাত্নক সংগ্রাম এবং পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে শির উচু করে দাঁড়ানোর আহবান রয়েছে উক্ত কবিতায়। সংস্কারের জগদ্দল পাষাণ ভেঙ্গে দিয়ে–সকল কালের উচ্চে শির তুলেছে 'বিংশ শতাব্দী'।

'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'

নজরুলের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' আষাঢ় ১৩৩৭ সালে (১৯৩০ খৃ.) প্রকাশিত হয়। করাচীর বাঙ্গালী পল্টনে থাকাকালে পল্টনের পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেবের কাছে ফার্সী শিখেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কাছ থেকে ফার্সী কবিদের বিখ্যাত সব কাব্য পড়ে হাফিজের[৪৭] 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছে হয়। সে থেকে তিনি হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদ শুরু করেন। তাঁর অনুদিত হাফিজের 'দীওয়ান'গুলো তৎকালিন 'মোসলেম ভারত', 'প্রবাসী' ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'সহ বিভিন্ন মাসিকে ছাপা হয়। তিনি বাঙ্গালী পল্টনে থাকাকালিন ত্রিশ-পয়ত্রিশটি ও পরবর্তিতে বাকী 'দীওয়ান'গুলো সমাপ্ত করেন। 'দীওয়ানে হাফিজে' প্রায় পাঁচ শতাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে।

'কাব্য আমপারা'

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে (বাং. ১৩৪০) নজরুলের 'কাব্য আমপারা' কলকাতা করীম বখ্শ ব্রাদার্স প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের আল কোরআনের পঠনপাঠন, মুখস্থকরণ এবং মর্মার্থ সহজবোধ্য করার জন্য নজরুল কোরআনুল কারীমের ত্রিশতম পারা 'আমপারা'র মোট আটত্রিশটি সুরা সরল পদ্যে বঙ্গানুবাদ করেন। শিশু-কিশোররাও যাতে অতি সহজে কোরআন মুখস্ত করতে পারে সে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এ মহান কাজটি সুসম্পন্ন করেন। তিনি 'Sales Quran' মাওলানা মোহাম্মদ আলীর 'আল-কোরআন', 'তাফসীরে হোসাইনী', 'তাফসীরে বায়জাভী', 'তাফসীরে কবীরী', 'তাফসীরে আজিজী', 'তাফসীরে মাওলানা আবদুল হক দেহলভী', 'তাফসীরে জালালাইন', মাওলানা আকরম খাঁ এবং মাওলানা রুহুল আমীন কৃত 'আমপারা' প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থের সহায়তায় এবং ফখরোল মোহাদ্দেসীন মৌলানা মোহাম্মদ মোমতাজ উদ্দিন, মৌলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ, মিঃ ইস্কান্দার গজনভী বি.এ , মৌলবী কে.এম.হেলাল সাহেবসহ বহু ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ পন্ডিতদের সম্পাদনায় তাফসীরের কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেন।[৪৮]

'মরু-ভাস্কর'

১৯৩০ খৃ. নজরুল বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে ইতিহাস ভিত্তিক মহাকাব্য 'মরু-ভাস্কর' লেখা শুরু করেন। প্রথম কবিতা 'অবতরণিকা' ১৩৩৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে সর্বমোট আঠারটি কবিতা চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সংকলিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে সাতটি কবিতা-'অবতরণিকা',

---

৪৭. পারস্যের তীর্থভূমি ইরানের সিরাজ নগর। শিরাজেরই মোসল্লা নামক স্থানে বিশ্ববিশ্রুত কবি হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আমল নাম শাম্‌সুদ্দিন মোহাম্মদ, হাফিজ তাঁর উপনাম। পিতার নাম বাহাউদ্দিন। হাফিজের পিতা ইস্পাহান থেকে ব্যবসা উপলক্ষে শিরাজে এসে বসবাস শুরু করেন। হাফিজ পাঠ্যাবস্থাই স্বীয় প্রতিভাবলে কবিতা লেখা শুরু শুরু করেন। কবির মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু গুল-আন্দাম তাঁর সমস্ত কবিতা 'দীওয়ান' আকারে সংগ্রহ ও সংকলন করেন। যৌবন কালে তিনি 'শরাব-সাকীর' প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও পরবর্তিতে প্রখ্যাত 'সূফী' সাধকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। দ্রঃ আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), খ.ত, পৃ. ১২৮-১৩৩

৪৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, খ.ত, পৃ. ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

'অনাগত', 'অভ্যুদয়', 'স্বপ্ন', 'আলো-আঁধারি', 'দাদা' ও 'পরভৃত'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারটি কবিতা–'শৈশব-লীলা', 'প্রত্যাবর্তন', 'শাককুস্ সাদর' ও 'সর্বহারা'। তৃতীয় অধ্যায়ে দু'টি কবিতা–'কৈশোর' ও 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ'। চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে রয়েছে 'শাদী মোবারক', 'খদিজা', 'সম্প্রদান', 'নওকাবা' ও 'সাম্যবাদী' পাঁচটি কবিতা।

নজরুল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)–এর আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন, আর কবি জীবনের মধ্য পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর জীবনী নিয়ে একটি পূর্ণ কাব্য রচনায় ব্রতী হন। 'মরু-ভাস্কর' নজরুলের অখণ্ড কাব্য রচনার প্রথম ও শেষ প্রয়াস। দুর্ভাগ্যবশত কাব্যটি অসমাপ্ত, কাব্যটি সম্পন্ন হবার পূর্বেই নজরুলের লেখনী নীরব হয়ে যায়। নজরুলের কবি-জীবনের প্রথম পর্বে কোন কোন কবিতায় ভগবান বা ঈশ্বর সম্পর্ক্যে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে ঈশ্বরদ্রোহীতার অভিযোগ উঠেছিল কিন্তু নজরুল কবি-জীবনের শেষে রচিত কয়েকটি কবিতায় আল্লাহ তায়ালাকে প্রিয়তম, প্রেমময়, পরম সুন্দর, চরম পতি, ধ্যান-জ্ঞান, তনু-মন-প্রাণ ও পরম গতি রূপে কল্পনা করেছেন। 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে নজরুলের কবি-জীবনের সমাপ্তী ঘটেছে। হযরত মোহাম্মদ (সা.)–এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পরম বিশ্বাসীরূপে আল্লাহ তায়ালার জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্য-জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন।

'অবতরণিকা' অধ্যায়ে কবি মরু-ভাস্কর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)–এর আবির্ভাবের আনন্দ সংবাদ বিবৃত করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.)–এর আগমনে যেন নিখিল বিশ্বে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে। 'অনাগত' অংশে কবি স্রষ্টা কর্তৃক বিশ্বের আদি মানব হযরত আদম (আ.)–এর সৃষ্টি এবং তাঁর ভিতরে মোহাম্মদ রূপ আলো প্রদানের কথা বলেছেন। 'অভ্যুদয়' অংশে কবি প্রাক-ইসলামী যুগের অধঃপতিত আরবের সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন। আরবের তথা পৃথিবীর এ চরম দুর্দিনে তমসাচ্ছন্ন বিশ্বের আকাশে দেখা দিলেন মোহাম্মদ (সা.)।

এরপর একে একে সকল ঘটনাই যেমন মা আমিনার স্বপ্ন, পিতা আবদুল্লার পরলোকগমন, দাদা আবদুল মোত্তালিবের অভিভাবকত্ব ও বিবি হালিমা সা'দিয়ার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ, শাক্কুস সাদ্র বা বক্ষবিদারণ, ছ'বছর বয়সে মা আমিনার নিকট প্রত্যাবর্তন, মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মায়ের মৃত্যু, আরো দু'বছর পর দাদা আবদুল মোত্তালিবের ইনতেকাল, অতঃপর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হওয়া। বাণিজোপলক্ষে চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া গমন এবং বুহায়রা পাদ্রীর ভবিষ্যতবাণী। 'উকাজ মেলাকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃঘাতী 'ফেজার' যুদ্ধ মহানবীর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর মধ্যস্থতায় অবসান, প্রিয়নবীর পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার ধনাঢ্য মহিলা বিবি খাদিজার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

পরিণয় সূত্রে বন্ধন। কা'বা ঘরের পুনর্নির্মাণ কালে হজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোত্রের ঝগড়া ও কলহের সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ সমাধান এ সব কিছুই কবি সুন্দ ও সাবলীলভাবে কাব্যিক আঙ্গিকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করেন।

'নতুন চাঁদ'

কাজী নজরুল ইসলামের 'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থ বাংলা ১৩৫২ সালে (১৯৪৫ খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট বিশটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে 'নতুন চাঁদ', 'চির-জনমের প্রিয়া', 'আমার কবিতা তুমি', 'সে যে আমি', 'অভয় সুন্দর', 'দুর্বার যৌবন', 'আর কত দিন?', 'ওঠরে চাষী', 'মোবারকবাদ', 'কৃষকের ঈদ', 'আজাদ', ঈদের চাঁদ', 'চাঁদনী রাতে' ইত্যাদি প্রধান।

'নতুন চাঁদ' গ্রন্থে সঙ্কলিত কয়েকটি গীতি কবিতায় কবির আবেগ ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেদনাময় এবং গভীর। নজরুলের কবি-জীবনের শেষ পর্বে রচিত এ সব কবিতায় কবিকে 'চির জনমের প্রিয়ার জন্যে ব্যাকুল দেখা যায়। চির জনমের প্রিয়ার অনুসন্ধানে অনন্তলোকে অনন্ত রূপে ক্রন্দনরত প্রেমিকের অভিষার-যাত্রা নজরুলের প্রেম কবিতাকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। জীবনে যাকে মেলেনি, জীবন প্রদীপ নিভে যাবার আগে তার জন্যে আকুলতা স্বাভাবিক ভাবেই তীব্রতর হয়েছে। জীবরে যে সাধ আশা পূর্ণ হয়নি, যে প্রেমের তৃষ্ণা মেটেনি, প্রেমিকের মৃত্যু হলেও প্রেমিকের সে অপূর্ণ সাধ আশার তো মৃত্যু নেই। তাই অনন্তলোকে অনন্ত রূপে অনন্ত কাল ধরে না পাওয়া প্রেমিকের জন্যে প্রেমিকের ক্রন্দনরোল ধ্বনিত হবেই। নজরুল তাঁর কবি-জীবনের শেষ পর্বে যে প্রিয়তমের অপেক্ষায় অধীর ও অস্থির হয়েছে, সে কখনো অশরীরী চেতনা রূপেও প্রতিভাত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর প্রেমের স্বরূপ কবি-জীবনের শেষ পর্বে মরমী রূপ লাভ করেছে। সমষ্টিগত জীবনে যে কবির কণ্ঠে আশার গান ধ্বনিত হয়েছে , ব্যক্তি জীবনে তাঁকেই গাইতে হয়েছে নিরবধি বেদনার গান। সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনে নজরুলের কণ্ঠে হতাশার সুর পরিলক্ষিত না হলেও আত্মগত কবিতাসমূহে একটা অতৃপ্ত আত্মার আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

'নতুন চাঁদ' কাব্যগ্রন্থে যেমনি আছে গাঢ় প্রেমানুভূতি তেমনি আছে বিদ্রোহাত্মক জ্বালা। 'নতুন চাঁদ' কবিতাটি ৫ নভেম্বর ১৯৪১ খৃ. দৈনিক নবযুগ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এবং সূফীতত্ব জ্ঞানের পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'অভেদম' কবিতায় প্রখ্যাত সূফী ইবনুল আরাবীর (মৃ.১২৪০ খৃ.) সর্বখোদাবাদ (প্যানথিজম) ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি এ কাব্যে সূফীতত্ত্বের ভিত্তিতে পরম সত্যকে অনুসন্ধানের আহবান করেছেন। 'চির জনমের প্রিয়া', 'আমার কবিতা তুমি', 'সে যে আমি' ও 'নিরুক্ত' কবিতায় নজরুলের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

তিনি 'আমার সুন্দর' নামক কবিতায় তাঁর মানস বিকাশের তথা আধ্যাত্মিক চেতনার ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন।

'চির জনমের প্রিয়া' কবিতায় এক প্রতিক্ষিত বিরহী হৃদয়ের গভীর আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। কবির দৃষ্টিতে আকাশের বিনিদ্র তারা যেন অভিষপ্ত বিরহীর আঁখি, ঝরা ফুল যেন কুটি জনমের ছিন্ন অশ্রু-হার, পুর্ণিমা চাঁদ যেন প্রেমিকের কুটি জনমের অপূর্ণ সাথের প্রতীক। 'দুর্বর যৌবন', 'ওঠ রে চাষী', 'মোবারকবাদ', 'কৃষকের ঈদ', 'শিখা', 'আজাদ', 'ঈদের চাঁদ', 'অভয় সুন্দর') প্রভৃতি কবিতায় কবির স্বভাব-সিদ্ধ বিদ্রোহ, স্বধীনতাপ্রীতি ও সাম্য-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। 'দুর্বার যৌবন' কবিতায় নজরুল দেশের যুব-শক্তিকে বিদ্রোহের পথে আসার ডাক দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংশ যা-ই হোক না কেন বিদ্রোহের পথেই মুক্তি, বিদ্রোহের পথেই স্বাধীনতা।

'ওঠ রে চাষী', 'কৃষকের ঈদ'-এ দু'টি কবিতায় শোষিত কৃষক শ্রেণীর দুঃসহ জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলেছেন নজরুল। ঈদের পবিত্র উৎসবের দিনেও কবির দৃষ্টিতে পড়েছে দুর্দশাগ্রস্থ কৃষিজীবীদের জীবনের মর্মান্তিক রূপ। 'আজাদ' কবিতায় কবি মুসলমান সমাজকে বিদ্রুপের কষাঘাত করেছেন। প্রাণহীন, সাহসহারা, উদ্দীপনা বঞ্চিত সমাজকে তিনি 'কলের পুতুল' অভিহিত করেছেন।

নজরুলের শেষ পর্যায়ের কবিতায় আবেগ-অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার নতুনত্ব নেই সত্য কিন্তু উপলব্ধির গাঢ়তা আছে। উপলব্ধির এ গাঢ়তার জন্য 'নতুন চাঁদ' এর কবিতাগুলো সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

'শেষ-সওগাত'

নজরুল ইসলামের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'শেষ-সওগাত' বাংলা ১৩৬৫ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৫৮খৃ.) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে সর্বমোট বিয়াল্লিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'শেষ-সওগাত'-এর প্রায় সকল কবিতার বক্তব্য-বিষয় কবির সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা। ব্যতিক্রম শুধু 'নারী' ও 'সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি' কবিতা দু'টি। নারীকে কবি অনুপ্রেরণাময়ী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাকে স্বর্গীয় ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। নজরুলের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলোর মধ্যে 'সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি' কবিতাটি ভাষায় ও ভাবে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'নিত্য প্রবল হও', 'চির বিদ্রোহী', 'ভয় করিও না, মানবাত্মা', 'নবযুগ', 'মোহররম', 'আর কত দিন?', 'বিশ্বাস ও আশা', 'ডুবিবে না আশা তরী', 'বকরীদ', 'আল্লাহর রাহে ভিক্ষা দাও', 'একি আল্লার কৃপা নয়?', 'মোহসিন স্মরণে', 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ', 'গোড়ামী ধর্ম নয়', 'কবির মুক্তি' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ কবিতাই নজরুলের নবযুগের 'সম্পাদক' থাকাকালে রচিত।

'শেষ-সওগাত' গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'জাগো সৈনিক আত্মা'। কবিতাটিতে মানুষ জাতিকে মুক্তির অভিযানে এগিয়ে চলার আহবান জানিয়েছেন। নজরুল জাতীয় নেতৃত্বের সততায় সর্বদাই সন্দিহান ছিলেন, তাই 'বন্ধুরা এসো ফিরে' কবিতায় জাতীয় নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন। 'শেষ-সওগাত' কাব্যের অন্যতম কবিতা 'চির বিদ্রোহী'। কবি জীবনের প্রারম্ভে বিদ্রোহী হয়েছিলেন নজরুল। কেন তিনি বিদ্রোহ করেছেন সে সম্পর্কে গদ্যে ও পদ্যে তাঁর অনেক বক্তব্য আছে, সে সব বক্তব্য 'চির বিদ্রোহী'র অন্তর্ভূক্ত। বিদ্রোহের তীব্রতা ও সমাজ সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও নজরুলের শেষ পর্যায়ের কবিতা কল্পনা-আবেগ-বঞ্চিত। অথচ তাঁর প্রথম পর্যায়ের বক্তব্য আবেগ ও কল্পনা রঞ্জিত। শেষের দিকে তিনি অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্যকে ছন্দে প্রকাশ করেছেন মাত্র, কবিতায় রূপান্তরিত করতে পারেন নি। অবশ্য তাঁর এ পর্যায়ের কবিতা যতই দুর্বল হোক না কেন, মানব-বিকাশের বিবর্তন বোঝার জন্যে এর মূল্য অপরিসীম।

'নিত্য প্রবল হও' কবিতায় কবি ঈমানদার ব্যক্তিকে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির নিকট মাথানত করতে বারণ করেছেন। ঈমান ও ছবর একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই অবিচল ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতার মুখে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সুদৃঢ় থাকার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

'মোহররম' মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) প্রিয় দৌহিত্র হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের স্মৃতি বিজড়িত মাস। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়, অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী-স্বেচ্ছাচারী ইয়াজিদের দুঃশাসনের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরণ জিহাদ করে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। এটি বিশ্ব মুসলিমের জন্য একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা। মুসলিম বিশ্বে দিনটি জাতীয় শোঁক দিবস হিসেবে পালিত হয়। 'মোহররম' কবিতায় কবি নজরুল ঔপনিবেশিক ব্রটিশ রাজকে প্রতীকী অর্থে 'এজীদ' রূপে আখ্যায়িত করে এদের বিরুদ্ধে শোচ্চার হবার আহবান জানান। 'মোহররম' মুসলমানদের মধ্যে মাযহাবী অনৈক্য সৃষ্টির পরিবর্তে ঐক্য ও আত্মত্যাগের আহবান জানায়।

'শেষ-সওগাত' কাব্যের 'বিশ্বাস ও আশা' কবিতায় কবি ইসলাম ধর্মকে আশার ধর্ম আখ্যায়িত করে বলেন, ইসলাম নিরাশার ধর্ম নয়। মানুষ নিজ চেষ্টা ও সাধনাবলে নিজের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারে। অন্যের উপর নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে রাখলে কষ্মিনকালেও ভাগ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–ليس للانسان الا سعى "চেষ্টা সাধনা অনুযায়ী মানুষের ফল লাভ হয়ে থাকে"[৪৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "কোন জাতি

৪৯. আল কোরআন, সুরা-৫৩, আয়াত. ৩৯

নিজেরা নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন না করা অবধি আল্লাহ তা'য়ালা কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না।[৫০]

'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'

কবি নজরুল ইসলামের 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' শীর্ষক ফার্সী চতুষপদী কাব্য গ্রন্থের কাব্যানুবাদ বাংলা ১৩৬৬ সালে (১৯৫৯ খৃ.) প্রকাশিত হয়। এতে মোট ঊনিশটি রুবাঈ' সংকলিত হয়েছে। করাচীর বাঙ্গালী পল্টনে থাকা অবস্থায় নজরুলের ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের কাব্যানুবাদ ১৩৩৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়। অতপর ১৩৪০এর কার্তিক-পৌষ সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'তে নজরুলের অনুদিত ওমর খৈয়ামের ঊনষাটটি রুবাঈ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মূল রুবাইয়াৎ ফার্সী গ্রন্থের প্রায় এক হাজার রুবাঈ' থেকে বাছাই করে মাত্র একশত সাতান্নব্বইটি রুবাঈ' বাংলায় কাব্যরূপ দান কেরন।

ওমর খৈয়ামের মূল নাম গিয়াসুদ্দীন আবুল ফাত্হ্ উমর ইবন্ ইবরাহীম আল খৈয়াম। জন্ম সন, তারিখ অজ্ঞাত, মৃত্যু আনুমানিক ১১২৩ খৃ.। খৈয়াম তাঁর বংশগত পদবী। তিনি গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মাঝে মধ্যে অবসর সময়ে চতুষ্পদী কবিতা লিখতেন। তাঁর নামে কোন গজল, মসনবী বা দীর্ঘ কবিতা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি। জীবনের অধিকাংশ সময় বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র এবং সামান্য কাব্য চর্চায় অতিবাহিত করেন। তাঁর এককালের সহপাঠী বন্ধু নিজাম-উল-মুলক এর পক্ষ থেকে 'উচ্চ রাজপদ' লাভের অফার পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেন। কবি নজরুল তাঁকে একজন খাঁটি সূফী মুসলমান এবং নবী করীম (সা.)–এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল বলে মনে করেন।

'ঝড়'

নজরুলের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'ঝড়' অগ্রহায়ন ১৩৬৭ সালে (১৯৬০ খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট আটটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে 'উঠিয়াছে ঝড়', 'শাখ-ই-নবাত', 'দিওয়ান-ই-হাফিজ', 'ক্ষমাকরো হযরত', 'সাম্পানের গান' ও অনামিকা উল্লেখযোগ্য।

এ পর্যন্ত কবি নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হল। কারণ নজরুল বাংলা সাহিত্য জগতে একজন খ্যাতিমান 'কবি' হিসেবেই পরিচিত। যদিও তিনি প্রথমে একজন 'গদ্য লেখক' হিসেবে সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। নজরুল গানের পাখি হিসেবেও সমধিক পরিচিত। তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান ছাড়াও বহু সংখক গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ও ছোটগল্প রয়েছে। যেহেতু আমার মূল উদ্দেশ্য নজরুলের কাব্য সাধনা সম্পর্কে পর্যালোচনা, তাই গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্প

---

৫০. আল কোরআন, সুরা- ১৩, আয়াত- ১১

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি বিষয়ে নজরুলের অবদান সম্পর্কে গভীর ও বিস্তারিত পর্যালোচনায় না গিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্মের কালানুক্রমিক বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

কবি নজরুল ইসলামের কালানুক্রমিক তালিকা:[৫১]

১.	অগ্নি-বীণা (কবিতা)	...	বাংলা	...	১৩২৯/১৯২২ খৃ.
২.	যুগবাণী (প্রবন্ধ)	...	,,	...	১৩২৯/১৯২২ খৃ.
৩.	রাজবন্দীর জবানবন্দী (প্রবন্ধ)	...	,,	...	১৩২৯/১৯২২ খৃ.
৪.	ব্যথার দান (গল্পগ্রন্থ)	...	,,	...	১৩২৯/১৯২২ খৃ.
৫.	দোলন-চাঁপা (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩০/১৯২৩ খৃ.
৬.	বিষের-বাঁশী (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩১/১৯২৪ খৃ.
৭.	রিক্তের বেদন (গল্পগ্রন্থ)	...	,,	...	১৩৩১/১৯২৪ খৃ.
৮.	ভাঙ্গার গান (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩১/১৯২৪ খৃ.
৯.	ছায়ানট (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩২/১৯২৪ খৃ.
১০.	পুবের হাওয়া (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩২/১৯২৫ খৃ.
১১.	সাম্যবাদী (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩২/১৯২৫ খৃ.
১২.	চিত্তনামা (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩২/১৯২৫ খৃ.
১৩.	সর্বহারা (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩৩/১৯২৬ খৃ.
১৪.	ঝিঙেফুল (কিশোর কাব্য)	...	,,	...	১৩৩৩/১৯২৬ খৃ.
১৫.	রুদ্রমঙ্গল (প্রবন্ধ)	...	,,	...	১৩৩৩/১৯২৬ খৃ.
১৬.	দুর্দিনের যাত্রী (প্রবন্ধ)	...	,,	...	১৩৩৩/১৯২৬ খৃ.
১৭.	ফণি-মনসা (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩৪/১৯২৭ খৃ.
১৮.	সিন্দু-হিন্দোল (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩৪/১৯২৭ খৃ.
১৯.	বাঁধন-হারা (উপন্যাস)	...	,,	...	১৩৩৪/১৯২৭ খৃ.
২০.	জিঞ্জির (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩৫/১৯২৮ খৃ.
২১.	সঞ্চিতা (কাব্য সঙ্কলন)	...	,,	...	১৩৩৫/১৯২৮ খৃ.
২২.	বুলবুল ১ম খণ্ড (গান)	...	,,	...	১৩৩৫/১৯২৮ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

২৩.	চক্রবাক (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩৬/১৯২৯ খৃ.
২৪.	সন্ধ্যা (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩৬/১৯২৯ খৃ.
২৫.	চোখের চাতক (গান)	...	,,	...	১৩৩৬/১৯২৯ খৃ.
২৬.	প্রলয়-শিখা (কবিতা)	...	,,	...	১৩৩৭/১৯৩০ খৃ.
২৭.	রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (কাব্যানুবাদ)	...	,,	...	১৩৩৭/১৯৩০ খৃ.
২৮.	নজরুল-গীতিকা (গীতি সঙ্কলন)	...	,,	...	১৩৩৭/১৯৩০ খৃ.
২৯.	চন্দ্রবিন্দু (গান)	...	,,	...	১৩৩৭/১৯৩০ খৃ.
৩০.	মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস)	...	,,	...	১৩৩৭/১৯৩০ খৃ.
৩১.	ঝিলিমিলি (নাটক)	...	,,	...	১৩৩৭/১৯৩০ খৃ.
৩২.	শিউলিমালা (গল্পগ্রন্থ)	...	,,	...	১৩৩৮/১৯৩১ খৃ.
৩৩.	কুহেলিকা (উপন্যাস)	...	,,	...	১৩৩৮/১৯৩১ খৃ.
৩৪.	আলেয়া (গীতিনাট্য)	...	,,	...	১৩৩৮/১৯৩১ খৃ.
৩৫.	সুর-সাকী (গান)	...	,,	...	১৩৩৯/১৯৩১ খৃ.
৩৬.	জুলফিকার (গান)	...	,,	...	১৩৩৯/১৯৩২ খৃ.
৩৭.	বনগীতি (গান)	...	,,	...	১৩৩৯/১৯৩২ খৃ.
৩৮.	কাব্যে-আমপারা (কাব্যানুবাদ)	...	,,	...	১৩৪০/১৯৩৩ খৃ.
৩৯.	গুল-বাগিচা (গান)	...	,,	...	১৩৪০/১৯৩৩ খৃ.
৪০.	পুতুলের বিয়ে (শিশু সাহিত্য)	...	,,	...	১৩৪০/১৯৩৩ খৃ.
৪১.	গীতি-শতদল (গান)	...	,,	...	১৩৪১/১৯৩৪ খৃ.
৪২.	গানের মালা (গান)	...	,,	...	১৩৪১/১৯৩৪ খৃ.
৪৩.	সুরলিপি (স্বরলিপি)	...	,,	...	১৩৪১/১৯৩৪ খৃ.
৪৪.	সুরমুকুর (স্বরলিপি)	...	,,	...	১৩৪১/১৯৩৪ খৃ.
৪৫.	মক্তব সাহিত্য (শিশু সাহিত্য)	...	,,	...	১৩৪৩/১৯৩৬ খৃ.
৪৬.	নির্ঝর (কবিতা)	...	,,	...	১৩৪৫/১৯৩৮ খৃ.
৪৭.	নতুন চাঁদ (কবিতা)	...	,,	...	১৩৫১/১৯৪৪ খৃ.
৪৮.	বুলবুল ২য় খণ্ড (গান)	...	,,	...	১৩৫৯/১৯৫২ খৃ.

৫১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইসলাম কালজ কালোত্তর, পৃ. ১৪৯; আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, পৃ. ৩৪১-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৪৯.	সঞ্চয়ন (শিশু সাহিত্য)	...	,,	...	১৩৬২/১৯৫৫ খৃ.
৫০.	মরু-ভাস্কর (রসুলচরিত কাব্য)	...	,,	...	১৩৬৪/১৯৫৭ খৃ.
৫১.	শেষ-সওগাত (কবিতা)	...	,,	...	১৩৬৫/১৯৫৮ খৃ.
৫২.	মধুমালা (গীতিনাট্য)	...	,,	...	১৩৬৫/১৯৫৮ খৃ.
৫৩.	রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (কাব্যানুবাদ)	...	,,	...	১৩৬৬/১৯৫৯ খৃ.
৫৪.	ঝড় (কবিতা)	...	,,	...	১৩৬৭/১৯৬০ খৃ.
৫৫.	ধূমকেতু (প্রবন্ধ)	...	,,	...	১৩৬৭/১৯৬০ খৃ.
৫৬.	পিলেপট্‌কা (শিশু সাহিত্য)	...	,,	...	১৩৭০/১৯৬৩ খৃ.
৫৭.	ঘুম জাগানো পাখি (শিশু সাহিত্য)	...	,,	...	১৩৭১/১৯৬৪ খৃ.
৫৮.	রাঙাজবা (গান)	...	,,	...	১৩৭৩/১৯৬৬ খৃ.
৫৯.	দেবী-স্তুতি (নাটক)	...	,,	...	১৩৭৫/১৯৬৮ খৃ.
৬০.	নজরুল গীতি-সন্ধানে (গান)	...	,,	...	১৩৭৬/১৯৬৯ খৃ.
৬১.	সন্ধ্যামালতি (গান)	...	,,	...	১৩৭৭/১৯৭০ খৃ.
৬২.	নজরুল-গীতিঃ ১ম-৫ম (গান)	...	,,	...	১৩৭৯/১৯৭২ খৃ.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

আ

আউলিয়া > আওলিয়া (أوليــاء) শব্দটি বহুবচন, একবচনে অলি (ولي) ওলী, বন্ধু, অভিভাবক, দরবেশ, কর্তা, পৃষ্ঠপোষক, মহাত্মা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে কবি 'আউলিয়া' শব্দ দ্বারা দরবেশ তথা আল্লাহর বন্ধু অর্থ বুঝায়েছেন। উল্লেখ্য যে, আউলিয়া শব্দটি যদিও অলি শব্দের বহুবচন। তথাপি শব্দটি বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণে কবি একবচন হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্মরূপ :

আউলিয়া সাধু নিজামুদ্দিন
সপিল তোমায় স্বরগ-জ্যোতি[১]

আকবর > আকবার (أكبر) সুমহান, বৃহত্তম, মহত্তর,সবচেয়ে বড় ইত্যাদি। নামবাচক বিশেষ্য।

'আকবর' শব্দ দ্বারা মোগল সম্রাট আকবরকে বুঝানো হয়েছে। সম্রাট আকবর (রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) পিতা হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৫৫৬ খৃ. মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। একজন বিজয়ী বীর, প্রশাসক ও শিল্প সংস্থার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সমসাময়িক বিখ্যাত শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আবুল ফজল রচিত 'আকবর নামা' উল্লেখযোগ্য।[২]

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

দেখেছ আবার আকবর শার
মার শোকে গোঁফ দাড়ি মুড়ানো।[৩]

আখেরে /আখেরী > আ'খির (أخر) শেষ, সমাপ্তি, পরিণাম, উপসংহার। শব্দটি উর্দু ভাষায় আখেরে ও আখেরী দু'ভাবে আসে। আরবীতে শব্দটি ى(নেছবত) যোগে 'আখেরী' হয়েছে।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪] পাঁচবার 'শেষ' অর্থে এসেছে–

দাড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে
কেউ দিত, কেউ দিত বা তাড়ায়ে
'ভিখারীর ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায়'[৫]

---

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা' "বেলা শেষের গান" (কলকাতা:এম.সি.সরকার এণ্ড সন্স,তা.বি), পৃ. ১৫১
২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলা পিডিয়া (ঢাকা:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৩), খ. ১,পৃ. ১১৩-১১৪
৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলা শেষের গান", পৃ. ১৫০
৪. আখেরী: বেলাশেষের গান (চার বার),শবাসীন: তুলির-লিখন (এক বার)
৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শবাসীন' "তুলির-লিখন"(কলকাতা:কান্তিক প্রেস,১৩২১ বাং), পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

আতর >'ইত্‌র (عطر) সুগন্ধি, সৌরভ, সুঘ্রাণ, সুবাস ইত্যাদি ।

আতর শব্দটি আটটি কবিতায়[৬] নয়বার 'সুগন্ধি' অর্থে এসেছে–

আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভীতে মোরা মগণ সর্ব্বদাই ।[৭]

আদায় > আদা' (ادا) পরিশোধ, আদায়, সম্পাদন,পালন, গ্রহণ, সংগ্রহ, উসুল ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৮] চারবার 'উসুল' অর্থে এসেছে–

কার কাছে বা ততটুক্‌ ও হয়নিক আদায়
কেউ বা গেছে মানে মানে কেউ ঠেকেছে, দায় ।[৯]

আবীর >'আবীর (عبير) সুগন্ধি, সুবাস, রঞ্জকদ্রব্য ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সুবাস' অর্থে এসেছে–

ফুলের গন্ধ চাঁদের আলো
আগের মতোই লাগে ভালো
আবীর-মাখা মেঘের কোণে সূর্য্য অস্ত-গামী;[১০]

আমীর > আমীর (أمير) যুবরাজ, শাহজাদা, রাজা, বাদশাহ, শাসনকর্তা, নেতা, অমাত্য, রাজ সভাষদ, অভিজাত ব্যক্তি, সর্দার, ধনী, বিত্তবান ইত্যাদি ।

'আমীর' শব্দটি চারটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে ।

'রাজা-বাদশাহ' অর্থে তিনটি কবিতায়[১১] চারবার–

প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা–নাকাড়া,
গিয়েছে বেজে;
গোলাম তোমার আমীর হয়েছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে![১২]

---

৬. কয়েকটি গান:বেলা শেষের গান, আলের পাথার, ইনসাফ: বিদায়-আরতি, প্রিয়া যবে পাশে: তীর্থ সলিল, আফিমের ফুল, কবর-ই-নুরজাহান, সাঝাই: কাব্য-সঞ্চয়ন, মিলনান্দ মনোজ্ঞ: তীর্থরেণু ।

৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রিয়া যবে পাশে' :"তীর্থ সলিল"(কলকাতা:ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ, ১৩১৯ বাং.), সং. ২, পৃ. ৭২

৮. নৈশ তর্পণ: বেনু ও বীণা, লুব্ধা, তাজা-বেতাজা: তীর্থরেণু, মরিয়া: তুলির লিখন

৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নৈশ তর্পণ', " বেনু ও বীণা", ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্র রচনাবলী (কলিকাতা:ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৪), খ. ১, পৃ. ২৬

১০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আমি', "কুহু ও কেকা", (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮ বাং.), পৃ. ১৩৮

১১. পদস্থ বন্ধুর প্রতি:তীর্থ-সলিল(২বার),দিল্লীনামা: বেলা শেষের গান, খেয়ালীর প্রেম:তীর্থ-রেণু

১২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'খেয়ালীর প্রেম' "তীর্থ-রেণু",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩

Dhaka University Institutional Repository

'ধনী' বা 'বিত্তবান' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

গরীবের প্রাণ, **আমীরের** প্রাণ,–
সমান যে জন জানে,
সর্দারী তারি– সুল্‌তানী তারি–
দুনিয়ার মাঝখানে;[১৩]

আরব > 'আরাব > (عرب) আরব ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'আরব জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

কালো-অশোক জগৎ-প্রিয়,– রাজার সেরা তাঁরে জানি;
হাব্‌সী কালো লোকমানেরে মানে **আরব** আর ইরানী ।[১৪]

আলিম >'আলিম (عالم) জ্ঞানী, বিদ্বান, পণ্ডিত, শিক্ষিত, বিজ্ঞানী, ইসলাম ধর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'পণ্ডিত' অর্থে এসেছে–

ভক্ত হ'ল জ্ঞানীর সেরা গ্রন্থ না ছু'য়ে,
ভক্ত **আলিম** সত্য ইলম্‌ অন্তরে থুয়ে,[১৫]

আল্লা > আল্লাহ (الله) সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সৃষ্টিকর্তা' অর্থে এসেছে–

বোধিবৃক্ষের মালিক? –কিবা সে
জর্ডন-তীর-চারী ?
কিবা **আল্লার** প্রেরিত পুরুষ
অমিলে মিলন-কারী ?[১৬]

ই

ইজ্জত > ইজ্জৎ > (ইয্‌যাহ) (عزة) আবরু, মান, মর্যাদা, গৌরব, সম্মান, সতীত্ব ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৭] চারবার 'মান-সম্মান' অর্থে এসেছে–

কাঁদতে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
'ইজ্জতে' ভাই রাখতে বজায় বল বাহুতেই আছে ।[১৮]

---

১৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", ড.অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সত্যেন্দ্র রচনাবলী (কলিকাতা:ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৬), খ. ৩, পৃ. ২৫৮

১৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কালোর আলো', "কুহু ও কেকা", পৃ. ১৩০

১৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মর্দ-ই-খুদা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৫৪

১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিশ্ব-বেদন',"মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৮

১৭. চরকার গান, গিরিরাণী: কাব্য সঞ্চয়ন, আখেরী: বেলা শেষের গান

১৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গিরিরাণী', "কাব্য সঞ্চয়ন" (কলকাতা: এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, বাং. ১৩৭২), পৃ. ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ঈদ > ঈদ > (عيد) উৎসব, খুশি, মুসলমানদের বিখ্যাত পর্বদ্বয়–ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। 'ঈদ' শব্দ দ্বারা কবি 'ঈদুল ফিতর'-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

কৃচ্ছ্রের শেষে বিধি পূরাল মানস–
উদিল **ইদের** চাঁদ–তাজ।[১৯]

ইনসাফ > (ইনস.াফ) (انصاف) ন্যায়বিচার, সুবিচার ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ন্যায়বিচার' অর্থে এসেছে–

কসুর করিলে পূরা পাবে সাজা–
এই মোর **ইনসাফ**।[২০]

ইলম্ > 'ইলম্ (علم) জ্ঞান, বিদ্যা, তথ্য, তত্ত্ব, শাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' অর্থে এসেছে–

ভক্ত হল জ্ঞানীর সেরা গ্রন্থ্ না ছুঁয়ে,
ভক্ত আলিম সত্য **ইলম্** অন্তরে থুয়ে,[২১]

ইলাহি > ইলাহ্ > ইলাহুন (اله) বিধাতা, মা'বুদ, উপাস্য, প্রভু, দেবতা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিধাতা' অর্থে এসেছে–

মানুষ উঁচু, মানুষ নীচু– শুন্‌তে না চাহি,
হায় রে সরম! কোথায় ধরম ? কোথায় ইলাহি ?[২২]

ইসারা > ইশারা > ই'শারাহ্ (اشارة) ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ, বরাত, সুত্র ইত্যাদি।

শব্দটি নয়টি কবিতায় অন্তত নয় বার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

'ইঙ্গিত' অর্থে সাতটি কবিতায়[২৩] সাতবার–

দিল্লী পতির প্রিয় পাত্র সে
বদাউন-সর্দার
নগরী- সাজিল নাগরীর মতো
ইসারায় যেন তার।[২৪]

---

১৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'তাজ', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ৬৯
২০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৫৯
২১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,'মর্দ-ই-খুদা', "মণি মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৫৪
২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যশমন্ত', "তুলির লিখন", পৃ. ৮৫
২৩ বিদ্যুৎ পর্ণা, দুর্ভাগা:তুলির-লিখন,বজ্রবোধন, কে, নব জীবনের গান:বিদায়-আরতি, কয়েকটি গান:বেলা শেষের গান, নতুন কলম্বস: মণি-মঞ্জুষা
২৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

'নির্দেশ' অর্থে দু'টি কবিতায়[২৫] দু'বার–

হঠাৎ কখন্ কোন্ গগণের পাস্ত হাওয়ার কোন ইসারায়
শরীর পেল এক নিমিষে ওই নতুন সে কোন তারায় ?[২৬]

ইসলাম > ইসলাম (إسلام) আত্মসমর্পণ করা, ইসলাম গ্রহণ করা। ইসলাম শব্দ দ্বারা ইসলাম ধর্ম উদ্দেশ্য, পারিভাষিক অর্থে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, শান্তিস্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলামের মূল উৎস কোরআন এবং হাদীছ। এর মূল কথা হচ্ছে-আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তে বিশ্বাস, ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব, সকল নবী ও রাসূল, পরকাল, তাক.দীর ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস। তৎসঙ্গে সৎকর্মে আত্মনিয়োগও ইসলামের অন্যতম মূলকথা।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৭] দু'বার ইসলাম (ধর্ম) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

এশিয়ার হক, হারুনের স্মৃতি, ইসলাম-সম্মান,–
মর্ম্মবিণার তিন তারে যার, পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,[২৮]

ইস্তাহার > ইশতিহার (إشتهار) ঘোষণাপত্র, নোটিশ, প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ইত্যাদি।

'ঘোষণা' অর্থে শব্দটি একটি কবিতায় একবারই ব্যবহার হয়েছে–

বোতল কাড়িয়া মাতালের, গেল কোন তেলি কারাগারে,
কোন্ লাট ঢাকে অশোকের লাট মদের ইস্তাহারে।[২৯]

ইহুদী > য়াহুদ > ইয়াহুদী (يهودى) 'জু' (Jew) নামক জাতি, হযরত মুসা (আ.) এর ধর্মানুসারী।

ইহুদ সম্ভবতঃ বাইবেল-ওল্ড টেষ্টামেন্টে বর্ণিত UR of the chaldees এর নাম। কারণ একেই ইহুদীদের পূর্বপুরুষ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইয়াহুদী ইয়াকুব (আ.)-এর বংশধর। এরা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। একত্রে সকলকে বনু ইসরাঈল বলা হতো। উল্লেখ্য যে, ইসরাঈল শব্দটি হযরত ইয়াকু.ব (আ.) এর উপাধী, যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। এ বংশে অনেক নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। এদের নিজস্ব রাজ্যও ছিল। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাঁদের চরম অবাধ্যতার কারণে এরা ভাসমান জাতিতে পরিণত হয়। ইসলামের উন্মেষকাল থেকেই এ জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কেও এরা বহুবার প্রাণনাশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। আবার এ যুগেও মুসলমানদের ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে মুসলিম ভূমিতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।[৩০]

---

২৫. ফুল-শির্ণি:কুহু ও কেকা, ইনসাফ: বিদায়-আরতি
২৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বজ্রবোধন', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২১৫
২৭. আমি:তীর্থরেণু, গান্ধিজী:কাব্য সঞ্চয়ন
২৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ১৮২
২৯. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
৩০. সম্পাদন পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি), খ. ১,পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে এবং মুসা (আ.)-এর অনুসারীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মোস্লেম মানে কোরান কেবল
হিন্দু সে দেব মানে,
মুশার বচন মানে ইহুদীরা,
বাইবেল খ্রীষ্টানে;[৩১]

উ

উকিল, উকীল্ (وكيل) প্রতিনিধি, মুখপাত্র, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আইন ব্যবসায়ী, মুসলমানদের বিয়েতে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি নিয়ে বরকে জানায়।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩২] দু'বার 'প্রতিনিধি' অর্থে এসেছে–

রুষ্টভাবে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্বত,–
চোরের উকিল! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ![৩৩]

'উজির, উজীর > ওয়াযীর (وزير) মন্ত্রী, অমাত্য ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩৪] তিনবারই মন্ত্রী অর্থে এসেছে–

নর্ত্তকী কার হইল মহিষী–
মোসাহেবে কেও উজির বুঝে।[৩৫]

ও

'ওজন' > ওয্ন (وزن) পরিমাপ, মাপ, মাত্রা, ছন্দ ইত্যাদি।

শব্দটি সাতটি কবিতায়[৩৬] নয়বার পরিমাপ অর্থে এসেছে–

ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কর্‌লে ওজন দেখতে পারে,
আমরা নেহয়ৎ কম যাবনা, যদিও আছি পরের তাঁবে।[৩৭]

---

৩১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিশ্ব-বেদন', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৮
৩২. গিরিরাণী:কাব্য সঞ্চায়ন, আখেরী:বেলা শেষের গান
৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গিরিরাণী', "কাব্য সঞ্চায়ন", পৃ. ১৫৫
৩৪. পদস্থ বন্ধুর প্রতি:তীর্থ সলিল, দিল্লীনামা:বেলা শেষের গান, নরম-গরম-সংবাদ
৩৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলা শেষের গান", (কলকাতা: এম সি সরকান এণ্ড সন্স, তা. বি), সং. ২, পৃ. ১৪৫
৩৬. দেড়ে টিকটিকি (২বার):মণি-মঞ্জুষা, স্নেহের নিরিখ (২বার):তীর্থ-রেণু, দাবীর চিঠি, বিকর্ণ কি ঘন্টাকণ:বিদায়-আরতি, যশ:তুলির-লিখন, ছেলের দল:কাব্য সঞ্চয়ন, দিল্লীনামা:বেলা শেষের গান
৩৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দাবির চিঠি', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০৫

'ওস্তাদ' > উস্‌তায (استاد) শিক্ষক, গুরু, অধ্যাপক, সঙ্গীতাচার্য, দক্ষ, নিপুণ, কুশলী ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় তিনবার গুরু ও দক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে;
'গুরু' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

তুলিব খেলা দেখে 'সাবাস' ওস্তাদে বলে
আদ্‌রা দেখে আদর ক'রে ঠাঁই দিলে দলে ।[৩৮]

'দক্ষ' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

কত ওস্তাদ নক্সা–নবীশ
আলোকিত তোর প্রাচীর পুঁথি ।[৩৯]

ক

কবর > কবর > ক.াবর (قبر) গোর, সমাধি ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৪০] পাঁচবার 'সমাধি' অর্থে এসেছে–

কবরে যাহার খিরনির ফুল
শোভাপায় উটপাখীর মোতি ।[৪১]

কয়েদ > ক.ায়দ (قيد) বন্দী, আটক, পদবেড়ী ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪২] দু'বার 'বন্দি' অর্থে এসেছে–

মার,মার,– দেশটা ভর কলে এবং কারখানাতে,
আমরা তোদের করছি কয়েদ বুঝবি পরে কি কায়দাতে;[৪৩]

করম > কারম্‌ (كرم) দয়া, অনুগ্রহ, কৃপা, মহানুভবতা, উদারতা, দানশীলতা, বদান্যতা, মহত্ত্ব, সম্মান ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সম্মান' অর্থে এসেছে–

দেখেছি দেহ-পিণ্ড মাঝে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেরে,
ভাসিয়া গেছে ভরম আর করম কোন মন্তরে ।[৪৪]

---

৩৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যশমণ্ড', "তুলির লিখন", পৃ. ৮১
৩৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলা শেষের গান", পৃ. ১৪১
৪০. তাজ:কাব্য সঞ্চয়ন, দিল্লীনামা (২বার):বেলা শেষের গান, তাজের প্রথম প্রশাস্তী,আত্মনিবেদন:মণি-মঞ্জুষা
৪১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলা শেষের গান", পৃ. ১৫১
৪২. গান্দিজী: বেলা শেষের গান, ঢালাই কলের গান: মণি-মঞ্জুষা
৪৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঢালাই কলের গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৭
৪৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঝুলন', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

কলম > ক.লম (قلم) লেখনী, লিপি, রেখা, দপ্তর, বিভাগ ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৫] দু'বার 'লেখনী' অর্থে এসেছে–

মুখ হয়ে যাবে বন্ধ চলিবে কলম,
মগজে তাকিবে ঝি ঝি-বিশ্ব থম্‌থম্‌ ।[৪৬]

কসর >ক.াস্‌.র (قصر) প্রাসাদ, বালাখানা, অট্টালিকা, ভবন ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'প্রাসাদ' অর্থে এসেছে–

কেল্লা-কসর পাহাড়-সোসর
বুরুজ মিনার সমুদ্দত ।[৪৭]

কসুর > (কু.সূ.র) (قصور) অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি, ভুল, ছোট হওয়া, অবহেলা, অপূর্ণতা, কমতি ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'অপরাধ' ও 'ত্রুটি' অর্থে এসেছে–
'অপরাধ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কসুর করিলে পুরা পাবে সাজা–
এই মোর ইনসাফ ।[৪৮]

'ত্রুটি' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বিধান কর্ত্তা! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ!
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ ।[৪৯]

কাজী > কাদ.ী > (قاضی) বিচারক, মুসলমান বিচারপতি, মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-ব্যবহার ইত্যাদির ব্যবস্থাপক, মুসলমানদের বিবাহ রেজিষ্ট্রিকারী, কর্মী ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'বিচারক' ও 'কর্মী' অর্থে এসেছে–
'বিচারক' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

সকল কামনা সফল করিতে তুমি আছ কৃপাময়!
তুমি কাজী, তুমি কোরান আমার, তুমি মোর সমুদয়,[৫০]

'কর্মী' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কাজের বেলায় ইংরেজ যারে মেনেছিল 'কাজী' ব'লে,
কাজ ফুরাইলে পাজী হ'ল হায় বর্ণ-বাধার গোলে![৫১]

---

৪৫. ইলশে গুড়ি, সিগার সংগীত: কাব্য সঞ্চয়ন
৪৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সিগার সঙ্গীত', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ১২৩
৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলা শেষের গান", পৃ. ১৩৭
৪৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৫৯
৪৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গিরিরাণী', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ১৫৫
৫০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'হাফেজের রুবাইয়াত', "তীর্থ-সলিল", পৃ. ১৬৮
৫১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "বেলা শেষের গান", পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

কানুন > ক.নূন্ (قانون) আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, অনুশাসন ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'রীতি-নীতি' অর্থে এসেছে–

কায়দা-কানুন জানিনে ভাই, বল্‌ছি সবার করে ধ'রে,
ও বিদেশী ? গোরাব জাতি! তোমরা শোনো বিশেষ করে ।[৫২]

কাফের > কাফির (كافر) আবরক, কৃষক, অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, ইসলাম ধর্ম অস্বীকারকারী, পৌত্তলিক, বহু-ইশ্বরবাদী ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৩] দু'বার 'ইসলাম ধর্ম অস্বিকারকারী" অর্থে এসেছে–

আমি ইসলাম, আমিই কাফের,
আমিই ঘোবাই চন্দ্রতারা![৫৪]

কায়দা > ক.'ইদাহ্ (قاعدة) কৌশল, দক্ষতা, পটুতা, আচার-ব্যবহারের রীতি-পদ্ধতি, আরবী বর্ণমালা ও বানান শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক, রীতি-নীতি, পদ্ধতি, মূলনীতি, ভিত্তি, ঘাটি, ব্যাকরণ ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায় চারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'কৌশল' অর্থে দু'টি কবিতায়[৫৫] দু'বার–

মার মার,– দেশটা ভর কলে এবং কারখানাতে,
আমরা তোদের করছি কয়েদ, বুঝবি পরে কি কায়দাতে,[৫৬]

'রীতিনীতি' অর্থে দু'টি কবিতায়[৫৭] দু'বার–

কায়দা-কানুন জানিনে ভাই, বল্‌ছি সবার করে ধ'রে,
ও বিদেশী! গোরার জাতি! তোমরা শোন বিশেষ ক'রে ।[৫৮]

কায়েম > ক.াইম (قائم) সুদৃঢ়, স্থায়ী, মজবুত, পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠিত, যথাযথ, দণ্ডায়মান, বিদ্যমান, সোজা, স্থির ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায় মোট চারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে–

'স্থায়ী' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কথা রাখিল না যবে হীন-মনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া ক্ষোভের ডেরা,[৫৯]

৫২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দাবীর চিঠি', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০৪
৫৩. আমি:তীর্থরেণু, শিরাজ-ই-হিন্দ: বেলা শেষের গান
৫৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আমি', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৭০
৫৫. ঢালাই কলের গান:মণি-মঞ্জুষা, আখেরী:বেলা শেষের গান
৫৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঢালাই কলের গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৭
৫৭. দাবীর চিঠি: বিদায়-আরতি, মর্দ-ই-খুদা:মণি-মঞ্জুষা
৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দাবীর চিঠি', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০৪
৫৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "বেলা শেষের গান", পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

'প্রতিষ্ঠিত' অর্থে তিনটি কবিতায়[৬০] তিনবার–

সাহেব বলেই– কর্‌ব সেলাম ? মন্দ ভাল বাছ্‌ব নাকো ?
অন্যায় যে করবে **কায়েম** বল্‌ব তারে সুখে থাকো ?[৬১]

কুদরত > কু.দরাত্‌ (قدرة) দৈবশক্তি, শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ, যোগ্যতা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'দৈবশক্তি' অর্থে এসেছে–

পীর বদরের **কুদরতি**তে
নৌকো বাধা হিজল-গাছে ।[৬২]

কেল্লা > কি.ল'আহ (قلعة) দুর্গ, সেনানিবাস, গড় ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৬৩] চারবার 'দুর্গ' অর্থে এসেছে–

ঘুষির বদলে ঘুষি দিতে গেল
যুদ্ধে জাপানি সেনা,
ময়দানে আর **কেল্লা**য় হল
গোলাগুলি লেনা দেনা[৬৪]

কোরান > কু.রআ'ন (قرآن) ইসলাম ধর্মের মূলগ্রন্থ, আরবী ভাষায় রচিত মুসলমানদের ধর্মীয় কিতাব; মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর ঐশীবাণী । ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌল প্রেরণা ও উৎস এ কোরআন । মুসলিম জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণের সকল নিয়ম-কানুনই আল্লাহর কালাম কোরআন মাজিদ থেকে নিঃসৃত হয়েছে । আল্লাহর আদেশে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নিকট এ ঐশী বাণী নিয়ে আসেন । পবিত্র রমজান মাসের 'লায়লাতুল কদর'-এ সর্বপ্রথম কোরআন অবতীর্ণ হয় । পরবর্তীতে দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী কোরআনের বিভিন্ন অংশ প্রয়োজনানুসারে নাযিল হয় ।[৬৫]

শব্দটি ছয়টি কবিতায়[৬৬] ছয়বারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মোশ্লেম মানে **কোরান** কেবল
হিন্দু সে বেদ মানে ।
মুশার বচন মানে ইহুদীরা
বাইবেল খৃষ্টানে;[৬৭]

---

৬০. গান্ধিজি: কাব্য সঞ্চয়ন, সিরাজ-ই-হিন্দ, আখেরী:বেলা শেষের গান
৬১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলা শেষের গান", পৃ. ১৩৩
৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুরের পাল্লা', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৪২
৬৩. অনুশোচনা (২বার), পাতিল প্রমাদ:মণি-মঞ্জুষা, দিল্লী-নামা: বেলা শেষের গান
৬৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অনুশোচনা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১২০
৬৫. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (বগুড়া: সাহিত্য সোপান,২০০০), পুণঃমুদ্রণ,পৃষ্ঠা-১৩৩
৬৬. বিশ্ববেদন (২বার), ঝুলন:মণি-মঞ্জুষা, ইনসাফ:বিদায়-আরতি, হাফেজের রুবাইয়াত:তীর্থ-সলিল, দিল্লীনামা:বেলা শেষের গান
৬৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিশ্ববেদন', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

খ

খতম > খাতাম্ (ختم) সমাপ্তি, শেষ, ছাপ, সীলমোহর, মৃত্যু, অবসান ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সমাপ্তি' অর্থে এসেছে–

"লোকের মুখে শুনতাম ছেলেবেলা
লড়াই যখন গেল **খতম** হয়ে।[৬৮]

খবর > খাব্‌র (خبر) বার্তা, সংবাদ, বৃত্তান্ত, তথ্য, সন্ধান ইত্যাদি।

শব্দটি পনেরটি কবিতায়[৬৯] সতরবার 'সংবাদ' অর্থে এসেছে–

খুনের খবর গুম করে যারা
রেখেছে রাজার কাছে
খুনীর্ দোসর শয়তান তারা,–
দাও ঝুলাইয়া গাছে।[৭০]

খবীশ > খাবীছ. (خبيث) দুষ্ট, মন্দ, খারাপ, নিকৃষ্ট, দুষিত, অনিষ্টকর, নোংরা, অপরিস্কার ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'নিকৃষ্ট' অর্থে এসেছে–

রাজ-দরবারে গেল সমাচার,
রাজা শুনে ক্রোধে ফুলে,
সুরার আবিস্কর্ত্তা **খবীশ**
সুরকে দিলেন শুলে[৭১]

খাতির > খাতি.র (خاطر) অন্তর, মন, শ্রদ্ধা, সম্মান ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৭২] চারবার 'সম্মান' অর্থে এসেছে–

"লড়াই শেষে দশ-হাজারী দুজন
খাতির এবং খেতাব পেল জবর",[৭৩]

---

৬৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যুদ্ধের স্মৃতি', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১২৫
৬৯. সুর্যাস্তে ও সুর্যোদয়ে, অরণ্যানী:মণি-মঞ্জুষা, মহানামন, ইনসাফ, বন্যাদায়:বিদায়-আরতি, ফরিয়াদ:বেলাশেষের গান, সাড়ে চুয়াত্তর (২বার),দরদী, তখন ও এখন, ভোজ ও পুত্তলিকা:কুহু ও কেকা, রাজবন্দিনী,যশমন্ড:তুলির-লিখন, কিশোরী,আভ্যুদায়িক, গিরিরাণী: কাব্য সঞ্চয়ন
৭০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৫৮
৭১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সুরার কাহিনী', "বেলাশেষের গান", পৃ. ২০
৭২. যুদ্ধের স্মৃতি (২বার):মণি-মঞ্জুষা, ইনসাফ:বিদায়-আরতি, আখেরী: বেলাশেষের গান
৭৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যুদ্ধের স্মৃতি', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

খালাস > খালাস. (خلاص) সমাপ্তি, শেষ, নিষ্কৃতি, রক্ষা, উদ্ধার, ছাড়, মুক্ত, শূন্য ইত্যাদি।

শব্দটি মোট চারটি কবিতায় চারবার এসেছে–

'শূন্য' বা 'খালি' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

সন্ধ্যার ঝোঁকে, শোনো গো, যেন কে
খালাস করিছে বোঝাই গাড়ি![৭৪]

'মুক্ত' অর্থে তিনটি কবিতায়[৭৫] তিনবার–

শান্তনা শুধু- খালাস হয়েছি
ন্যস্ত ভারের দায়।[৭৬]

খালি > খালী (خالی) শূন্য, শুধু ইত্যাদি।

শব্দটি আটটি কবিতায় আটবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'শূন্য' অর্থে তিনটি কবিতায়[৭৭] তিনবার–

জানি গো নিরেট মডারেট তারা –
খালি–পেটে তোলে ঢেকুর যাহারা[৭৮]

'শুধু' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[৭৯] পাঁচবার–

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে
খালি শোন শন্ শন্[৮০]

খালেদ > খালিদ্ (خــالد) চিরস্থায়ী। খালেদ শব্দ দ্বারা ইসলামের ইতিহাসের অপরাজিত সিপাহসালার খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদকে বুঝানো হয়ে থাকে। যিনি রাঊলুল্লাহ্ (স.) কর্তৃক 'সাইফুল্লাহ' উপাধীতে ভূষিত। এখানে খালেদ দ্বারা রূপক অর্থে 'বীর' বুঝানো হয়েছে। শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে–

লোভের হানার বান ডেকে যায়, দিগ্‌গজেদের দিক্ ভোলায়,
অনেক খালেদ শাস্ত্র দ্যাখান ঢাক্‌তে নিজের লুব্ধতায়![৮১]

---

৭৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অরণ্যানী', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩৫
৭৫. পরিব্রাজক, সতী, মরিয়া: তুলির লিখন
৭৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পরিব্রাজক', "তুলির-লিখন", পৃ. ৬৩
৭৭. বর্ষ বোধন, জৌষ্ঠি-মধু, নরম-গরম-সংবাদ:বিদায়–আরতি
৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নবম-গরম-সংবাদ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৭৬
৭৯. সোমপায়ীর গান, শেষ আশা:মণি-মঞ্জুষা, বর্ষার মশা, পাতিল প্রমাদ: বিদায় আরতি, দুদিনের অতিথি: বেণু ও বিণা
৮০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বর্ষার মশা', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৯৬
৮১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শিরাজ-ই-হিন্দ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৮৪

খাস > খাস. (خاص) আসল, খাটি, বিশেষ, বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট, সংশ্লিষ্ট, একান্ত, ব্যক্তিগত, স্বকীয়, নিজস্ব ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিশেষ' অর্থে এসেছে–

লাখে লাখে মাজারমন্ডি গিলাস-ফুলের খাস্ গোলাম,
সোষম-ফুলের নীল সুষমায় আকুল যেথা হয় আকাশ,[৮২]

খিদমত > খিদমাহ্ (خدمة) সেবা, খেদমত, চাকুরী, পেশা, দাসত্ব, পরিচর্যা, কাজ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সেবা' অর্থে এসেছে–

নিজের ঘরের বন্দেজে আর নিজের দেশের খিদমতে
ফিলিপিনোর চাইতে অধম ভাব্‌ছ মোদের কোন মতে ?[৮৩]

খিতাব, খেতাবী > খিতাব্ (خطاب) (خطابی) ی টি সম্বন্ধ বাচক। বক্তৃতা, ভাষণ, চিঠি, পত্র, বার্তা। ব্যবহারিক অর্থে সম্মানজনক উপাধি বা পদবী ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৮৪] চারবার 'সম্মানজনক উপাধি' অর্থে এসেছে–

ধন-জনের ধারত না ধার, চিন্‌ত তারে অল্প ক'টি লোকে,
নয় দারোগা, নয় খেতাবী, খাতির দাবী করবে সে কোন মুখে ?[৮৫]

খেয়াল > খিয়াল্ (خیال) ছায়ামুর্তি, ধারণা, কল্পনা, স্বপ্ন, চেতনা, ভূত, স্মরণ, চিন্তা, বিশেষ লক্ষ্য ইত্যাদি।

শব্দটি নয়টি কবিতায় দশবার এসেছে–

'কল্পনা' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[৮৬] ছয়বার–

এমনি করিয়া কাটে জীবনের দিন,
খেয়ালে, স্বপনে, চিত্ত ভাবনাহীন।[৮৭]

'স্মরণ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

অসুরে যে রাজ্য নেছে, তাই সে খেয়াল হায়;
রোসের ভরে শিশুর 'পরে বজ্র নিয়ে ধায়।[৮৮]

---

৮২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জাফরানিস্থান', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৭০
৮৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দাবীর চিঠি', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০৬
৮৪. যুদ্ধের-স্মৃতি:মণি-মঞ্জুষা, লাজের কাহিনী:সতেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, রাজা ভড়ং:কাব্য সঞ্চয়ন, কবির তিরোধান: বেলাশেষের গান
৮৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কবির তিরোধান', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৮০
৮৬. কবির কারবার (২বার):মণি-মঞ্জুষা, স্বর্ণগর্ভ: হোমশিখা, খেয়ালির প্রেম: তীর্থ-রেণু, সোমপায়ীর গান:মণি-মঞ্জুষা, বর্ষা:কাব্য সঞ্চয়ন
৮৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কবির কারবার', 'মণি-মঞ্জষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৯৯
৮৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্কন্ধধাত্রী', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

'ধারণা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

খেয়াল নাই – নাইরে ভাই
পাইনি তার সংবাদই,[৮৯]

'চিন্তা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

নেইক খেয়াল, আত্মা বেঁচে জগৎ-জোড়া কিনছে জমিদারী!
কে জানে ক'দিনের ঠিকা, ঠিকাদারের ঠ্যাকার কিন্তু ভাবী![৯০]

'বিশেষ লক্ষ্য' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কি পাই না পাই, আমরা তা ভাই মোটেই ধরিনে।
মার্চ্চ করে যাই গোলার মুখে খেয়াল করিনে।[৯১]

খোলা/খুলতে > খাল্' (خلع) উন্মুক্ত, বাঁধন ছড়ানো, প্রকাশ করা, খুলে দেয়া ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৯২] চারবার 'উন্মুক্ত' অর্থে এসেছে–

প্রাণের হাশি, হাস্তে জানে, খুলতে জানে মনের কল,–
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,– ওই আমাদের ছেলের দল।[৯৩]

গ

গজল > গায.াল (غزل) সঙ্গীতের সুর বিশেষ, প্রণয়গীতি, ধর্ম-সঙ্গীত ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'প্রণয়গীতি' অর্থে এসেছে–

সঙ্গীতে তোর তৈরী শরীর বঙ্গ-বীণার বঙ্গিনী!
অল্-গজলির গজল-গানের তুই যে চির সঙ্গিনী![৯৪]

গরিব, গরীব > গারীব (غريب) নির্ধন, নিরাশ্রয়, অপরিচিত, দরিদ্র, অদ্ভুত, বিস্ময়কর, বিরল, অসহায়, দুস্থ, নিঃস্ব ইত্যাদি।

শব্দটি নয়টি কবিতায় বারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'নির্ধন' অর্থে চারটি কবিতায়[৯৫] পাঁচবার–

বিধাতার বরে গরীব মেসিহি আপন খেয়ালে
রয়েচে সুখে,[৯৬]

---

৮৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঝর্ণার গান', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২১৩
৯০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কোনো ধর্ম ধ্বজের প্রতি', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২২১
৯১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বাঙ্গালী পল্টনের গান', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৭১
৯২. ভোরাই, কবি জুবিলি: বেলাশেষের গান, আত্ম ঘাতিনী: তীর্থরেণু, ছেলের দল: কুহু ও কেকা
৯৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ছেলের দল', "কুহু ও কেকা", পৃ. ১২৮
৯৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঘুমতি নদী', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৬৯
৯৫. মুচি:মণিমঞ্জুষা, ইনসাফ: বিদায় আরতি, যশমন্ত (২বার),খেয়ালীর প্রেম:তীর্থরেণু
৯৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'খেয়ালীর প্রেম', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৯৩

'অসহায়' অর্থে তিনটি কবিতায়[৯৭] পাঁচবার–

লাজ ঢেকেছিল কুঁড়েয় গরীব মেয়ে,
তুমি এলে তার আব্রুর মাথা খেয়ে।[৯৮]

'দরিদ্র' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

চির দুর্ভিক্ষের কর তুমি উচ্ছেদ,
মর্যাদা-বোধে ভর গরীবের অন্তর।[৯৯]

'অপরিচিত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

দাঁড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে,
কেউ দিত, কেউ দিতবা তাড়ায়ে,
ভিখারীর ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায়।[১০০]

গাজী > গাযী (غازی) বিজয়ী, ধর্মযোদ্ধা, আক্রমণকারী, দখলদার ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১০১] দু'বার 'ধর্মযোদ্ধা' অর্থে এসেছে–

কই সে গাজী কোথায় আজি ? কাফেরগুলো টলল না!
ধর্ম দিয়ে ধর্ম প্রচার? – গল্‌ল না মন গল্‌ল না।[১০২]

গায়েব > গায়বী (غیب) অদৃশ্য, গুপ্ত রহস্য, গোপন তত্ত্ব ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অদৃশ্য' অর্থে এসেছে–

গুম হল কারা? গায়েব হল কে?
হে নগরী! সবি তোমার জানা।[১০৩]

গায়বী > গায়ীবী (غیبی) বিশেষণ। অদৃশ্য, লুক্কায়িত, গোপন, গুপ্ত, আজগুবি ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অদৃশ্য' অর্থে এসেছে–

গিরিরাজের গায়বী– টোপর ওই গো দেখা যায়,–
স্বর্ণ–সারে সিঞ্চিত কি স্বর্গ– সুষমায়![১০৪]

---

৯৭. উড়োজাহাজ (৩ বার):বেলাশেষের গান, বন্যাদায়: বিদায় আরতি, গান্ধিজী: বেলাশেষের গান
৯৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'উড়োজাহাজ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ২২
৯৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'চরকার আরতি', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৬৭
১০০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শবাসীন', "তুলির লিখন', পৃ. ১০৩
১০১. শিরাজ-ই-হিন্দ,দিল্লীনামা: বেলাশেষের গান
১০২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শিরাজ-ই-হিন্দ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৮৪
১০৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৫৪
১০৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দার্জিলিঙের চিঠি', "কুহু ও কেকা", পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম, গুলাম (غلام) ভৃত্য, চাকর, দাস, ক্রীতদাস, একান্ত অনুগত, আজ্ঞাবহ, ছেলে, বালক ইত্যাদি।

শব্দটি দশটি কবিতায় তেরবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'ভৃত্য বা চাকর' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[১০৫] সাতবার–

প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা-নাকাড়া
গিয়েছে বেজে;
গোলাম তোমার আমীর হয়েছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে![১০৬]

'ক্রীতদাস' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কেনা **গোলাম** কেবল খাটে!– জোয়াল নিয়ে স্কন্ধে,
জাবনা খায়, আর জাবর কাটে ঘনায় যখন সন্ধ্যে।[১০৭]

'অপরিচিত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

দাড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে,
কেউ দিত, কেউ দিতবা তাড়ায়ে
ভিখারির ঝুলি ভরিত আখেরে **গরীবের** করুণায়।[১০৮]

'বালক' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

বুঝ সমঝের বইছে হাওয়া, **গোলাম**-সমঝ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর করছে দাবী সব দুনিয়া দাড়িয়ে উঠে![১০৯]

'আজ্ঞাবহ' অর্থে দু'টি কবিতায়[১১০] দু'বার–

সুলতানা! আমি **গোলাম** তোমার, বাঁধা আছি হাতে গলে,
রাখিতে, মারিতে, বিক্রি করিতে পার গো ইচ্ছা হলে[১১১]

জ

জবাব > জওয়াব (جواب) উত্তর, কৈফিয়ত, প্রত্যুত্তর, সাড়া ইত্যাদি।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

---

১০৫. নওরোজের গান, জগদন্তরাত্মা (২বার):মণি-মঞ্জুষা,পাতিল প্রমাদ:বিদায় আরতি, খেয়ালীর প্রেম (২বার):তীর্থরেণু,মরিয়া:তুলির লিখন
১০৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'খেয়ালীর প্রেম', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৯৩
১০৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গরু ওজরু', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৪৩
১০৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শবাসীন', "তুলির লিখন", পৃ. ১০৩
১০৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৩
১১০. প্রেম পত্রিকা: তীর্থরেণু, প্রিয়া যবে পাশে: তীর্থ সলিল
১১১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রেম পত্রিকা', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৮৩

'উত্তর' অর্থে চারটি কবিতায়[১১২] চারবার–

মনের মালিক তফাৎ থাকে দ্যায় না সে ধরা,
কইলে কথা জবাব দিতে করেই না ত্বরা ।[১১৩]

'কৈফিয়ত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

সুধালে বারতা,– কী দিব জবাব ? –
গেছে– সব গেছে মারা,
কেল্লা যাহারা করিল দখল
কেউ ফেরে নাই তারা ।[১১৪]

জমা, জমে, জমতে > জাম' (جمع) জমা, সংগ্রহ, সংকলন, যোগ, সঞ্চিত বা পুঞ্জিত, জমাট হওয়া, একত্র হওয়া, সংহত হওয়া, আয় ইত্যাদি ।

শব্দটি এগারটি কবিতায় চৌদ্দবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'একত্রিত হওয়া' অর্থে চারটি কবিতায়[১১৫] সাতবার–

মিছের ঝুলে আকাশ জুড়ে জাল প'ড়ে যে জমছে কালি,
পুড়িয়ে দে তুই সেই লুতাজাল দুই হাতে দুই মশাল জ্বালি ।[১১৬]

'আয়' অর্থে দু'টি কবিতায়[১১৭] দু'বার–

জমা-খরচ দেখবিরে আর কত?
তামাম সালের সাল্-তামামী হয়নি যে তোর মোটেই মনের মত ।[১১৮]

'উপভোগ্য' অর্থে দু'টি কবিতায়[১১৯] দু'বার–

তৃতীয় পেয়ালা মশগুল করে
মজলিস ক্রমে জমিয়ে আসে;[১২০]

---

১১২. দুর্ভাগা:তুলির লিখন, নবাব ও গোয়ালিনী: তীর্থ রেণু, আমরা, ভোজ্য ও পুত্তলিকা: কুহু ও কেকা
১১৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুর্ভাগা', "তুলির লিখন", পৃ. ৮৯
১১৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অনুশোচনা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১২০
১১৫. শেষ (৩বার):তুলির লিখন, আখেরী (২বার): বেলাশেষের গান, সেবা সাম: বিদায় আরতি, সুর্যাস্তে ও সুর্যোদয়ে: মণি-মঞ্জুষা
১১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩০
১১৭. সালতামামী,আখেরী:বেলাশেষের গান
১১৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাল-তামামী', "বেলা শেষের গান" পৃ. ৭৭
১১৯. আপান গীতি:তীর্থ রেণু,চায়ের পেয়ালা:মণি-মঞ্জুষা
১২০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'চায়ের পেয়ালা', "মণি-মঞ্জুষা",সতেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৭

'সঞ্চিত বা পুঞ্জিত' অর্থে তিনটি কবিতায়[১২১] তিনবার–

ওই মেঘ জমছে,
চল্ ভাই সম্‌ঝে
গাও গান, দাও শিশ্,–
বক্‌শিশ বক্‌শিশ্![১২২]

'জমাট' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ময়দানেতে খেলতে এসে ভিড় দেখে হায় গিছ্‌ল জ'মে যারা
দুধের ছেলে মায়ের দুলাল মায়ের কোলে ফিরল না আর তারা![১২৩]

জলসা > জালসাহ্ (جلسة) আসর, বৈঠক, মজলিশ, অধিবেশন, উপবেশন, সম্মেলন, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১২৪] তিনবার 'সভা-সমাবেশ' অর্থে এসেছে–

ফসলা-বনের জলসা ফুরুলো,
মৌমাছি এল রোল তুলি'।[১২৫]

জাফরানে > জাফরান > যা'ফারান (زعفران) কুমকুম রং বিশেষ। এখানে শব্দটি স্থান বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

কোমল-কঠিন মিল্‌ছে যেথায় আঙুরে আর আখ্‌রোটে,
ভুঁই-চাপারি সই স্যাঙ্গাতি জাফরানে নীল ফুলফোটে,[১২৬]

জাবর > জাবর (جبر) জোড়ালো, ক্ষমতাবান, উৎকৃষ্ট, চমকপ্রদ, জবরদস্তি, জোর, শক্তি, জুলুম ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১২৭] দু'বার 'জুলুম' অর্থে এসেছে–

অন্তত নয় তেমন,– যেমন গলা-কাটা মহাজনের দল,
কিম্বা যেমন জমীদারের জুলম-জবর আমলা নায়েব খল।[১২৮]

জারী / জারি > জারী (جاري) প্রবাহমান, বর্তমান, ধাবমান, চলমান, চালু ইত্যাদি।

---

১২১. শেষ:তুলির লিখন, কোন ধর্মধ্বজের প্রতি,দুরের পাল্লা:বিদায় আরতি
১২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুরের পাল্লা', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৪২
১২৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ফরিয়াদ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৮৭
১২৪. বিদুৎ বিলাস:বেলাশেষের গান, জাফরানিস্থান, জ্যৈষ্ঠিমধু: বিদায় আরতি
১২৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জ্যৈষ্ঠিমধু', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৭৪
১২৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জাফরানিস্থান', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৭০
১২৭. কাঠ গড়া, শিরাজ-ই-হিন্দ: বেলাশেষের গান
১২৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,'কাঠ গড়া', "বেলাশোষের গান", পৃ. ৭৫

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১২৯] চারবার 'চালু' অর্থে এসেছে–

ভুলি প্রতিজ্ঞা রাজা বিরুধক
হুকুম করিল জারি–
"শাক্যের কুল কর নির্মুল
কি পুরুষ কিবা নারী"![১৩০]

জাহির, জা.হির (ظاهر) প্রকাশ, স্পষ্ট, দৃশ্যমান, বাহ্যিক, ঘোষণা, প্রদর্শন, বিঘোষিত ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৩১] তিনবার 'প্রকাশ' অর্থে এসেছে–

বচন-দক্ষ মিথ্যা পক্ষ
হেরে গিয়ে হল রুঢ়,
বর্বরতায় গর্বের বেশে
জাহির করিল মূঢ়[১৩২]

জিজিয়া > জিয্য়াহ্ (جزية) ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত কর ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার উল্লেখিত অর্থে এসেছে–

কথা রাখিল না যবে হীন-মনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল বকেয়া যুগের জিজিয়া-ক্ষোভের ডেরা,[১৩৩]

জুলুম > জু.ল্ম্ (ظلم) অত্যাচার, উৎপীড়ন, জবরদস্তি, নিপীড়ন, নির্যাতন, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি।

শব্দটি ছয়টি কবিতায়[১৩৪] সাতবার 'অত্যাচার' অর্থে এসেছে–

তোমার 'পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ন ক'রে মনুষ্যত্বধারা
রোমের হুকুম-মহকুমা গুড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা।[১৩৫]

জেয়াদা > যিয়াদাহ (زيادة) অতিরিক্ত, আধিক্য, বাড়তি, বেশি, বৃদ্ধি ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;
'অতিরিক্ত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

জানেনা জেহাদ-জেদ– জানে না'ক জেয়াদা বিবাদ,–
ভালবেসে সুখী আছে,– পেয়ে শুভ শান্তির আস্বাদ,[১৩৬]

---

১২৯. সালতামামী, ফরিয়াদ (২বার): বেলাশেষের গান, মহানামন: বিদায় আরতি
১৩০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মহানামন', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৩৩
১৩১. দেবদাসী: তুলির লিখন, দিল্লীনামা: বেলাশেষের গান, ইনসাফ: বিদায় আরতি
১৩২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৫৭
১৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১০৬
১৩৪. বেতালের প্রশ্ন, ফরিয়াদ (২বার): বেলাশেষের গান, ক্ষণিকের গান: মণি-মঞ্জুষা, ঘুমতিনদী, বড়দিনে, মহানামন: বিদায় আরতি
১৩৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বড়দিনে', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২১৯
১৩৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিশ্বের প্রার্থনা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৩৩

'বেশী' অর্থে দু'টি কবিতায়[১৩৭] দু'বার–

তলোয়ার চেয়ে খুনির ছোরায়
আস্থা উহার দেখি জেয়াদা,[১৩৮]

জেহাদ > জিহাদ (جهاد) প্রচেষ্টা, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধ, ধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'প্রচেষ্টা' অর্থে এসেছে–

জানে না জেহাদ-জেদ্– জানে না'ক জেয়াদা বিবাদ,–
ভালবেসে সুখী আছে,–পেয়ে শুভ শান্তির আস্বাদ,–
তাহাদের কর আশীর্বাদ।[১৩৯]

ত

তলব > ত.লাব (طلب) খোঁজ করা, সন্ধান করা, অম্বেষণ করা, চাওয়া, দাবী করা, আবেদন করা ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৪০] দু'বার 'খোঁজা' বা 'অম্বেষণ করা' অর্থে এসেছে–

শুনে যেন দোক্তা-পাতার লাগ্‌ল তলব জোর
আড়ালে তায় শুধাই ডেকে' কেমন ওষুধ তোর?–[১৪১]

তাজ > তাজ্ (تاج) মুকুট, কিরীট, শিরোভূষণ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'মুকুট' অর্থে এসেছে–

আরাকান্ হতে ইরাণ অবধি
হেথা বসি' কেউ বিথারে বাহু,
দস্যুর পায়ে তাজ রাখে কেউ
রোহিলা পাঠানে মানে গো রাহু।[১৪২]

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য-সঞ্চয়নে 'তাজ' নামক একটি কবিতায় 'তাজ' শব্দটি ছয়বার ব্যবহার করেছেন – তবে সেখানে 'তাজ' শব্দ দ্বারা তিনি 'তাজমহল' বুঝিয়েছেন।

তাঁবে > তাবি' (تابع) অনুসারী, অনুগামী, অনুগত, অধীন, পরবর্তী ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অধীন' অর্থে এসেছে–

ন্যায়ের দাড়ীপাল্লা দিয়ে কর্‌লে ওজন দেখ্‌তে পাবে
আমরা নেহাৎ কম যাব না, যদিও আছি পরের তাঁবে।[১৪৩]

---

১৩৭. দূরের পল্লা:কাব্য সঞ্চয়, সর্বদমন: বিদায় আরতি
১৩৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সর্বদমন', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৯০
১৩৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিশ্বের প্রার্থনা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৩৩
১৪০. আখেরী: বেলাশেষের গান, দুর্ভাগা: তুলির লিখন
১৪১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুর্ভাগা', "তুলির লিখন", পৃ. ৯০
১৪২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৪৩
১৪৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দাবীর চিঠি', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

তামাম > তামাম্ (تمام) পূর্ণতা, সাকুল্য, পূর্ণ, গোটা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'পূর্ণ' অর্থে এসেছে–

ব্রিটন দেছে ক্রমোয়েল, আর ভারত জামদগ্ন্য-রাম,
কার্তবীর্য-চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট;– কালায় গোরায় মিল তামাম ।[১৪৪]

তালিম > তা'লীম (تعليم) শিক্ষা, উপদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'শিক্ষা' অর্থে এসেছে–

তালিম মানুষ মিলেছে যার
তাকেই মজা মালুম হয় ।[১৪৫]

তুফান > তূফান্ (طوفان) প্লাবণ, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'প্লাবণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

উঠা-নামার চল্‌ছে তুফান, আগমনী ডাক্‌ছে কিসর্জনে,[১৪৬]

দ

দলিল > দালীল্ (دليل) যুক্তি, প্রমাণ, প্রতীক, চালক, নির্দেশিকা ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় তিনবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'যুক্তি' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

কেউ কারো দাস নয় দুনিয়ায়, এই কথা আজ বল্‌ব জোরে,
মিথ্যা দলিল তাদের, যারা জীবকে দ্যাখে তুচ্ছ ক'রে ।[১৪৭]

'প্রমাণ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

টিটকারী দ্যায় সন্দেহীরা, ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন করলে দলিল পাকা ।[১৪৮]

দাখিল > দাখিল (داخل) উপস্থাপন, প্রবেশ, অন্তর্ভূক্ত, অভ্যন্তর ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'উপস্থাপন' অর্থে এসেছে–

তারো হিসাব চাইছে জগৎ, দাখিল করো নাইক দেরী ।
প্রণাম দাবী ছাড়তে হবে, নাইক দেরী, আজ আখেরী![১৪৯]

---

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৬
১৪৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অরূপ গুরু', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৫৩
১৪৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সরযূ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৬
১৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১২৯
১৪৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বড়-দিনে', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ১৩৭
১৪৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া > দুন্ইয়া (دنیا) পৃথিবী, বিশ্ব, জগৎ, ইহ্কাল ইত্যাদি ।

শব্দটি সাতাশটি কবিতায়[১৫০] চল্লিশবার 'ইহজগৎ' অর্থে এসেছে–

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী ।[১৫১]

দোকান > দুক্কান (دکان) বিপণী, দোকান, পণ্যশালা, আপণ ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৫২] তিনবার 'বিপণী' অর্থে এসেছে–

ঢুকছে গরু
দোকান ঘরে,
আমের গন্ধে,
আমোদ করে![১৫৩]

দোকানী > দুক্কানী (دکانی) দোকানদার, দোকানী ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উল্লিখিত অর্থে এসেছে–

দোকানী যে রেজ্‌কী কুড়ায়, নাক তুলে রাজ কায়দা করে,
তারেও কি রাজ ভক্তি দেব? রাখ্‌ব কী ধন রাজার তরে ?[১৫৪]

দোয়াত > দাওয়াত্ (دوات) কালির পাত্র, মস্যাধার ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'কালির পাত্র' অর্থে এসেছে–

ঘরে এসেই দোয়াত হতে,
লুকিয়ে, ফেলে দিলাম কালি,
দোয়তের সে ফুলদানীতে
ফুলটি রেখে দেখছি খালি;[১৫৫]

---

১৫০. খোকা, আত্ম-নিবেদন:মণি-মঞ্জুষা, ইনসাফ (২বার),মধু-মাধবী, কবি পুজা:বিদায় আরতি, চরকার আরতি,সাল-তামামী,শিরাজ-ই-হিন্দ,কয়েকটি গান (২বার) গান্ধিজী,আখেরী (৩বার),দিল্লীনামা (২বার):বেলাশেষের গান,তুমি ও আমি,বজ্র কামনা, নতুন মানুষ, নফর কুন্ড,শীতান্তে:কুহু ও কেকা,জন্মভুমি:তীর্থ রেণু, যশমন্ত:তুলির লিখন,রেল গাড়ীর গান, নেই ঘরের ঘুম পাড়ানী:শিশু কবিতা, তাজ, জাতির পাতি (২বার),বৈকালী,রাজা কারিগর (৩বার),গান্ধিজী (২বার):কাব্য সঞ্চয়ন

১৫১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জাতির পাতি', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ৮২

১৫২. পাল্কির গান:সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, বিদ্যার্থী:তুলির লিখন

১৫৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পাল্কির গান', "সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা", পৃ. ১০

১৫৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৩

১৫৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুর্দিনে অতিথি', "বেণু ও বীণা", সতেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ন

নকল > নাক্.ল (نقل) স্থানান্তর, পরিবর্তন, বদলি, পরিবহণ, নকল, অনুবাদ, বর্ণনা, অনুকরণ, কৃত্রিম ইত্যাদি। শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'পরিবর্তন' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কালার ছিল বৌদ্ধ মিশন, গোরার মিশন খৃষ্টীয়,
সবাই জানে কালার দেখেই **নকল** করে সৃষ্টি ও।[১৫৬]

'কৃত্রিম' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৫৭] তিনবার–

বয়স গত: ক্ষ্যাপার মত কামড় দিতে এলে **নকল** দাঁতে?
বাঁধানো দাঁত উল্টে গিয়ে, আহা, শেষে লাগ্‌বে যে টাক্‌রাতে![১৫৮]

'অনুকরণ' অর্থে চারটি কবিতায়[১৫৯] চারবার–

যাদের অঙ্গে সাজিত সে-সব
কোথায় তাহারা? জান কি তুমি?
যাদের গহনা **নকল** করিয়া
প্রতিমা সাজায় বঙ্গভুমি ?[১৬০]

নকীব > নক়ীব (نقيب) প্রধান ব্যক্তি, নেতা, মুখপাত্র, নত্তাবধায়ক, ঘোষক ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৬১] তিনবার 'ঘোষক' অর্থে এসেছে–

সহসা **নকীব** ফুকারিল– "হের হুজুরের তাঞ্জাম"
পথ ছেয়ে গেল ঝান্ডা নিশান হাজারো সরঞ্জাম।[১৬২]

নজর > নাজ্.র (نظر) দৃষ্টি, লক্ষ্য, মনযোগ, পর্যবেক্ষণ, অভিনিবেশ ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৬৩] চারবার 'দৃষ্টি' অর্থে এসেছে–

রাখব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের 'পর
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর![১৬৪]

---

১৫৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দাবীর চিঠি', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২০৫
১৫৭. কোন ধর্মধ্বজের প্রতি:বিদায় আরতি,বর্ষবোধন:কাব্য সঞ্চয়ন, ভাদ্র শ্রী:কুহু ও কেকা
১৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কোন ধর্মধ্বজের প্রতি', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২২০
১৫৯. সাঝের বাতি,মালতি ফুল:সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশু কবিতা,বর্ষবোধন:কাব্য সঞ্চয়ন,দিল্লীনামা:বেলাশেষের গান
১৬০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৪৬
১৬১. দিল্লীনামা:বেলাশেষের গান, গঙ্গাহৃদী বঙ্গভুমি:কাব্য সঞ্চয়ন,লাজের কাহিনী:সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশু কবিতা
১৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'লাজের কাহিনী', "সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা", পৃ. ৩৬
১৬৩. সাগর তর্পণ:কুহু ও কেকা, নেই ঘরের ঘুম পাড়ানী: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশু কবিতা, গোপন কথা:মণি-মঞ্জুষা
১৬৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাগর তর্পণ', "কুহু ও কেকা", পৃ. ২১৫

নজীর > নাজী.র (نظیر) সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ, অনুরূপ, উদাহরণ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সমকক্ষ' অর্থে এসেছে–

নজীর খুঁজে নাই যদি পাই
নাই তাতে ভাই দুঃখ লেশ,[১৬৫]

নহি, নাহি > নাহী (نهی) নিষেধ, বারণ, মানা, নিষেধ সূচক ক্রিয়া ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার নিষেধ সূচক ক্রিয়া 'না' অর্থে এসেছে–

আছি শুধু পথ চেয়ে
কেন পথ চাহি কিছু নাহি জানি
আকাশ আসিছে ছেয়ে ।[১৬৬]

নাজীর > নাজি.র (ناظر) দর্শক, পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক, অধ্যক্ষ, প্রধান কর্মকর্তা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'প্রধান কর্মকর্তা' অর্থে এসেছে–

আমরাই হব উজীর নাজীর,
দেরে-না দেরে-না দ্রিম![১৬৭]

নায়েব > নাইব (نائب) প্রতিনিধি, স্থলাভিসিক্ত, ভারপ্রাপ্ত, উপ ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৬৮] চারবার 'প্রতিনিধি' অর্থে এসেছে–

রাজার নায়ের হাতি চড়ে আজ এই পথে নাকি যাবে
তাই এ জনতা, তামাসার লোভে কত জন খাবি খাবে ।[১৬৯]

নিকে > নিকা > নিকাহ্. (نکاح) বিবাহ ।

শব্দটি উল্লিখিত অর্থে দু'টি কবিতায়[১৭০] দু'বার এসেছে–

জিজ্ঞাসিনু বুড়া-বিপত্নীকে,
কেন তুমি করনা ক' নিকে ?[১৭১]

---

১৬৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,'কবি জুবিলি', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৭৩
১৬৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সরল গাছ ও বিদ্যুত', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ৩৩
১৬৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,'নরম-গরম-সংবাদ', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৭৬
১৬৮. বেতালের প্রশ্ন:বেলাশেষের গান,লাজের কাহিনী (৩বার):শিশু কবিতা
১৬৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'লাজের কাহিনী', "সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা", পৃ. ৩৬
১৭০. পাতিল প্রমাদ:বিদায় আরতি,ফার্সী উদ্ভট:তীর্থ সলিল
১৭১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ফার্সী উদ্ভট', "তীর্থ সলিল",পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ত > নিয়্যাত (نيت) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, সংকল্প, অভিলাস, উদ্দেশ্য, মনোবাঞ্ছা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অভিপ্রায়' অর্থে এসেছে–

সত্য কথাটা বলিতে কি ভাই
আমারো দশাটা ওদেরি মত,
নূতন দেখিতে আমারো হৃদয়,
লালসায় ভরা যেন নিয়ত ।[১৭২]

ফ

ফকির > ফকীর > ফক্.ীর > (فقير) গরীব, ভিখারী, অভাবী, সাধু দরবেশ ইত্যাদি ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'গরীব' অর্থে দু'টি কবিতায়[১৭৩] দু'বার–

আচার নিষ্ঠ দানশীল ধনী হতে,
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহু মতে ।[১৭৪]

'সাধু-দরবেশ' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৭৫] তিনবার–

বিশ্বজীবের ব্যথার ব্যথি সোনার রাজ্য ফেলে
বেরিয়ে গেছে ফকীর-বেশে ছাই দিয়ে সংসারে[১৭৬]

ফিকির > ফিক্র (فكر) চিন্তা, ধারণা, ফন্দি, মত, উদ্বেগ, চালাকী, বুদ্ধি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'ফন্দি' অর্থে এসেছে–

জানিস তো বল মোহনদাসের মহাদুষমন গণি,
কি ফিকির আটে সুরা-রাক্ষসী পুতনা বোতল-স্তনী,[১৭৭]

ফুরসুৎ > ফুরস.াত্ (فرصة) সুযোগ, সুবিধা, অনুকূল, সময়, অবকাশ ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'সুযোগ' অর্থে দু'টি কবিতায়[১৭৮] দু'বার–

কে গেছে কে যায় আর
অতশত ভাবনার
ফুরসুৎ নেই আজ নেই, বন্ধু ।[১৭৯]

---

১৭২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নূতন কলম্বস', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০
১৭৩. আখেরী:কাব্য সঞ্চয়ন, সাকীর প্রতি:তীর্থ সলিল
১৭৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাকীর প্রতি', "তীর্থ সলিল", পৃ. ১৬৬
১৭৫. বুদ্ধবরণ,দিল্লীনামা:বেলাশেষের গান, ফুল্ল সাজ্ঞি:কুহু ও কেকা
১৭৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বুদ্ধবরণ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৯৮
১৭৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১১১
১৭৮. হিন্দোল বিলাস, কোন ধর্মধ্বজের প্রতি:বিদায় আরতি
১৭৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'হিন্দোল বিলাস', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

'অবকাশ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ঋতুর রঙের ঘটা দেখে লয়
উঁকি মেরে একবার,
তখনি হাতের কাজ নিয়ে পড়ে
ফুরসুত নাই তার ।[১৮০]

ব

বকেয়া > বাকি.য়াহ্ (باقية) অবশিষ্ট, বাকী, সাবেক ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সাবেক' অর্থে এসেছে–

কথা রাখিল না যবে হীন-মনা কথার কাপ্তেনেরা,
কায়েম রাখিল **বকেয়া** যুগের জিজিয়া– ক্ষোভের ডেরা,[১৮১]

বদল > বাদল (بدل) পরিবর্তন, বদল, বিনিময়, বিকল্প ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৮২] তিনবার 'পরিবর্তন' অর্থে এসেছে–

উপরোধে পথ রুধি তার,– অনুরোধের আঁচল গলে,–
বন্ধ ক'রে দিলাম যাওয়া; পাঠিয়ে দিলাম তার **বদলে**[১৮৩]

বয়ান > বায়ান্ (بيان) বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা, ইস্তেহার, রিপোর্ট ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বর্ণনা' অর্থে এসেছে–

ধন্য সে,– প্রভাত জাগি' সতৃষ্ণ নয়নে
প্রতিদিন যেইজন দেখে ও **বয়ান**;–
মাতাল চেতনা পায় নিশা অবসানে,
প্রেমের কাটেনা নেশা না গেলে পরাণ![১৮৪]

বাকী > বাকী (باقى) অবশিষ্ট, পরিশেষ, স্থায়ী ইত্যাদি ।

শব্দটি তেরটি কবিতায়[১৮৫] তেরবার 'অবশিষ্ট' অর্থে এসেছে–

শুক্ল-ধ্যানের সাগর বেলায়
আছি দাড়াইয়া শান্ত– আঁখি,

---

১৮০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মুচি', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৫
১৮১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১০৬
১৮২. ভীম জননী:বেলাশেষের গান, লুব্ধা:তীর্থ রেণু,গান:কুহু ও কেকা
১৮৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভীম জননী', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৫৯
১৮৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রেমের নেশা', "তীর্থ সলিল", পৃ. ৬৯
১৮৫. গোপন কথা,গান,রাজ্যের স্বপ্ন,বিরাট, পেয়ালার প্রেম:মণি মঞ্জুষা, মল্লিকুমারী,গিরিরাণী, জাফরানিস্থান:বিদায় আরতি, উড়োজাহাজ, সাল-পহেলী:বেলাশেষের গান, তীর্থ রেণু, নব্য অলংকার,দরবেশের ঘুর্ণি নৃত্য:তীর্থ রেনু,সতী:তুলির লিখন

Dhaka University Institutional Repository

তবু মনে হয়- এখনো সময়

হয় নি, কি যেন রয়েছে বাকী ।[১৮৬]

বাতিল > বাতি.ল (باطل) মিথ্যা, নষ্ট, অকেজো, অকার্যকর, অন্যায়, অসত্য, নাকচ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'নাকচ' অর্থে এসেছে-

হো হো, পাতিলের বিল করিতে বাতিল

উদয় হয়েছি আমরা হে,[১৮৭]

বিদায় > বিদা' (وداع) বিদায়, প্রস্থান, ছুটি, বিতাড়ন ইত্যাদি ।

শব্দটি একত্রিশটি কবিতায়[১৮৮] পয়ত্রিশবার 'বিদায়' বা 'প্রস্থান' অর্থে এসেছে-

বিদায় শেয়াল, নেকড়ে বিদায়, বিদায় ভালুক ভাই,

সুবল ব'লে ছিল যে-জন সে আর বেচেঁ নাই ।[১৮৯]

বিলকুল > বিল্‌কুল (بالکل) একদম, স্রেফ, সমুদয়, সম্পূর্ণ, বেবাক ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায় চারবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'সম্পূর্ণ' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৯০] তিনবার-

কেয়া-গুড়ি তবে মাখ্,

তুলে নে রে লাখে লাখ

জুঁইফুল,-বিলকুল চুলে তুই পর ।[১৯১]

'স্রেফ' অর্থে একটি কবিতায় একবার-

কিছুই চাওয়ার ধার ধারিনে আজ মোরা বিল্‌কুল,

বীরের বরণ লাভ ক'রে মন ফুর্তিতে মশ্‌গুল ।[১৯২]

বুরুজ > বুরুজ (بروج) برج এর বহুবচন । দুর্গ, উঁচু দালান, প্রাসাদ, গম্বুজ ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৯৩] দু'বার 'গম্বুজ' অর্থে এসেছে-

মোগল মরেছে, মরেছে পাঠান,

জেগে আছে তার কীর্ত্তি যত,

---

১৮৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মল্লি কুমারী', "বিদায় আরতি",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৭৮

১৮৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পাতিল প্রমাদ', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৬১

১৮৮. বনচ্ছায়া,বালিকার অনুরাগ,রাখাল ও রাজকন্যা,জীবন স্বপ্ন,নিশীথে,সমাপ্তে:তীর্থ সলিল, গায়ের পালা (৩বার),বিদেশী (২বার), ভালবাসার দুঃখ, জাগরণী,বিদায়ক্ষণে:মণি-মঞ্জুষা, তিলক,ইনসাফ, জৈষ্টি মধু:বিদায় আরতি, সরযু: বেলাশেষের গান, সূদুরের যাত্রী:কুহু ও কেকা, ঘুমপাড়াণী, নীরব প্রেম,বানর,বিদায় ক্ষণে,পতিতার প্রতি,বিবাহান্তে বিদায়, যোদ্ধজননী, নস্য,বিদায়,সাযুজ্য সাধনা:তীর্থ-রেনু,মতী, বিষকন্যা:তুলির লিখন, মধুমাসে, গিরীরানী (২বার):কুহু ও কেকা

১৮৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গায়ের পালা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৬২

১৯০. হিন্দোল বিলাস,জৈষ্ঠি মধু,কে :বিদায় আরতি

১৯১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'হিন্দোল বিলাস', "বিদায় আরতি",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৬৭

১৯২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বাঙ্গালী পল্টনের গান', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৭১

১৯৩. যশমন্ত: তুলির লিখন, দিল্লীনামা:বেলাশেষের গান

কেল্লা-কসর পাহাড়-সোসর
বুরুজ মীনার সমুদ্দত[১৯৪]

বুল্‌বুলী > বুলবুলী (بلبلى) সুকণ্ঠধারী গানের পাখি বিশেষ ইত্যাদি।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[১৯৫] ছয়বার উল্লিখিত অর্থে এসেছে–

বাজ-পাখী সে যতই চ্যাঁচাক আসবে নাক বসন্ত
বুলবুলি সে ডাকছে কোথায়, চল করি তাই তদন্ত।[১৯৬]

বুরকা > বুরক.া' (برقع) মুসলিম নারীদের জন্য ব্যবহৃত আপাদমস্তক আবৃত ঢিলেঢালা আচ্ছাদন।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উল্লিখিত অর্থে এসেছে–

পাঠান-পোষাক শের-মসজিদে।
মোগল-পোশাক সাজাহাঁবাদে,
লোদির দত্ত **বোরকা** তোমার
কে জানে সে কোন ধুলায় কাঁদে ?[১৯৭]

ম

মক্কা > মাক্কাহ্ (مكة) আরব দেশের অন্যতম প্রধান নগর এবং মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান; হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্মভুমি। পবিত্র কাবাগৃহ এখানেই অবস্থিত। লোহিতসাগর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে ইয়ামান, জিদ্দা ও ফিলিস্তীন সড়ক পথের সংগমস্থলে যে পর্বতমালার একটি উপত্যকা রয়েছে, এ উপত্যকাতেই পবিত্র মক্কা নগরী অবস্থিত।[১৯৮]

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মক্কা-মদিনা সকলি ঢুঁড়িনু
প্রেমিকের দেখা নাই,
শ্যামলী লুকাল ধবলী আসিল
এইবারে ছুটি চাই।[১৯৯]

---

১৯৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৭
১৯৫. জাফরানিস্থান:বিদায় আরতি, ভোরাই, শিরাজ-ই-হিন্দ (২বার):বেলাশেষের গান, বর্ষায়:বেণু ও বীণা, উপদেশ:তীর্থরেণু
১৯৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শিরাজ-ই-হিন্দ', "বেলাশেষের গান', পৃ.৮৫
১৯৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৯
১৯৮. ড.মুহাম্মদ হুমাইন হায়কল অনুবাদ মওলানা আবদুল আউয়াল, মহানবীর জীবন চরিত (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩
১৯৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আত্ম-নিবেদন', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

মক্কেল > মুয়াক্কিল (موكل) উকিল বা এজেন্ট নিয়োগকারী ইত্যাদি ।

শব্দটি উপরোক্ত অর্থে একটি কবিতায় একবারই এসেছে–

ফন্দি করে খসিয়ে টাকা শুন্য করে থলি
মক্কেল বিদায় করেন তাঁরা এই কথাটি বলি,[২০০]

মজবুত/মজবুৎ > মাজ.বুত. (مضبوط) দৃঢ়, শক্ত, মজবুত ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার ভিন্নার্থে এসেছে–

'শক্ত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কহে অঙ্গুর আঁধারে মাটির মাঝে,
মজবুৎ নই, তবুও লাগিব কাজে!' [২০১]

'দৃঢ়' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

দুঃখ ভারী শিল্পী
বিশ্বকর্মার অংশ,
কর্চে হৃদয় **মজবুত**
এমনি,– যে নাই ধ্বংশ ।[২০২]

মজলিশ/ মজলিস > মাজলিস্ (مجلس) সভা, সমাবেশ, অধিবেশন, আসর, পরিষদ, বোর্ড, আড্ডা ইত্যাদি ।

শব্দটি ছয়টি কবিতায় ছয়বার ভিন্নার্থে এসেছে;

'আসর' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[২০৩] পাঁচবার–

নক্সা দেখে আপনি তুমি তুষলে বখশিশে,
দেওয়ান-খাসে ঠাই দিলে হে গুণবীর **মজলিস** ।[২০৪]

'আড্ডা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

এ সকল কথা আগে ভাবি নাই;
দিন গেছে টো টো ক'রে,–
দোকানে দোকানে **মজলিস্** রেখে,–
ফল পেড়ে পাখী ধরে ।[২০৫]

---

২০০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নস্য', "তীর্থ রেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৪৪
২০১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অঙ্কুর', "তীর্থ রেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৪৩
২০২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুঃখ কামার', "তীর্থ রেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৪৭
২০৩. জৈষ্টিমধু, রেলগাড়ীর গান:সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, চায়ের পেয়ালা:মণি-মঞ্জুষা,শিরাজ-ই-হিন্দ: বেলাশেষের গান, যশমন্ত,বিদ্যার্থী: তুলির লিখন ।
২০৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,'যশমন্ত', "তুলির লিখন", পৃ. ৮১
২০৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিদ্যার্থী', "তুলির লিখন", পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

মৎলব/ মতলব > মাত.লাব (مطلب) উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, অভিপ্রায়, ফন্দি, কৌশল ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

'উদ্দেশ্য' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কত **মতলব** হয় মাটি
কত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়,[২০৬]

'ফন্দি' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বধু খোজে বর, ভেক সরোবর,
যত মাথা **মৎলব** সে তত![২০৭]

মদিনা > মাদীনাহ্ (مدينة) শহর, নগর । এখানে মদিনা দ্বারা আল্ মাদিনাতুল মোনাত্তয়ারাহ কে বুঝানো হয়েছে । আরব দেশের অন্যতম প্রধান নগর এবং বিশ্ব মুসলিমের তীর্থস্থান । হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা থেকে হিজরত করে এ মদিনায় আসেন এবং ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এ মদিনাতেই আয়েশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন । পবিত্র রওজা মোবারক এখানে অবস্থিত । মদিনার পূর্ব নাম ইয়াসরিব ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মক্কা-**মদিনা** সকলি ঢুঁড়িনু
প্রেমিকের দেখা নাই,
শ্যামলী লুকাল ধবলী আসিল
এইবারে ছুটি চাই ।[২০৮]

মনিব > মুনীব (منيب) প্রভু, পৃষ্টপোষক, নিযুক্তকারী ব্যক্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'প্রভু' অর্থে এসেছে–

নফর নয়,– একমাত্র সেই তো **মনিব**
নফরের দুনিয়ার; দীন হীন প্রতি জীবে শিব[২০৯]

মমতাজ > মুমতায (ممتاز) শ্রেষ্ট, চমৎকার, প্রথম শ্রেণীর, অনন্য, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইত্যাদি । এখানে মমতাজ দ্বারা মোগল সম্রাট শাহাজাহানের পত্নী মমতাজ বেগমকে বুঝানো হয়েছে ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[২১০] অন্তত তিনবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

কোথা নূরজাঁহা ? কোথা **মমতাজ**?
দিলরাস বানু আজ কোথায়?

---

২০৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ফৌজদার', "তীর্থ রেণু",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৩৫
২০৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মোমপায়ীর গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৯
২০৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নিবেদন', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৫১
২০৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নফর কুন্ড', "কুহু ও কেকা", পৃ. ১২১
২১০. মমতাজ:বেণু ও বীণা, তাজ:কাব্য সঞ্চয়ন, দিল্লীনামা:বেলাশেষের গান

কোথায় দারার প্রেয়সী নাদিরা?

হামিদা, মাহুম কোথায়? হায়![২১১]

ময়দান > মায়দান (میدان) মাঠ, ক্ষেত্র, প্রান্তর ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'মাঠ' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

(আমি) সব্‌জান খোলায়াড় সব জানি খেলতে!

ময়দানে মজ্‌বুত গোলে বল ঠেলতে![২১২]

'প্রান্তর' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ধ্বজা কত ওড়ে **ময়দান** জুড়ে সারি সারি কত তাঁবু

চাবুকের ঘায়ে কতনা বাবুকে হ'তে হবে আজ কাবু;[২১৩]

'রণক্ষেত্র' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার –

ঘুষির বদলে ঘুষি দিতে গেল

যুদ্ধে জাপানী সেনা,

ময়দানে আর কেল্লায় হ'ল

গোলাগুলি লেনা দেনা,[২১৪]

মরসুম > মওসুম > মাওসুম (موسم) মৌসুম, ঋতু, সময় ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'ঋতু' অর্থে এসেছে–

মরি, ভোমরা ছুটেছে তার পাকে

হাওয়া করে দুটো পাখনাকে,–

ফলের মধ্যের **মারসুম** যাপে

ফুলের মধুর দিন ভুলি![২১৫]

মরিয়ম > মারয়াম্‌ (مریم) মরিয়ম, হযরত ঈসা (আ.)-এর মা, একজন মহিয়সী নারী ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

কাশ্মীরী বেগম? কোথায়–

ইস্তাম্বুলী? কান্দাহারী? ?

---

২১১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৪৭

২১২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'খেলোয়াড়ের দল', "সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা", পৃ. ৫

২১৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'লাজের কাহিনী', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩৬

২১৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অনুশোচনা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১২০

২১৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জ্যৈষ্ঠি মধু', সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা", পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

কোথা যোদপুরী? কোথা মরিয়ম?
কোথা উদিপুরী ? রোকিয়া নারী?[২১৬]

মশগুল > মাশগুল্ (مشغول) ব্যস্ত, নিয়োজিত, লিপ্ত, নিবিষ্ট, বিভোর, মগ্ন, আবিষ্ট ইত্যাদি ।

শব্দটি ছয়টি কবিতায় ছয়বার 'ব্যস্ত' ও 'লিপ্ত' অর্থে এসেছে–

'ব্যস্ত' অর্থে দু'টি কবিতায়[২১৭] দু'বার–

সহসা অদূরে নৌকার 'পরে
দেখিনু সেই সে নারী,
নতুন বন্ধু– সঙ্গে চলেছে
মশ্‌গুল তারা ভারী![২১৮]

'লিপ্ত' অর্থে চারটি কবিতায়[২১৯] চারবার–

ওরে দিল! তুই থাকিসনে আর
দুনিয়াতে মশগুল ।[২২০]

মশাল > মাশ্‌আ.ল (مشعل) প্রদীপ, দীপদণ্ড, দেউটি ইত্যাদি ।

শব্দটি নয়টি কবিতায়[২২১] অন্তত নয়বার 'প্রদীপ' অর্থে এসেছে–

অমল যশের লালসায় হায় জয়ের মশাল জ্বালি;
নিরীহ জনের রক্তে কেবল লভে কীতির কালি ।[২২২]

মসজিদ > মাসজিদ (مسجد) মুসলমানদের উপাসনালয়, সেজদার ঘর, নামাজের স্থান ইত্যাদি ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২২৩] অন্তত সাতবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

আপনার হাতে কত শত বার
ঘুরায়েছ তুমি যমের জাঁতা,
পূত মসজিদে সায়েদ রাজার
দেখেছ খশিয়া পড়িতে মাথা ।[২২৪]

---

২১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৪৬
২১৭. পেয়ালার প্রেম:মণি-মঞ্জুষা,পরিব্রাজক :তুলির লিখন
২১৮. পরিপ্রাজক :তুলির লিখন, পৃষ্ঠা–৬০

২১৯. চায়ের পেয়ালা,আত্ম নিবেদন:মণি-মঞ্জুষা, কে :বিদায় আরতি, বাঙ্গালী পল্টনের গান:বেলাশেষের গান
২২০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আত্ম-নিবেদন', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৫১
২২১. চিরন্তনী, গোত্র-সঞ্জীবন:মণি-মঞ্জুষা,তিলক, সেবা সাম:বিদায় আরতি, ফরিয়াদ, নমস্কার,আখেরী:বেলাশেষের গান, সাগ্নিকের সাম্যসাম: হোমশিখা,বাসন্তি বর্ষা,জ্ঞানপাপী,আদর্শ যাত্রী:তীর্থ রেণু
২২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাম্যসাম', "হোমশিখা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৮৪
২২৩. পেয়ালার প্রেম:মণি-মঞ্জুষা,ঘুমতি নদী:বিদায় আরতি,শিরাজ-ই-হিন্দ (২বার),দিল্লীনামা (২বার):বেলাশেষের গান, শিশির যাপন:তীর্থরেণু
২২৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৪৮-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

মহকুমা > মাহ্.কামাহ্ (محكمة) আদালত, বিচারালয় ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিচারালয়' অর্থে এসেছে–

তোমার 'পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ন ক'রে মনুষ্যত্বধারা
রোমের হুকুম-**মহকুমা** গুড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা।[২২৫]

মহব্বত > মুহ.াব্বাহ্ (محبة) প্রেম, ভালবাসা, হৃদ্যতা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'ভালবাসা' অর্থে এসেছে–

বন্দী স্বামীর মোচন-হেতু হ'লে এবার বন্দিনী,
মহব্বতের মুঠা শিথিল করলে ইরাণ-নন্দিনী;[২২৬]

মহল > মাহাল্ল (محل) স্থান, কেন্দ্র, স্থল, ক্ষেত্র, পাত্র ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২২৭] দু'বার 'স্থান' অর্থে এসেছে–

তোগ্‌লকাবাদে শৃগাল ফিরিছে,
বাওলিতে ভেক নাহিছে শুধু,
ফিরোজাবাদের শুন্য **মহল**,
শুস্ক নহর করিছে ধুধু।[২২৮]

মানা > মানা' (منع) নিষেধ, কারণ, বাঁধা ইত্যাদি।

শব্দটি সাতটি কবিতায়[২২৯] আটবার 'নিষেধ' অর্থে এসেছে–

আমার এরা পাগল বলে, কয় গো দেওয়ান!
শাহান শাহা! আসতে ব'লে আজ কেন **মানা**?[২৩০]

মাফ > মা'আফ (معاف) ক্ষমা, রেহাই, অব্যাহতি ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায়[২৩১] চারবার 'ক্ষমা অর্থে এসেছে–

বাদশা! আমার গর্দ্দান নাও; যাতনা এড়ি;
পাগল ক'রে **মাফ** ক'রে পায় পরিয়ো না বেড়ী।[২৩২]

---

২২৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বড়দিনে', "বিদায় আরতি",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২১৯
২২৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কবর-ই-নুরজাহান', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ৭৮
২২৭. সাড়ে-চুয়াত্তর: কুহু ও কেকা, দিল্লী-নামা: বেলাশেষের গান
২২৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৭
২২৯. দুখ সর্ববরী মাঘে:তীর্থ-সলিল, সালতামামী,গান্ধিজী:বেলাশেষের গান, সোম: হোম শিখা, শিশির যাপন:তীর্থরেণু, রাজবন্ধিনী, যশমন্ত (২বার):তুলির লিখন
২৩০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যশমন্ত ', "তুলির লিখন", পৃ. ৮১
২৩১. তাজের প্রথম প্রশাস্তি,ঢালাই কলের গান:মণি-মঞ্জুষা,ইনসাফ:বিদায় আরতি,যশমন্ত :বেলাশেষের গান
২৩২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যশমন্ত ', "তুলির লিখন", পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মাল > মাল (مال) ধন, সম্পদ, অর্থ, তহবিল, পণ্য ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৩৩] দু'বার 'পণ্য সামগ্রী' অর্থে এসেছে–

হ'ল বিহ্বল যাত্রীর দল
সর্দ্দার মাঝি তবে
হুকুম করিল "বোঝাই কমাও,
মাল ফেলে দিতে হবে।"[২৩৪]

মাল্লা > মাল্লাহ্. (ملاح) নাবিক, মাঝি, লবন-ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় পাঁচবার 'মাঝি' অর্থে এসেছে–

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়–
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।[২৩৫]

মালিক > মালিক্ (مالك) রাজা, প্রভু, কর্তা, সত্ত্বাধিকারী, অধিকারী, অধিপতি, শাসনকতা ইত্যাদি।

শব্দটি বারটি কবিতায় বারবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'অধিকারী' অর্থে সাতটি কবিতায়[২৩৬] সাতবার–

এক যে রাজার জৌষ্ঠপূত্র– অনেক টাকার মালিক,
বাড়ির দ্বারে সিংহ তাঁহার, গাড়ির দ্বারে শালিক![২৩৭]

'অধিপতি' অর্থে তিনটি[২৩৮] কবিতায় তিনবার–

আসমানে চাঁদ সবাই দেখে বারণ নাহি তায়
দেখ্‌লে চোখে চাঁদের মালিক শিকল না পরায়।[২৩৯]

'রাজা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বল্লম-ধারী চলে সারি সারি
ফলায় আলোক জ্বলে,

---

২৩৩. স্নেহের নিরিখ:তীর্থরেণু, পরিব্রাজক :তুলির লিখন
২৩৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পরিব্রাজক ',"তুলির লিখন", পৃ. ৪৮
২৩৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুরের পাল্লা', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৩৯
২৩৬. শিকারের গান, স্নানার্থী, বিশ্ব-বেদন:মণি-মঞ্জুষা, বর্ষ-বোধন:বিদায় আরতি,মাতামন:বেলাশেষের গান,কালোর আলো:কুহু ও কেকা, নস্য: তীর্থ-রেণু,দুর্ভাধা:তুলির লিখন
২৩৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নস্য', "তীর্থ-রেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৪৪
২৩৮. নওরোজের গান:মণি-মঞ্জুষা,বর্ষ-বোধন:বিদায় আরতি,যশমন্ত:তুলির খিলন
২৩৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যশমন্ত ', "তুলির লিখন", পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রজার নালিশ শুনিয়া ফেরেন
মালিক সদলবলে ।[২৪০]

'বার্তা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

অচেনা নীড়ের মালিকের কাছে,
অচেনা পক্ষী-জননীর কাছে
কণ্ঠে না জানি কি যে তোর আছে,–
পাগল যাহে নিখিল![২৪১]

মালুম > মা'লূম (معلوم) পরিচিত, অনুভূত, জ্ঞাত, সুবিদিত ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অনুভূত' অর্থে এসেছে–

তালিম মানুষ মিলেছে যার
তাকেই মজা মালুম হয়,
সমঝে যদি সুজন হয় ।[২৪২]

মীনার > মানার (منار) বাতিঘর, আলোকস্তম্ভ, মিনার বা আজানের জন্য ব্যবহৃত মসজিদের উঁচু চূড়া, প্রাসাদ-অট্টালিকাদির উঁচু স্তম্ভ ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় চারবার 'উঁচু প্রাসাদ' ও 'আলোক স্তম্ভ' অর্থে এসেছে;

'উঁচু প্রাসাদ' অর্থে একটি কবিতায় তিনবার –

যমুনা দেখিতে উচ্চ মীনারে
চড়িতে যাহারা কই গো তারা ?[২৪৩]

'আলোক স্তম্ভ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

গাছের ছায়ায় প্রভাতী আলোর মীনারে,
অপরূপ তার রূপ যেন দেছে বাড়ায়ে ।[২৪৪]

মুরব্বি > মুরাব্বী (مربی) লালন-পালনকারী, প্রতিপালক, শিক্ষক, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, বয়োজ্যেষ্ঠ ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় তিনবার 'অভিভাবক' ও 'বয়োজ্যেষ্ঠ' অর্থে এসেছে–

---

২৪০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৫৫
২৪১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কোকিল', "তীর্থ সলিল", পৃ. ১৫
২৪২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অরূপ গুরু', "মণি-মঞ্জুষা",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৫৩
২৪৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৪৭
২৪৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সম্মানার্থী', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

'অভিভাবক' অর্থে একটি কবিতায় একবার –

মুরুব্বিদের করছে তলব, চাইছে হিসাব, চাইছে চাবী,
মানুষ ব'লেই সকল মানুষ ইজ্জতেরি করছে দাবী ।[২৪৫]

'বয়োজ্যেষ্ঠ' অর্থে দু'টি কবিতায়[২৪৬] দু'বার–

মুরুব্বিদের মুখে শোনা অনেক দিনের গান,
আধখানা তার শুনেছিলাম শিখেওছি আধখান;[২৪৭]

মুলুক > মুল্‌ক (ملك) দেশ, রাজ্য, কর্তৃত্ব মালিকানা, অধিকার ইত্যাদি ।

শব্দটি দশটি কবিতায়[২৪৮] এগারবার 'রাজ্য' অর্থে এসেছে–

নিমক-হারাম হায় গো যে-দিন **মুলুক** খোয়ালে,
বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে ক্ষোভে মাথা নোয়ালে;[২৪৯]

মুশা > মূসা (موسى) ক্ষুর, লৌহ শিরস্ত্রানের উপরিভাগ । এখানে মুশা দ্বারা বনী-ইসরাঈলদের নিকট প্রেরীত নবী ও রাসূল হযরত মুসা (আ.) এর কথা বলা হয়েছে । তাঁর উপর 'তাওরাত' নামক আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয় । মুসা (আ.)-এর উপাধী ছিল 'কালিমুল্লাহ' । আল কোরআনে যে ক'জন নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতের কথা আলোচিত হয়েছে তম্মধ্যে মুসা (আ.) ও তাঁর জাতির কথা সবচে' বেশী আলোচিত হয়েছে ।

মোস্লেম আনে কোরান কেবল,
হিন্দু সে বেদ মানে,
মুশার বচন মনে ইহুদীরা,
বাইবেল খৃষ্টানে;[২৫০]

মোস্‌লেম > মুসলিম্‌ (مسلم) আত্মসমর্পনকারী, অনুগত, হযরত মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

যারে মাঝে পেয়ে কাজিয়া থামায়ে হিন্দু ও **মুস্‌লেম**
'আত্মদমন স্বরাজ' সমঝি ভূঞ্জে পরম প্রেম,[২৫১]

---

২৪৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৩
২৪৬. নস্য:তীর্থ রেণু, আখেরী:বেলাশেষের গান
২৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নস্য', "তীর্থ রেণু",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১,পৃ. ৪৪৪
২৪৮. আভ্যুদয়িক,বর্ষবোধন:কাব্য সঞ্চয়ন,বালকের নমস্কার:মণি-মঞ্জুষা,ঘুমতি নদী, ইনসাফ:বিদায় আরতি,বাঙ্গালী পল্টনের গান,শিরাজ-ই-হিন্দ, ফরিয়াদ,কবি জুবিলী (২বার):বেলাশেষের গান,দার্জিলিঙের চিঠি:কুহু ও কেকা
২৪৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বাঙ্গালী পল্টনের গান', "বেলাশেষের গান",পৃ. ৬৯
২৫০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিশ্ব-বেদন', "মণি-মঞ্জুষা",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৮
২৫১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

মুসাফির > মুসাফির্ (مسافر) সফরকারী, ভ্রমণকারী, যাত্রী, পথিক আগন্তুক ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৫২] তিনবার 'অতিথি' অর্থে এসেছে–

মুসাফের রোজ আসে নাকো আর

ম্লান মুসাফের-খানার আলো,

থেমেছে ডঙ্কা, তুমি ভাবিছ কি ?

সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো ?[২৫৩]

মেজাজ্ > মিয.াজ্ (مزاج) মিশ্রণ, সংমিশ্রণ, মানসিক অবস্থা, স্বভাব, প্রকৃতি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'মানসিক অবস্থা'র প্রতি ইঙ্গিতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

নওরোজে আজ খোস **মেজাজে** না দিলে বক্‌শিশ্

গমের ক্ষেতে বাধব ঘোড়া, কাঁদবে যবের শীষ ।[২৫৪]

মৌলবী > মাওলাভী (مولوی) মুসলিম পণ্ডিত, আরবী ও ফার্সীতে পন্ডিত, প্রভুর প্রতি ভক্ত ব্যক্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৫৫] দু'বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

পুড়ছে ভট্ট সঙ্গে তারি **মৌলবী** সে যাচ্ছে পুড়ে,

ত্রিশটি ভাষার বাসাটি হায় জন্ম হ'য়ে যাচ্ছে উড়ে ।[২৫৬]

র

রদ > রাদ্দ্ (رد) প্রত্যাবর্তন, ফেরৎ, জবাব, খণ্ডন, নিবৃত্তি, রহিত, খারিজ, বর্জন ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৫৭] দু'বার 'রহিত' অর্থে এসেছে–

দিসনে বাধা বারণ করি করিস্‌নে রে কান্নাকাটি,

মরণ কারো হয় নাক' **রদ্**, মাটি যা' সে হবেই মাটি ।[২৫৮]

রাজী > রাদ.ী (راضی) সম্মত, সন্তুষ্ট, খুশী, ইচ্ছুক ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সম্মত' অর্থে এসেছে–

বামুন বলেই করব খাতির শুনঃ শেপের ঘৃণ্য পিতায়

হাড়কাটে যে নিজের ছেলে বাঁধতে **রাজী**, ধন যদি পায়![২৫৯]

---

২৫২. একটি চামেলির প্রতি:বিদায় আরতি, দিল্লীনামা: বেলাশেষের গান
২৫৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৫৩
২৫৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নওরোজের গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৫
২৫৫. সরযু:বেলাশেষের গান, শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিণাথ দে:কুহু ও কেকা
২৫৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শ্মশান-শয্যায় আচার্য্য হরিণাথ দে', "কুহু ও কেকা",পৃ. ১১৪
২৫৭. সতি:তুলির লিখন, গান্ধিজী: বেলাশেষের গান
২৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সতী', "তুলির লিখন",পৃ. ১২১
২৫৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩১

রায় > রা'য় (رأى) মত, ধারণা, অভিমত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

শব্দটি একটি মাত্র কবিতায় একবারই 'মত' অর্থে এসেছে–

দেখ্ছ বুড়ো বাইরে থেকে,–
রায় দিতে হয় ভিতর দেখে,
দু'টো হিসাব ভজলে তবে মিলবে সাল্তামামী;
আমি যে সেই আমিই।[২৬০]

ল

লোকমান > লুক.মান (لقمان) লোকমান হাকীম।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

কালো অশোক জগৎ-প্রিয়,-রাজার সেরা তারে জানি;
হাব্সী কালো লোকমানেরে মানে আরব আর ইরাণী।[২৬১]

লোকসান > নুক.স.ান্ (نقصان) ক্ষতি, ঘাটতি, হ্রাস, স্বল্পতা, অভাব ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'ক্ষতি' অর্থে এসেছে–

কোথায় লোভের ঘৃণ্য শোলুই জন্মাল কার মনে,–
সাপ হয়ে সে জড়িয়ে দিল লোক্সানে কোন্ জনে[২৬২]

শ

শয়তান > শায়ত.ান (شيطان)প্রেতাত্মা, দুরাচার, ইবলীস, প্রবঞ্চক, পাপাত্মা ইত্যাদি। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী হযরত আদম (আ.) কে সিজ্দাহ্ করা সংক্রান্ত আল্লাহর আদেশ সরাসরি অমান্য করে অভিসপ্ত হয়ে যাওয়া ইবলীস এর কুক্ষাত নাম শয়তান। তার আর এক নাম আযাযীল।

শব্দটি নয়টি কবিতায় দশবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'দুরাচার' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[২৬৩] পাঁচবার–

চিল শকুনের চলছে কানাকানি,
বিষিয়ে তোলে বিশ্ব-বাতাস সর্পজিহব সুসভ্য শয়তানী![২৬৪]

---

২৬০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আমি', "কুহু ও কেকা", পৃ. ১৩৮
২৬১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কালোর আলো', "কুহু ও কেকা",পৃ. ১৩০
২৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গিরিরাণী', "কাব্য সঞ্চয়ন",পৃ. ১৫৬
২৬৩. উড়োজাহাজ,চরকার আরতি,সালতামামী:বেলাশেষের গান,ইনসাফ:বিদায় আরতি,বড় দিনে:কাব্য সঞ্চয়ন
২৬৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাল-তামামী', "বেলাশেষের গান",পৃ. ৭৭

'প্রেতাত্মা' অর্থে দু'টি কবিতায়[২৬৫] দু'বার–

অকারণে আলো করিয়া প্রেতস্থান
মশাল জ্বালিয়া হাসিতেছে **শয়তান**।[২৬৬]

'পাপাত্মা' অর্থে দু'টি কবিতায়[২৬৭] দু'বার–

তোমাদের ফুলে ফুল্ল মেদিনী
তোমাদের ভূলে ভোলে সবাই,
তোমরা রহিলে রাহুর কবলে
শয়তান পূজা পায় যে, ভাই![২৬৮]

'প্রবঞ্চক' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

হাসে **শয়তানী** হাসি হেটো লোক যত,
জীবনের ভূল ধরি পরিহাস করে;
এমনি করিয়া শেষ হয় প্রহসন,–
তাও লোকে ভূলে যায় দিন দুই পরে![২৬৯]

শামস্-উল-উলামা > শামসুল'উলামা (شمس العلماء) জ্ঞানীদের সূর্য, আরবী ও ইসলামী বিষয়ে উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতগণের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে **শামস্-উল-উলামা**।[২৭০]

শহীদ/সহিদ > শাহীদ (شهيد) দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন দানকারী, দেশ, জাতি ও সত্য-ন্যায়ের পথে আত্মোৎস্বর্গকারী ব্যক্তি ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[২৭১] তিনবার দেশ, জাতি ও সত্য-ন্যায়ের পথে আত্মোৎস্বর্গকারী ব্যক্তি অর্থে এসেছে–

জপমালে যার সারা দুনিয়ার সত্য-প্রেমীর মেল,
গ্রীসের **শহীদ** সক্রেটিস্ আর ইহুদীর দানিয়েল,[২৭২]

---

২৬৫. জ্ঞান-পাপী:তীর্থ রেণু, কোন ধর্মধ্বজের প্রতি:বিদায় আরতি
২৬৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জ্ঞান-পাপী', "তীর্থ রেণু",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১,পৃ. ৪১৩
২৬৭. গোত্র সঞ্জিবন:মণি-মঞ্জুষা,বড় দিনে:কাব্য সঞ্চয়ন
২৬৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গোত্র সঞ্জিবন', "মণি-মঞ্জুষা",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২১৭
২৬৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিদায়', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১,পৃ. ৪৫০
২৭০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্মশান সয্যায় আচার্য্য হরিণাথ দে', "কুহু ও কেকা",পৃ. ১১৪
২৭১. গান্ধিজী:বেলাশেষের গান, কোন ধর্ম ধ্বজের প্রতি:বিদায় আরতি, নব্য তুরস্কের জাতিয় সঙ্গীত:মণি-মঞ্জুষা
২৭২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

শিয়া > শী'আহ্ (شِيعَة) দল, সম্প্রদায়,অনুসারী। শিয়া একটি মুসলিম ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের মতে হযরত আলী (রা.) হলেন হযরত মুহম্মদ (স.) এর অব্যবহিত খলিফা। তাদের মতে, হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরতের জামাতা এবং অন্যতম প্রভাবশালী হাশেমী হিসেবে হযরত আলী (রা.)-ই মুসলিম জাহানের খলিফা। কিন্তু পর পর তিনবার এদের প্রত্যাশানুযায়ী খলিফা নির্বাচিত না হওয়ায় এরা গোপনে গোপনে সংগঠিত হতে থাকে।

হযরত আলী (রা.)এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়ার সাথে সিফ্ফিনের রণাঙ্গনে এক তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আলীর (রা.) বিজয়ের চূড়ান্তক্ষণে মুয়াবিয়ার ধূর্ততায় সালিশী নিস্পত্তির প্রস্তাব প্রতারণায় পর্যবসিত হয়। আলী (রা.)এর নৈতিক পরাজয় ঘটে। হযরত আলী (রা.) খারেজীদের হাতে নিহত হয়। হযরত আলীর (রা.) এ পরাজয় এবং হত্যা বিবাদকে পুঁজি করে মুয়াবিয়া যখন গণতন্ত্র হত্যা করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখনি এ সম্প্রদায়টি আত্ম-প্রকাশ করে। অতঃপর ইয়াযিদের বাহিনীর হাতে কারবালার প্রান্তরে হযরত ইমাম হুসাইনের (রা.) নির্মম শাহাদাতের ঘটনা থেকে উদ্ভূত ইমাম হুসাইন (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর পরিবারের প্রতি যৌক্তিক সমবেদনা পোষণ করতে গিয়ে এরা ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে জন্ম লাভ করে।[২৭৩]

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'শিয়া সম্প্রদায়' অর্থে এসেছে–

বাহাদুর শাহ হইল সে শিয়া,
মোল্লা রাখিল মনের মত,
সুন্নি সাজাদা দিনে দুপহরে
মসজিদে তারে করিল হত![২৭৪]

শীত > শিতা' (شِتَاء) শীতল, ঠাণ্ডা, হিমেল ইত্যাদি।

শব্দটি পনেরটি কবিতায় বিশবার[২৭৫] 'ঠাণ্ডা' অর্থে এসেছে–

শীতের দিনে নেইকো কাপড়, প্রায় উলঙ্গ রয়।
দেখ মা! আমার এদের কথা ভাবলে দুঃখ হয়।[২৭৬]

---

২৭৩. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ২৩৯-৪০

২৭৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৫২

২৭৫. সুর্য সারথী (২বার):তুলির লিখন, অকারণ,দার্জিলিঙের চিঠি:কুহু ও কেকা, খুকীর বালিশ:মণি-মঞ্জুষা, তাতারাশির গান:সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, একটি মুষিকের প্রতি (২বার), দেবদারু ও বনলতা, বনচ্ছায়া (৪বার), পরিবর্তন, প্রোষিত ভর্তৃকা, রাখাল ও রাজকন্যা, ফাসী উদ্ভট, চরম-শাস্তি, লামার গান, অনুতপ্ত:তীর্থ সলিল

২৭৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'খুকির বালিশ', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

স

সওয়াল > সুওয়া'ল (سوال) প্রশ্ন, আবেদন, শিক্ষা-বৃত্তি, প্রার্থনা, জেরা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'প্রশ্ন' অর্থে এসেছে–

সওয়াল-জবাবে নাকাল করিয়া
শেষে দিলি পিটটান![২৭৭]

সরাব > শরাব > শারাব্ (شراب) মদ্য, সুরা, শরবৎ, সিরাপ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সুরা' বা 'মদ্য' অর্থে এসেছে–

সরাবখানাই হল মশগুল
সরাবের ফেনা গায়ে মাখি'![২৭৮]

সাকিন > সাকিন্ (ساکن) শান্ত, নীরব ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'শান্ত' অর্থে এসেছে–

দ্যাখ তাসের মতন মোরা চারি জাতি,
আমরা সবাই জ্যান্ত তাস,
তাসের কেল্লা সাকিন রয়েছি
ভয়ে ভয়ে পাছে লাগে বাতাস![২৭৯]

সাকী > সাকী (ساقی) সুরা পরিবেশনকারী, প্রেমিকা ইত্যাদি।

শব্দটি তেরটি কবিতায় সতরবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'সুরা পরিবেশনকারী' অর্থে আটটি কবিতায়[২৮০] নয়বার–

সতত সদয় সাকী আমাদের
জোর-জবরিতে নাই,
সঙের মাঝে চক্র করেছে,
তবু সবে পায় ঠাঁই।[২৮১]

---

২৭৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভোজ ও পুত্তলিকা', "কুহু ও কেকা", পৃ. ২৪১

২৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পেয়ালার প্রেম', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ৭৮

২৭৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পাতিল প্রমাদ', "বিদায় আরতি",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৬০

২৮০. সাকির প্রতি,আপান গীতি:তীর্থরেণু, গোলাপের দিনে, লজ্যত-ই-জান: মণি-মঞ্জুষা, সাকির প্রতি, সাকির প্রতি,রুবাইয়াৎ (২বার), সাকির প্রতি:তীর্থ সলিল

২৮১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'লজ্যত-ই-জান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

'প্রেমিকা' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[২৮২] আটবার এসেছে–

উটের সহিস সাড়া দিয়ে গেল
পড়ে গেল হাঁকাহাঁকি
এমন সময় দেখিনু অদূরে
দাঁড়ায়ে আমার সাকী[২৮৩]

সাফ > স.াফ্ (صاف) পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, নির্মল, স্বচ্ছ, খাঁটি, অকৃত্রিম ইত্যাদি ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২৮৪] পাঁচবার 'পরিস্কার' অর্থে এসেছে–

লটপটিয়ে সেথায় বাঘা পড়ল নিয়ে মাটি;
জিব দিয়ে সাফ্ করলে বারেক সামনেরি থাবাটি;[২৮৫]

সাবেক > সাবিক. (سابق) পূর্ববর্তী, আগেরকার, পূর্বতন, প্রাচীন ইত্যাদি ।
শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'পূর্ববর্তী' অর্থে এসেছে–

'যাচ্ছে সময়!' যাচ্ছে ?–বটে!– আমরা কি জানি?
সাবেক চালে চলছি মোরা সাবেক বিধানী![২৮৬]

সামিল > শামিল্ (شامل) অন্তর্গত, অন্তর্ভূক্ত, পরিব্যাপ্ত, ব্যাপক, সমান, তুল্য, ন্যায়, সদৃশ ইত্যাদি ।
শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'তুল্য' অর্থে এসেছে–

হাওয়া যেথা মেওয়ার সামিল, মেওয়া সে অফুরন্ত,
এক্লা ঝিলম্ একশো যেথা, শান্ত এবং দুরন্ত![২৮৭]

সাহেব > স.াহি.ব (صاحب) সঙ্গী, সাথী, সহচর, বন্ধু, মালিক, কর্তা, ওয়ালা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ইংরেজ ইত্যাদি ।
শব্দটি তিনটি কবিতায় ছয়বার বিভিন্ন অর্থে এসেছে –
'ইউরোপীয় ইংরেজ' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

হাঁ সাহেব! বলি তোমাদের দেশে
হলুদের চাষ আছে ?
আছে?.......থাক! তবু দাড়াঁতে পারে না
খোঁদ হলুদের কাছে ।[২৮৮]

---

১৮২. নিরব প্রেম,বিদায় ক্ষণে:তীর্থরেণু,চাঁদনী রাতের চাষ, প্রেয়ালার প্রেম (৩বার):মণি-মঞ্জুষা,মুমূর্ষ তাতার সিপাহী গান (২বার):তীর্থসলিল
২৮৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিদায় ক্ষণে',"তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১,পৃ. ৩৯৯
২৮৪. আখেরী:বেলাশেষের গান, বাঘের স্বপন,তাজের প্রথম প্রশস্তি,ঢালাই কলের গান:মণি-মঞ্জুষা, নেই ঘরের ঘুম পাড়ানী: সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশু কবিতা
২৮৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঘের স্বপন', "মণি-মঞ্জুষা",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩৪
২৮৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গরুর গাড়ীর গান', "মণি-মঞ্জুষা",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৩
২৮৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জাফরানিস্থান', " বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১৭০
২৮৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মরিয়া', "তুলির লিখন", পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

'কর্তা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

সাহেব ব'লেই করব সেলাম ? মন্দ ভালো বাছ্‌ব নাকো?
অন্যায় যে করবে কায়েম বলব তারে সুখে থাক ?[২৮৯]

'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি' অর্থে একটি কবিতায় তিনবার–

আগা সাহেব! মীর্জা সাহেব! তোমরা বড়লোক,
আমরা গোলাম করছি সেলাম, বাড়বাড়ন্ত হোক;[২৯০]

সুন্নি > সুন্নী (سنّی) মুসলমানদের ধর্মীয় সম্প্রদায়। বিশেষ করে যারা চার খলীফাঃ হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উছমান (রা.) ও হযরত 'আলী (রা.)কে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.)-এর বৈধ উত্তরাধিকার মনে করে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্তের বৈধতা, ইজমা ও কেয়াসের নীতিসমূহকে কোরআন ও হাদিসের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করে ও প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর সকল নির্দেশ ও কর্মপদ্ধতি সর্বান্তকরণে অনুসরণ ও অনুকরণ করে, তারাই ইতিহাসে সুন্নী সম্প্রদায় হিসেবে খ্যাত।[২৯১]

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

বাহাদুর শাহ হইল সে শিয়া
মোল্লা রাখিল মনের মত,
সুন্নি শাজাদা দিনে দুপহরে
মসজিদে তারে করিল হত।[২৯২]

সুফি > সু.ফী (صوفی) সুফীবাদী ধার্মিক, মুসলিম মরমী সাধক ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'মুসলিম মরমী সাধক' অর্থে এসেছে–

সুফি বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি
আমাদের এই দেশে!
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে
বাউলে ও দরবেশে![২৯৩]

---

২৮৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৩
২৯০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নওরোজের গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৪
২৯১. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ২৩৮-৩৯
২৯২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৫২
২৯৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ফুল-শির্ণি', "কুহু ও কেকা",পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সুরু > শূরু' (شروع) আরম্ভ, সূচনা ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[২৯৪] তিনবার 'আরম্ভ' অর্থে এসেছে–

তার পর সুরু হ'য়ে গেল এই খেলা,
সজীব অস্ত্র হলাম চাণক্যের;
মানব-জীবন লয়ে শুধু হেলাফেলা,
অন্ত আমার নাই নাই পাতকের ।[২৯৫]

সুলতান > সুলত.ান (سلطان) সম্রাট, রাজা ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[২৯৬] ছয়বার 'সম্রাট' অর্থে এসেছে–

বদাউন-বনে সেবারের মতো
শীকার করিয়া সারা
দঙ্গল ফিরে সুল্‌তান্‌ সহ
উল্লাসে মাতোয়ারা ।[২৯৭]

সেলাম > সালাম (سلام) শান্তি, অভিবাদন, আশির্বাদ ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'অভিবাদন' অর্থে দু'টি কবিতায়[২৯৮] চারবার–

সাহেব ব'লেই-কর্‌ব সেলাম ? মন্দ ভালো বাছব নাকো ?
অন্যায়ে যে করবে কায়েম বল্‌ব তারে সুখে থাকো ?[২৯৯]

'আশির্বাদ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

তাই বলি ভাই আবার আমি মনের মতন হ'ব, ওরে!
চলে যা'ব জন্মের মত সেলাম ক'রে আড়ম্বরে;[৩০০]

---

২৯৪. বিষ কন্যা:তুলির লিখন, দুরের পাল্লা:সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, গান্ধিজী:কাব্য সঞ্চয়ন
২৯৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিষ-কন্যা', "তুলির লিখন", পৃ. ১৩২
২৯৬. ইনসাফ (২বার):বিদায় আরতি, প্রিয়া যবে পাশে, সাকীর প্রতি:তীর্থ সলিল,দিল্লীনামা (২বার): বেলাশেষের গান
২৯৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৫৫
২৯৮. আখেরী:বেলাশেষের গান, নওরোজের গান (৩বার):মণি-মঞ্জুষা
২৯৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৩
৩০০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পদস্থ ক্ষন্ধুর প্রতি', "তীর্থ সলিল",পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

হ

হক > হ.াক (حق) সত্য, ন্যায়, সঠিক, প্রকৃত, যথার্থ, অধিকার ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'সত্য' অর্থে এসেছে–

বিশ্ববিধান বিধির বিধান, ন্যায়ের নিধান নিত্যকালে–
হক দাবী যার বুক তাজা তার 'হার' লেখে না তার কপালে ।[৩০১]

হজম > হায্‌ম্ (هزم) পরিপাক, আত্মসাৎ, পরাজিত, পরাস্ত ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'পরিপাক' ও 'আত্মসাৎ' অর্থে এসেছে–
'পরিপাক' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

যাবে যে হজম হ'য়ে নিগমের আগেতেই!
হুঁস্ নাই! হাঁশফাঁশ্ ! ওঠে কি সে পড়ে কি![৩০২]

'আত্মসাৎ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

হেম–সুমেরুর হৃত সোনা দেবো নাকো হজম হ'তে,
পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই কর্‌ব লড়াই বিধিমতে ।[৩০৩]

হরফ > হ.ারফ্ (حرف) বর্ণ, অক্ষর, অব্যয়, লিপি ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৩০৪] পাঁচবার 'অক্ষর' অর্থে এসেছে–

করিলাম স্থির খুঁজিয়া এখনি
রামায়ন পুঁথিখানা
চেষ্টা করিয়া পড়িব, নাগরী
হরফ তো আছে জানা ।[৩০৫]

হাওদা > হাওদাজ্ (هودج) হাতি বা উটের পিঠে বসার আসন বিশেষ ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৩০৬] অন্তত পাঁচবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

হাওদা হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে থামালে হাতী
মেহেরবাণী বহুত তোমার মোগলের নাতি ।[৩০৭]

---

৩০১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দাবীর চিঠি', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২০৭
৩০২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'চরকার আরতি', " বেলাশেষের গান", পৃ. ৬৫
৩০৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গিরিবাণী', "বিদায় আরতি",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৫১
৩০৪. বিদ্যার্থী (২বার):তুলির লিখন, নাপ্পি পিরিতি কথা, কবি জুবিলি:বেলাশেষের গান,তাজ:কাব্য সঞ্চয়ন
৩০৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিদ্যার্থী', "তুলির লিখন",পৃ. ৯৭
৩০৬. ইনসাফ (২বার):বিদায় আরতি, কবর-ই-নুর জাহান:কাব্য সঞ্চয়ন, দিল্লীনামা:বেলাশেষের গান, যশমন্ত:তুলির লিখন
৩০৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যশমন্ত ', "তুলির লিখন", পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

হাওয়া > হাওয়া' (هواء) বাতাস, বায়ু, বায়ুমণ্ডল, শূন্য ইত্যাদি ।

শব্দটি তিরান্নব্বইটি কবিতায়[৩০৮] একশত তেইশবার 'বাতাস' অর্থে এসেছে-

জানালা খুলে বাদলা হাওয়া নিই গো মাথা পেতে,
কালো চুলের লহর দোলে জ্যোৎস্না তরঙ্গেতে ![৩০৯]

হাকিম > হ.াকিম্ (حاكم) শাসনকর্তা, শাসক, প্রশাসক, বিচারক, গভর্ণর, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, চিকিৎসক ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৩১০] চারবার 'বিচারক' অর্থে এসেছে-

কোন হাকিমে মনের পরে করতে পারে জোর
খোর-পোষের এ নয় গো দাবী স্নেহের ক্ষুধা মোর ।[৩১১]

হাজির > হ.াদি.র (حاضر) উপস্থিত, হাজির, বর্তমান, প্রস্তুত, শহরবাসী, স্থায়ী বাসিন্দা ইত্যাদি ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[৩১২] পাঁচবার 'উপস্থিত' অর্থে এসেছে-

হাজির হ'ল নূতন বছর ক্ষেত্রে খামারে,
ঘোড়া কোথায় বাঁধব এখন বল্ তা আমারে ।[৩১৩]

হাঁজী > হ.াজ্জ > হ.াজী (حاجى) যিনি হজ করেছেন ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

হাজীর মেয়ে আজকে সাঁঝে প্রাচীন কাঁথা জড়িয়েছে,
শীতের বাতাশ প্রাচীন গাথা পাণ্ডু পাতা ছড়িয়েছে,[৩১৪]

---

৩০৮. শোভিকা,যশমন্ত,সতী:তুলির লিখন,আকুল আহ্বান,মূল ও কূল, বাতাসী মার দেশ (৩বার):বেণু ও বীণা, শিশির যাপন,বাসন্তী বর্ষা, বুতার্কিক ও কাঠঠোকরা,নব্য অলংকার,স্বর্ণ মৃগ, মেলার যাত্রী,লুব্দা,আত্মঘাতিনী, মনিহার,তানকা,বীরের ধর্ম, রণমৃতু:তীর্থ রেণু, দুই সুর কে ?,মদন মহোৎসব,মধুমাসে, গান (২বার),সহযিয়া,মূর্চ্ছা (২বার), সাড়ে-চুয়াত্তর (২বার), গ্রীষ্মের সুর, যোরো হাওয়ায় (৩বার), অভয়,বর্ষা (২বার), ছায়াচ্ছন্ন (২বার), ছিন্নমুকুল, ভুঁই চাপা (২বার), বারানসী, দার্জিলিঙের চিঠি (৩বার), পাগলা ঝোরা, আমর া, শীতভে, আবার:কুহু ও কেকা, প্রণাম, ডোরাই (২বার),ময়ূর মাতম, সাঝাই, সাল-পহেলী, ভীমজননী, কবির ভিরোধান (২বার), শিরাজ-ই-হিন্দ, কয়েকটি গান (২ক্ষার), দিল্লীনামা, খাচার পাখি: বেলাশেষের গান, আকাশের খোকা-খুকী (২বার), বালকের নমস্কার, নওরোজের গান, নব-বর্ষে, চায়ের পেয়ালা (২বার), তারেই, সূর্যের মৃত্যু, সরল গাছ ও বিদ্যুত, বাঘের স্বপন (২বার), পরীর মায়া, ক্ষণিকের গান, বৈরাগ্য, খেয়ালীর গান, বিশ্ব কর্মের বিজয় যাত্রা (৫বার), দেশের মায়া, যুদ্ধের স্মৃতি:মণি-মঞ্জুষা, ঘুমতি নদী, জাফরানিস্থান, আলোর পাথার, ভোমরার গান, তিলক, বজ্রবোধন, কোন ধর্মধ্বজের প্রতি, দুরের পাল্লা (৩বার), গিরিবাণী (৩বার), ইনসাফ,মধুমাধবী, কে ? কন্যাদায়:বিদায় আরতি, মৌচাক,তাতারসির গান, রেলগাড়ীর গান, পলাশফুল, ধানের মঞ্জুরী:সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, অবিচার, দিবাস্বপ্ন:তীর্থ সলিল, আমন্ত্রণে, পারিজাত, সমুজ পরি, গঙ্গাহৃদীবঙ্গভুমি, বর্ষা নিমন্ত্রণ, জৌষ্ঠিমধু, গান্ধিজী:কাব্য সঞ্চয়ন

৩০৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মনিহার', "তীর্থরেণু",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১,পৃ. ৪১৩

৩১০. ইনসাফ:বিদায় আরতি, ক্ষণিকের গান:মণি-মঞ্জুষা, দুর্ভাগা:তুলির লিখন,কবি জুবিলি:বেলাশেষের গান

৩১১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুর্ভাগা', "তুলির লিখন", পৃ. ৮৯

৩১২. মরিয়া:তুলির লিখন, উড়োপাখি:তীর্থরেণু,কাঠগড়া: বেলাশেষের গান, নওরোজের গান:মণি-মঞ্জুষা, রাজবন্দিনী: তুলির লিখন

৩১৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নওরোজের গান', "মণি-মঞ্জুষা",সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৫

৩১৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জাফরানিস্থান', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ > হ.াফিজ. (حافظ) যিনি পবিত্র কোরআন শরীফ মুখস্ত করেন তাঁকে হাফেজ বলা হয়, তবে এখানে হাফেজ শব্দ দ্বারা পারস্য কবি হাফিজকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম শামসুদ্দীন মোহাম্মদ। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে পারস্যের মিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনার সাথে বৈষ্ণব কবিদের রচনার ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩১৫] দু'বার এসেছে এবং পারস্য কবি হাফিজকে বুঝানো হয়েছে–

আর কতদিন বিরহ-বেদনা **হাফেজ** সহিবে, হায়,
বুক-ফাটা দুখ কবে হ'বে শেষ? সে কথা সুধা'ব কা'য় ?[৩১৬]

হারাম > হ.ারাম্ (حرام) নিষিদ্ধ, অপবিত্র, অবৈধ, ইসলাম ধর্মের বিধানে নিষিদ্ধ বা অবৈধ কাজ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অবৈধ' অর্থে এসেছে–

ধৃষ্ট জনের মেহেরবাণী **হারাম** ব'লে জানে মুসলমানে,
হিন্দু-শিখের গোরক্ত সে, কে ছোঁবে তায়, নেবে সে কোন প্রাণে ?[৩১৭]

হালুয়া > হ.াল্ওয়া (حلوى) মিষ্টান্ন, মিঠাই ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'মিষ্টান্ন' অর্থে এসেছে–

হালুয়া না হয় নাই হ'ল, দাও সুজির পালোই দাও,
খুশী হ'য়ে যা দেবে সেই বাদশাহী পোলাও।[৩১৮]

হিম্মৎ > হিম্মাহ্ (همة) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আকাংখা, আগ্রহ, সংকল্প, উচ্চাভিলাষ ইত্যাদি। প্রচলিত অর্থে সৎ সাহস।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সৎ সাহস' অর্থে এসেছে–

ঘর ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর ঘর !
ঘর ঘর **হিম্মৎ**। আপনায় নির্ভর![৩১৯]

হিসাব > হি.সাব্ (حساب) গণনা, পরিমাপ, চালান, বিল, অংক, বিচার, বিবেচনা, জমা-খরচ নির্ণয়, কৈফিয়ত, জবাবদিহিতা, দেনা-পাওনা নির্ণয় ইত্যাদি।

শব্দটি দশটি কবিতায় পনেরবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

---

৩১৫. প্রিয়া যবে পাশে,সাকির প্রতি:তীর্থ সলিল
৩১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাকির প্রতি', "তীর্থ সলিল",পৃ. ১৬৬
৩১৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ফরিয়াদ', "বেলাশেষের গান",পৃ৮৯
৩১৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নওরোজের গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৪
৩১৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'চরকার গান', "কাব্য সঞ্চয়ন",পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

'গণনা' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[৩২০] পাঁচবার–

হিসাব তাহার নাইক' কোথাও; শিল্পী শুধু কল্পনাতে
আভাষখানি রেখে গেছে কঙ্কালের ওই অংকপাতে;[৩২১]

'অংক' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

দু'টো হিসাব ভজ্‌লে তবে মিল্‌বে সালতামামী;
আমি যে সেই আমিই ।[৩২২]

'জমা-খরচ নির্ণয়' অর্থে দু'টি কবিতায়[৩২৩] ছয়বার–

ডিমের হিসাব রাখ্‌ছে, দেখ, মীর মালিকের মেয়ে,
একটি ডিমের নেইকো হিসাব কেউ ফেলেছে খেয়ে!
নুতন করে হিসাব কর আমাদের মুখ চেয়ে ।[৩২৪]

'কৈফিয়ত' বা 'জবাবদিহিতা' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

শ্রদ্ধা-ভাজন সত্যি যেজন তারেই মানুষ শ্রদ্ধা দেবে,
রাহাজানি করলে ভক্তি বিশ্বমানব হিসাব নেবে ।[৩২৫]

'দেনা-পাওনা নির্ণয়' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

জীবন খাতায় তোমার আমার হিসাব নিকাশ হ'লে,
ভেবনা কখনো এমনটি আর হ'বেনা ভূমণ্ডলে;[৩২৬]

হুকুম > হু.ক্‌ম (حكم) শাসন, কর্তৃত্ব, বিচার, রায়, আদেশ, নির্দেশ, আজ্ঞা, অনুমতি ইত্যাদি । শব্দটি ঊনিশটি কবিতায় তেত্রিশবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'আদেশ' অর্থে দশটি কবিতায়[৩২৭] উনিশবার–

কাঠগড়াতো অশুচি নয়, অশুচি ও নয়কো কোন-মতে,
ওখানে তো জজ বসে না,– ফাঁসীর হুকুম হয় না ওখান হ'তে ।[৩২৮]

---

৩২০. সিদ্ধিদাতা:কুহু ও কেকা, সালতামামী: বেলাশেষের গান,গরুর গাড়ীর গান:মণি-মঞ্জুষা, দূরের পাল্লা:সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, বণ্যাদায়: বিদায় আরতি

৩২১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সিদ্ধিদাতা', "কুহু ও কেকা", পৃ. ৯৮

৩২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আমি', "কুহু ও কেকা", পৃ. ১৩৮

৩২৩. আখেরী (৩বার): বেলাশেষের গান, নওরোজের গান (৩বার):মণি-মঞ্জুষা

৩২৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নওরোজের গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৫

৩২৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩২

৩২৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,'রুবাইয়াৎ', "তীর্থ সলিল",পৃ. ১০৯

৩২৭. রাজবন্দিনি:তুলির লিখন, চাদের লোভ, উড়োপাখি: তীর্থরেণু, রাজাকারিগর (৫বার), বেতালের প্রশ্ন, গান্ধিজী (৩বার), দিল্লীনামা: বেলাশেষের গান, নওরোজের গান:মণি-মঞ্জুষা, মহানামন (৩বার),ইনসাফ (২বার): বিদায় আরতি

৩২৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বেতালের প্রশ্ন', "বেলাশেষের গান",পৃ. ৭৫

'নির্দেশ' অর্থে সাতটি কবিতায়[৩২৯] বারবার–

> পূর্ণিমা রাতি! পূর্ণ করিয়া
> দাও গো হৃদয় প্রান;
> সত্য পীরের **হুকুমে** মিলেছে
> হিন্দু-মুসলমান![৩৩০]

'বিচার' অর্থে দু'টি কবিতায়[৩৩১] দু'বার–

> তোমার পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ন ক'রে মনুষ্যত্বধারা
> রোমের **হুকুম**-মহকুমা গুড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা ।[৩৩২]

হুজুর > হু.দু.র (حضور) উপস্থিতি, আগমন, যোগদান, অংশগ্রহণ ইত্যাদি । এখানে সম্মান সূচক সম্বোধন 'মহাশয়' অর্থে বুঝানো হয়েছে ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

> **হুজুর** বলেন "বাদশাজাদী থাক্‌বে ঝরোখায়,
> নীল যমুনায় পড়বে ছায়া, – দেখ্‌বে শুধু তায় ।[৩৩৩]

হুরী > হুর > হু.র (حور) বেহেশতের হুর, অপ্সরী, পরী ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বেহেশতের হুর' অর্থে এসেছে–

> নওরোজে নয় **হুরী**
> গাঁয়ে গোলাপ-কুড়ি,
> পেগম্বরের দোহাই দিয়ে
> নওরোজে গান জুড়ি ।[৩৩৪]

---

৩২৯. রাজ বন্দিনী:তুলির লিখন, আমরা, ফুল শির্ণি: কুহু ও কেকা, রাজাকারিগর, বাঙ্গালী পল্টনের গান: বেলাশেষের গান, ক্ষণিকের গান: মণি-মঞ্জুষা, পদস্থ বন্ধুর প্রতি (৬বার):তীর্থ সলিল

৩৩০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,ফুল শির্ণি', "কুহু ও কেকা",পৃ. ১৩৪

৩৩১. ইচ্ছা মূর্তি: বেলাশেষের গান, বড় দিনে:বিদায় আরতি

৩৩২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বড়দিনে', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২১৯

৩৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'যশমস্ত ', "তুলির লিখন", পৃ. ৮২

৩৩৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'নওরোজের গান', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

আ

আকবর[১] তিনটি কবিতায়[২] তিনবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে।

'সম্রাট আকবর' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

সেই দারা চায় তখত- তাউস্! ইসলামে করি নাশ
আকবর- শাহা চেয়েছিল যাহা– পুরাইতে সেই আশ।[৩]

'সুমহান' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

–এত কুদরৎ তার!
আল্লা তা'লা – **আকবর**! এযে মতলব বোঝা ভার![৪]

আখেরে /আখের[৫] শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার বিভিন্ন অর্থেএসেছে।

'শেষ' অর্থে দু'টি কবিতায়[৬] দু'বার–

সুরু হতে সেই **আখের** অবধি হেথায় কেবলি–
অবাক চমৎকার![৭]

'পরকাল' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বাদ্‌শার্ ছেলে বিকাইয়া গেনু এক বস্রাই গুলে!
খোদার বান্দা বুত্‌-পরস্ত্‌– **আখেরের** ভয় ভুলে।[৮]

আজান > আয.ান্ (أذان) নামাজের জন্য আহ্বান।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার উপরোক্ত অর্থেএসেছে–

মুয়াজ্জেন ওই মস্‌জিদে ধরে সন্ধ্যা- **আজান্** মগ্‌রবের,
পিলু- বারোয়াঁয় বাঁশিটি ফোঁপায়–কোথায় বিদায়-উৎসবের![৯]

---

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় **'আকবর'** শব্দ দ্রষ্টব্য
২. নাদির শাহের শেষ: স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর: বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা
৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীর', "অগ্রন্থিত কবিতা", ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ (কলকাতা: ভাবরী, ১৯৯৭), পৃ. ৬১৫
৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদির শাহের শেষ', "স্বপ্ন পসারী', মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৪
৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার **'আখেরী'** শব্দ দ্রষ্টব্য
৬. হাফিজের অনুসরণে:স্বপন পসারী, শরাব খানা :হেমন্ত গোধূলী
৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শরাব খানা', "হেমন্ত -গোধূলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ,প. ৪৬৭
৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্বরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০৩
৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহান', "স্বপন পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

আতর[১০] শব্দটি দু'টি কবিতায়[১১] দু'বার 'সুগন্ধি' অর্থে এসেছে-

অশ্রু- শিশিরে আতরের বাস, ঝরা পাপড়িও কেমন চায়!–

ফুলের মতন হওয়া কি বারণ ?- রূপ র'বে বিনা দুখের দায়![১২]

আদব > আদাব (ادب) সাহিত্য, ভদ্রতা, সভ্যতা, শিক্ষা, শিষ্ঠাচার, ব্যবহার, চাল-চলন ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই শিষ্ঠাচার অর্থে এসেছে–

মেহেরুন্নিসা! এ বেশে এমন অসময়ে আগমন ?

হুকুম ছিল না – আদব ভুলেছ ? ভালো নাই মোর মন ।[১৩]

আদম > আদাম (آدم) ইসলাম ধর্মানুসারে মানব জাতির আদি পিতা ও আল্লাহর প্রেরিত প্রথম নবী ।

কোরআনের ভাষ্য আনুযায়ী তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে -

ইহলোকে কিবা পরলোকে ঠাঁই –

স্বর্গ-নরক মোর তরে নাই,

নই সন্তান আদমের – তাই

স্বর্গ হইতে করে নাই দূর, করেনি আমারে সে অপমান ।[১৪]

আবীর[১৫] শব্দটি ছ'টি কবিতায়[১৬] ছ'বারই 'সুগন্ধি' অর্থে এসেছে–

দুই গন্ডে ফুটে উঠে আবীর কুম্‌কুম

অলস নয়নতারা যেন ঘুমঘুম! –[১৭]

আরজ/আরজি > আরদ.(عرضی) নিবেদন. উপস্থাপন, প্রস্তাব ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৮] দু'বার 'নিবেদন' অর্থে এসেছে –

তবে কেন মোর চোখের জলের

জবাব মেলেনা কেনো দিনই

---

১০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আতর' শব্দ দ্রষ্টব্য

১১. শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপন-পসারী, প্রেম ও ফুল:স্মরগরল

১২. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩১

১৩. মোহিতলাল মজুমদার,' নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০০

১৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল', "হেমন্ত-গোধূলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৮

১৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আবীর' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৬. শ্রী পঞ্চমী:হেমন্ত-গোধূলী,রোগ শয্যার চিঠি,তীর্থ-পথিক,সরস-পতি,অর্পণ,বসন্ত উৎসবে বাসন্তিকা:অগ্রন্থিত কবিতা

১৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'তীথ-পথিক', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৯৪

১৮. শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপ্ন পসারী,ফারসী ফরাস:অগ্রন্থিত কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

মিছে কেঁদে মরি – আরজি আমার

জানি গো সেথায় পৌঁছে নি![১৯]

আল্ বুরূজ[২০] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সুউচ্চ প্রাসাদ' অর্থে এসেছে –

জমিন ফাটিয়া নীলশিখা কই? প্রলয়ের বারিধারা?,

অতলের তলে এখনো নামেনি আল-বুরূজের চুড়া,[২১]

আল্লা > আল্লাহ্ (الله) আল্লাহ, শব্দটি ছ'টি কবিতায়[২২] বিশবার আল্লাহ্ অর্থে এসেছে –

কোটী শবদেহে দেয়াল তুলিয়া আল্লার আশ্‌মান

আঁধারিয়া, তুমি দিনের জলুস্ করিয়া দিয়াছ ম্লান! [২৩]

আলী > 'আলী (علی) উচ্চ, মর্যাদাবান, হযরত আলী (রা) ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জামাতা ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)কে বুঝানো হয়েছে।

আলির বংশধর!

মনে থাকে যেন ইমাম হোসেন, কারবালা-প্রান্তর![২৪]

আশেক > আশিক >'আশিক্. (عاشق) প্রেমিক, প্রণয়ী, অনুরাগী ইত্যাদি।

কবি এখানে 'আশেক' শব্দ দ্বারা পারস্য সম্রাট নাদিরশাহকে বুঝিয়েছেন। শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে–

আজ নও রোজ-রাতে

আশেক এসেছে, যৌতুক দিতে দিল্ তার ওই হাতে![২৫]

আহদ > 'আহাদ (احد) এক, একত্ববাদ, একটি, জনৈক, কেহ, অন্যতম ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'একত্ববাদ' অর্থে এসেছে –

তবে সেই 'এক' – সেই আহদের খেলাফ হবে যে তায়,–

নিস্ফল হবে মক্কা হতে ফিরে আসা মদিনায়![২৬]

---

১৯. মোহিতলাল মজুমদার,ফারসী ফরাস:অগ্রন্থিত কবিতা, মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-৫৬৬
২০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বুরুজ' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদির শাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২
২২. নাদিরশাহের জাগরণ (দু'বার),নাদির শাহের শেষ (চার বার),শেষ শয্যায় নুরজহান (দু'বার):স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর (তিন বার): বিস্মরণী, রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম (দু'বার), দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (সাত বার): অগ্রন্থিত কবিতা।
২৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৩
২৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ,পৃ. ৬১৫

Dhaka University Institutional Repository

আহাম্মক > আহমাক. (احمق) বোকা, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানশুন্য,স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'নির্বোধ' অর্থে এসেছে –

খুরম আজিও বিদ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক,
তারি ফন্দিতে তুমি ও নারাজ,– আমি কি আহাম্মক![২৭]

ই

ইজ্জত[২৮] শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৯] চারবার 'মান-সম্মান' অর্থে এসেছে–

শাহ-বেগমের ইজ্জত কোথা? ওড়নাও গেছে ঘুচে'!
খালি পায়ে নেই জুতাটুকু! বুঝি শরম ফেলেছে মুছে'?[৩০]

ইদ[৩১] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'ঈদুল ফিতর' অর্থে এসেছে –

'রোজ'ার উপোস ভেঙ্গে দিল যেন
'ঈদ্'-রাতে![৩২]

ইনাম > ইন্'আম্ (انعام) উপহার, দান, পুরস্কার, অনুগ্রহ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বারই 'পুরস্কার' অর্থে এসেছে –

চাইনা ইনাম, তোমাকেই দিনু দিল্লীর ঐ তখ্ত –[৩৩]

ইবরাহিম > ইবরাহীম (ابراهيم) ইনি বনু ইসরাঈল ও বনু ইসমাঈলের পূর্বপুরুষ । কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ইনি মুসলমানদের জাতির পিতা এবং সম্মানিত নবী (সা) । আল্লাহর অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীন হয়ে 'খালীলুল্লাহ' অভিধায় অভিষিক্ত হন । তিনি পবিত্র ক্বাবা গৃহের অন্নতম নির্মাতা । তাঁর সময় কাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ১৮৫০–১৮০০ অব্দের মধ্যে । তিনি জালিম রাজা নমরুদের বিরুদ্দে জিহাদ করে জয়ী হন । তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ) ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) অন্নতম ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে ।

দাও বলে দাও! যে বলে একদা ইবব্রাহীমের বুক
নিজ সন্তান জবে' করিবারে কাঁপে নাই এতটুক![৩৪]

---

২৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৯৯
২৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ইজ্জত' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৯. হাফিজের অনুসরণে:স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর: (৩বার) বিস্মরণী
৩০. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০০
৩১. সত্যেন্দ্রথাথ দত্তের কবিতায় 'ইদ' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩২. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল গান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২০
৩৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৬
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইমান > ঈমান্ (ایمان) ঈমানের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর 'আজমত ও অহদানিয়্যাতকে অন্তরে বিশ্বাস, মুখে প্রকাশ ও কার্যে প্রতিফলন ঘটানোকে ঈমান বলে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী- আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ, আসমানী কিতাবসমুহ, নবী-রাসুলগণ, শেষ বিচারের দিন, তকদীরের ভাল-মন্দ ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান-এসবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে।

শব্দটি দুটি কবিতায়[৩৫] দু'বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

জল্লাদ আমি নহি যে শুধুই,আমার ও ইমান আছে।

হালাল হারাম দুই যদি এক হইত আমার কাছে,-[৩৬]

ইরাক >'ইরাক (عراق) ইরাক, এটি পারস্যোপসাগরীয় একটি আরব রাষ্ট্র। এর পূর্বনাম মেসোপটেমিয়া বা নাহরাওয়ান। দেশটি সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে ২০০৩ খৃ. ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের আওতাভূক্ত না হলেও আমেরিকা ও বৃটেনের অনুগত শাসক দ্বারা পরিচালিত। এখানে অসংখ্য নবী (আঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কবর রয়েছে।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

জন্ম আমার নয় কোনখানে-

রুম, মহাচীন, কিবা শকসানে,

ইরাকে সে নয়, নয় খোরাসানে,[৩৭]

ইলাহী > ই'লাহী (الهی) আমার প্রভু, আমার আল্লাহ, শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

এইখানে তুমি বসিবে, গায়িব গজল ইলাহী-তোমারী গান,

আজ নওরাতি-জালাবে না বাতি? সাজাবেনা তাঁর গোলাব দান?[৩৮]

ইসারা / ইশারা[৩৯] শব্দটি তিনটি কবিতায়[৪০] তিনবার 'ইঙ্গিত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

সেই যেন হোথা উকি দিয়ে চায়,

যেন মৃদু-মৃদু হাসে ইসারায়।[৪১]

---

৩৫. নুরজহান ও জহাঙ্গীর:স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব:অগ্রন্থিত কবিতা
৩৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব', " অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১১
৩৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল', "হেমন্ত গোধূলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৭
৩৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নূরজহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
৩৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ইশারা' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪০. মৃত্যু, নাদিরশাহের শেষ: স্বপন-পসারী, রূপকথা:বিস্মরণী
৪১. মোহিতলাল মজুমদার, 'রূপকথা', "হেমন্ত-গোধূলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম[৪২] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ইসলাম ধর্ম' অর্থে এসেছে–

সেই দারা চায় তখ্ত–তাউস! ইসলামে করি নাশ
আকবর–শাহা চেয়েছিল যাহা–পুরাইতে সেই আশ ।[৪৩]

এ

এনসান্ > ইনসান্ (إنسان) মানুষ, মানবজাতি ইত্যাদি ।

শব্দটি দুটি কবিতায়[৪৪] দু'বারই 'মানুষ' অর্থে এসেছে–

খোদার বান্দা এনসান্ সেই, নাই তার নিস্তার–
চিবাইয়া খাবে আপন কলিজা! যদি সে ফেরেস্তার[৪৫]

এশা–'ইশা' (عشاء) সন্ধ্যা, সন্ধ্যারাত, এশা (নামাজ) ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার এশার নামাজ অর্থে এসেছে–

এশার ওক্ত-ম্সজিদে ও যে দেয় আজান![৪৬]

ও

ওক্ত/ওক্ত্ >ওয়াক্ত (وقت) সময়, ক্ষণ, কাল, মেয়াদ, মুহূর্ত ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৪৭] পাঁচবার 'সময়' অর্থে এসেছে–

শুভদিনে আজ চোক চাহিলেনা. ওক্ত যে সব বহিয়া যায় ।
আজিকার দিনে খোদার দুয়ারে জানাবে না শেষ–প্রার্থনায়?[৪৮]

ওমরাহ > 'উমারা' (أمراء) আমিরগণ, বাদশাহের অধীন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, অভিজাতবর্গ, ক্ষমতাশালী, রাজন্যবর্গ ইত্যাদি । আমীর শব্দের বহুবচন উমারা' । এখানে ওমরাহ দ্বারা রাজন্যবর্গকে বুঝানো হয়েছে ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

ওমরাহ্দের শ্মশ্রু-বাহারে পাকাও পলিতা-ধুপ!–
ভাঙা– মগজের চর্বি– চেরাগে রোশ্নাই হবে খুব![৪৯]

---

৪২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ইসলাম' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা, মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫
৪৪. নাদিরশাহের জাগরণ:স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব:অগ্রন্থিত কবিতা
৪৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের জাগরণ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০০
৪৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ-শয্যায় নুরজাহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩০
৪৭. নাদিরশাহের শেষ, শেষ শয্যায় নুরজাহান, বেদুঈন,দিলদার:স্বপন-পসারী
৪৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
৪৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২
৫০. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষশয্যায় নুরজাহান', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩২

ক

কওসর > কাওছ.ার (كوثر) অফুরন্ত কল্যাণ, বিশেষদান, বেহেস্তের প্রধান নহরের নাম- যার পানি অফুরন্ত অতি সুস্বাদু ও সুগন্ধময় এবং যা একবার পান করলে কখনো পিপাসাও হয়না ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার বেহেস্তের বিশেষ নহরের প্রতি ইঙ্গিত করে ব্যবহৃত হয়েছে–

কি এনেছ ভরি' স্ফটিক-সুরাহী? – **কওসর** হ'তে আবে-হায়াত?

তুমি আগে পিও, তোমার আননে এখনো ঘোচেনি কালিমাপাত! [৫০]

কদর > ক.াদ্‌র্ (قدر) সম্মান, মূল্য, মর্যাদা, ভাগ্য, নিয়তি, পরিমাণ, পরিমাপ,ক্ষমতা, অদৃষ্ট ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'মূল্য' অর্থে এসেছে–

রূপের **কদর** জানি খুব জানি!– তসবীরে হয় আঁকা,

রূপ সে বিকায় কানা-কড়িতেই, তসবীর লাখ-টাকা![৫১]

কবর[৫২] শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৩] পাঁচবার 'সমাধি' অর্থে এসেছে–

ঘুমাইলে বুঝি? ঘুমাও ঘুমাও! কাজ নাই মিছা জাগিয়া
আর–

ওই যা– হোথায় আলো নিবে গেল! **কবর** আঁধার
শাহ্‌দারার ।[৫৪]

কলম[৫৫] শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'লেখনী' অর্থে এসেছে–

ছোরা নয়–ছুরী, **কলম** কাটিতে দারা রেখেছিল বুঝি,

তাই দিয়ে জোরে গর্দানে টান দিনু শেষে সোজাসুজি ।[৫৬]

কসম > ক.াসাম্‌ (قسم) শপথ, প্রতিজ্ঞা, দিব্যি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'শপথ' অর্থে এসেছে–

সারা দুনিয়ার মালিক, আর সে দীন-দুনিয়ার যিনি –

দুয়েরী **কসম**, করিনি কসুর–দুয়েরেই আমি চিনি ।[৫৭]

---

৫১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', " বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০৫
৫২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কবর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫৩. শেষ-শয্যায় নুরজহান (৪বার):স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর:বিস্মরণী
৫৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ-শয্যায় নুরজহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩২
৫৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কলম' শব্দ দ্রষ্টব্য,
৫৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৪
৫৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–৬১১

Dhaka University Institutional Repository

কসুর[৫৮] শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৯] দু'বারই 'ত্রুটি' অর্থে এসেছে–

সারা দুনিয়ার মালিক, আর সে দীন-দুনিয়ার যিনি –
দুয়েরী কসম, করিনি **কসুর**–দুয়েরেই আমি চিনি ।[৬০]

কাফন > কাফান্ (كفن) মুসলমানদের মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড়, স্ত্রী মৃতদেহের জন্য পাঁচ খন্ড আর পুরুষ মৃতদেহের জন্য তিন খণ্ড ব্যবহৃত হয় ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

এই খানে রাখ্, ঝালর-ঝুলানো রূপার কুর্সি 'পরে;
খুলে দে **কাফন**, কুর্ণিশ কর্ ।–ফের বেয়াদপি করে!....[৬১]

কাফের[৬২] শব্দটি তিনটি কবিতায়[৬৩] আটবার 'আল্লাহতে অবিশ্বাসী' অর্থে এসেছে–

নিজেরে নিজেই জানিনা যখন
জানিব কেমনে কে ভগবান?
নই খৃষ্টান, ইহুদাও নই,
কাফের কিংবা মুসলমান ।[৬৪]

কিয়ামত/কেয়ামত > কি.য়ামাত্ (قيامة) কেয়ামত, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, ধ্বংশ ইসলাম ধর্ম মতে যেদিন হযরত ইসরাফিল (আ.) সিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন, সে দিন কিয়ামত সংগঠিত হবে ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৬৫] দু'বারই 'মহাপ্রলয়ের দিন' বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে–

'রোজ **কেয়ামত**' দেখো দাড়াইয়া জুম্মা-বাড়ীর ছাতে!
–কোনো কথা নয় আর!
যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার![৬৬]

---

৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কসুর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫৯. নুরজহান ও জহাঙ্গীর:বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব:অগ্রন্থিত কবিতা
৬০. মোহিতলাল মজুমদার,'দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১১
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫
৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কাফের' শব্দ দ্রষ্টব্য
৬৩. নাদিরশাহের শেষ:স্বপন-পসারী, শরাবখানা:হেমন্ত-গোধুলী,দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (৬বার):অগ্রন্থিত কবিতা
৬৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শরাবখানা', "হেমন্ত গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৭
৬৫. নাদিরশাহের শেষ:স্বপন-পসারী, কবি বিদ্রোহীর প্রতি:অগ্রন্থিত কবিতা
৬৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২

কিসমৎ > কি.সমাত্ (قسمة) ভাগ, অংশ, ভাগ্য, অদৃষ্ট ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অংশ' অর্থে এসেছে–

তাহার হুকুমে করিতিস বুঝি এমনই বে-ইজ্জৎ?
তোর কাছে তবে রাজমুণ্ডের কিছু নাই **কিসমৎ**?[৬৭]

কুদরৎ > কু.দরাত্ (قدرة) শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা, আল্লাহর কুদরত, মহিমা, বিশেষ ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিশেষ ক্ষমতা' অর্থে এসেছে–

–এত **কুদরৎ** তার!
আল্লা-তা'লা-আকবর! এ যে মতলব বুঝা ভার![৬৮]

কোরান[৬৯] শব্দটি একটি কবিতায় একবার মহাগ্রন্থ আল্-কোরআন অর্থে এসেছে–

তোমার আদেশ – শ্রেষ্ঠ সে বাণী – **কোরাণের** তৌহিদ্
বরবাদ্ করে বুত্পরস্তি করিবারে তার জিদ।[৭০]

কেরামত/কেরামতি >কারামাত্ (كرامة) ক্ষমতা, শক্তি, সম্মান, মহত্ত্ব, অলৌকিক ঘটনা, বুজুর্গী, ফের, বিপর্যয় ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'ফের' বা 'বিপর্যয়, অর্থে একটি কবিতায় একবার–

নসীবের **কেরামত**!
এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ![৭১]

'বুজূর্গী' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

জানিতে চাহ কি জাহাপনা, এই নফরের **কেরামতি**?
– রহিবে না রোষ – দেখিবে যখন এতটুকু গাফিলতি[৭২]

---

৬৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১১
৬৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৪
৬৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কোরান' শব্দ দ্রষ্টব্য
৭০. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫
৭১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৬
৭২. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১২
৭১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৬
৭২. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১২

Dhaka University Institutional Repository

কেল্লা[৭৩] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'দুর্গ' অর্থে এসেছে–

কাল রাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজগবি!–
আমারই কেল্লা লাহোর যেন সে–তারি মত এক ছবি![৭৪]

কোরবান > কু.রবান্ (قربان) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ত্যাগ, উৎসর্গ, বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবন দান বা আত্মদান ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবন দান' অর্থে এসেছে–

সহসা শুনিনু, কে যেন কোথায় ডেকে বলে. "সাবধান"!
রক্ত উহাতে কিছু নাই আর, হয়ে গেছে কোরবান–[৭৫]

খ

খবর[৭৬] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সংবাদ' অর্থে এসেছে–

বক্সিরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ– বেলা কেন?
মরিয়ম আর সখিনা– বাদীরে বলে দেই– থাকে হাজির যেন।[৭৭]

খাতির[৭৮] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'তোয়ায' অর্থে এসেছে–

ধরিয়াছি তাই, জগৎ জানিবে, বাদশা আলমগীর
দুনিয়াদারিব খাতির করেনি, – খোদার দুয়ারে শির[৭৯]

খালি[৮০] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'শূন্য' অর্থে এসেছে–

শাহ্-বেগমের ইজ্জত কোথা? ওড়না ও গেছে ঘুচে'!
খালি পায়ে নেই জুতাটুকু! বুঝি শরম ফেলেছ মুছে' ?[৮১]

---

৭৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কেল্লা' শব্দ দ্রষ্টব্য
৭৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৯৯
৭৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৩
৭৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খবর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৭৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খাতির' শব্দ দ্রষ্টব্য
৭৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০৯
৮০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খালী' শব্দ দ্রষ্টব্য
৮১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

খুলে/ খোলা[৮২] শব্দটি পাঁচটি কবিতায় আটবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'উন্মুক্ত' অর্থে চারটি কবিতায়[৮৩] চার বার–

নিশির ডাকে তখন যে তার মন-মহলের খিল খোলা!
সেতারখানার কি সুর হানে!
দুল্‌ছে নিশার নীল দোলা![৮৪]

'বাঁধন ছড়ানো' অর্থে একটি কবিতায় একবার –

উসুখুসু চূলগুলি চোখ থেকে তুলে' দাও,
পায়ের নুপুরটি খুলে নাও,[৮৫]

'খুলে দেয়া' অর্থে একটি কবিতায় তিনবার –

ঘটেছে তো ভয়, এইবার তবে খুলে দে জান্‌লাগুলা।
ওটারে এখনি সাফ করে' আন্‌ মুছায়ে ময়লা –ধুলা।[৮৬]

খেয়াল[৮৭] শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'সপ্ন' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

গিন্নির বড়–ই ইচ্ছে ছিল একটা দামী ফ্রক,
মেয়ের খেয়াল অন্য রকম– বাবা– সাজার সখ্‌![৮৮]

'চেতনা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

জায়েদ তখন খেয়াল হারায়, দবদবিয়ে রগ
নেশার আগুন ভেল্কি লাগায় – দিল্‌ করে ডগ্‌ মগ।[৮৯]

খেলাপ > খিলাফ্ (خلاف) পরিপন্থি, বিরুদ্ধাচরণ, ব্যতিক্রম ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'বিরুদ্ধাচরণ' অর্থে এসেছে–

তবে সেই 'এক' – সেই আহদের খেলাপ হবে যে তায়,–
নিস্ফল হবে মক্কা হইতে ছুটে আসা মদিনায়![৯০]

---

৮২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খোলা'শব্দ দ্রষ্টব্য
৮৩. মৃত্যু, ইরাণী, বেদুইন:স্বপন-পসারী, নিদালি:হেমন্ত-গোধুলী
৮৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'ইরাণী', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৫
৮৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'নিদালি', "হেমন্ত-গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৭৫
৮৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৪
৮৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খেয়াল' শব্দ দ্রষ্টব্য
৮৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'পুজোর পোশাক', "রূপকথা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৯০
৮৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৯
৯০. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫

Dhaka University Institutional Repository

গ

গজব > গাদ.াব (غضب) রাগ, ক্রোধ, রোষ, অভিশাপ, আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ক্রোধ' অর্থে এসেছে –

দারা বেইমান, কাফেরের রাজা! – হিন্দু, কেরেস্তান!
আমি মরি নাই, তোমারি **গজবে** হারায়েছে তার প্রাণ ।[৯১]

গজল[৯২] শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'প্রণয়গীতি' অর্থে দু'টি কবিতায়[৯৩] দু'বার–

কস্তুরী-কালো পশ্‌মিনা চুলে বিনায়ে 'লালা'র মালা
আজ গোলাপের অপমান কেন? **গজল** গাও নি বালা?[৯৪]

'ধর্মসঙ্গীত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

এই খানে তুমি বসিবে, গায়িব **গজল**-ইলাহী – তোমারি গান,
আজ নওবাতি– জ্বালাবেনা বাতি? সাজাবেনা তার গোলাব-দান ?[৯৫]

গরীব[৯৬] শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'নির্ধন' ও 'অসহায়' অর্থে এসেছে –

'নির্ধন' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

পিয়ারা আমার বড় যে রূপসী!– চাহে না সে –
এমন **গরীব**– অভাজন তারে ভালোবাসে,[৯৭]

'অসহায়' অর্থে একটি কবিতায় একবার –

আছে বটে,– আছে!– শাদার উপরে ছোট সেই কালো দাগ ।
নাজির খাঁ
এবার চলিনু, **গরীবেরে** 'পরে আর করিও না রাগ ।[৯৮]

---

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫
৯২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'গজল' শব্দ দ্রষ্টব্য
৯৩. নাদিরশাহের শেষ, ইরাণী: স্বপন-পসারী
৯৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৫
৯৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
৯৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'গরীব' শব্দ দ্রষ্টব্য
৯৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'হাফিজের অনুসরণে', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৩
৯৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৬

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম[৯৯] শব্দটি দু'টি কবিতায় অন্তত তিনবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে –

'একান্ত অনুগত' অর্থে দু'টি কবিতায়[১০০] দু'বার–

গোলাম হাজির, আনিয়াছি, দেখে লও;
দেখ এই কিনা, বান্দার 'পরে এই বার খুশী হও![১০১]

'আজ্ঞাবহ' অর্থে একটি কবিতায় একবার –

এই দুনিয়ার বাদশাহ যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি –
ভুলিতে পারিনা– যে জন নফর তুমি যে গোলাম তারি![১০২]

জ

জওয়াব/জবাব > জাওয়াব্ (جواب) জবাব, সাড়া, উত্তর, প্রত্যুত্তর ইত্যাদি ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে,

'প্রত্যুত্তর' অর্থে দু'টি কবিতায়[১০৩] দু'বার –

– কোনো কথা নয় আর!
যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার ![১০৪]

'উত্তর' অর্থে তিনটি কবিতায়[১০৫] তিনবার –

আরে বুজ্রুক! বুজরুকি রাখ! কথার জবাব চাই –
আমি চেয়েছিনু শিরটাই শুধু, এ তো আমি চাহি নাই ।[১০৬]

জবেহ্ /জবে' > য.াব্হ্ (ذبح) হত্যা, বধ, কোরবানী, উৎস্বর্গ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'কোরবানী' অর্থে এসেছে –

দাও বল দাও! যে – বলে একদা ইব্রাহিমের বুক
নিজ সন্তানে জবে' করিবারে কাঁপে নাই এতটুক![১০৭]

---

৯৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'গোলাম'শব্দ দ্রষ্টব্য

১০০. নুরজহান ও জহাঙ্গীর:বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব:অগ্রন্থিত কবিতা

১০১. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১০

১০২. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০১

১০৩. নাদিরশাহের শেষ :স্বপন-পসারী, ফারসী ফরাস: অগ্রন্থিত কবিতা

১০৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২

১০৫. হাফিজের অনুসরণে:স্বপন-পসারী, প্রেম-ফুল:স্মরগরল, দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা

১০৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১২

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯

Dhaka University Institutional Repository

জমতে[১০৮] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'জমাট' হওয়া অর্থে এসেছে –

বুকের সে বিষ আজও
জম্‌তে আছে দেরি;
নেই কোন ভয় লাজ ও –
মুর্তি আনন্দেরি![১০৯]

জমজম > যাম্‌যাম্ (زمزم) জম্‌জম্ কূপ বা জমজমের পানি ইত্যাদি।

মুসলিম ইতিহাসে ইহার উৎপত্তির কাহিনী হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র হাজেরা ও ইসমাঈলের সাথে সম্পৃক্ত। কূপটি কা'বা ঘরের দক্ষিণ-পূর্বকোণে যেখানে হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ অবস্থিত, তার বিপরীত দিকে। চৌদ্দফুট গভীর এ কূপের উপরে গম্বুজ আছে। মুসলমানগণ এ কূপের পানি পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর মনে করে পান করেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জুরহুমীয়গণ তাদের সমুদয় সম্পদ নিক্ষেপ করে কূপটি ভরে ফেলেছিল। পরে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর দাদা আবদুল মোত্তালিব কুপটি আবিষ্কার করে পূনঃখনন করেন এবং উহার চতুর্দিকে পাকা প্রাচীর নির্মাণ করেন। ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জম্‌জমের পানি উপচে বন্যা হয়, তাতে কয়েকজন হাজী প্রাণ হারান।[১১০]

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

'হাশিশ' খাওয়া'য়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল এতদিন–
'জম্‌জম' জলে ধুয়ে দিল মাথা দিল্‌দার কোন জিন্![১১১]

জল্লাদ > জাল্লাদ্ (جلاد) ঘাতক, প্রাণ দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অপরাধীর বধকারী

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১১২] সাতবার 'ঘাতক' অর্থে এসেছে –

শাহজাদা দারা – হায়, হায়, তুই এত বড় জল্লাদ!
কুত্তার মত মারিলি তাহারে? – ওরে ও হারামজাদ![১১৩]

জান্নাত > জান্নাত্ (جنة) বেহেশ্‌ত, বাগান, উদ্যান ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'উদ্যান' অর্থে এসেছে –

প্রেমেরি বাঁধনে একদিন যবে বাঁধিবে বাহুর পাশে –
জান্নাত্ পানে চাহিতে আঁখি যে ঘৃণায় মুদিয়া আসে![১১৪]

---

১০৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'জমতে' শব্দ দ্রষ্টব্য
১০৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'প্রেম ও ফুল', "স্মরগরল", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৩৩৩
১১০. সম্পদাক, ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, পৃ. ৩৪১
১১১ মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৩
১১২. নুরজহান ও জহাঙ্গীর: বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা
১১৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১১
১১৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'ফার্সি ফরাস', "হেমন্ত-গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৮

Dhaka University Institutional Repository

জাফরান[১১৫] শব্দটি দু'টি কবিতায়[১১৬] দু'বার 'জাফরানী রং' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে –

ছাঁৎ করে তবু খুণের আগুন নিবে' গেল যেন নিমেষ তরে–
চোখ-জ্বালা-করা লাল কুয়াসায় ফিকে জাফরান রংটি ধরে![১১৭]

জাহান্নাম > জাহান্নাম্ (جهنم) দোজখ, নরক, ধ্বংশ, অধোগতি, পাপিদের জন্য নিদিষ্ট অত্যন্ত নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক স্থান ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'ধবংশ' অর্থে এসেছে–

নসীবের কেরামত! –
এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ![১১৮]

জিন > জিন্ন (جن) ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীর মতে আগুনের তৈরী অদৃশ্য দেহধারী জীব বিশেষ, দৈত্য ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে –

হাশিশ খাওয়ায়ে অজ্ঞান করে রেখেছিল এতদিন –
'জম্‌জম্' জলে ধুয়ে দিল মাথা দিলদার কোন জিন![১১৯]

জেব > জাইব্ (جيب) পকেট, ছিটমহল, গলাবন্ধ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'পকেট' অর্থে এসেছে –

যতখন তুমি আছ আর আছে জোয়ানি,
আর এই জেবে আছ টাকা সিকি–দোয়ানি।[১২০]

জোহরা > যাহ্‌রাহ্ (زهرة) আলো, ঔজ্জ্বল্য, চাক্‌চিক্য, সৌন্দর্য, গৌরবর্ণ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় এসেছে এবং জোহরা দ্বারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নুরজাহানের গৃহ পরিচারিকাকে বুঝানো হয়েছে।

কেন মিছে ভয় করিস জোহরা ? তুই যে আমার ছোট বহিন!
শাহ-বেগমের গরব কোথায়! তোরও চেয়ে আমি অধম হীন।[১২১]

---

১১৫. সতেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'জাফরান' শব্দ দ্রষ্টব্য
১১৬. ইরাণী, বেদুঈন:স্বপন-পসারী
১১৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৭
১১৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৬
১১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৩
১২০. মোহিতলাল মজুমদার, 'রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৮৪
১২১. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬

ত

তকরার > তাকরার (تکرار) পুনরাবৃত্তি, পুনরুক্তি, বিবাদ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'পুনরাবৃত্তি' অর্থে এসেছে –

তকরার রেখে ধর তরবার! আহমদ্ আব্দালি

এখনি আসিবে, শিরগুলা কাটি' কুত্তারে দিবে ডালি'![১২২]

তসবীর > তাস্‌ভীর (تصویر) ছবি, চিত্র, আকৃতি, প্রতিকৃতি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'ছবি' অর্থে এসেছে –

রূপের কদর জানি খুব জানি! – তসবীরে হয় আঁকা,

রূপ সে বিকায় কানা- কড়িতেই, তসবীর লাখ-টাকা![১২৩]

তহুরা > ত.াহুরা (طهور) বেহেস্তের পবিত্র পানীয় বিশেষ ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে –

স্বর্গের সুরা এই সে তহুরা! – আনিয়াছ ভরি' আমারি তরে?

চুমকে-চুমুকে সব ব্যথা যাবে! সব স্মৃতি নাকি উদাস করে?[১২৪]

তাজ[১২৫] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[১২৬] সাতবার 'মুকুট' অর্থে এসেছে –

ফেলিয়া দিয়াছি তাজ দেখ ওই, কাছে নেই হাতিয়ার–

তোমাদেরো আগে পেয়েছি সমন মৃত্যু- ফেরেস্তার ।[১২৭]

তাজ্জব > তা'আজ্জুব্ (تعجب) বিস্ময়, আশ্চর্য ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১২৮] দু'বার 'বিস্ময়' অর্থে এসেছে–

একি হল, একি! বড় তাজ্জব! – ছায়া নয় ও যে ছবি!

একবার সেই দেখেছেনু ওরে, ভুলে গিয়েছিনু সবি![১২৯]

---

১২২. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৬
১২৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০৫
১২৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩২
১২৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'তাজ' শব্দ দ্রষ্টব্য
১২৬. নাদিরশাহের শেষ (২বার), ইরাণী, শেষ শয্যায় নুরজহান (২বার):স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর: বিস্মরণী,দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব:অগ্রন্থিত কবিতা
১২৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৬
১২৮. নাদিরশাহের শেষ:স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর:বিস্মরণী
১২৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

তামিল > তা'মীল (تعميل) সম্পাদন, মান্য, রক্ষা, পালন ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৩০] তিনবার 'মান্য' অর্থে এসেছে –

তামিল করেছি হুকুম তোমারি – তোমারে করেছি ভয়,
খোদার বান্দা বেইমান বটে, তোমার বান্দা নয় ।[১৩১]

তারিখ > তারীখ (تاريخ) তারিখ, ইতিহাস, কাহিনী ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'তারিখ' অর্থে এসেছে–

হ্যাঁ দ্যাখ, সেদিন আস্‌তেছিলাম একলা পথে শেষ রাতে,
তারিখ যে তার মনেই আছে – অগ্রহায়ন তেস্রাতে –[১৩২]

তুফান[১৩৩] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'প্রবল শোরগোল' অর্থে এসেছে –

ছুবীর. ফলকে ঝলকে-ঝলক রক্তের ফোয়ারায়
অট্টহাসির তুফান তুলেছি– খোদা চেয়ে ছিল ঠায়![১৩৪]

তৌহিদ > তাওহ্ীদ (توحيد) একত্ববাদ, আল্লাহর একত্ব, ঐক্যকরণ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'একত্ববাদ' অর্থে এসেছে–

তোমার আদেশ – শ্রেষ্ঠ সে বাণী – কোরাণের তৌহিদ
বরবাদ করে' বুত পরস্তি করিবারে তার জিদ ।[১৩৫]

দ

দুনিয়া[১৩৬] শব্দটি আটটি কবিতায়[১৩৭] সতরবার 'ইহজগৎ' অর্থে এসেছে –

এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আমরাই প্রজা আমরা রাজা!
আমাদের সাথে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা![১৩৮]

---

১৩০. নাদিরশাহের শেষ:স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (২বার):অগ্রন্থিত কবিতা
১৩১. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১১
১৩২. মোহিতলাল মজুমদার, 'রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৮৬
১৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'তুফান' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৩৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১২
১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫
১৩৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'দুনিয়া' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৩৭. দিলদার, নাদিরশাহের জাগরণ, নাদিরশাহের শেষ, শেষ শয্যায় নুরজহান, বেদুইন (৪বার):স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর (৫বার): বিস্মরণী, রুবাইয়াৎ-ই-চামার খায়-আম, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (৩বার): অগ্রন্থিত কবিতা
১৩৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন' "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দো'য়ার > দু'আ (دعا) প্রার্থনা, আশীবাদ, অনুগ্রহ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'আশীর্বাদ' অর্থে এসেছে–

যা' ছিল আমার সব ভালো ছিল – খোদার শ্রেষ্ঠ **দো'য়ার** দান!
যা' ঘটেছে মোর সারাটি জীবনে, গোড়া থেকে শেষ– সব সমান![১৩৯]

ন

নকল[১৪০] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'মিথ্যা' বা 'অলিক' অর্থে এসেছে –

তোর দোষ নেই আমিও বুঝিনি, দেখিনি তখন এমন করে' –
শাহ-বেগমের **নকল** খেলায় আসলের নেশা গেছিল ধরে'![১৪১]

নকীব[১৪২] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ঘোষণাকারী' অর্থে এসেছে–

রাজার **নকীব** বাসন্ত-পিক ফুকারিল দিক্-পথে–
হয়েছে সময় ঋতু-অধিপের আসিবার ফুল-রথে![১৪৩]

নজর[১৪৪] শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৪৫] তিনবার 'দৃষ্টি' অর্থে এসেছে–

ভূরুর কোণা সূরু কোথায় – **নজর** নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়াতলে![১৪৬]

নফর > নাফর্ (نفر) দল, ব্যক্তি, ছোটদল, ভৃত্য, গোলাম, পরিচারক, চাকর ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৪৭] চারবার 'ভৃত্য' অর্থে এসেছে–

এই দুনিয়ায়– বাদ্‌শা যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি–
ভুলিতে পারি না – যে জন **নফর** তুমি যে গোলাম তারি![১৪৮]

---

১৩৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজাহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৮
১৪০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'নকল' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৪১. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজাহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৮
১৪২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'নকীব' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৪৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'বসন্ত -আগমনী', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৭৯
১৪৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'নজর' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৪৫. চোখের দেখা, বেদুঈন: স্বপন-পসারী, রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম:অগ্রস্থিত কবিতা
১৪৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'চোখের দেখা', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬৯
১৪৭.. নুরজহান ও জহাঙ্গীর (২বার):বিস্বরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (২বার):অগ্রস্থিত কবিতা
১৪৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

নসীব > নাস.ীব (نصيب) ভাগ্য, অদৃষ্ট, অংশ ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৪৯] তিনবার 'ভাগ্য' অর্থে এসেছে–

ওঠো একবার! নওরাতি আজ– শেষ নওরোজ হয়ত এই!

এ দিনের মত স্মরণবাসর তোমার নসীবে আর যে নেই![১৫০]

নহর > নাহার (نهر) নদী, স্রোতস্বিনী, তটিনী, প্রবাহিণী, তরঙ্গিণী, খাল, নালা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'নদী' অর্থে এসেছে–

রোকনাবাদের নীল নহরের কিনারাটি

গুল-গলাগলি গলিটি এমন মুসল্লার?[১৫১]

নাজের/ নাজির > নায.ীর (نذير) সতর্ককারী, ভীতিপ্রদর্শনকারী, উৎসগীকৃত, মান্নতকৃত ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় তিনবার মোগল সম্রাট আরংজীবের সেনাপতি নাজির খাঁকে উদ্দেশ্য করে ব্যবহৃত হয়েছে–

ওই আসিতেছে! – হঠাৎ কি হল? কপাল উঠে যে ঘামি!

নাজের! নাজের![১৫২]

নাদির > নাদির্ (نادر) বিরল, দুর্লভ, স্বল্প, অনন্যসাধারণ, অভিনব ইত্যাদি ।

এখানে নাদির শব্দ দ্বারা পারশ্যরাজ নাদির শাহ্ উদ্দেশ্যে । যাকে ইরানের নেপালিয়ন বলা হয় । এই নৃপতি ১৭৩৯ খ্রি; দিল্লীশ্বর মুহাম্মদ শাহের সাথে এক তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন, যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে ।

শব্দটি একটি কবিতায় একুশবার উল্লিখিত অর্থেএসেছে–

নাদির! নাদির! – শুনিয়াছি আমি উঠিয়াছি তাই জাগি'–

ইস্পাহানের গুলাব-বাগান– কে ছোটে তাহার লাগি'?[১৫৩]

নার > নার্ (نار) আগুন, বহ্নি, হুতাশন, দোজখ, জাহান্নাম, আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৫৪] দু'বার 'আগুন' অর্থে এসেছে–

রূপের গর্বে ধিক্কার হ'ল– মরিল যেদিন শের আফকন্,

'নার' গেল, 'নূর' – সেও ঘুচে গেল, নির্বিষ হ'ল এ দেহ-মন![১৫৫]

---

১৪৯. নাদিরশাহের জাগরণ, শেষ শয্যায় নুরজাহান:স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর:বিস্মরণী
১৫০. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৯৯১২৬
১৫১. মোহিতলাল মজুমদার, 'হাফিজের অনুসরণে', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২২
১৫২. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১০
১৫৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের জাগরণ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৯৯
১৫৪. শেষ শয্যায় নুরজাহান (২বার), বেদুঈন: স্বপন-পসারী
১৫৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

নার্গিস > নারজিস্ (نرجس) নার্গিজ, এক প্রকার সুগন্ধি ফুল ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

ফাঁক হয়ে গেল মাথার খিলান, চক্ষু-কোটর রক্তে ভরে–
মুঠা-মুঠা যেন নার্গিস-ফুল কুটি-কুটি হয়ে দু'ধারে ঝুরে![১৫৬]

নূর্ > নূর্ (نور) আলো, কিরণ, জ্যোতি, উজ্জ্বলতা, প্রদীপ, বাতি ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৫৭] তিনবার 'আলো' অর্থে এসেছে–

মহলের নূর ছিল যেই তার, তাহারে করিল নূরজহান।
জীবনেই তারে জয় মালা দিল, ফিরায়ে নিল না আর সে দান![১৫৮]

ফ

ফকির[১৫৯] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সাধু দরবেশ' অর্থে এসেছে–

ভুলিয়াছি ভয়, স্নেহ ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি রাজনীতি;
রমনীর রূপ হারাম করেছি,– ফকিরের যেই রীতি[১৬০]

ফরাস > ফিরাশ (فراش) বিছানা,শয্যা, শয্যা-সঙ্গিনী, স্ত্রী, মেঝে ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৬১] দু'বার 'বিছানা' অর্থে এসেছে–

সমুখে উদার মাঠ, উপরে আকাশ,
সেথা হোথা সুমসৃণ ঘাষের ফরাস।[১৬২]

ফেরদৌসী > ফিরদাউসী (فردوسی) স্বর্গীয়, বেহেশ্তী ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার এসেছে–

এখানে ফেরদৌসী শব্দ দ্বারা ইরাণের মহাকবি শাহনামা রচয়িতা, পৃথিবী বিখ্যাত দিক্ বিজয়ী মহাবীর সুলতান মাহমূদের সভাকবি মাওলানা আবুল কাশেম ফেরদৌসীকে বুঝানো হয়েছে–

হাজার বছর আগে– ভাবিতে বিস্ময় মানি, হে ফেরদৌসী-কবি!–
সারা প্রাচী স্তব্ধ যবে, অস্তপ্রায় কাব্যরবিচ্ছবি,[১৬৩]

---

১৫৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৭
১৫৭. শেষ শয্যায় নুরজাহান (২বার), বেদুইন:স্বপন-পসারী
১৫৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৮
১৫৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ফকীর' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৬০. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০৯
১৬১. ইরাণী:স্বপন-পসারী, রমনার তাজ: অগ্রন্থিত কবিতা
১৬২. মোহিতলাল মজুমদার, 'রমনার তাজ', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০০
১৬৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'ফেরদৌসী', "হেমন্ত -গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ব

বদল[১৬৪] শব্দটি চারটি কবিতায়[১৬৫] চারবার 'বিনিময়' অর্থে এসেছে–

তোমার সাথে একটি রাতে
বদল হ'ল মিলন মালা
একটি প্রহর সুখের লহর
একটি নিমেষ সুধায়-ঢালা![১৬৬]

বাকী[১৬৭] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অবশিষ্ট' অর্থে এসেছে–

তাই তো আমার প্রাণটা হ'ল রঙীন তোমার রূপের রঙে–
লাগছে এমন "কোল আঁধারে" পাগল হওয়াই কেবল বাকি![১৬৮]

বাতিল[১৬৯] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অকার্যকর' করা অর্থে এসেছে–

নাদির! এখনি ভূলে গেলে– তুমি দুনিয়ার দুষমন!
বাতিল করেছ কায়কোবাদের ধর্ম সিংহাসন![১৭০]

বাদে > বা'দ্ (بعد) পরে, বাদ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় চারবার 'পরে' অর্থে এসেছে–

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী!
হরদম্ দাও!– আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?[১৭১]

বিদায়[১৭২] শব্দটি পঁচিশটি কবিতায়[১৭৩] ত্রিশবার 'বিদায়' অর্থে এসেছে–

আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি–
নিমিষের দেখা, মধুর বিদায় ।[১৭৪]

---

১৬৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বদল' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৬৫. পরমক্ষণ: স্বপন-পসারী, মূল্যজ্ঞান:হেমন্ত গোধূলী, ফারসী-ফরাস, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা

১৬৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'পরমক্ষণ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৮৭

১৬৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বাকি' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৬৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৮৬

১৬৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বাতিল' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৭০. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২১০৩

১৭১. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল গান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২১

১৭২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বিদায়' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৭৩. পুরুরবা, মৃত্যু, শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপন-পসারী, মৃত-প্রিয়া, ঘুঘুরডাক, নচিকেতা: বিস্মরণী, দেবদাসী, বসন্তবিদায়, দিনশেষে জ্যোৎস্না গোধুলী, শেষ-শিক্ষা (৩বার), বিদায়-বাসনা (২বার), প্রেম-ফুল, বঙ্গ লক্ষী, সত্যেন্দ্রনাথ: স্মরগরল, রবীন্দ্র-জয়ন্তী, উষা, শ্যালট-বাসিনী, ক্ষণিকা, একটি নিমেষ: হেমন্ত-গোধুলী, মন্দির পথে, তরু কুমারী, ফারসী ফরাস (২বার), রোগ শয্যায় চিঠি (২বার), রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম, রমনার তাজ: অগ্রন্থিত কবিতা

১৭৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'ক্ষণিকা', "হেমন্ত-গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বিলকুল > বিল্‌কূল (بالكل) সম্পূর্ণ, সমস্ত, সমুদয়' বেবাক ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার 'সম্পূর্ণ' ও 'বেবাক' অর্থে এসেছে–

'সম্পূর্ন' অর্থে দু'টি কবিতায়[১৭৫] দু'বার–

গুলগুলে মশ্‌গুল

বিলকূল ভর্‌-ভর্‌,

কারছায়া জ্যোৎস্নায়!–

সুন্দর! সুন্দর! [১৭৬]

'বেবাক' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

হিন্দুস্তানে কাফেরের ডেরা **বিলকুল** ভাঙা চাই!–

তখ্‌তে বসিয়া মোগলেরা কেহ সেই কথা ভাবে নাই।[১৭৭]

বুরুজ[১৭৮] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'প্রাসাদ' অর্থে এসেছে–

মাটির **বুরুজ**, পাথরের টালি, দুয়ারে শিকল, লোহার বেড়া–

ফাটকে-আটক বাস করে হোথা হাজার হাজার মানুষ-ভেড়া![১৭৯]

বুল্‌বুল্‌[১৮০] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[১৮১] ছয়বার সুকণ্ঠিধারী পাখি 'বুলবুলী' উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে–

বুলবুল্‌ গায় গুঞ্জরি–
যা' কিছু শাখায় মুকালিয়া উঠে
প্রেম সে ত' নয়, সুন্দরি![১৮২]

বোরকা > বুরকা' (برقع) অবগুণ্ঠণ, অঙ্গাবরণ ইত্যাদি।

আপন দেহসৌন্দর্য্য পুরুষের দৃষ্টির আড়াল করার নিমিত্তে মুসলিম রমণীদের পরিধেয় আপাদমস্তক আবরক বিশেষ পোষাক।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'অবগুণ্ঠণ' অর্থে এসেছে–

কালো-পশমের **বোরকা** ছিঁড়িয়া দেখা দিল মোর সব্‌জা-হুরী–

নাকে-মুখে মোর পিয়ালা পিয়ায়, পুরাণো সে গান হাওয়ার পূরি'।[১৮৩]

---

১৭৫. দিলদার, গজল গান: স্বপন-পসারী
১৭৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দিলদার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬৮
১৭৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫
১৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বুরুজ' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৭৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৪
১৮০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বুলবুলী' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৮১. নাদিরশাহের জাগরণ, গজল গান, ইরাণী, শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপন-পসারী, ফারসী ফরাস (২বার): অগ্রন্থিত কবিতা
১৮২. মোহিতলাল মজুমদার, 'ফারসী-ফরাস', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৬৬
১৮৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বোস্তানে > বুসতান্ (بستان) বাগান, কানন, উদ্যান, বাগিচা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'বাগিচা' অর্থে এসেছে–

গালে-গাল দিয়ে লালে-লাল হ'ল

বোস্‌তানে![১৮৪]

ম

মক্কা[১৮৫] শব্দটি একটি কবিতায় একবার পবিত্র মক্কা নগরীর কাবা গৃহ উদ্দেশ্য–

তবে সেই 'এক' – সেই আহদের খেলাপ হবে যে তায়,–

নিষ্ফল হবে মক্কা হইতে ছুটে আসা মদিনায়![১৮৬]

মগরব > মাগরিব্ (مغرب) মাগরিব্ । শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে এবং মুসলমানদের সান্ধ্যকালীন উপাসনা সালাতুল মাগরিবকে বুঝানো হয়েছে–

মুয়াজ্জেন্ ওই মসজিদে ধরে আজান মগরবের,

পিলু-বারোঁয়ায় বাঁশিটি ফোঁপায়– কোথায় বিদায়-উৎসবের![১৮৭]

মজনু > মাজনূন্ (مجنون) পাগল, প্রেমোত্তক, উম্মাদ, জ্বিনে-ধরা ইত্যাদি ।

এখানে 'মজনু' শব্দ দ্বারা লায়লী-মজ্‌নুকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত আরব্য উপন্যাসের নায়ক লায়লীর প্রেমিক মজ্‌নূ উদ্দেশ্য, যার মূল নাম কায়েস ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মজনুর গোরে এখনো যে তার

বুক জুড়ে,

লাইলী–অধর–'লালা'–ফুলটির

মূল জাগে![১৮৮]

মজলিসে[১৮৯] শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৯০] দু'বার 'আসর' অর্থে এসেছে–

রং–বেরঙের সাজ করে ওরা, শাদা-চোখে হয় সুর্মা-টানা!

মজলিসে বসে' মিঠে মদ খায়, পিঠে ঠেস দিয়ে তাকিয়াখানা![১৯১]

---

১৮৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল গান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২০

১৮৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মক্কা' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৮৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫

১৮৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৫

১৮৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল গান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২১

১৮৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মজলিস' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৯০. বেদুঈন:স্বপন-পসারী, শরাব-খানা: হেমন্ত গোধূলী

১৯১. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মতলব[১৯২] শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৯৩] দু'বার 'উদ্দেশ্য' অর্থে এসেছে–

হা হা, হা হা, ধ্বনি শুনি, তবু সেই মুখে নাই কোন রব,
কি দেখিতে কি যে দেখিলাম! – ঘুরে গেল সেই **মতলব**।[১৯৪]

মদিনা[১৯৫] শব্দটি একটি কবিতায় একবার মসজিদে নববী খ্যাত পবিত্র 'মদিনা শরীফ' কে বুঝানো হয়েছে। যেখানে মহানবী (সা.) এর রওজা মোবারক অবস্থিত।

তবে সেই 'এক'–সেই আহদের খেলাপ হবে যে তায়,–
নিষ্ফল হবে মক্কা হইতে ছুটে আসা **মদিনায়**![১৯৬]

মনিব[১৯৭] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'প্রভু' অর্থে এসেছে–

করেনি বান্দা; গোনা হয়ে থাকে **মনিব** সহিবে কেন?
আলমগীরের নফর আমি যে, সে-কথা ভূলিনে যেন।[১৯৮]

মমতাজ[১৯৯] শব্দটি একটি কবিতায় একবার এসেছে এবং মোঘল সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলকে বুঝানো হয়েছে–

দীন-দুনিয়ার মালিক যে জন তাঁর নাকি বড় ন্যায়-বিচার!–
মমতাজ পায় তাজের শিরোপা, নুরজাহানের কাফন সার![২০০]

ময়দান[২০১] শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে –

'মাঠ' অর্থে দু'টি কবিতায়[২০২] তিনবার–

রাতের চেরাগ নিবে গেলে হ'বে এই **ময়দানে** আরেক খেলা–
হুতাশী হাওয়ায় সওয়ার হ'য়ে ছুটিবে কাহারা নিশীথ-বেলা![২০৩]

---

১৯২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মতলব' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৯৩. নাদিরশাহের শেষ: স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা
১৯৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৩
১৯৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মদিনা' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৯৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫
১৯৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মনিব' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৯৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১২
১৯৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মমতাজ' শব্দ দ্রষ্টব্য
২০০. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৮
২০১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ময়দান' শব্দ দ্রষ্টব্য
২০২. নাদিরশাহের শেষ, বেদুঈন (২বার):স্বপন-পসারী
২০৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

'রণক্ষেত্র' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

উঠিনু যখন, স্বপ্নের মত ময়দান দেখি সাফ্,
শুধু মাথার উপরে জ্বলিছে কার আঁখি আকতাব![২০৪]

মশগুল[২০৫] শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

'মগ্ন' অর্থে দু'টি কবিতায়[২০৬] দু'বার–

ছিল যে মাতাল, মদের নেশায় দিনরাত মশগুল–
পাগল করিয়া দিলে কেন তারে? – একি নসীবের ভূল![২০৭]

'বিভোর' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

গুল্‌গুলে মশগুল
বিল্‌কুল ভর্‌-ভর্‌,
কার ছায়া জোৎস্নায়!
সুন্দর! সুন্দর![২০৮]

মশাল[২০৯] শব্দটি দু'টি কবিতায়[২১০] দু'বার 'প্রদীপ' অর্থে এসেছে–

ঘুম ভেঙে যায়, ওকি ও হোথায়?– আঁধারে কে দেয় মশাল জ্বালি' ।
রূপালী জলের ঝাপটায় ধুয়ে সাজায় আকাশে তারায় ডালি ।[২১১]

মসজিদ[২১২] শব্দটি ছয়টি কবিতায়[২১৩] সাতবার মুসলমানদের ধর্মীয় উপাসনালয় 'মসজিদ' অর্থে এসেছে–

কার তরে তুই ছেয়ে দিলি ভূঁই–
তুলিলি আকাশ ঘিরে'
উদ্ধত ওই গুম্বুজ গুলো
মসজেদ-মন্দিরে ?[২১৪]

---

২০৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১০
২০৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মশগুল' শব্দ দ্রষ্টব্য
২০৬. বসন্ত আগমনি: স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর: বিস্মরণী
২০৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০৩
২০৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'দিলদার', স্বপন-পসারী, মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬৮
২০৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মশাল' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১০. বেদুঈন:স্বপন-পসারী, কবি বিদ্রোহীর প্রতি: অগ্রন্থিত কবিতা
২১১. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৯
২১২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মসজিদ' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১৩. নাদিরশাহের শেষ, শেষ শয্যায় নুরজাহান (২বার): স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর: বিস্মরণী, শরাবখানা, প্রেম-হীনের পুজা: হেমন্ত-গোধুলী, ফারসী-ফরাস: অগ্রন্থিত কবিতা
২১৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'প্রেম-হীনের পুজা', "হেমন্ত-গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৭১

মহল[২১৫] শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'রাজপ্রাসাদ' অর্থে এসেছে–

সারারাত কাল ঘুমাওনি বুঝি ? সারাদিন আজ জাগিলেনা যে!
বেলা প'ড়ে এল, শাহী-নহবত্ প্রহর-ঘন্টা মহলে বাজে ।[২১৬]

মাঝার > মাযার (مزار) যিয়ারতের স্থান, বুযুর্গ বক্তিদের সমাধি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সমাধি' অর্থে এসেছে–

যদি কোনদিন আবার কখনো নাম ধরে ডাক তায়–
মাটির মাঝারে মরা-দেহ উঠি' বসিবে সে পুনরায় ।[২১৭]

মানা[২১৮] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২১৯] ছয়বার 'নিষেধ' অর্থে এসেছে–

চোখের কোণায় ঘুমের কাজল টানা–
ঘরের ভিতর আস্‌তে যেন মানা![২২০]

মাফ[২২১] শব্দটি চারটি কবিতায় বারবার 'ক্ষমা' ও 'অব্যাহতি' অর্থে এসেছে–

'ক্ষমা' অর্থে তিনটি কবিতায়[২২২] এগারবার–

এসে থাক যদি মাফ চাহিবারে, বল তবে সেই কথা,
নহিলে আরো যে কঠিন হবে সে– ব্যথার উপরে ব্যথা![২২৩]

'অব্যাহতি' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

মাফ পেয়েছি যে,– ছুটি আজ থেকে, হুকুম মিলেছে খোদা-তা'লার,
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার![২২৪]

---

২১৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মহল' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৫
২১৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৯৯২০৫
২১৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মানা' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১৯. বেদুঈন: স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর, মৃত প্রিয়া (২বার):বিস্মরণী, ভোলানাথ: রূপকথা, তরুকুমারী: অগ্রন্থিত কবিতা
২২০. মোহিতলাল মজুমদার, 'মৃতপ্রিয়া', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২১৬
২২১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মাফ' শব্দ দ্রষ্টব্য
২২২. নাদিরশাহের শেষ (৩বার): স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর (৫বার):বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (৩বার): অগ্রন্থিত কবিতা
২২৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২১১
২২৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

মালিক[২২৫] শব্দটি চারটি কবিতায় ছয়বার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

'অধিপতি' অর্থে তিনটি কবিতায়[২২৬] চারবার–

শুধু ওরি হাতে নিস্তার নেই, জিন-সর্দার পাগলা ও যে,
ওর সাড়া পেয়ে আশমানে ওই দিনের **মালিক** ও আড়াল খোঁজে![২২৭]

'অধিকারী' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর সুলতানা!
তুমি হবে তার জানের **মালিক**! – খুন কর– নাই মানা ।[২২৮]

'রাজা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

রুটী ও পেয়ালা সার-হ'ল শুধু– স্বপনে কাটাই দিবা
রাজ্যের খোজ **মালিক** রাখেনা, বাড়িছে প্রলয়-বিভা ।[২২৯]

মিনার[২৩০] শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৩১] তিনবার 'প্রাসাদ-অট্টালিকাদির উচু স্তম্ভ' অর্থে এসেছে–

মাঝখানে তার মস্ত **মিনার**– আকাশে ঠেকেছে মাথা!
এত উচুঁ,– তবু জমিন্ হ'তে সে সমান সোনায় গাঁথা![২৩২]

মুয়াজ্জেন > মুয়ায.যি.ন (مؤذن) নামাজের জন্য আহ্বানকারী ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মুয়াজ্জেন ওই মসজিদে ধরে সন্ধ্যা আজান্ মগরবের
পিলু– বারোয়ায় বাঁশিটি ফোঁপায়– কোথায় বিদায় উৎসবের![২৩৩]

মুরিদ > মুরীদ্ (مريد) ইচ্ছুক, প্রার্থী, অনুসারী, মুসলমান ভক্ত, সাধক, পীরের শিষ্য ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'শিষ্য' অর্থে এসেছে–

আজ এতদিনে একি পরিচয়! – বুকে এক, মুখে আর!
নূতন পীরের নূতন **মুরিদ**! – বাহ্‌বা চমৎকার!–[২৩৪]

---

২২৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মালিক' শব্দ দ্রষ্টব্য
২২৬. শেষ শয্যায় নুরজাহান, বেদুঈন (২বার): স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা
২২৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৭
২২৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০২
২২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩
২৩০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মীনার' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৩১. নাদিরশাহের জাগরণ: স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর (২বার): বিস্মরণী
২৩২. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৯৯
২৩৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৫
২৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

মুস্‌কিল > মুশ্‌কিল্‌ (مشکل) কঠিন, জটিল, বিপদ, সংকট, অসুবিধা, বিপত্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'জটিল' অর্থে এসেছে–

কারো কুল বেল হয়, কারো আম আমড়া–
দুনিয়ার এই ধারা, **মুশকিল** ভারী এ![২৩৫]

মুশ্‌তারা > মুশ্‌তারী (مشتری) বৃহস্পতি (গ্রহ) ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

চাঁদ ডুবে গেল, নিবে' যায় ওই 'পারবিন্‌' '**মুশ্‌তারা**'–
একি থম্‌-থম্‌ করে আশ্‌মান্‌ নীল ইস্পাতপারা ।[২৩৬]

মুসল্লা > মুসাল্লা (مصلی) নামাজের স্থান ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মোর তরে আর নামাজ নাহি রে, পাতিস্‌ নে আর **মুসল্লায়**,
বিশ্বপতির দরবারে মোর সকল আরজ আজ ফুরায়![২৩৭]

মুসাফের[২৩৮] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'পথিক' অর্থে এসেছে–

দিল্‌ -মিল্‌ -মঞ্জিল,
ভাঙা -ঘর সরা'য়ের–
করে' তুলি রঙ্গিল,
আয় ভাই **মুসাফের**![২৩৯]

মুসাবিদা > মুসাভিদাহ্‌ (مسودة) পাণ্ডুলিপি, খসড়া ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'পাণ্ডুলিপি' অর্থে এসেছে–

আল্লার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ সিধা,
দূর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের **মুসাবিদা**![২৪০]

---

২৩৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৮৪
২৩৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৫
২৩৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
২৩৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মুসাফির' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৩৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'দিলদার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬৯
২৪০. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরাব > মিহ.রাব্ (محراب) মসজিদে ইমামের দাড়াবার স্থান, খোত্‌বা পাঠের স্থান ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'খোত্‌বা পাঠের স্থান' অর্থে এসেছে-

দেহের- মনের ঈদগাহে মোর - **মেহেরাবে** জ্বলে হাজার বাতি,
আজ থেকে তাই অনন্ত মোর, চির-মিলনের সে নওরাতি![২৪১]

মোল্লা > মুল্লাউন (ملاء) পরিপূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্টি মহাপন্ডিত ব্যক্তি, আরবী ফারসী ভাষা ও ইসলামী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বংশিয় উপাধী বিশেষ, মসজিদের ইমাম ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'আরবী ফারসী ভাষা ও ইসলামী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি' অর্থে এসেছে-

যতখন তুমি আছ আর আছে জোয়ানি,
আর এই জেবে আছে টাকা-সিকে-দোয়ানি,
নেহি কুছ পরোয়া!- **মোল্লা** কি আল্লা!
শেষ কালে থাকে থাক্ লিভারের চোঁয়া নি ।[২৪২]

র

রহমত > রাহ.মাত্ (رحمة) করুণা, দয়া, কৃপা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'করুণা' অর্থে এসেছে -

খোদা রহমান, তাঁরো **রহমতে** আর দাবি নাই মোর,
দাঁড়ার সম্মুখে হাঁটু-জোড় করি- হারায়েছি সেই জোর ।[২৪৩]

রহমান > রাহ্.মান্ (رحمان) পরম করুণাময় ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

খোদা **রহমান**, তাঁরো রহমতে আর দাবি নাই মোর,
দাঁড়ার সম্মুখে হাঁটু-জোড় করি- হারায়েছি সেই জোর ।[২৪৪]

রেওয়াজ > রিওয়াজ্ (رواج) প্রচলন, রীতি, পদ্ধতি, ধরণ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'প্রচলন' অর্থে এসেছে-

প্রেমীদের নাকি এই **রেওয়াজ**-
প্রাণে প্রাণে হয় কথা-বলাবলি,
সে ভাষার নাকি নেই আওয়াজ![২৪৫]

---

২৪১. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজাহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
২৪২. মোহিতলাল মজুমদার, 'রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৮৪
২৪৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১১
২৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১

Dhaka University Institutional Repository

'ইবলিশ' অর্থে তিনটি কবিতায়[২৫৩] পাঁচবার–

সে নহে নাদির, মানুষ নহে সে! – খোদারি সে কারসাজি!
শয়তান, সেও পারে কি এমন দেখাবার ভোজবাজি ?[২৫৪]

'দুরাচার' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

তখন ভাগিছে মহাভয়ে মোর শিপাহী গোলন্দাজ,
'শয়তান' ছুটে আসিতেছে রুখে– উদ্যত যেন বাজ![২৫৫]

'প্রবঞ্চক' অর্থে দু'টি কবিতায়[২৫৬] দু'বার–

বোস্তান্ আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব হায়াত্ –
সাপ-**শয়তান** বুলবুল্ হ'য়ে গায়িছে সারাটি জ্যোৎস্নারাত![২৫৭]

শরাব > শারাব্ (شراب) মদ্য, সুরা, সুস্বাদু পানীয়, শরবত ইত্যাদি।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায় নয়বার বিভিন্নার্থে এসেছে–

'সুরা' বা 'মদ্য' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[২৫৮] আটবার–

স্বপনের মত **শরাবের** নেশা বিলাইছে দেখ আলোর সাকী।
সারা দুনিয়াটা গুলজার করে, বুঁদ্ হয়ে যায় বনের পাখি।[২৫৯]

'শরবত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বুড়ারা ঘুমায়, জোয়ানেরা জেগে, খিম্‌খিম্-দানা খাওয়ায় উটে,
পরে পেয়ালায় ঘোড়ুই দুধের **শরাব** সদ্য ফেনায়ে উঠে![২৬০]

শরীয়ত > শরী'আহ্ (شريعة) ইসলামের বিধি বিধান, আইন, পথ, পন্থা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ইসলামী বিধান' অর্থে এসেছে–

এখনো এলো না! এত দেরী কেন ? ঘটে নি তো কিছু পথে ?
কে তারে বাঁচাবে ?– বিচার হয়েছে খাঁটি **শরিয়ত** – মতে।[২৬১]

---

২৫৩. নাদিরশাহের শেষ (২বার): স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর: বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (২বার): অগ্রন্থিত কবিতা
২৫৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৩
২৫৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০৯
২৫৬. শেষ শয্যায় নুরজাহান: স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীর: অগ্রন্থিত কবিতা
২৫৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ-শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৯
২৫৮. গজলগান (২বার), হাফিজের অনুসরণে (২বার), শেষ শয্যায় নুরজহান, বেদুঈন: স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর (২বার): বিস্মরণী
২৫৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৪০
২৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
২৬১. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১০

Dhaka University Institutional Repository

শিয়া[২৬২] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'দল' অর্থে এসেছে –

শেখ শিয়া সুফী দরবেশ যত – বাঁচেনা যেনই কেহ,
কাটিয়া পড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড করিবে দেহ।[২৬৩]

শেখ > শাইখ > শায়খ্ (شيخ) বৃদ্ধ, প্রধান ব্যক্তি, সরদার, পীর-মুরশিদ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সরদার' অর্থে এসেছে–

শেখ শিয়া সুফী দরবেশ যত– বাঁচেনা যেনই কেহ্
কাটিয়া পড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড, করিবে দেহ।[২৬৪]

শেজ্দা > সাজ্দাহ্ (سجدة) দুই পা, দুই হাত, কপাল এবং নাকের অগ্রভাগ মাটিয়ে ঠেকিয়ে নিবেদন করা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে –

নমাজের বেলা হয়েছে তখন, তুরিতে নামিনু ভূঁয়ে–
আল্লার নামে শেজ্দা করিনু বারবার মাথা নুয়ে![২৬৫]

শোকর > শুক্র্ (شكر) কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার[২৬৬] 'কৃতজ্ঞতা' অর্থে এসেছে–

আল্লারে মোর হাজার শোকর–চলে' গেল আগে আমায় রেখে–
সেই দিন হ'তে বুঝেছি জোহরা, বুঝি নাই যাহা নিকটে থেকে![২৬৭]

শীত > শিতাউন (شتاء) শীতকাল, শীত ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায় চারবার[২৬৮] 'শীতকাল' অর্থে এসেছে–

যাই-যাই করে' শীত চলে' গেল সেদিন কুহেলি-প্রাতে,
আজি সন্ধ্যায় বসন্ত এল, পঞ্চমী– চাঁদ সাথে![২৬৯]

---

২৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'শীয়া' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৬৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২
২৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
২৬৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০৯
২৬৬. শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা
২৬৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৯
২৬৮. বসন্ত আগমনী, চুড়ির আওয়াজ: স্বপন-পসারী, নিষ্ঠুরা রূপসী: হেমন্ত গোধুলী, কবি-কাহিনী: অগ্রন্থিত কবিতা
২৬৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'বসন্ত আগমনী', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

স

সবুর > স.ব্‌র (صبر) ধৈর্য, সহ্য, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, অপেক্ষা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'অপেক্ষা' অর্থে এসেছে –

সাঁজ একটু সবুর সইবে না তোর! প্রাণ যে আমার উঠছে কেঁদে!

না হতেই কি হবে তোর আল্‌তা পরে, বিউনি বেঁধে ?[২৭০]

সাকী > সাকী (ساقی) সুরা পরিবেশনকারী, প্রেমিকা ইত্যাদি।

শব্দটি ছয়টি কবিতায় দশবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

'সুরা পরিবেশনকারী' অর্থে তিনটি কবিতায়[২৭১] ছয়বার–

বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী!

হর্‌দম্ দাও! – আজ বাদে কাল ভরসা কি ?[২৭২]

'প্রেমিকা' অর্থে চারটি কবিতায়[২৭৩] চারবার–

সকল ভাবনা দুর করি' দাও, বোলাও পেয়ালা
রূপসী সাকী!
জীবনের রোদ পড়ে' এল ওই মহা–নিশা সব
দিবে গো ঢাকি![২৭৪]

সাফ > স.াফ (صاف) নির্মল, পরিস্কার, সচ্ছ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় তিনবার 'পরিস্কার' অর্থে এসেছে–

ঘুচেছে তো ভয়, এইবার তবে খুলে দে জান্‌লাগুলা।

ওটারে এখনি সাফ করে' আন্ মুছায়ে ময়লা-ধুলা।[২৭৫]

---

২৭০. মোহিতলাল মজুমদার, 'কলস ভরা', "স্বপন-পসারী', মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১১৮
২৭১. নাদিরশাহের জাগরণ, গজলগান (৪বার), হাফিজের অনুসরণে: স্বপন-পসারী
২৭২. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল গান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২০
২৭৩. হাফিজের অনুসরণে, বেদুঈন: স্বপন-পসারী, রুবাইয়াত-ই-চামার খায়-আম, প্রেমাঞ্জলি: অগ্রন্থিত কবিতা
২৭৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'প্রেমাঞ্জলি', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৫৬৪
২৭৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৪

সামিল[২৭৬] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'অন্তর্ভূক্ত' অর্থে এসেছে–

'ঘর– করনার সামিল না হ'লে
প্রেম লঘুপাক কখনো নয়'–
অধ্যাপকের এ কথা শুনিয়া
'বুঝায়ে বলুন' – ছাত্রী কয় ।[২৭৭]

সাহেব[২৭৮] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সম্রান্ত ব্যক্তি, অর্থে এসেছে–

না,না, ভালো নয়! খাঁ সাহেব, তুমি কি বল? কেমন লাগে?
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা ভাগে![২৭৯]

সুফী[২৮০] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'মুসলিম মরমী সাধক' অর্থে এসেছে–

শেখ শিয়া সুফী দরবেশ যত – বাঁচে না যেনই কেহ,
কাটিয়া পড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড করিবে দেহ![২৮১]

সুরত > সু.রাহ্ (صورة) চেহারা, আকৃতি, রূপ, ছবি, ফটো, চিত্র, প্রতিকৃতি, কপি, অনুলিপি, পদ্ধতি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'রূপ' অর্থে এসেছে–

মেহের! তোমার মোহনী সুরত!– পরীরাও ফিরে চায়!
আজও মনে হয়, সেই খোশরোজ ওই চোখে চমকায়![২৮২]

সুরু[২৮৩] শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার 'আরম্ভ' অর্থে এসেছে–

ভূরুর কোণা সুরু কোথায় – নজর নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়াতলে![২৮৪]

---

২৭৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'সামিল' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৭৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'প্রেমের স্বরূপঃ "হেমন্ত গোধূলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৫৮
২৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'শাহেব' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৭৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৯৯
২৮০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'সূফী' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৮১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২
২৮২. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০৩
২৮৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'সুরু' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৮৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'চোখের দেখা', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানা > সুলত.ানাহ্ (سلطانة) বেগম, সম্রাজ্ঞী ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সম্রাজ্ঞী' অর্থে এসেছে–

তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর সুলতানা!
তুমি হবে তার জানের মালিক – খুন কর – নাই মানা ।[২৮৫]

সেলাম[২৮৬] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'আশীর্বাদ' অর্থে এসেছে–

সেলিম কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা–
জহাঙ্গীরের প্রেম যত বড়, ছল নয় তার আধা![২৮৭]

সেলামত > সালামাত (سلامة) নিরাপত্তা, সুস্থতা, মঙ্গল, শান্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'শান্তি' অর্থে এসেছে–

রূপের রূপায় কেবা কিনিয়াছে সব– সেরা দৌলত? –
তোমার তাজের কোহিনুর নয় – হৃদয়ের সেলামত![২৮৮]

হ

হজরত্ > হাদ.রাত্ (حضرة) সম্ভ্রমের পাত্র, পয়গম্বর, অতি সম্মানিত ব্যক্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[২৮৯] তিনবারই 'অতি সম্মানিত ব্যক্তি' অর্থে এসেছে–

দোহাই তোমার আলা হজরত্! মাফ্ কর গোস্তাখি;
কি বলিতে কি যে বলে' ফেলি আমি, বুঝি নাকো, চেয়ে থাকি ।[২৯০]

হাওদা[২৯১] শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৯২] দু'বার 'হাতী বা উটের পিঠে বসার আসন বিশেষ' অর্থে এসেছে–

পাহাড়ের মত উচুঁ হাওদায় বসেছে দম্ভভরে
শাদা মেঘ যেন – সিংহলী হাতী ঘন হুঙ্কার করে ।[২৯৩]

---

২৮৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'সুরু' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৮৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'চোখের দেখা', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬৯
২৮৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০২
২৮৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'সেলাম' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৮৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০০
২৮৮. পাগুক্ত, পৃ. ২০৬
২৮৯. শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপন পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর: বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা
২৯০. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৩
২৯১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হাওদা' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৯২. বেদুঈন: স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব: অগ্রন্থিত কবিতা
২৯৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০৯

হাওয়া[২৯৪] শব্দটি তেরটি কবিতায়[২৯৫] ষোলবার 'বাতাস' অর্থে এসেছে-

গাঙের কূলে মনের ভুলে বসেছিলাম তোমার পাশে,
ওপার হ'তে বাঁশির উদাস সুরখানি কার হাওয়ায় ভাসে;[২৯৬]

হাকিম[২৯৭] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'বিচারক' অর্থে এসেছে-

বক্সীরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ-বেলা কেন?
মরিয়ম আর সখিনা-বাঁদীরে বলে' দেই- থাকে হাজির যেন।[২৯৮]

হাজির[২৯৯] শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩০০] তিনবার 'উপস্থিত' অর্থে এসেছে-

গোলাম হাজির, আনিয়াছি, দেখে লও;
দেখ এই কিনা, বান্দার 'পরে এইবার খুশী হও![৩০১]

হাফিজ[৩০২] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'পারস্য কবি হাফিজ' উদ্দেশ্য-

গীত শেষ হ'ল- সারা হ'ল গাঁথা মোতিমালা!
এস গো হাফিজ! গাও দেখি হেন সুধা- ঢালা-[৩০৩]

হামাম > হ.াম্মাম্ (حمام) স্নানাগার, গোসলখানা ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩০৪] দু'বার 'স্নানাগার' অর্থে এসেছে-

কালো ডানার শ্বেত-মরালী!- স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র- তনুর ডান- বামে![৩০৫]

---

২৯৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হাওয়া' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৯৫. নাদিরশাহের জাগরণ, ইরাণী, শেষ শয্যায় নুরজহান, বেদুঈন: স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর, ঘুঘুর ডাক, বিস্মরণী: বিস্মরণী, প্রেম ও ফুল: স্বরগরল, রূপকথা, বালুকা-বাসর, শ্যালট-বাসিনী: হেমন্ত গোধুলী, শান্ত-খোকা: রূপকথা
২৯৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'বালুকা-বাসর', "হেমন্ত-গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪০৯
২৯৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হাকিম' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৯৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
২৯৯. সত্যেন্দ্রনাধ দত্তের কবিতায় 'হাজির' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩০০. শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব (২বার): অগ্রন্থিত কবিতা
৩০১. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১০
৩০২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হাফিজ' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩০৩. মোহিতলাল মজুমদার,'হাফিজের অনুসরণে', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৩
৩০৪. ইরাণী, শেষ শয্যায় নুরজাহান: স্বপন-পসারী
৩০৫. ইরাণী: স্বপন-পসারী, মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃষ্ঠা-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

হায়াত > হ.য়াহ্ (حياة) জীবন, প্রাণ, আয়ু ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'প্রাণ' অর্থে এসেছে–

বোস্তান আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব **হায়াত্** –
সাপ–শয়তান বুলবুল্ হ'য়ে গায়িছে সারাটি জ্যোৎস্নারাত![৩০৬]

হারাম[৩০৭] শব্দটি একটি কবিতায় তিনবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে–

'নিষিদ্ধ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ভুলিয়াছি ভয়, স্নেহ ভূলিয়াছি, ভূলিয়াছি রাজনীতি;
রমণীর রূপ **হারাম** করেছি, – ফকিরের যেই রীতি[৩০৮]

'অবৈধ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

জল্লাদ আমি নহি যে শুধুই, আমার ও ইমান আছে ।
হালাল **হারাম** দুই যদি এক হইত আমার কাছে,–[৩০৯]

'অপবিত্র' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বুঝেছিস্ নিজে? না-পাক! **হারাম**! – তুই না মুসলমান!–
দারাবে আল্লা সবার বদলে লইয়াছে কোরবান্![৩১০]

হারেম > হ.ারাম্ (حرم) নিষিদ্ধ, পবিত্র, পবিত্রস্থান, অন্তপুর, অন্দর মহল, ক্যাম্পাস ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'পবিত্রস্থান' অর্থে এসেছে–

মসজিদ হোক ঘোড়া-ঘর, আর **হারেম** কসাই-খানা!
আল্লার নাম করে যদি কেউ টুঁটি কেটে কর মানা![৩১১]

হাল > হ.াল (حال) অবস্থা, বর্তমান সময়, আধুনিক, পরিস্থিতি, বিষয়, ক্ষেত্র, অবস্থান ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩১২] দু'বার 'অবস্থা' অর্থে এসেছে–

সেদিন শহরে রাজপথে সেই দেখিয়া দারায় **হাল**
কেঁদেছিল যারা – জানোয়ার যত, কুত্তা-ভেড়ীর পাল!–[৩১৩]

---

৩০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৩০৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হারাম' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩০৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রস্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০৯
৩০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১
৩১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩
৩১১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০৪
৩১২. বেদুঈন: স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব: অগ্রস্থিত কবিতা
৩১৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রস্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬০৯

Dhaka University Institutional Repository

হালাল > হ.ালাল্ (حلال) বৈধ, ইসলাম ধর্মানুসারে বৈধ ও পবিত্র, শুদ্ধ, ন্যায়সঙ্গত ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'বৈধ' অর্থে এসেছে–

জল্লাদ আমি নহি যে শুধুই, আমারও ইমান আছে ।
হালাল হারাম দুই যদি এক হইত আমার কাছে,–[৩১৪]

হাশিশ > হ.াশীশ (حشيش) মদক দ্রব্য বিশেষ, ভাং, শুক্না ঘাস, খড়কুটা, তৃণলতা ক্লান্তিনাশক, শান্তি দায়ক ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'মাদক দ্রব্য বিশেষ' অর্থে এসেছে–

'**হাশিশ**' খাওয়া'য়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল এত দিন–
'জম্‌জম্' জলে ধুয়ে দিল মাথা দিলদার কোন্ জিন![৩১৫]

হিসাব[৩১৬] শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'বিচার-বিবেচনা' অর্থে এসেছে–

তারি নির্দেশে হয়েছিলে তুমি একদিন কবে হঠাৎ বড়–
তুমি বড় নও– নির্বোধ নও! তুমি চিরদিন **হিসাবে** দড় ।[৩১৭]

হুকুম[৩১৮] শব্দটি চারটি কবিতায় পনরবার বিভিন্নার্থে এসেছে–

'আদেশ' অর্থে দু'টি কবিতায়[৩১৯] ছয়বার–

তামিল করেছি **হুকুম** তোমারি – তোমারে করেছি ভয়,
খোদার বান্দা বেইমান বটে, তোমার বান্দা নয় ।[৩২০]

নির্দেশ' অর্থে তিনটি কবিতায়[৩২১] আটবার–

কাল রাতে তার জবাব পেয়েছি, **হুকুম** মিলেছে খোদা-তা'লার!
সকল যাতনা জুড়াইয়া গেছে, অবসান আজ সব জ্বালার![৩২২]

---

৩১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১
৩১৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৩
৩১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হিসাব' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩১৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'বুদ্ধিমান', "হেমন্ত গোধূলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪০২
৩১৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হুকুম' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩১৯. নাদিরশাহের শেষ: স্বপন-পসারী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (৫বার): অগ্রন্থিত কবিতা
৩২০. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১১
৩২১. শেষ শয্যায় নুরজহান (২বার): স্বপন-পসারী, নুরজহান ও জহাঙ্গীর (৪বার): বিস্মরণী, দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব (২বার): অগ্রন্থিত কবিতা
৩২২. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ-শয্যায় নুরজহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

হুজুর[৩২৩] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'মহাশয়' অর্থে এসেছে–

বান্দা হাজির রবে যে হুজুর! এখনো বলনি তুমি,
দারারই মুণ্ড আনিয়াছি কিনা; তার পর মাটি চুমি'[৩২৪]

হুর/হুরী[৩২৫] শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩২৬] দু'বার 'অপ্সরী' অর্থে এসেছে–

রং মহলের হুর-পরী-দলে নামটি দিল সে– নুরমহল!
ষোড়শীর রূপে মজেছিল সে কি? যৌবন শেষ– তবু চপল![৩২৭]

হেজাজ >হি.জাজ (حجاز) সৌদী আরবের নগরী বিশেষ

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

হেজাজ বংশে ভেজাবে না মুখ ঘোলা-কাদা-মাখা 'দেদা'র জলে,
আমাদের উট– দুধে-ভরা-বাঁট, চরে না শুক্‌না কাঁটার দলে! [৩২৮]

---

৩২৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হুজুর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩২৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৬
৩২৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হুর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩২৬. শেষ শয্যায় নুরজহান: স্বপন-পসারী, শরাবখানা: হেমন্ত গোধুলী
৩২৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৮
৩২৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

আ

আউলিয়া[১] শব্দটি চারটি কবিতায়[২] চারবার 'আল্লাহর বন্ধু' অর্থে এসেছে–

লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হ'ল যাহার কাবা দেউলে
কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি' কালি দিল কুলে,[৩]

আকবর[৪] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে এবং ভারতের মুসলিম মোগল সম্রাট মহামতি আকবরকে বুঝানো হয়েছে–

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজীব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শীব![৫]

আকিকা > 'আক়ীক়াহ্ (عقيقة) শিশুর আকিকা, নবজাতকের মঙ্গলার্থে জবাইকৃত বিশেষ পশু। শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

সাতদিন যবে বয়স শিশুর– আরবের প্রথা-মতো
আসিল আকিকা-উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত![৬]

আখের/ আখেরী[৭] শব্দটি চারটি কবিতায়[৮] ছয়বার শেষ অর্থে এসেছে–

উমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহবান নয়–রূপ ধরে এস!– গ্রাসে অন্ধতা-রাহু[৯]

আজব > 'আজব (عجب) বিস্ময়কর, আশ্চর্য, তাজ্জব, অলৌকিক, অদ্ভুত ইত্যাদি।
শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিস্ময়কর' অর্থে এসেছে–

খাইবে পোলাও কোরমা কাবাব!
আয়কি শুনিবি কথা আজব![১০]

---

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আউলিয়া' শব্দ দ্রষ্টব্য
২. ইন্দ্রপতন:চিত্তনামা, আর কত দিন?:নতুন চাঁদ, শাদী মোবারক, নওকাবা: মরু-ভাস্কর
৩. নজরুল ইসলাম, 'আর কত দিন?', "নতুন চাঁদ", আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), খ. ৪, পৃ. ৩৮
৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আকবর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫. নজরুল ইসলাম, 'ইন্দ্রপতন', "চিত্তনামা", আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৬), খ. ১, পৃ. ২৬৮
৬. নজরুল ইসলাম, 'দাদা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৭২
৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আখেরী' শব্দ দ্রষ্টব্য
৮. খালেদ, উমর ফারুক :জিঞ্জীর, সর্বহারা:মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৩বার)
৯. নজরুল ইসলাম, উমর ফারুক :জিঞ্জীর, আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৭), খ. ২, পৃ. ১৮০
১০. নজরুল ইসলাম, 'জীবনে যাহারা বাঁচিল না', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪৩, পৃ. ৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আজান[১১] শব্দটি ষোলটি কবিতায়[১২] পঁচিশবার 'নামাজের জন্য আহ্বান' অর্থে এসেছে–

বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙ্গে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ী-ছেড়া এ কি জানাযায় ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে![১৩]

আজীজ > 'আযীয (عزيز) অতীব সম্মানিত, মহাপরাক্রান্ত, প্রিয় বন্ধু ইত্যাদি ।
শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে। এখানে আজীজ শব্দ দ্বারা খান বাহাদুর আবদুল আজীজ খানকে (১৮৬৭-১৯২৬ খৃ.) বুঝানো হয়েছে। নোয়াখালী জেলার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ, ধর্ম প্রচারক, সমাজকর্মী এবং ইংরেজী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম গ্রাজুয়েট ছিলেন। মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহী করা, এবং তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি বরিশালে সুহৃদ সম্মিলনী নামে একটি প্রতিষ্ঠান এবং নিজের কিছু সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যান। তিনি চট্টগ্রামেই অধিককাল অতিবাহিত করেন। তিনি সাহিত্যিক হাবিবুল্লাহ বাহার ও সামসুন্নাহার মাহ্মুদের নানা। তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। যার ফলে কবি নজরুল তাঁর নামে 'বাংলার আজীজ' কবিতাটি রচনা করেন।[১৪]

ফুরিয়েছে কাজ, ডাকছে তবু হিন্দু-মুসলমান,
সবার "আজীজ" সবার প্রিয়, আবার গাহ গান![১৫]

আতর[১৬] শব্দটি সাতটি কবিতায়[১৭] নয়বার 'সুগন্ধি' অর্থে এসেছে–

উড়ছে আতর, পুড়ছে দেদার, ধুপ-ধুনো গুল্‌গুল্;
বেহেশ্‌তী খত্ পেয়ে সারা দুনিয়াটা মশগু॥[১৮]

আতীক > 'আতীক. (عتيق) স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, সর্বোত্তম, সুপ্রাচীন, মহান ইত্যাদি ।
শব্দটি একটি কবিতায় একবারই এসেছে। এখানে আতিক শব্দ দ্বারা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রা.)-এর দ্বিতীয় স্বামীকে বুঝানো হয়েছে। তার মৃত্যুর পরই খাদিজা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিধবার বেশে রহি' কতকাল করিল খদিজা "আতীক" বীরে,
জীবনের পারে সেও গেল চলি', আসিল শোকের তিমির ঘিরে'।[১৯]

---

১১. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'আজান' শব্দ দ্রষ্টব্য

১২. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের বাশী, মুক্তি, মৌলভী সাহেব, আজান (২বার): সংযোজন, যা শত্রু পরে পরে:ফনি মনসা, নকীব (২বার), খালেদ (২বার), সুবহ্ উম্মেদ, উমর ফারুক (৫বার):জিঞ্জীর, ভোরের সানাই, যৌবন-জল-তরঙ্গ, বাংলার আজিজ (২বার):সন্ধ্যা, নতুন চাঁদ, কেন জাগাইলি তোরা:নতুন চাঁদ, অবতরণিকা (২বার):মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম(১০০)

১৩. নজরুল ইসলাম, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', "বিষের বাশী", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৬৬

১৪. সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৮৬), খ. ১, পৃ. ৪৭২

১৫. নজরুল ইসলাম, 'বাংলার আজীজ', "সন্ধা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫২

১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আতর' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৭. ফুলছড়ি: সংযোজন, ফাল্গুনী: সিন্দু হিন্দোল, নওরোজ, ঈদ মোবারক :জিঞ্জির, অবতরণিকা: মরু-ভাস্কর, শেষ করো ঋণ:শেষ সওগাত, সালাম অস্ত রবি (৩বার):ঝড়

১৮. নজরুল ইসলাম, 'ফুলছড়ি', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৯৫

১৯. নজরুল ইসলাম, 'শাদী মোবারক', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

আদব[২০] শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার শিষ্টাচার অর্থে এসেছে–

শিখেনি ক কভু সভ্যতা কোনো
আদব কায়দা কোন দেশের,
বেহেশ্‌তে যাবে ভরসায় শুধু
তুলিয়া পূণ্য করিল ঢের![২১]

আদম[২২] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২৩] চৌদ্দবার এসেছে এবং প্রতিবারই পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে–

আদিম মানব আদমে সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, "যাও কর খেলা ঐ ধরার আঙ্গনে গিয়া!"[২৪]

আনোয়ার > আন্‌ওয়ার (انوار) উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম, আলোকোজ্জ্বল ইত্যাদি।
এখানে আনোয়ার শব্দ দ্বারা তুরস্কের জাতীয় আন্দোলন ও মুসলিম জাগরণের পুরোধা আনোয়ার পাশাকে বুঝানো হয়েছে। তুর্কী সুলতানাত যখন ধ্বংশের দ্বারপ্রান্তে, তুরস্ক যখন নানামূখী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের শিকার, তখন আনোয়ার পাশা সমমনা তরুণদের নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে তুরস্ককে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ১৯১৩ খৃ. তিনি ইটালীকে হটিয়ে থ্রেস উদ্ধার করেন এবং ১৯১৪ খৃ. সমর সচিব হয়ে দেশকে সামরিক শক্তিতে বলিয়ান করেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে অক্ষ শক্তির মিত্র হিসেবে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রাশিয়া চলে যান। ১৯২১-২২ খৃ. তুর্কীবীর কামাল পাশার ইউরোপ বিরোধী যুদ্ধ ও নব্য তুরস্ক প্রতিষ্ঠা কালে তিনি জীবিত থাকলেও কামাল পাশার আগ্রহ না থাকায় আনোয়ার তাতে অংশ গ্রহণ করেননি।[২৫]

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৬] ছত্রিশবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

ওকে আসে! আনোয়ার ভাই?–
আনোয়ার ভাই! জানোয়ার সব সাফ!
জোর নাচো ভাই! হর্দম দাও লাফ
আজ জানোয়ার সব সাফ![২৭]

---

২০. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'আদব' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১. নজরুল ইসলাম, 'জীবনে যাহারা বাচিল না', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৭
২২. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'আদম' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৩. মানুষ, পাপ : সাম্যবাদী, বিংশ শতাব্দী: প্রলয়-শিখা, অনাগত (৭বার), নওকাবা: মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ওমর খৈয়াম (২বার)
২৪. নজরুল ইসলাম, 'অনাগত', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৫৮
২৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, পৃ. ২৬৮-২৭২
২৬. কামাল পাশা (২বার), আনোয়ার (৩৬বার) : অগ্নি-বীণা
২৭. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আবীর[২৮] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২৯] পাঁচবার 'সুগন্ধি' অর্থে এসেছে–

কর লালে-লাল কালার কালো
আবীর আমির টিটকিরিতে ॥[৩০]

আমামা > 'আমামাহ্ (عمامة) পাগড়ী, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩১] পাঁচবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর "শির দেগা নেহী দেগা আমামা!"[৩২]

আমিন > আমীন (امين) বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, নিরাপদ, কবুল করা, সচিব, সেক্রেটারী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তত্ত্বাবধায়ক, জমি জরিপকারী, কর্মচারী বিশেষ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায় আঠারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'বিশ্বাসী' অর্থে চারটি কবিতায়[৩৩] সতেরবার এসেছে। আল-আমীন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর উপাধী; বস্তুতঃ নবুয়তের পূর্বে মক্কার কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে 'আল্-আমীন' তথা বিশ্বাসী বলেই ডাকতো।

'বিশ্বাসী' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

সুন্দর এই মিমাংসা তব, আমীন, হেজাজে ধন্য–!
তুমি রাখ এই পাথর একাই, ছুঁইবেনা কেহ অন্য![৩৪]

'কবুল করা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

কোরবাণীর আজ এই যে খুন,
শিখা হয়ে যেন জ্বালে আগুন,
জালিমের যেন রাখেনা চিন্ ॥
আমিন্ রাব্বিল্ আলামিন![৩৫]

আমীর[৩৬] শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩৭] চারবার 'রাজা-বাদশাহ্' অর্থে এসেছে–

পামীর ছাড়িয়া আমীর আজিকে
পথের ধুলায় খোঁজে মনি!

---

২৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আবীর' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৯. হোলী, বেশরম: পুবের হাওয়া, বাসন্তী, ফাল্গুণী: সিন্ধু-হিন্দোল, অবতরণিকা: মরু-ভাস্কর
৩০. নজরুল ইসলাম, 'হোলী', "পুবের হাওয়া", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২২৬
৩১. রণভেরী, মোহর্‌রম (২বার): অগ্নি-বীণা, খালেদ (২বার): জিঞ্জির
৩২. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৯
৩৩. শাদী মোবারক (৩বার), খদিজা (৯বার), নওকাবা (৫বার): মরু-ভাস্কর, শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান
৩৪. নজরুল ইসলাম, 'নওকাবা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১৯
৩৫. শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৬
৩৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আমীর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৭. সুবহ্ উম্মেদ, আমানুল্লাহ্: জিঞ্জির, মোহর্‌রম (২বার): শেষ সওগাত

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়েছে মরা মরু-সাগরে রে
আব্-হায়াতের প্রাণ-খণি![৩৮]

আম্বিয়া > আম্বিয়া (انبياء) নবী, পয়গাম্বর, প্রেরিত পুরুষ, আল্লাহর বাণী বাহক, ভবিষ্যত বক্তা ইত্যাদি। এটি নবী শব্দের বহুবচন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সুমহান বাণী মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য যুগে যুগে তাঁর অনেক প্রিয় বান্দাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যারা শুধুমাত্র তৌহিদের দাওয়াত দিত এবং মানুষদিগকে সৎ পথের সন্ধান দিত।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩৯] দু'বার 'আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ' বা 'নবী' অর্থে এসেছে–

সকল কালের সকল গ্রন্থ, কেতাব, যোগী ও ধ্যানী,
মুনি, ঋষি, আওলিয়া, আম্বিয়া দরবেশ মহাজ্ঞানী[৪০]

আরব[৪১] শব্দটি আঠারটি কবিতায়[৪২] ষাটবার 'আরব জাতি' অর্থে এসেছে–

আরবের প্রাণ আরবের গান, ভাষা আর বাণী হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্বদাই।[৪৩]

আরশ > 'আরশ্ (عرش) সিংহাসন, ছাদ, মাচা, শক্তি, গোত্র ইত্যাদি।

শব্দটি দশটি কবিতায়[৪৪] দশবার 'আল্লাহর সিংহাসন' অর্থে এসেছে–

আরশে থাকিয়া হাসিলেন খোদা– নিখিলের শুভ মাগি'–
আসিল যে মহা-মানব– যাচিছে কল্যাণ তারি লাগি'![৪৫]

আরিফ > 'আরিফ (عارف) জ্ঞানী, দক্ষ কর্মী, বিশিষ্ট ব্যক্তি ইত্যাদি।

এটি একটি পেশাগত পদবী। আরব দেশে সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর এবং তাঁর সমকালে কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যতঃ আরিফদের অস্তিত্ব ছিল। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর শাসনামলে এ পদবী অনুমোদন করেননি। মদিনার খলিফাগণ এবং উমাইয়্যা শাসনামলে সংশ্লিষ্ট গোত্র হতে মনোনীত আরিফগণ বিভিন্ন গোত্র হতে রাজস্ব আদায় করে খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তাদের নিকট জমা দিত। কাদিসিয়্যাহ যুদ্ধের পর কুফার সৈন্যবাহিনীকে অনেকগুলো ইউনিটে বিভক্ত করে

---

৩৮. নজরুল ইসলাম, 'সুবহ্ উম্মেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫১
৩৯. শাদী মোবারক, নওকাবা : মরু- ভাস্কর
৪০. নজরুল ইসলাম, 'নওকাবা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১৯
৪১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আরব' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪২. বার্ষিক সওগাত, খালেদ (৩বার), সুবহ উম্মেদ (৪বার), অগ্রপথিক, উমর ফারুক (২বার) : জিঞ্জির, বিংশ শতাব্দী: প্রলয় শিখা, অবতরণিকা (৪বার), অনাগত (৯বার), দাদা (২বার), পরভৃত (৫বার), সর্বহারা, কৈশোর (৫বার), সত্যগ্রাহী মোহাম্মদ (৯বার), শাদী মোবারক (৪বার), খদিজা (২বার), খদিজা (৫বার) : মরু-ভাস্কর, মোহররম: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
৪৩. নজরুল ইসলাম, 'পরভৃত', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪৩, পৃ. ৭৫
৪৪. বিদ্রোহী, কোরবাণী, মোহররম: অগিনবীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম, উমর ফারুক: জিঞ্জির, তকভীর: আমপারা, দাদা, শাদী মোবারক, সম্প্রদান: মরু-ভাস্কর, আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও: শেষ সওগাত
৪৫. নজরুল ইসলাম, 'দাদা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

একজন আরিফের অধিনে একটি দল (عرافة) ন্যস্ত করা হয়। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী আরিফের সামরিক পদ বহাল ছিল। বর্তমানে ইরাক ও সিরিয়ায় একজন আরিফ দশজন সৈন্যের নেতৃত্ব দেন।[৪৬]

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'জ্ঞানী' অর্থে এসেছে–

কোথা সে **আরিফ**, কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিধর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভূবন থরথর![৪৭]

আল্লা[৪৮] শব্দটি ষাটটি কবিতায়[৪৯] একশত উননব্বইবার আল্লাহর ইসমে জাত 'আল্লা' অর্থে এসেছে–

কতজন ছিল সেনা তাহাদের? অস্ত্র কি ছিল হাতে?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক **আল্লা**তে![৫০]

আলম > 'আলম (عالم) জগৎ, বিশ্ব, পৃথিবী, দুনিয়া ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'জগৎ' অর্থে এসেছে–

হাজার মাসের চেয়েও বেশী কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেস্তা আর জিব্রাঈল **আলমের**[৫১]

আলেম[৫২] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিদ্বান' অর্থে এসেছে–

এই গোষ্ঠীর মাঝে থাকি' শিশু লভিল ভাষার যে সম্পদ,
ভাবিত নিরক্ষর নবী ঘরে সকলে '**আলেম**' মোহাম্মদ।[৫৩]

---

৪৬. সম্পাদক, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইফাবা প্রকাশনী, ১৯৮৬), খ. ২, পৃ. ৫৬৬
৪৭. নজরুল ইসলাম, 'আজাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৬
৪৮. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'আল্লা' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৯. জাগরণী, শহিদী ঈদ (৫বার): ভাঙ্গার গান, দীওয়ান-ই-হাফিজ (২বার), আনন্দ ময়ীর আগমনেঃ সংযোজন, যা শত্র পরে পরেঃ কামাল পাশা (২বার), রণভেরী, কোরবাণী, মোহররমঃ অগ্নিবাণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম, বন্দনা গান, বিদ্রোহীর বাণীঃ বিষের বাশী, ফণি- মনসা, খালেদ (২বার), সুবৃহ উম্মেদ, উমর ফারুক (২বার): জিঞ্জির, সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, সুরা নসর, সুরও হুমাজাত, সুরা তাকাসুর, সুরা বাইয়্যেনাহ্ (৩বার), সুরা তীন, সুরা শাম্‌স (২বার), সুরা গাশিয়া, সুরা 'আলা, সুরা বুরুজ (২বার), সুরা ইনশিকাক, সুরা তাৎফিক (২বার), সুরা আবাসা (২বার), সুরা নাজেয়াতঃ আমপারা, নতুন চাঁদ (৬বার), মোবারকবাদ (১১বার), কৃষকের ঈদ (২বার), আজাদ (৫বার), ঈদের চাঁদ (৫বার): নতুন চাঁদ, অনাগত, কৈশোর (২বার), সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, নওকাবা (৩বার): মরু- ভাস্কর, কেন আপনারে হানি হেলা?, বন্ধুরা এসো ফিরে, নিত্য প্রবল হও (১১বার), ভয় কবিওনা হে মানবাত্মা (৬বার), হুল ও ফুল (২বার), নবযুগ (৭বার),শোধ করো ঋণ (৩বার), মোহররম (৫বার), বিশ্বাস ও আশা (৩বার), ডুবিবেনা আশা তরী (১০বার), বকরীদ (১১বার), আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও (৬বার), একি আল্লার কৃপা নয় (১৪বার), মহাত্মা মোহসিন (২বার), মোহসিন স্মরণে (৪বার), এক আল্লাহ জিন্দাবাদ (১১বার), বোমার ভয়, টাকাওয়ালা (৩বার): শেষ সওগাত, সালাম অস্ত রবি (৪বার), কবির প্রশস্তি (৩বার): ঝড়
৫০. নজরুল ইসলাম, 'নিত্য প্রবল হও', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২১৩
৫১. নজরুল ইসলাম, 'সুরা কদর', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০), খ. ৩, পৃ. ২৯৯
৫২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'আলিম' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫৩. নজরুল ইসলাম, 'পরভৃত', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ > আশরাফ্ (اشرف) উচ্চ বংশীয়, ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৪] দু'বার 'উচ্চ বংশীয়' অর্থে এসেছে–

ইস্‌লামে নাই ছোট বড় আর
আশরাফ আত্‌রাফ;
এই ভেদ-জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
করো মিসমার সাফ্![৫৫]

আশেক/ আশিক[৫৬] শব্দটি সাতটি কবিতায়[৫৭] আটবার 'প্রেমিক' অর্থে এসেছে–

বিরান মুলুক ইরান ও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যজিয়া নিদ ।
মাশুকের বাহু ছাড়ায়ে আশিক
কছম করিছে হবে শহীদ![৫৮]

আহদ > আহ.াদ (احد) এক, একক, জনৈক, একটি, কেহ্ ইত্যাদি । এটি আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম । হযরত বেলাল (রা.) ইসলামগ্রহণের দায়ে তাঁর মুনীব কর্তৃক সীমাহীন নির্যাতনের মুখেও 'আহাদ' 'আহাদ' বলে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'এক' অর্থে এসেছে–

ঘোষিল ওহদ, "আল্লা আহদ!"
ফুকারে তুর্য তুর পাহাড় ।
মন্দ্রে বিশ্ব – রন্দ্রে – রন্দ্রে
মন্ত্র আল্লা-হু-আক্‌বার![৫৯]

ই

ইজ্জত[৬০] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'মান-সম্মান' অর্থে এসেছে–

চাহি না ক গাভী দুম্বা উট
কত টুকু দান? ও দান ঝুট ।
চাই কোরবাণী চাই না দান ।

---

৫৪. টাকাওয়ালাঃ শেষ সওগাত, ঘোষণাঃ ঝড়
৫৫. নজরুল ইসলাম, 'ঘোষণা', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৯
৫৬. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'আশিক' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫৭. বাদল প্রাতের শরাব, মানিনী, সোহাগঃ পূবের হাওয়া, দিওয়ান-ই-হাফিজঃ সংযোজন, সুবহ উম্মেদ (২বার), নওরোজঃ জিঞ্জির, প্রিয়ার দেওয়া শরাবঃ সংযোজন
৫৮. নজরুল ইসলাম, 'সুবহ উম্মেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫২
৫৯. প্রাগুক্ত
৬০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ইজ্জত' শব্দ দ্রষ্টব্য

রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শর চাই তোর, তোর ছেলের,
দেবে কি? কে আছ মুসলমান?[৬১]

ইনসাফ[৬২] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'ন্যায় বিচার' অর্থে এসেছে-

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ![৬৩]

ইবলিস > ইবলীস (ابليس) শয়তান, শয়তানের নাম বিশেষ। তার প্রকৃত নাম আজাজীল। হযরত আদম (আঃ) কে সেজদাহ্ করার আল্লাহর নির্দেশটি অমান্য করার কারণে তাকে অভিসম্পাত দেয়া হয়। এরপর থেকেই সে عدو الله বা আল্লাহর শত্রু হিসেবে বিবেচিত।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

'সাবে ঈন্
তাবে ঈন্
হ'য়ে চিল্লায় জোরে "ওই ওই নাবে দ্বীন"
ভয়ে ভুমি চুমে 'লাত মানাত' -এর ওয়ারেশীন।
রোয়ে 'ওজ্জা হোবল্' ইবলিস খারেজিন, -
কাঁপে জীন![৬৪]

ইমান[৬৫] শব্দটি তিনটি কবিতায়[৬৬] ছয়বার 'বিশ্বাস' অর্থে এসেছে-

শয়তান তা'রে শেষ করিয়াছে, ইমান লয়েছে কেড়ে',
পরাণ গিয়াছে মৃত্যু পুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে'![৬৭]

ইমাম > ইমাম্ (امام) নেতা, প্রধান, সরদার, যিনি নামাজে নেতৃত্ব দেন, ধর্মীয় নেতা ইত্যাদি।

শব্দটি ছয়টি কবিতায় দশবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে ঃ

'নেতা' অর্থে চারটি কবিতায়[৬৮] পাঁচবার-

যেন দলে দলে কলের পুতুল শক্তি শৌর্যহীন,
নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে- ইহারা মুসলেমীন![৬৯]

---

৬১. নজরুল ইসলাম, 'শহিদী ঈদ', "ভাঙ্গার গান", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫৩
৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ইনসাফ' শব্দ দ্রষ্টব্য
৬৩. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২ও, পৃ. ১৮১
৬৪. নজরুল ইসলাম, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', "বিষের বাশী", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৬২-৩
৬৫. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'ইমান' শব্দ দ্রষ্টব্য
৬৬. মোবারকবাদ, কৃষকের ঈদ (৪বার): নতুন চাঁদ, বিশ্বাস ও আশা: শেষ সওগাত
৬৭. নজরুল ইসলাম, 'বিশ্বাস ও আশা', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৪২
৬৮. আজাদ (২বার) ঈদের চাঁদ: নতুন চাঁদ, নিত্য প্রবল হও, মোহররম: শেষ সওগাত
৬৯. নজরুল ইসলাম, 'আজাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

'নামাজে নেতৃত্বদানকারী' অর্থে দু'টি কবিতায়[৭০] পাঁচবার–

কোথায় ইমাম? কোন্ সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে?
চারি দিকে তব মুর্দার লাশ, তারি মাঝে চোখে বিঁধে[৭১]

ইমারাত > 'ইমারাহ্ (عمارة) আবাদী, পাকা বাসগৃহ, অট্টালিকা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'পাকা বাসগৃহ' অর্থে এসেছে–

ধন্না দিইনি টাকাওয়ালাদের পাকা ইমারতে কভু,
আল্লাহ ছাড়া কারেও কখনো বলিনি হুজুর প্রভু![৭২]

ইশারা[৭৩] শব্দটি ছয়টি কবিতায় ছয়বার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে ঃ

'নির্দেশ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ভাবিবে – খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি'
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি![৭৪]

'ইঙ্গিত' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[৭৫] পাঁচবার–

কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমার ডাক্‌ছ ইশারায়!......[৭৬]

ইসলাম[৭৭] শব্দটি ষোলটি কবিতায়[৭৮] পঁয়তাল্লিশবার 'ইসলাম ধর্ম' অর্থে এসেছে–

হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তা'রা অসত্য সাথে রণ।[৭৯]

ইয়াকুত > ইয়াকূ.ত. (ياقوت) নীলকান্ত মণি, বহু মূল্যবান প্রস্তর খণ্ড ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বহু মূল্যবান পাথর' অর্থে এসেছে–

কইল গোলাপ "মুখে আমার 'ইয়াকুত' মণি, রং সোনার,
গুলবাগিচার মিসর দেশে য়ুসোপ আমি রূপকুমার।"[৮০]

---

৭০. কৃষকের ঈদ (৪বার), আজাদঃ নতুন চাঁদ
৭১. নজরুল ইসলাম, 'কৃষকের ঈদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৩
৭২. টাকাওয়ালাঃ শেষ সওগাত, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৯
৭৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ইশারাহ' শব্দ দ্রষ্টব্য
৭৪. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৫
৭৫. চির-চেনাঃ ছায়ানট, সর্বহারাঃ সর্বহারা, সত্য-কবিঃ ফণি-মনষা, এ মোর অহংকারঃ জিঞ্জির, জীবনঃ সন্ধ্যা
৭৬. নজরুল ইসলাম, 'এ মোর অহংকার', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৯
৭৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ইসরাম' শব্দ দ্রষ্টব্য
৭৮. আনোয়ার, রণভেরী, মোহররমঃ অগ্নি-বীণা, শহিদী ঈদ (৯বার): ছায়ানট, আজানঃ সংযোজন, মিসেস এম রহমান, খালেদ (৫বার), সুবৃহ উম্মেদ (৩বার), ঈদ মোবারক (৪বার), উমর ফারুক (৭বার): জিঞ্জির, রীফ সর্দার (২বার), বাংলার আজিজঃ সন্ধ্যা, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ (২বার): মরু-ভাস্কর, নিত্য প্রবল হও, মোহররম (৫বার): শেষ সওগাত, ঘোষণাঃ ঝড়
৭৯. নজরুল ইসলাম, 'নিত্য প্রবল হও', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪৩, পৃ. ২১৪
৮০. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৫৬)", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩২৪

ঈ

ঈদ[৮১] শব্দটি বিশটি কবিতায়[৮২] তেত্রিশবার মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব 'ঈদ মোবারক'কে বুঝানো হয়েছে–

আজ আল্লার নামে জান্ কোরবাণে ঈদের পুত বোধন ।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন![৮৩]

ঈমান[৮৪] শব্দটি আটটি কবিতায়[৮৫] আটবার ইসলামী পরিভাষা হিসেবে 'ঈমান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

ঈমান আনিয়াছিল আল্লার প্রতি,
অনন্ত – প্রতাপ যিনি মহিয়ান অতি ।[৮৬]

উ

উকিল[৮৭] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিয়ের উকিল' অর্থে এসেছে–

এই না শুনে কূজন ধরে অহম কালো কোকিল,
চুম্বনেরি 'ফি' দিয়ে তাঁয় কইলে, "সাবাস উকিল!"[৮৮]

উজির[৮৯] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'মন্ত্রী' অর্থে এসেছে–

শা'জাদা উজির, নওয়াব-জাদারা– রূপ-কুমার
এই মেলার খরিদ্‌-দার ।[৯০]

উম্মত্ > উম্মাহ্ (أمة) অনুসারী, শিষ্য, জাতি ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'রাসূলের অনুসারী' অর্থে এসেছে–

আল্লা! এরাও মুসলিম, এরা রাসুলের উম্মত্,
কেন পায়নি ক প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহমত্?[৯১]

---

৮১. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'ঈদ' শব্দ দ্রষ্টব্য

৮২. কোরবাণী : অগ্নি-বীণা, শহিদী ঈদ (২বার): ভাঙ্গার গান, সুব্‌হ উম্মেদ, ঈদ মোবারক, আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়, এ মোর অহংকারঃ জিঞ্জির, চল্ চল্ চল্, রীফ সর্দারঃ সন্ধ্যা, শাখ-ই-নবাত, মোবারকবাদঃঝড়, কেন জাগাইলি তোরা, কৃষকের ঈদ (৭বার), ঈদের চাঁদ (৫বার): নতুন চাঁদ, অবতরণিকা, অনাগত, সম্প্রদানঃ মরু-ভাস্কর, নিত্য প্রবল হও, বকরীদ (৩বার), এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদঃ শেষ-সওগাত

৮৩. নজরুল ইসলাম, 'কোরবাণী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৭

৮৪. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'ঈমান' শব্দ দ্রষ্টব্য

৮৫. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাঁশী, চাষীর গানঃ সংযোজন, সুরা বাইয়্যেনাহ্, সুরা তীন, সুরা বালাদ, সুরা বুরুজ, সুরা ইনশিকাক, সুরা তাৎফিকঃ আমপারা

৮৬. নজরুল ইসলাম, 'সুরা বুরুজ', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩১৩

৮৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'উকিল' শব্দ দ্রষ্টব্য

৮৮. নজরুল ইসলাম, 'কালোর উকিল', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৯৬

৮৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'উজির' শব্দ দ্রষ্টব্য

৯০. নজরুল ইসলাম, 'নওরোজ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫৬

৯১. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

উম্মি > উম্মী (امي) নিরক্ষর, অজ্ঞ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'নিরক্ষর' অর্থে এসেছে-

সেই সে পূর্ণ মুসলমান সে পূর্ণ শক্তি-ধর,
'উম্মি' হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর![৯২]

এ

এফতার > ইফ্.তার (افطار) রোজা ভঙ্গ করা, প্রাতঃরাশ করা, ইফতার করা ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৯৩] তিনবার 'রোজা ভঙ্গ করা' অর্থে এসেছে-

রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু সলিলে হায়,
বেলাল! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায়![৯৪]

এলহান > ইলহ.ান (الحان) সুর, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সুর' অর্থে এসেছে-

কাবুল লইল নতুন দীক্ষা
কবুল করিল আপনা জান্ ।
পাহাড়ী তরুর শুকনা শাখায়
গাহে বুলবুল খোশ **এলহান**![৯৫]

ও

ওক্ত > ওয়াক্.ত (وقت) সময়, ক্ষণ, কাল, মেয়াদ, মুহূর্ত ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৯৬] তিনবার 'সময়' অর্থে এসেছে-

যে তরবারির পূণ্যে আবার সত্যেরে তোরা দানিবি তখ্ত্
ছুঁচো মেরে তার খোয়াস্নে মান, ফুরায়ে এসেছে ওদের ওক্ত্![৯৭]

ওজন[৯৮] শব্দটি তিনটি কবিতায়[৯৯] চারবার 'পরিমাপ' অর্থে এসেছে-

সত্য লইয়া করিছে ওজন কে উনি মুদীর মত?
মনে মনে ভাবে কি কাজই করিনু আমি সে বিজ্ঞ কত![১০০]

---

৯২. নজরুল ইসলাম, 'আজাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৭
৯৩. নতুন চাঁদ, কেন জাগাইলি তোরা, কৃষকের ঈদ (২বার):নতুন চাঁদ
৯৪. নজরুল ইসলাম, 'কৃষকের ঈদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪২
৯৫. নজরুল ইসলাম, 'সুবৃহ উম্মেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫৭
৯৬. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাঁশী, বাদল প্রাতের শরাবঃ পূবের হাওয়া, যৌবন জল তরঙ্গঃ সন্ধ্যা
৯৭. নজরুল ইসলাম, 'যৌবন জল তরঙ্গ', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৪৫
৯৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ওজন' শব্দ দ্রষ্টব্য
৯৯. মিথ্যাবাদীঃ সাম্যবাদী, নওরোজঃ জিঞ্জির, সুরা তাৎফিক (২বার): আমপারা
১০০. নজরুল ইসলাম, 'মিথ্যাবাদী', "সাম্যবাদী", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

ওজু > ওয়াদূ. (وضو) অজু, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১০১] দু'বার 'অজু' অর্থে এসেছে–

আব-জমজম উথলি' উঠিছে তোমার ওজুর তরে,
সারা ইসলাম বিনা ইমামেতে আজিকে নামাজ পড়ে![১০২]

ওফাৎ > ওয়াফাত্ (وفات) মৃত্যু, ইন্তেকাল, পরলোকগমন, তিরোধান ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

শহীদ হয়েছ? ওফাৎ হয়েছে? ঝুটবাৎ! আলবৎ!
খালেদের জান কব্জ্ করিবে ঐ মালেকুল- মৌৎ?[১০৩]

ওলি > ওয়ালী (ولي) বন্ধু, অভিভাবক, আল্লার প্রিয় বান্দা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'আল্লার প্রিয় বান্দা' অর্থে এসেছে–

কোনো "ওলি" কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গাম্বর,
অন্য ধর্মে দেয়নি ক গালি, – কে রাখে তার খবর?[১০৪]

ওহী > অহ়ী (وحي) ঐশীবাণী, প্রত্যাদেশ, বার্তা, অনুপ্রেরণা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ঐশীবাণী' অর্থে এসেছে–

পাওনি ক "ওহি" হওনি ক নবী, তাই ত পরাণ ভরি'
বন্ধু ডাকিয়া আপনার বলি' বক্ষে জড়ায়ে ধরি![১০৫]

ওয়ারেশীন > ওয়ারেছ়ীন (وارثين) বংশধর, উত্তরসূরী, ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

সাবে ঈন
তাবে ঈন
হ'য়ে চিল্লায় জোর "ওই ওই নাবে দ্বীন"
ভয়ে ভূমি চুমে 'লাত্ মানাত্'– এর ওয়ারেশীন ।[১০৬]

---

১০১. বাদল প্রাতের শরাব: পূবের হাওয়া, খালেদ: জিঞ্জির
১০২. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৬
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
১০৪. নজরুল ইসলাম, 'গোঁড়ামী ধর্ম নয়', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৬২
১০৫. নজরুল ইসলাম, ওমর ফারুক: জিঞ্জির, নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৩
১০৬. নজরুল ইসলাম, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', "বিষের বাঁশী", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

ক

কওসর[১০৭] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[১০৮] ছয়বার 'বেহেশ্‌তের সুপেয় পানি' অর্থে এসেছে–

আল্লাহ্‌ – আকবার! আল্লাহ্‌ – আকবার!
আল্লার কাছ থেকে এল আজ রহমত **কওসর**।[১০৯]

বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর?
বেহেশ্‌ত হতে তকবীর ধ্বনি, আল্লাহ্‌ আকবার![১১০]

কদম > ক.দম (قدم) পা, পদক্ষেপ, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায় চব্বিশবার 'পা' ও 'পদক্ষেপ' অর্থে এসেছে;

'পা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ইমামতি তুমি করিবে না জানি, তুমি গাজী মহাবীর,
দিন-দুনিয়ার শহীদ নোয়ায় তোমার **কদমে** শির![১১১]

'পদক্ষেপ' অর্থে একটি কবিতায় তেইশবার–

কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল!
অগ্রপথিক রে সেনাদল,
জোর **কদম** চল্‌ রে চল্‌॥[১১২]

কদর[১১৩] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'মর্যাদা' অর্থে এসেছে–

হাজার মাসের চেয়েও বেশী **কদর** এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশ্‌তা আর জিব্রাইল আলমের[১১৪]

কব্‌জ > ক.বদাহ (قبضة) দখল, ধারণ, বদ্ধতা, আটককরণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, জান কবজাকরণ, পাকড়াও ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় তিনবার 'জান কবজ করা' অর্থে এসেছে–

বেছে বেছে ঐ "সঙ্গ-দিল্‌" দের **কব্‌জ্‌** করেনি জান?
মালেকুল-মৌত্‌ সেদিনো মেনেছে বাদশাহী ফরমান!–[১১৫]

---

১০৭. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'কওসর' শব্দ দ্রষ্টব্য

১০৮. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (২বার): বিষের বাঁশী, শরাবান তহুরা: পূবের হাওয়া, বকরীদ: শেষ সওগাত, কবির প্রশস্তী: ঝড়, আজাদ: নতুন চাঁদ

১০৯. নজরুল ইসলাম, 'কবির প্রশস্তী', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৫

১১০. নজরুল ইসলাম, 'আজাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৯

১১১. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৬

১১২. নজরুল ইসলাম, 'অগ্রপথিক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬২

১১৩. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'কদর' শব্দ দ্রষ্টব্য

১১৪. নজরুল ইসলাম, 'সুরা কদর', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৯৯

১১৫. নজরুল ইসলাম, খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

কবর[১১৬] শব্দটি চৌদ্দটি কবিতায়[১১৭] আঠারবার 'সমাধী' অর্থে এসেছে–

নতুন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিসরের মমি,
শ্রদ্ধার আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি'![১১৮]

কবুল > ক.বূল্ (قبول) কবুল, গ্রহণ, অনুমোদন, স্বীকৃতি, সম্মতি ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১১৯] তিনবার 'গ্রহণ' অর্থে এসেছে–

কহে পুরোহিত "আমাদের এই আঙিনায় গির্জায়,
পড়িলে নামাজ হবে না কবুল আল্লার দরগায়?"[১২০]

কলম[১২১] শব্দটি দু'টি কবিতায়[১২২] চারবার 'লিখনি' অর্থে এসেছে–

বসিবে কখন্ জ্ঞানের তখ্‌তে বাঙলার মুসলিম!
বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু "মিম্"।[১২৩]

কলেমা > কালিমাহ্ (كلمة) শব্দ, কথা, বাণী, উক্তি, ভাষণ, ইসলামের মূল বাণী তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১২৪] তিনবার 'ইসলামের মূল বাণী তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে–

নামাজ পড়িয়া রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে
কেন হ'তেছিস দলে দলে তোরা কতল-গাহেতে জবেহ্?[১২৫]

কসম[১২৬] শব্দটি তিনটি কবিতায়[১২৭] তিনবারই 'শপথ' অর্থে এসেছে–

মসজিদের ঐ পথে ছুটি প্রায়ই আমি ব্যাকুল প্রাণ,
নামাজ পড়তে নয় তা বলে, খোদার কসম! সত্যি মান।[১২৮]

---

১১৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কবর' শব্দ দ্রষ্টব্য

১১৭. যুগান্তরের গানঃ বিষের বাঁশী, অবেলার ডাকঃ দোলন চাঁপা, শহিদী ঈদঃ ভাঙ্গার গান, চিরঞ্জিব জগলুলঃ জিঞ্জির, শীতের সিন্ধুঃ চক্রবাক, যৌবন জল তরঙ্গঃ সন্ধ্যা, রুবাইয়াৎ- ই-হাফিজ, সুরা আদিয়াতঃ আমপারা, অভয় সুন্দর (২বার), উঠরে চাষীঃ নতুন চাঁদ, সর্বহারা (৪বার): মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, জীবনে যাহারা বাঁচিল না, শাখ-ই-নবাতঃ ঝড়

১১৮. নজরুল ইসলাম, 'চিরঞ্জিব জগলুল', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৭৪

১১৯. সুব্‌হ্ উম্মেদ, উমর ফারুকঃ জিঞ্জির, আর কত দিন?ঃ শেষ সওগাত

১২০. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৫

১২১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কলম' শব্দ দ্রষ্টব্য

১২২. মিসেস এম রহমানঃ জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৩বার)

১২৩. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪০

১২৪. চাষীর গীতঃ সংযোজন, আজাদ (২বার): নতুন চাঁদ

১২৫. নজরুল ইসলাম, 'আজাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৬

১২৬. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'কসম' শব্দ দ্রষ্টব্য

১২৭. দীওয়ান-ই-হাফিজ; সংযোজন, সুব্‌হ্ উম্মেদঃ জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১২০)

১২৮. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১২০)": নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩১৬

কয়েদ[১২৯] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বন্দি' অর্থে এসেছে–

কাঠ-মোল্লার মৌলবীর
যুজদানে ইসলাম কয়েদ,
আজও ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরি তরে মোজাদ্দেদ?[১৩০]

কানুন > কানূন[১৩১] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বিধি-বিধান' অর্থে এসেছে–

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃংখল![১৩২]

কাফন[১৩৩] শব্দটি চারটি কবিতায়[১৩৪] পাঁচবার 'মৃত ব্যক্তির আচ্ছাদন' অর্থে এসেছে–

মাতৃ-স্তন্য পায়নি সে, তাই দিয়াছে মৃত্যু-স্তন্য তায়,
কাফন কেনার পয়সা নাই, কি পরায়ে গোরে দিব বাছায়?[১৩৫]

কাফের[১৩৬] শব্দটি পনেরটি কবিতায়[১৩৭] বিশবার 'আল্লাহতে অবিশ্বাসী' অর্থে এসেছে–

মেষ সম যারা ছিল এতদিন
শের হ'ল আজ সেই মেসের!
এ-মেষের দেশ মেষই রহিল
কাফ্রির অধম এরা **কাফের**![১৩৮]

কাফেলা > ক.াফিলাহ্ (قافلة) যাত্রীদল।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৩৯] তিনবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মোরা যে ভুলেছি, ভুলিও বীর,
নাই স্বরণের সে অধিকার,

---

১২৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কয়েদ' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৩০. নজরুল ইসলাম, 'রীফ সর্দার', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৪৯

১৩১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কানুন' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৩২. নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৮

১৩৩. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'কাফন' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৩৪. সত্যেন্দ্র প্রয়াণঃ ফণি-মনসা, খালেদ (২বার): জিঞ্জির, সাজিয়াচি বর মৃত্যুর উৎসবেঃ চক্রবাক, কেন আপনারে হানি হেলাঃ শেষ-সওগাত

১৩৫. নজরুল ইসলাম, 'কেন আপনারে হানি হেলা', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২০৫

১৩৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কাফের' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৩৭. মানিনীঃ পূবের হাওয়া, দুঃশাসনের রক্ত পান, শহিদী ঈদঃ ভাঙ্গার গান, আমার কৈফিয়ৎ (২বার): সর্বহারা, পথের দিশা, হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধঃ ফণি-মনসা, সুবহ্ উম্মেদ, আয় বেহেশতে কে যাবি আয়, আমানুল্লাহঃ জিঞ্জির, যৌবন-জল-তরঙ্গঃ সন্ধ্যা, সুরা নাবাঃ আমপারা, আজাদ (২বার): নতুন চাঁদ, হুল ও ফুলঃ শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৪বার), জীবনে যাহারা বাঁচিল নাঃ ঝড়

১৩৮. নজরুল ইসলাম, 'সুবহ্ উম্মেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫৪

১৩৯. মিসেস এম রহমানঃ জিঞ্জির, রীফ-সর্দারঃ সন্ধ্যা, খদিজাঃ মরু-ভাস্কর

Dhaka University Institutional Repository

কাঁদিছে কাফেলা কারবালায়,
কে গাহিবে গান বন্দনার![১৪০]

কালাম > কালাম্ (كلام) কথা, বাক্য, বাণী, মন্তব্য, উক্তি, আলাপ, আল্লার কালাম ইত্যাদি ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[১৪১] পাঁচবার 'বাণী' অর্থে এসেছে–

ফেলবে চিনে', মারবে প্রাণে, খোদার কালাম করবে রদ ।"
তালিব শুনে' কাঁপ্‌ল ভয়ে, হাসল শুনে' মোহাম্মদ ।[১৪২]

কায়েম[১৪৩] শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৪৪] তিনবার 'প্রতিষ্ঠিত' অর্থে এসেছে–

আল্লার নামে শপথ করিল হাজির সবে–
সন্ধির সব শর্ত এবার কায়েম র'বে ।[১৪৫]

কাৎরা > ক.াত্.রা (قطرة).ফোটা, বিন্দু ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

ধুঁকে ম'লো, আহা, তবু পানি এক কাৎরা
দেয় নি রে বাছাদের মুখে কম্‌জাতরা![১৪৬]

কিল্লা[১৪৭] শব্দটি চারটি কবিতায়[১৪৮] অন্ততঃ পাঁচবার 'দুর্গ' অর্থে এসেছে–

মাথা কেটে আর অস্ত্র হেনে ও হয়না স্বাধীন আর সকল,
সুতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া কেল্লা করিবে ওরা দখল![১৪৯]

কিয়ামত[১৫০] শব্দটি নয়টি কবিতায়[১৫১] দশবার 'মহা প্রলয়ের দিন' অর্থে এসেছে–

যে ইস্রাফিল প্রলয়-সিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে–
তারি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে ।[১৫২]

---

১৪০. নজরুল ইসলাম, 'রীফ-সর্দার', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫০
১৪১. কামাল পাশাঃ অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাশী, উমর ফারুকঃ জিঞ্জির, কৈশোরঃ মরু-ভাস্কর, সালাম অস্ত-রবিঃঝড়
১৪২. নজরুল ইসলাম, 'কৈশোর', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৬
১৪৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কায়েম' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৪৪. সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, শাদী মোবারক, নওকাবাঃ মরু-ভাস্কর
১৪৫. নজরুল ইসলাম, 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৯
১৪৬. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৯
১৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কেল্লা' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৪৮. কামাল পাশা (২বার)ঃ অগ্নি-বীণা, পুজা-অভিনয়ঃপ্রলয় শিখা, জোর জমিয়াছে খেলাঃ শেষ সওগাত, উমর ফারুকঃ জিঞ্জির
১৪৯. নজরুল ইসলাম, 'পুজা-অভিনয়', "প্রলয় শিখা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৭২
১৫০. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'কিয়ামত' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৫১. খেয়া পারের তরণী, কোরবাণী, মোহররমঃ অগ্নি-বীণা, শহিদী ঈদঃ ভাঙ্গার গান, সুরা ইনফিতার (২বা)ঃ আমপারা, ঈদের চাঁদঃ নতুন চাঁদ, খদিজাঃ মরু-ভাস্কর, মোহররমঃ শেষ সওগাত
১৫২. নজরুল ইসলাম, 'ঈদের চাঁদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

কেতাব > কিতাব (کتاب) বই, পুস্তক, গ্রন্থ, চিঠিপত্র ইত্যাদি।

শব্দটি চাবটি কবিতায় পাঁচবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'বই পুস্তক' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৫৩] চারবার–

(তোরা) কলুর বলদ টানিস্ ঘানি গলদ কোথায় নাইকো জ্ঞান।
(শুধু) প'ড়ছ কেতাব, নিচ্ছ খেতাব, নিমক-হারাম বে-ঈমান ॥[১৫৪]

'আসমানী কেতাব' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৫৫] পাঁচবার–

নিশ্চই পূর্বের সকল
কেতাবেই আছে তা বিদ্যমান,
বিশেষ করিয়া ইব্রাহিম,
মুসার কেতাব তার প্রমাণ।[১৫৬]

কোরান[১৫৭] শব্দটি চব্বিশটি কবিতায়[১৫৮] তেত্রিশবার 'মহাগ্রন্থ আল-কোরআন' অর্থে এসেছে–

বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী, নর-দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস!
হাদিস কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে না ক তা'রা কোরানের বাণী– সমান নর ও নারী![১৫৯]

কোরবাণী > কে.ারবাণী (قربان) নৈকট্য, সান্নিধ্য, উৎসর্গ, কোরবাণী ইত্যাদি।

শব্দটি দশটি কবিতায়[১৬০] বিশবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

"এয় ইবরাহীম্ আজ কোরবাণী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন!"
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন![১৬১]

---

১৫৩. মিলন-গানঃ ভাঙ্গার গান, মৌলবী সাহেবঃ সংযোজন, সাম্যবাদী (২বার): সাম্যবাদী
১৫৪. নজরুল ইসলাম, 'মিলন-গান', "ভাঙ্গার গান", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৪১
১৫৫. সুরা আ'লা (২বার), সুরা তাৎফিক (২বার): আমপারা, নওকাবাঃ মরু-ভাস্কর
১৫৬. নজরুল ইসলাম, 'সুরা আ'লা', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩১১
১৫৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'কোরান' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৫৮. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাঁশী, দিওয়ান-ই-হাফিজ, অনন্দময়ীর আগমনেঃ সংযোজন, দ্বারে বাজে ঝঞ্জার জিঞ্জির: সিন্দু-হিন্দোল, মিসেস এম রহমান (৩বার), খালেদ, উমর ফারুক (৪বার): জিঞ্জির, বাংলার আজিজঃ সন্ধ্যা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (৬১), সুরা আল-বাইয়্যেনাহ্, সুরা কদর, সুরা আ'লা, সুরা বুরুজ,, সুরা ইনশিকাক, সুরা নাজেয়াতঃ আমপারা, কৃষকের ঈদ (২বার), আজাদ (২বার): নতুন চাঁদ, কেন আপনারে হানি হেলা?, বন্ধুরা এসো ফিরে, চির বিদ্রোহী, মোহররম, গোঁড়ামী ধর্ম নয় (২বার): শেষ সওগাত, সাম্যবাদী (২বার), মানুষঃ সাম্যবাদী
১৫৯. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪২
১৬০. রণভেরী, কোরবাণী (৩বার), মোহররমঃ অগ্নি-বীণা, দুঃশাসনের রক্ত পান, শহিদী ঈদ (৯বার): ভাঙ্গার গান, ইন্দ্রপতনঃ চিত্তনামা, কৃষকের গানঃ সর্বহারা, যা শত্রু পরে পরেঃ ফণি-মনসা, মিসেস এম রহমানঃ জিঞ্জির
১৬১. নজরুল ইসলাম, 'কোরবাণী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৬

কৌম > ক.াওম (قوم) জাতি, বংশ, গোত্র, দল, জনগণ, লোকজন ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৬২] চারবার 'জাতি' অর্থে এসেছে–

খালেদ! খালেদ! ফজর হ'ল যে, আজান দিতেছে কৌম্,
ঐ শোন শোন – "আসসালাতু খায়র্ মিনান্নৌম!"[১৬৩]

খ

খত > খাত্‌ত. (خط) লিপি, রেখা, লাইন, সারি, ডোরা, চিঠি, পত্র ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'চিঠি' অর্থে এসেছে–

উড়ছে আতর, পুড়ছে দেদার ধুপ-ধুনো গুলগুল;
বেহেশ্‌তী খত্ পেয়ে সারা দুনিয়াটা মশগুল ॥[১৬৪]

খবর[১৬৫] শব্দটি বিশটি কবিতায়[১৬৬] একুশবার 'সংবাদ' অর্থে এসেছে–

তারে আমি ভালবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,
চৌচির হয়ে পড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।[১৬৭]

খবুজ > খুব্‌জ (خبز) রুটি।

শব্দটি একটি কবিতায় অন্ততঃ একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

শুকনো খবুজ খোর্মা চিবায়ে উমর দারাজ-দিল্
ভাবিছে কেমনে খুলিবে আরব দিন দুনিয়ার খিল,–[১৬৮]

খলিফা > খালীফাহ্ (خليفة) প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, খলিফা; ইসলামী খিলাফতের প্রধান ব্যক্তির খেতাব।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[১৬৯] বারবার 'খালীফাহ' অর্থে এসেছে–

খলিফা হইয়া মুসলিম দুনিয়ার বাদশাহী করে,
ভৃত্যে চড়ায়ে উটের পিঠে নিজে চলে রশি ধ'রে![১৭০]

---

১৬২. খালেদ, উমর ফারুক: জিঞ্জির, আজাদ (২বার): নতুন চাঁদ
১৬৩. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৬
১৬৪. নজরুল ইসলাম, 'ফুল-ছড়ি', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৯৫
১৬৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খবর' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৬৬. কামাল পাশা: অগ্নি-বীণা, অবেলার ডাক, আশা: দোলন চাঁপা, দিওয়ান-ই-হাফিজ: সংযোজন, বাংলার মহাত্মা, পথের দিশা: ফণি-মনসা, উমর ফারুক: জিঞ্জির, সুরের দুলাল: সন্ধ্যা, সুরা যিলযাল, সুরা আলাক, সুরা নাবা: আমপারা, আজাদ: নতুন চাঁদ, পরভৃত, সর্বহারা, কৈশোর (২বার), খদিজা, সম্প্রদান, নওকাবা: মরু-ভাস্কর, গোড়ামী ধর্ম নয়: শেষ সওগাত, জীবনে যাহারা বাঁচিল না: ঝড়
১৬৭. নজরুল ইসলাম, 'অবেলার ডাক', "দোলন চাঁপা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৩০
১৬৮. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৫
১৬৯. খালেদ, উমর ফারুক (৯বার): জিঞ্জির, মোহররম (২বার): শেষ সওগাত
১৭০. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

খালি[১৭১] শব্দটি দশটি কবিতায় অন্ততঃ চৌদ্দবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে–

'শূন্য' অর্থে সাতটি কবিতায়[১৭২] এগারবার–

শুক্রবার আজ, বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মা যার,
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শারাব চলুক আজ দেদার ।[১৭৩]

'শুধু' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৭৪] তিনবার–

কেঁপে মরে কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি ।
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি![১৭৫]

খারাব > খারাব্ (خراب) ধ্বংশ, বিধ্বস্ত, নষ্ট, মন্দ, দুষ্ট, বদ, অশুভ ইত্যাদি ।

শব্দটি চারটি কবিতায় চারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে ।

'নষ্ট' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৭৬] তিনবার–

অনেক শরাব খারাব হ'ল,
অনেক সাকীর ভাঙ্‌ল বুক!
আজ এল কোন দীপান্বিতা?
কার্ শরমে রাঙলো মুখ?[১৭৭]

'অশুভ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বদ্ নসিবের বরাত খারাব বরাদ্দ তায় ক'রলে কিনা আল্লায়,
পিচাশগুলো প'ড়ল এসে পেল্লায় এই পাগলদেরই পাল্লায়![১৭৮]

খাস[১৭৯] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[১৮০] পাঁচবার 'বিশেষ' অর্থে এসেছে–

খাস দরবার ভরিয়া গিয়াছে হাজার দেশের লোকে,
"কোথায় খলিফা" কেবলি প্রশ্ন ভাসে উৎসুক চোখে,[১৮১]

---

১৭১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খালি' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৭২. বেলা শেষে (২বার): দোলন চাঁপা, আলতা স্মৃতি: ছায়ানট, ইন্দ্রপতন (২বার): চিত্তনামা, সাবধানি ঘন্টা, ইন্দুপ্রয়ান (২বার): ফণি-মনসা, রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম (২বার), মিসেস এম রহমান: জিঞ্জির

১৭৩. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম" (৫৫), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০৩

১৭৪. মহান্তের মোহ অন্তের গান: ভাঙ্গার গান, ভিরু: জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

১৭৫. নজরুল ইসলাম, 'ভিরু', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬০

১৭৬. দীল দরদী: ফণি-মনসা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (৪), আর কত দিন?: নতুন চাঁদ

১৭৭. নজরুল ইসলাম,'দীল দরদী', "ফণি-মনসা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৭২

১৭৮. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫

১৭৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খাস' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৮০. মোহররম: অগ্নি-বীণা, মিলন গান: ভাঙ্গার গান, দীওয়ান-ই-হাফিজ: সংযোজন, আমার কৈফিয়ত: সর্বহারা, উমর ফারুক: জিঞ্জির

১৮১. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

খিমা > খীমাহ্ (خيمة) তাবু, শিবির, সামিয়ানা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'তাবু' অর্থে এসেছে-

জয়নাল সম মোরা সবাই
শুইয়া বিমারী খিমার মাঝ,
আফসোস করি কাঁদি শুধু,
দুশ্‌মন্ করে লুটতরাজ![১৮২]

খেতাব > খিত.াব (خطاب) বক্তৃতা, ভাষণ, চিঠি, বার্তা, সম্মানজনক পদবী ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[১৮৩] দু'বারই 'সম্মানজনক পদবী' অর্থে এসেছে-

এরা জমিদার মহাজন ধনী নওয়াবী খেতাব পায়,
কা'রো কল্যাণ চাহে না ইহারা, নিজ কল্যাণ চায় ।[১৮৪]

খেয়াল[১৮৫] শব্দটি চারটি কবিতায় অন্ততঃ চারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'স্মরণ' অর্থে দু'টি কবিতায়[১৮৬] দু'বার-

দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নাই ক' খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ-সব বন্ধী-গড়ে ।[১৮৭]

'কল্পণা' অর্থে দু'টি কবিতায়[১৮৮] দু'বার-

খেয়ালের বশে তাদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা ।
লব-কুশে বলে ত্যাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা![১৮৯]

খেলাফ > খিলাফ্ (خلاف) বিরোধ বিবাদ, বিতর্ক, পার্থক্য, মতভেদ, বৈপরিত্য, ব্যতিক্রম, নড়চড় ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'বৈপরিত্য' অর্থে এসেছে-

মন কহে, আজ ফুটল যখন এন্তার ঐ গোলাফ গুল
শরিয়তের আজ খেলাফ্ ক'রে বেদম আমি করব ভুল ।[১৯০]

---

১৮২. নজরুল ইসলাম, 'রীফ সর্দার', " সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫০
১৮৩. মিলন গান: ভাঙ্গার গান, গোড়ামী ধর্ম নয়: শেষ সওগাত
১৮৪. নজরুল ইসলাম, 'গোড়ামী ধর্ম নয়', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৬২
১৮৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খেয়াল' শব্দ দ্রষ্টব্য
১৮৬. আনন্দময়ীর আগমনে: সংযোজন, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৮৩)
১৮৭. নজরুল ইসলাম, 'আনন্দময়ীর আগমনে', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩২২
১৮৮. নারী : সাম্যবাদী, হিংসাতুর: চক্রবাক
১৮৯. নজরুল ইসলাম, 'নারী', "সাম্যবাদী", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬
১৯০. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (৭৯), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০৮

খোলা/ খুলে/ খোলে[১৯১] শব্দটি পনরটি কবিতায় ঊনিশবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'উন্মুক্ত' অর্থে নয়টি কবিতায়[১৯২] দশবার–

খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা র'বে, চালা হাতুড়ি-শাবল চালা![১৯৩]

'খোলা' অর্থে চারটি কবিতায়[১৯৪] সাতবার–

বন্দী আত্মা কাঁদে কারাগারে, দ্বার খোলো, খোলো দ্বার!
পরাধিনতার এই শৃংখল খুলে দাও, খুলে দাও![১৯৫]

'প্রকাশ' অর্থে দু'টি কবিতায়[১৯৬] দু'বার–

যখন খোলা হবে সবার আমল-নামা; সেই দিন
জ্বলবে দোজখ ধূ ধূ, হবে আকাশ আবরণ বিহীন,[১৯৭]

গ

গজল[১৯৮] শব্দটি সাতটি কবিতায়[১৯৯] সাতবার 'সঙ্গিতের সুর' অর্থে এসেছে–

ভিজ্‌লো কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ, হিম-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হর্‌দম! হর্‌দম দাও মদ্‌, মস্ত কর গজল গেয়ে![২০০]

গমি > গাম্ (غمی) দুঃখ, বিষণ্ণতা, দুঃশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'দুঃখ' অর্থে এসেছে–

"কোন যাদুমণি এলি ওরে"– বলি' রোয়ে মাতা আমেনায়,
খোদার হবিবে বুকে চাপি', আহা, বেঁচে' আজ স্বামী নাই!

---

১৯১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'খোলা' শব্দ দ্রষ্টব্য

১৯২. সেবক: বিষের বাশী, পাহাড়ী গান: ছায়ানট, মানুষ: সাম্যবাদী, খালেদ, ভিরু (২বার), অগ্র-পথিক: জিঞ্জির, আর কত দিন?, ঈদের চাঁদ: নতুন চাঁদ, আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও: শেস সওগাত

১৯৩. নজরুল ইসলাম, 'মানুষ', "সাম্যবাদী", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৮

১৯৪. মোহররম: অগ্নি-বীণা, হোলি: পূবের হাওয়া, মুক্তি: সংযোজন, নবাগত উৎপাত (৪বার): শেস সওগাত

১৯৫. নজরুল ইসলাম, 'নবাগত উৎপাত', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২০৮

১৯৬. সুরা তাকভীর: আমপারা, অভয় সুন্দর: নতুন চাঁদ

১৯৭. নজরুল ইসলাম, 'সুরা তাকভীর', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩১৯

১৯৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'গজল' শব্দ দ্রষ্টব্য

. চৈতি হাওয়া, পূবের হাওয়া: ছায়ানট, বাদল- প্রাতের শরাব: পূবের হাওয়া, দীল-দরদী: ফণি-মনসা, আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়:জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, শাখ-ই-নবাত

২০০. নজরুল ইসলাম, 'বাদল- প্রাতের শরাব', "পূবের হাওয়া", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

দুরে আবদুল্লার রূহ্ কাঁদে, "ওরে আমিনারে গমি নাই–
দেখ সতী তব কোলে কোন্ চাঁদ, সব ভর-পুর 'কমি' নাই।"[২০১]

গরীব[২০২] শব্দটি ছয়টি কবিতায়[২০৩] সাতবার 'দরিদ্র' অর্থে এসেছে–

আমরা কাঙাল, আমরা গরীব, ভিক্ষুক "মিস্‌কিন্",
ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন।[২০৪]

গাজী[২০৫] শব্দটি চারটি কবিতায় চারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে–

'মুসলিম বিজয়ী বীর' অর্থে তিনটি কবিতায়[২০৬] তিনবার–

ওরে কল্লা দেখে আল্লা ডরায়, হল্লা শুধূ হল্লা,
ওদের হল্লা শুধু হল্লা
এক মুর্গির জোর গায়ে নেই, ধরতে আসেন তুর্কী তাজী,–
মর্দ গাজী মোল্লা!–[২০৭]

'সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী যোদ্ধা ও পীর, পুঁথি সাহিত্যের অন্যতম নায়ক-গাজী' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

জারিগান আর গাজীর গানেতে সারা গান চঞ্চল!
বৌ করে পিঠা 'পুর' দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল![২০৮]

গোলাম[২০৯] শব্দটি বারটি কবিতায় চৌদ্দবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে–

'ভৃত্য বা চাকর' অর্থে নয়টি কবিতায়[২১০] এগারবার–

উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি'
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি' সে উটের রশি?[২১১]

---

২০১. নজরুল ইসলাম, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', "বিষের-বাশী" নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৬৪
২০২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'গরিব' শব্দ দ্রষ্টব্য
২০৩. গরীবের ব্যাথা: সংযোজন, নিত্য প্রবল হও, ভুল ও ফুল, শোধ করো ঋণ, আর কত দিন?, গোড়ামী ধর্ম নয়: শেষ শওগাত
২০৪. নজরুল ইসলাম, 'আর কত দিন?', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৪১
২০৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'গাজী' শব্দ দ্রষ্টব্য
২০৬. কামাল পাশা: অগ্নি-বীণা, খালেদ, সুব্‌হ্ উম্মেদ: জিঞ্জির
২০৭. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫
২০৮. নজরুল ইসলাম, 'অঘ্রাণের সওগাত', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৩৮
২০৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় গোলাম' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১০. মিলন গান: ভাঙ্গার গান, দীওয়ান-ই-হাফিজ, আনন্দময়ীর আগমনে (৩বার): সংযোজন, রাজা-প্রজা: সাম্যবাদী, মিসেস এম রহমান, নওরোজ, ওমর ফারুক: জিঞ্জির, আজাদ: নতুন চাঁদ, নওকাবা: মরু-ভাস্কর
২১১. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

'আজ্ঞাবহ' অর্থে তিনটি কবিতায়[২১২] তিনবার–

মদের নেশায় গোলাম আমি সদাই থাকি নুইয়ে শির,
জীবন আমি পণ রাখি ভাই, প্রসাদ পেতে তার হাসির।[২১৩]

গোলামী > গোলামী (غلامی) দাসত্ব, চাকুরী, কর্ম ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২১৪] পাঁচবার 'দাসত্ব' অর্থে এসেছে–

গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জা অনেক উর্ধে, জেনো;
চাপরাশির ঐ তক্‌মার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো![২১৫]

জ

জহরত/ জওহর > জাওহার (جوهر) বহুমূল্য প্রস্তরাদি, হীরা পান্না চুন্নী প্রভৃতি নানারত্ন, বস্তু, মূলবস্তু, উপাদান ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[২১৬] তিনবার 'মণিমুক্তা' অর্থে এসেছে–

সব পাইয়াছি আমিনা, ইহার অধিক, বোন্,
পারিবে আমারে দিতে জহরত মানিক কোন!"[২১৭]

জওয়াব[২১৮] শব্দটি তিনটি কবিতায়[২১৯] চারবার 'উত্তর' অর্থে এসেছে–

কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?
আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই[২২০]

জবেহ[২২১] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২২২] সাতবার 'হত্যা' অর্থে এসেছে–

নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কলমা পড়িয়া সবে
কেন হ'তেছিস দলে দলে তোরা কতল-গাহেতে জবেহ?[২২৩]

---

২১২. রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (৩৩), মোবারকবাদঃ নতুন চাঁদ, রুবাইয়াৎ- ই- ওমর খৈয়াম (৮৯)
২১৩. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ- ই- ওমর খৈয়াম", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩১০
২১৪. মোবারকবাদ, আজাদ (৪বার): নতুন চাঁদ
২১৫. নজরুল ইসলাম, 'মোবারকবাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪১
২১৬. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাঁশী, সর্বহারা, কৈশোরঃ মরু-ভাস্কর
২১৭. নজরুল ইসলাম, 'সর্বহারা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৮৫
২১৮. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'জওয়াব' শব্দ দ্রষ্টব্য
২১৯. শহিদী ঈদঃ ভাঙ্গার গান, উমর ফারুক (২বার): জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১০)
২২০. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৫
২২১. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় ' জবেহ' শব্দ দ্রষ্টব্য
২২২. শহিদী ঈদ (২বার): ভাঙ্গার গান, পাপঃ সাম্যবাদী, নওরোজ, আমানুল্লাহঃ জিঞ্জির, আজাদ (২বার): নতুন চাঁদ
২২৩. নজরুল ইসলাম, 'আজাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

জমা[২২৪] শব্দটি বারটি কবিতায় বারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'পুঞ্জিভূত' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[২২৫] পাঁচবার–

তোমার তরে বুকের তলায়
অনেক দিনের অনেক কথা জমা
কানের কাছে মুখটি থুয়ে
গোপন সে সব কইব প্রিয়তমা।[২২৬]

'সঞ্চয়' অর্থে চারটি কবিতায়[২২৭] চারবার–

ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ![২২৮]

'একত্রিত' অর্থে দু'টি কবিতায়[২২৯] দু'বার–

এরা অজ্ঞান, এরা লোভী, তবু ইহাদের কর ক্ষমা,
আবার এদেরে ডেকে আল্লার ঈদগাহে কর জমা।[২৩০]

---

২২৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'জমা' শব্দ দ্রষ্টব্য
২২৫. অবেলায়, মুক্তি-বার: ছায়াপনট, মানুষ: সাম্যবাদী, ঈদের চাঁদ: নতুন চাঁদ, বিংশ শতাব্দী: প্রলয় শিখা
২২৬. নজরুল ইসলাম, 'মুক্তি-বার', "ছায়ানট", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৯৫
২২৭. আজাদ, ঈদের চাঁদ: নতুন চাঁদ, কেন আপনারে হানি হেলা?, টাকাওয়ালা: শেষ-সওগাত
২২৮. নজরুল ইসলাম, 'ঈদের চাঁদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৫০
২২৯. নিত্য প্রবল হও, নবযুগ: শেষ-সওগাত
২৩০. নজরুল ইসলাম, 'নবযুগ', "শেষ-সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৩৩

'জমাট বাঁধা' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

নির্মমতায় নর-পশুর
হায় গো যায় চোখের জল
বুকে জ'মে হ'ল হিম-পাষাণ,
হ'ল হৃদয় নীল গরল;[২৩১]

জলসা[২৩২] শব্দটি চারটি কবিতায়[২৩৩] পাঁচবার 'আসর' অর্থে এসেছে–

সাবধান তুই বস্‌বি যখন সারাব পানের জলসাতে,
মদ খাসনে বদ্-মেজাজী নীচ কুৎসিত লোক সাথে।[২৩৪]

জান্নাত[২৩৫] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২৩৬] ছয়বার 'বেহেশ্‌ত' অর্থে এসেছে–

"শাফায়াত"– পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।[২৩৭]

জাম > জ.াম (جام) পেয়ালা, পাত্র, বাটি, পানপাত্র ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৩৮] দু'বার 'পানপাত্র' অর্থে এসেছে–

রোম-সম্রাট শরাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলী বাদশার যত নজ্জুম আয়ু মাপে![২৩৯]

জালিম > জ.ালিম (ظالم) অত্যাচারী, নির্যাতনকারী, উৎপীড়ক বা উৎপীড়নকারী ইত্যাদি।

শব্দটি চৌদ্দটি কবিতায়[২৪০] আঠারবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগযুগান্তর কত,
জালিম ফারসী রোমক রাজার জুলুমে সে শত শত[২৪১]

---

২৩১. নজরুল ইসলাম, 'শরৎচন্দ্র', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫৬
২৩২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'জলসা' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৩৩. বকুল: সংযোজন, আয় বেহেশতে কে যাবি আয়?: জিঞ্জির, যৌবন-জল-তরঙ্গ: সন্ধ্যা, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার) ৯৫ ও ১০৩
২৩৪. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (১০৩), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩১৩
২৩৫. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'জান্নাত' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৩৬. খেয়াপারের তরণী: অগ্নি-বীণা, শহিদী-ঈদ: ভাঙ্গার গান, অনাগত: মরু-ভাস্কর, মোহররম (২বার), একি আল্লার কৃপা নয়?: শেষ সওগাত
২৩৭. নজরুল ইসলাম, 'খেয়াপারের তরণী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৪
২৩৮. খালেদ, ঈদ মোবারক: জিঞ্জির
২৩৯. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৫
২৪০. রক্তাম্বর ধারিনী মা, কামাল পাশা (২বার), রণভেরী (২বার), কোরবাণী, মোহররম: অগ্নি-বীণা, বোধন: বিষের বাঁশী, শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান, ধীবরদের গান: সর্বহারা, খালেদ (৩বার), সুহ্‌ব উম্মেদ: জিঞ্জির, তরুণের গান: সন্ধ্যা, আজাদ, ঈদের চাঁদ: নতুন চাঁদ, মোহররম: শেষ সওগাত
২৪১. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

জাহান্নাম[২৪২] শব্দটি আটটি কবিতায়[২৪৩] দশবার 'নরক' বা 'দোজখ' অর্থে এসেছে–

আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডি, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি![২৪৪]

জিয়ারত > যিয়ারাহ্ (زيارة) ভ্রমণ, সফর, পরিদর্শন, জিয়ারত, সাক্ষাত ইত্যাদি ।
শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

যে কবর তলে আছে সে লুকায়ে, সে কবর
জিয়ারত করি' পুছিবে স্বামির তার খবর ।[২৪৫]

জিন্[২৪৬] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২৪৭] সাতবার 'জিনজাতি' অর্থে এসেছে–

খুজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, 'জিন' পরী, হুর পাগল প্রায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায়![২৪৮]

জুলুম[২৪৯] শব্দটি এগারটি কবিতায় বারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'অত্যাচার-নির্যাতন' অর্থে দশটি কবিতায়[২৫০] এগারবার–

জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া, দানব সে, সে অসুর,
আল্লার মা'র প'ড়ে তা'রে করে দুনিয় হইতে দুর ।[২৫১]

'দুঃশাসন' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বছর গিয়াছে গেছে শতাব্দী যুগযুগান্ত কত,
জালিম ফারসী রোমক রাজার জুলুমে সে শত শত[২৫২]

---

২৪৩. বিদ্রোহী, ধুমকেতুঃ অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (২), জাতের বজাতিঃ বিষের-বাশী, দুঃশাসনের রক্তপান, শহিদী ঈদঃভাঙ্গার গান, ঈদ মোবারকঃ জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার)

২৪৪. নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১১

২৪৫. নজরুল ইসলাম, 'সর্বহারা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৮৬

২৪৬. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'জিন' শব্দ দ্রষ্টব্য

২৪৭. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাঁশী, অনাগত, সাক্লুস সদর (২বা), সর্বহারা (২বার): মরু-ভাস্কর, এক আল্লাহ জিন্দাবাদঃ শেষ সওগাত

২৪৮. নজরুল ইসলাম, 'অনাগত', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৬০

২৪৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'জুলুম' শব্দ দ্রষ্টব্য

২৫০. চরকার গান, ঝড়ঃ বিষের-বাঁশী, সুবহ্ উম্মেদঃ জিঞ্জির, ঈদের চাঁদ (২বার): নতুন চাঁদ, মোহররম, আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও, একি আল্লার কৃপা নয়?, গোড়ামী ধর্ম নয়ঃ শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, ঘোষণাঃ ঝড়

২৫১. নজরুল ইসলাম, একি আল্লার কৃপা নয়?: শেষ সওগাত, নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৫৫

২৫২. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ.২, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ত

তকদীর > তাক.দীর (تقدير) অদৃশ্য, ভাগ্য, নিয়তি, পরীক্ষার গ্রেড, কপাল ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায় পাঁচবার ভিন্ন ভিন্ন এসেছে;

'ভাগ্য' অর্থে চারটি কবিতায়[২৫৩] চারবার–

তাদেরই জড়তা-পাষাণ টুটিয়া ঝরিছে অগ্নিশিখা,
কে জানে কাহার তক্‌দীরে ভাই কি শাস্তি আছে লিখা![২৫৪]

'কপাল' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

তক্‌দীর চেয়ে খুন করে ওই উহারা মেসেরী বুঝি',
ট'লে তবু চলে বারে বারে হারে বারে বারে ওরা যুঝি'।[২৫৫]

তকবীর > তাক্‌বীর (تكبير) বড়ত্ব বর্ণনা, গৌরব বর্ণনা, আল্লাহু আকবার ধ্বনি ইত্যাদি।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২৫৬] পাঁচবার 'আল্লাহু আকবার ধ্বনি' অর্থে এসেছে–

তক্‌বীর শুনি' শয্যা ছাড়িয়া চকিতে উঠিয়া বসি,
বাতায়নে চাই – উঠিয়াছে কি রে গগনে মরুর শশী![২৫৭]

তফাৎ > তাফাউত্ (تفاوت) পার্থক্য, বিভেদ, দুরত্ব, ব্যবধান, প্রভেদ ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'পার্থক্য' অর্থে এসেছে–

বউল আজি বাউল হল, আমরা তফাতে!
আম-মুকুলের গুঁজি-কাঠি, দাওকি খোঁপাতে?[২৫৮]

তসবী > তাসবীহ্. (تسبيح) মুসলমানী জপমালা, গুণগান, স্তুতি, মহিমা, আল্লার নাম বা দোয়া দুরূদ পাঠের সময় নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনার জন্য দানা বা গুটির মালা বিশেষ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[২৫৯] পাঁচবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

ইহারাই "ফিরদৌস-আল্লা"র প্রেম-ঘন অধিবাসী
তস্‌বী ও তলোয়ার লয়ে আসি' অসুরে যায় বিনাশি–'।[২৬০]

---

২৫৩. খালেদ: জিঞ্জির, নতুন চাঁদ: নতুন চাঁদ, আগ্নেয়গীরি বাংলার যৌবন: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
২৫৪. নজরুল ইসলাম, 'আগ্নেয়গীরি বাংলার যৌবন', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২১৭
২৫৫. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ২১৭
২৫৬. উমর ফারুক: জিঞ্জির, কেন জাগাইলি তোরা, কৃষকের ঈদ: নতুন চাঁদ, 'দাদা': মরু-ভাস্কর, নিত্য প্রবল হও: শেষ সওগাত
২৫৭. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮০
২৫৮. নজরুল ইসলাম, 'চৌতি হাওয়া', "ছায়ানট", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৬৮
২৫৯. খালেদ: জিঞ্জির, আর কত দিন?: নতুন চাঁদ, বকরীদ: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার)
২৬০. নজরুল ইসলাম,'বকরীদ', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তস্‌লিম > তাস্‌লীম (تسليم) ইসলামী কায়দায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বা অভিবাদন, সালাম, স্বীকৃতি, হস্তান্তর, অর্পণ, প্রদান, সম্মতি ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৬১] দু'বার 'সালাম' বা 'অভিবাদন' অর্থে এসেছে-

সেই মুস্‌লিম থাকে যদি কেউ তস্‌লিম করি তা'রে,
ঈদগাহে গিয়া তারি সার্থক হয় ডাকা আল্লারে।[২৬২]

তসল্লী > তাসাল্লী (تسلی) সান্তনা, আরাম, প্রবোধ, আশ্বাসবাক্য ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

কত যে ক্লান্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির এরই মুলে
বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লী, সব গ্লানি গেছে ভুলে![২৬৩]

তাগিদ/তাকিদ > তাকীদ্ (تاکید) কোন কাজের জন্য বারবার অনুরোধ, পীড়াপীড়ি ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৬৪] অন্ততঃ দু'বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

দীন কাঙালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুনঃ ঈদ?[২৬৫]

তাজ[২৬৬] শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[২৬৭] ছয়বার 'মুকুট' অর্থে এসেছে-

এই ভারতের অবনত শিরে তোমরা পরালে তাজ,
সুযোগ পাইলে শক্তিতে মোরা অজেয়, দেখালে আজ![২৬৮]

তাজিম > তা'জ়ীম্ (تعظيم) শ্রদ্ধা, সম্মান, সম্ভ্রম, সমাদর ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৬৯] দু'বার 'সম্মান' অর্থে এসেছে-

খালেদ! খালেদ! তাজিমের সাথে ফরমান প'ড়ে চুমি'
সিপা'-সালারের সকল জেওর খুলিয়া ফেলিলে তুমি।[২৭০]

---

২৬১. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাঁশী, বকরীদঃ শেষ সওগাত
২৬২. নজরুল ইসলাম, 'বকরীদ', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৫০
২৬৩. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪০
২৬৪. ঈদ মোবারকঃ জিঞ্জির, কৃষকের ঈদঃ নতুন চাঁদ
২৬৫. নজরুল ইসলাম, 'কৃষকের ঈদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৪
২৬৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'তাজ' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৬৭. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (২বার): বিষের বাঁশী, শহিদী ঈদঃ ভাঙ্গার গান, আমানুল্লাহঃ জিঞ্জির, রীফ-সর্দারঃ সন্ধ্যা, মোবারকবাদঃ ঝড়
২৬৮. নজরুল ইসলাম, 'মোবারকবাদ', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৫০
২৬৯. খালেদঃ জিঞ্জির, উঠিয়াছে ঝড়ঃ ঝড়
২৭০. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

তাবিজ > তা'বীজ (تعويذ) মাদুলি, মন্ত্রপুত কবজ, বাহুর এক প্রকার অলংকার, রক্ষা কবচ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৭১] দু'বার 'মাদুলি' অর্থে এসেছে–

মাঝে তার ফুল্ল শিশু বেড়ায় খেলে ফুল-ভুলানো,
বুকে তার সোনার তাবিজ নিখিল আলোক দোল-দোলানো।[২৭২]

তামাম[২৭৩] শব্দটি তিনটি কবিতায়[২৭৪] তিনবার 'সমস্ত' অর্থে এসেছে–

শোন দামাম্ কামান্ তামাম্ সামান্
নির্ঘোষি কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম"![২৭৫]

তারিখ[২৭৬] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'মাসের দিন' বুঝাতে এসেছে–

শুভ বিবাহের পয়গাম তা'রে পাঠার – দেশের রেওয়াজ তাই
দিন ও তারিখ হ'ল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই।[২৭৭]

তুফান[২৭৮] শব্দটি আঠারটি কবিতায়[২৭৯] একুশবার 'প্রবল ঝড়-ঝঞ্জা' অর্থে এসেছে–

শারাব-খানায় গজল শোন তোমার কবির বন্দনা-গান;
তেম্‌নি করে সূর্য ডোবে, নহর-নীরে বহে তুফান।[২৮০]

তৌবা > তাওবাহ্ (توبة) তওবা, অনুশোচনা, অনুতাপ, প্রত্যাবর্তন, ক্ষমা, আর কোন পাপ কার্য না করার দৃঢ় সংকল্প করে পূণ্য বা ধর্মপথে প্রত্যাবর্তন করা।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[২৮১] পাঁচবার 'তওবা' অর্থে এসেছে–

নিত্য দিনে শপথ করি – করব তৌবা আজ রাতে,
যাব না আর পানশালাতে, ছোঁব না আর মদ হাতে।[২৮২]

---

২৭১. মিসেস এম রহমানঃ জিঞ্জির, শৈশব-লীলাঃমরু-ভাস্কর
২৭২. নজরুল ইসলাম, 'শৈশব-লীলা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৭৭
২৭৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'তামাম' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৭৪. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের বাঁশী, দীওয়ান-ই-হাফিজঃ সংযোজন, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ
২৭৫. নজরুল ইসলাম, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', "বিষের বাঁশী", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৬১
২৭৬. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'তারিখ' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৭৭. খদিজাঃ মরু-ভাস্কর, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১০
২৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'তুফান' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৭৯. রক্তাম্বরধারিনী মাঃ অগ্নি-বীণা, বোধন, বিদ্রোহীর বাণী (২বার), ঝড়ঃ বিষের বাঁশী, পুজারিণী (২বার)ঃ দোলন চাঁপা, কৃষকের গান, ছাত্র দলের গান, কাণ্ডারী হুশিয়ারঃ সর্বহারা, বাংলার মহাত্মাঃ ফণি-মনসা, দারীদ্রঃ সিন্ধু হিন্দোল, সুরের দুলালঃ সন্ধ্যা, রুবাইয়াৎ-ই- হাফিজ, নতুন চাঁদ, দুর্বার যৌবনঃ নতুন চাঁদ, ডুবিবেনা আশা তরী, সকল পথের বন্ধুঃ শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার), শাখ-ই-নবাতঃঝড়
২৮০. নজরুল ইসলাম, 'শাখ-ই-নবাত', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭
২৮১. শরাবান তহুরাঃ পূবের হাওয়া, সুরা বুরুজঃ আমপারা, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
২৮২. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (১২১), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

দ

দখল > দাখ্‌ল্‌ (دخل) অধিকার, কর্তৃত্ব, আয়ত্ত ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[২৮৩] দু'বার 'অধিকার করা' অর্থে এসেছে–

মাথা কেটে আর অস্ত্র হেনেও হয় না স্বাধীন আর সকল,
সুতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া কেল্লা করিবে ওরা দখল![২৮৪]

দলিল[২৮৫] শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'লিখিত প্রমাণ পত্র' অর্থে এসেছে–

আতর সুবাসে কাতর হ'ল গো পাথর-দিল
দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা – নাই দলিল,[২৮৬]

দাওত > দা'ওয়াহ (دعوة) আহ্বান, নিমন্ত্রণ, দাওয়াত, প্রচার ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায়[২৮৭] চারবার 'নিমন্ত্রণ' অর্থে এসেছে–

বোহায়রা কয় "আমার মঠে রইল দাওত আজ সবার,"
মুগ্ধ-চিতে শুন্‌ল তালিব সকল কথা বোহায়রার।[২৮৮]

দ্বীন/দীন > দীন্‌ (دين) ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, ধার্মিকতা, প্রথা, বিচার ইত্যাদি।

শব্দটি দশটি কবিতায়[২৮৯] পনেরবার 'ইসলাম ধর্ম' অর্থে এসেছে–

তেমনি করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন
আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন![২৯০]

---

২৮৩. অগ্র-পথিক: জিঞ্জির, পুজা-অভিনয়:প্রলয় শিখা
২৮৪. নজরুল ইসলাম, 'পুজা-অভিনয়', "প্রলয় শিখা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৭২
২৮৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'দলিল' শব্দ দ্রষ্টব্য
২৮৬. নজরুল ইসলাম, 'ঈদ মোবারক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬৮
২৮৭. যৌবন-জল-তরঙ্গ: সন্ধ্যা, কৈশোর, খদিজা: মরু-ভাস্কর, ঝড়: ঝড়
২৮৮. নজরুল ইসলাম, 'কৈশোর', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৬
২৮৯. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের বাঁশী, শহিদী ঈদ (২বার): ভাঙ্গার গান, মৌলবী সাহেব: সংযোজন, খালেদ, সুবহ্‌ উম্মেদ (৩বার): জিঞ্জির, রীফ সর্দার: সন্ধ্যা, আর কত দিন: নতুন চাঁদ, অবতরণিক (২বার), কৈশোর (২বার), সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ: মরু-ভাস্কর
২৯০. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া[২৯১] শব্দটি ছত্রিশটি কবিতায়[২৯২] আটষট্টিবার 'ইহজগৎ' অর্থে এসেছে-

সব অজানা জানার মাঝে প্রেম-দেওয়ানা ফিরনু ভাই,
দুনিয়া জুড়ে দেখনু ঢুঁরে দিল্‌দরদী বন্ধু নাই ।[২৯৩]

দোয়া[২৯৪] শব্দটি তিনটি কবিতায়[২৯৫] তিনবার 'প্রাথনা' অর্থে এসেছে-

হে শহীদ! বীর! এই দোয়া ক'রো আরশের পায়া ধ'রি –
তোমারী মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহেরা পরি'![২৯৬]

দোকান[২৯৭] শব্দটি তিনটি কবিতায়[২৯৮] চারবার 'বিপণী' অর্থে এসেছে-

আড্ডা আমার এই সে গুহা, মদ চোলাই-এর এই দোকান,
বাঁধা রেখে আত্মা-হৃদয় করি হেথায় শারাব পান ।[২৯৯]

দৌলত > দাওলাহ্ (دولة) রাষ্ট্র, দেশ, সাম্রাজ্য, রাজত্ব, পরিবর্তন, বিবর্তন, ধন-সম্পদ,বিত্ত ।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৩০০] চারবার 'ধন-সম্পদ' অর্থে এসেছে-

আর ক'টা দিন বেঁচে থাক, যার ঋণ করিয়াছ, তিনি
তোমাদের প্রাণ দৌলত্ নিয়ে খেলিবেন ছিনিমিনি ।[৩০১]

---

২৯১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'দুনিয়া' শব্দ দ্রষ্টব্য

২৯২. কামাল পাশা, আনোয়ার (২বার), কোরবাণী, মোহররম (৪বার): অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (২বার): বিষের বাঁশী, শরাবান তহুরা: পূবের হাওয়া, ফুল-ছড়ি, মৌলভী সাহেব (৩বার) দিওয়ান-ই-হাফিজ (৪বার): সংযোজন, খালেদ: জিঞ্জির, শরৎচন্দ্র: সন্ধ্যা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (২বার), নতুন চাঁদ, কেন জাগাইলি তোরা, মোবারকবাদ (৬বার), আজাদ (৪বার): নতুন চাঁদ, সাক্‌কুস সদর, কৈশোর, খদিজা: মরু-ভাস্কর, নিত্য প্রবল হও (৩বার), ভয় করিও না হে মানবাত্মা, হুল ও ফুল (২বার) নবযুগ, শোধ কর ঋণ, মোহররম (৪বার), আর কত দিন?, ডুবিবেনা আশা তরী, বকরীদ, একি আল্লার কৃপা নয়? (৩বার), মোহসিন স্মরণে (২বার) এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ (২বার): শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৩বার), জীবনে যাহারা বাঁচিল না, সালাম অস্ত রবি: ঝড়

২৯৩. নজরুল ইসলাম, 'দিওয়ান-ই-হাফিজ', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩১৪

২৯৪. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'দোয়া' শব্দ দ্রষ্টব্য

২৯৫. বন্দনা গান: সংযোজন, ওমর ফারুক: জিঞ্জির, হুল ও ফুল: শেষ সওগাত

২৯৬. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৮

২৯৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'দোকান' শব্দ দ্রষ্টব্য

২৯৮. নওরোজ (২বার): জিঞ্জির, কৈশোর; মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১২৮)

২৯৯. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (১২৮) নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩১৮

৩০০. অগ্রপথিক: জিঞ্জির, কৈশোর: মরু-ভাস্কর, শোধ করো ঋণ: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

৩০১. শোধ করো ঋণ: শেষ সওগাত, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৫

ন

নওয়াব > নাওয়াব্ (نواب) রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্তা, মুসলমান সামন্ত রাজা ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩০২] দু'বার 'শাসনকর্তা' অর্থে এসেছে–

কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়,[৩০৩]

নকীব[৩০৪] শব্দটি এগারটি কবিতায় ষোলবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'ঘোষণাকারী' অর্থে সাতটি কবিতায়[৩০৫] সাতবার–

টুটিয়াছে ঐ বক্ষ-কাবায়, সহে নাক আর দেরী,
নকীব কণ্ঠে শুনিব কখন নব অভিযান-ভেরী!....[৩০৬]

'তূর্যবাদক' অর্থে চারটি কবিতায়[৩০৭] নয়বার–

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুশিয়রি ইসলাম ডুবে তব সয!![৩০৮]

নজর[৩০৯] শব্দটি দু'টি কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে–

'দৃষ্টি' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ফজর বেলার নজর ওগো উঠলো মিনার 'পর,
ঘুম টুটানো আজান দিলে– "আল্লাহো আকবার!"[৩১০]

'লক্ষ্য' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর
থাকে যেন তোমার নজর,
তৃণ কুটোর পরেও ত গো
পড়ে রবির প্রভাতী কর![৩১১]

---

৩০২. নওরোজ, ঈদ মোবারক: জিঞ্জির
৩০৩. নজরুল ইসলাম, 'ঈদ মোবারক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬৯
৩০৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'নকীব' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩০৫. রণভেরী: অগ্নি-বীণা, নকীব, উমর ফারুক, অগ্রপথিক: জিঞ্জির, জাগরণ: সন্ধ্যা, সর্বহারা, নওকাবা: মরু-ভাস্কর
৩০৬. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮০
৩০৭. মোহররম: অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম, তূর্যনিনাদ (৬বার): বিষের বাঁশী, খালেদ: জিঞ্জির
৩০৮. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৫০
৩০৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'নজর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩১০. নজরুল ইসলাম, 'বাংলার আজিজ', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫১
৩১১. নজরুল ইসলাম, 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (৩৭), নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১১৫

নজ্জুম > নাজ্জাম (نجام) জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী, গণক ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩১২] দু'বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

নজ্জুম সব বল্‌ছে সবাই, আস্‌বে সেজন এ মঞ্জিল্ –
এই সে মাসে; আমার ধ্যানে তাদের গোনায় আছে মিল।[৩১৩]

নবী > নাবী (نبي) পয়গাম্বর, আল্লার প্রেরীতপুরুষ ইত্যাদি।

শব্দটি সতেরটি কবিতায়[৩১৪] একান্নবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

পয়গম্বর নবী ও রসুল – এঁরা ত খোদার দান!
তুমি রাখিয়াছ, হে অতি-মানুষ মানুষের সম্মান![৩১৫]

নবুয়ত > নুবুওয়াহ্ (نبوة) নবীর দায়িত্ব বা নবুয়ত।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩১৬] দু'বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

বহুকাল পরে পেয়ে পয়গাম্বরী নবুয়ত্
এই প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সত্যব্রতী হযরত।[৩১৭]

নসীব[৩১৮] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ভাগ্য' অর্থে এসেছে–

তোমার চেয়ে মোদের অনেক নসীব ভালো, হায় ইরানী!
শুনলো না কো তোমায় নিয়ে রচা তোমার কবির বাণী।[৩১৯]

নহর[৩২০] শব্দটি নয়টি কবিতায়[৩২১] পনেরবার 'নদী' অর্থে এসেছে–

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার চুঁড়ে,
বহে না সিরাজ-বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে'।[৩২২]

---

৩১২. খালেদ: জিঞ্জির, কৈশোর: মরু-ভাস্কর

৩১৩. নজরুল ইসলাম, 'কৈশোর', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৬

৩১৪. সুব্‌হ উম্মেদ, চিরঞ্জীব জগলুল, উমর ফারুক (৯বার): জিঞ্জির, সুরা শামস্: আমপারা, আজাদ: নতুন চাঁদ, অনাগত (৫বার), পরভৃত, শাক্‌কুস সাদর, সর্বহারা (২বার), কৈশোর (৮বার), সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ (৬বার), শাদী মোবারক (৪বার), খদিজা (৩বার), সম্প্রদান (২বার) , নওকাবা (৩বার):মরু-ভাস্কর, মোহররম: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার)

৩১৫. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৩

৩১৬. কৈশোর, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ: মরু-ভাস্কর

৩১৭. নজরুল ইসলাম, 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৯

৩১৮. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'নসীব' শব্দ দ্রষ্টব্য

৩১৯. নজরুল ইসলাম, 'শাখ-ই-নবাত', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬

৩২০. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'নহর' শব্দ দ্রষ্টব্য

৩২১. ভগ্নস্তূপ (২বার), দীওয়ান-ই-হাফিজ: সংযোজন, নিসীথ-অন্ধকার: সন্ধ্যা, সুরা বাইয়্যেনাহ: আমপারা, আর কত দিন?: নতুন চাঁদ, প্রত্যাবর্তন, কৈশোর, খদিজা: মরু-ভাস্কর, শাখ-ই-নবাত (৬বার): ঝড়

৩২২. নজরুল ইসলাম, 'নিসীথ-অন্ধকার', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫৫

নাহি[৩২৩] শব্দটি চুয়ান্নটি কবিতায়[৩২৪] একশত ত্রিশবার নিষেধ সূচক ক্রিয়া 'না' অর্থে এসেছে–

কোথায় রে, তোর কোথায় ব্যথা বাজে?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি, কিছুই দেখি না যে!
ওরে মানিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে–[৩২৫]

নিয়ামত > নি'আমাহ্ (نعمة) অনুগ্রহ, সৌভাগ্য, ধন সম্পদ, দান, প্রাচুর্য ইত্যাদি।

শব্দটি ছয়টি কবিতায় সাতবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'অনুগ্রহ' অর্থে তিনটি কবিতায়[৩২৬] তিনবার–

যে জন প্রার্থী তাহারে দেখিও
ক'রো না তিরস্কার কভু,
ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহা
দিলেন তোমারে তব প্রভু।[৩২৭]

'ধন-সম্পদ' অর্থে তিনটি কবিতায়[৩২৮] চারবার–

আগুন জ্বলে না মাসে কতদিন হায় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্ব'লে কত প্রাণ তিলে তিলে যার ম'রে।
বোঝে না ধনিক, হোক সে হিন্দু হোক সে মুসলমান
আল্লা যারে নিয়ামত দেন, পাষাণ তাদের প্রাণ![৩২৯]

---

৩২৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'নাহি' শব্দ দ্রষ্টব্য

৩২৪. রণভেরী (২বার): অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (২বার), অভয়মন্ত্র (২০বার), ঝড় (৩বার): অগ্নি-বীণা, বিশের বাশী, পুজারিণী (৬বার): দোলন চাঁপা, শায়ক বেধা পাখি, দইল মালা, কারবাঁশী বাজিল?: ছায়ানট, ল্যাবেণ্ডিস বাহিনীর বিজাতিয়সঙ্গীত: ডাঙ্গার গান, ইন্দ্রপতন (৩বার): চিত্তনামা, ধীবরদের গান, ফরিয়াদ (৩বার), গোকুল নাগ (২বার): সর্বহারা, সাবধানী ঘন্টা, অশ্বিনীকুমার (২বার), সত্য কবি (২বার) হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ:ফণি-মনসা, সিন্ধু (৯বার), অ-নামিকা (২বার), অতলপথের যাত্রী,দারীদ্র (৩বার): সিন্দু-হিন্দোল, মিসেস এম রহমান, খালেদ, ঈদ মোবারক, চিরঞ্জিব জগলুল (৫বার), আমানুল্লাহ: জিঞ্জির, দাড়ি-বিরাস (৩বার), বিংশ শতাব্দি (২বার): সন্ধ্যা, নবীনচন্দ্র: সংযোজন, সুরা ফজর (২বার): আমপারা, আমার কবিতা তুমি, নিরুক্ত (২বার), সে যে আমি (৩বার), অভয় সুন্দর (২বার), আর কত দিন? (৪বার), ওঠরে চাষি (২বার), শিখা: নতুন চাঁদ, অবতরনিকা, অনাগত, আলো-আধারী (৩বার), সর্বহারা (২বার), সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ (২বার), খদিজা (৫বার): মরু-ভাস্কর, নবাগত উৎপাত, ভয় করিওনা হে মানবাত্মা (৪বার), হুর ও ফুল (২বার), শোধ কর ঋণ, মোহররম, বিশ্বাস ও আশা (৩বার), ডুবিবেনা আশা তরী, আত্মগত: শেষ সওগাত, জীবনে যাহারা বাঁচিল না, সারাম অস্ত রবি (২বার): ঝড়

৩২৫. নজরুল ইসলাম, ''শায়ক বেধা পাখি', "ছায়ানট", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৮১

৩২৬. সুরা দ্বোহা: আমপারা, আজাদ: নতুন চাঁদ, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

৩২৭. নজরুল ইসলাম, 'সুরা দ্বোহা', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩০২

৩২৮. শোধ করো ঋণ (২বার), মহাত্মা মোহসিন: শেষ সওগাত, জীবনে যাহারা বাঁচিল না: ঝড়

৩২৯. নজরুল ইসলাম, 'শোধ করো ঋণ', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নূর[৩৩০] শব্দটি চারটি কবিতায়[৩৩১] চারবার 'আলো' বা 'জ্যোতি' অর্থে এসেছে–

কোন সে অচিন পরীর মুলুক ঘুরে'
নেয়ে হুরীর 'নূরে',
চুরি করে কিন্নরীদের সুধা-ক্ষরা সুরে
এলি শিশু ওরে,[৩৩২]

নেকাব > নিক.াব (نقاب) অবগুণ্ঠন, ঘোমটা, পর্দা, আবরণ ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩৩৩] দু'বার 'ঘোমটা' অর্থে এসেছে–

ফিরি ক'রে ফেরে শা'জাদী বিবি ও বেগম সা'ব
চাঁদ মুখের   নাই নেকাব?[৩৩৪]

ফ

ফকির[৩৩৫] শব্দটি তিনটি কবিতায় এগারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'সাধু-দরবেশ' অর্থে দু'টি কবিতায়[৩৩৬] দশবার–

রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বদ্ধ দু'টি হাত
থুয়ে ফকীর পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত ।[৩৩৭]

'গরীব' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

আজি আরাফাত-ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা-ফকীরে ভায়ে ভায়ে,[৩৩৮]

ফখর > ফাখর (فخر) অহংকার, গর্ব, গৌরব ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩৩৯] দু'বার 'গর্ব' অর্থে এসেছে–

ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে কর ফখর!
মোনাফেক তুমি সেরা বে-দ্বীন![৩৪০]

---

৩৩০. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'নূর' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৩১. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাশী,শরাবান তহুরা: ছায়ানট, ভোরের সানাই: সন্ধ্যা, আবাহন: সংযোজন
৩৩২. নজরুল ইসলাম, 'আবাহন', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৪৫০
৩৩৩. অ-নামিকা: সিন্দু-হিন্দোল, নওরোজ: জিঞ্জির
৩৩৪. নজরুল ইসলাম, 'নওরোজ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫৬
৩৩৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ফকির' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৩৬. মুক্তি: সংযোজন, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
৩৩৭. নজরুল ইসলাম,'মুক্তি', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৮৪
৩৩৮. নজরুল ইসলাম, 'ঈদ মোবারক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬৯
৩৩৯. শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান, জীবনে যাহারা বাঁচিল না: ঝড়
৩৪০. নজরুল ইসলাম, 'শহিদী ঈদ', "ভাঙ্গার গান", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫৪

ফজর > ফাজর (فجر) প্রত্যুষ, প্রাতকাল, ঊষা, ফজর ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩৪১] পাঁচবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

গাফ্‌লিয়াতের ঘুমে যখন
গ্রামের সবাই রয় ঘুমিয়ে,
উনিই জানান ফজর হ'ল
ভোরে উঠে আজান দিয়ে।[৩৪২]

ফজুল > ফুদূ.ল (فضول) কৌতুহল, অনধিকার চর্চা, বকবকানী, অতিরিক্ত, অনাবশ্যক ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩৪৩] দু'বার 'অতিরিক্ত' অর্থে এসেছে–

আজকে তোমার গোলাপ বাগে ফুটল যখন রঙিন গুল্
রেখো না পান-পাত্র বেকার, উপচে পড়ুক সুখ ফজুল।[৩৪৪]

ফতে > ফাতহ্ (فتح) বিজয়।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩৪৫] তিনবার 'বিজয়' অর্থে এসেছে–

মার্ দিয়া ভাই মার্ দিয়া
দুষমন সব হার গিয়া!
কিল্লা ফতে হো গিয়া![৩৪৬]

ফতোয়া > ফাত্ওয়া > ফুত্ওয়া (فتوى) ফতোয়া, রায়, মত, সিদ্ধান্ত, ইসলামী শরীয়ত সম্মত রায় বা লিখিত ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শব্দটি ছয়টি কবিতায়[৩৪৭] ছয়বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চঁষে![৩৪৮]

---

৩৪১. মৌলবী সাহেবঃ সংযোজন, খালেদ (৩বার): জিঞ্জির, বাংলার আজীজঃসন্ধ্যা
৩৪২. নজরুল ইসলাম, 'মৌলবী সাহেব', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩০০
৩৪৩. কৈশোরঃ মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৮)
৩৪৪. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (৮): নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৯৫
৩৪৫. কামাল পাশা (২বার): অগ্নি-বীণা, জোর জমিয়াছে খেলাঃ শেষ সওগাত
৩৪৬. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৮
৩৪৭. আনন্দময়ীর আগমনেঃ সংযোজন, আমার কৈফিয়ৎ, সর্বহারা, খালেদঃ জিঞ্জির, জোর জমিয়াছে খেলাঃ শেষ সওগাত রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৩৮)
৩৪৮. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৮
৩৪৯. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'ফরাস' শব্দ দ্রষ্টব্য

Dhaka University Institutional Repository

ফরাস[৩৪৯] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'বিছানা' অর্থে এসেছে–

কুঞ্জে জরীন ফারসী ফরাস্ বিছিয়েছে আজ ফুল বালারা
আজ চাই-ই-চাই লাল শিরাজী সচ্ছ সরস খোর্মা-পারা![৩৫০]

ফাতেহা > ফাতিহ.াহ (فاتحة) তূচনা, ভূমিকা, সূত্রপাত, মুখবন্ধ, উপক্রমণিকা ইত্যাদি। প্রচলিত অর্থে আত্মার মাগফিরাত কামনার জন্য সূরায়ে ফাতেহা ইত্যাদি পাঠ করে প্রার্থনা করা ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩৫১] দু'বার প্রচলিত অর্থ তথা আত্মার মাগফিরাত কামনার জন্য সুরায়ে-ফাতেহা ইত্যাদি পাঠ করে প্রার্থনা করা অর্থে এসেছে;

সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'
তব 'ফাতেহা'য় কি দিবে এ জাতি বিনা দু'টো বাঁধা বুলি?[৩৫২]

ফেকা > ফেকাহ[৩৫৩] > ফিক.হ্ (فقه) জ্ঞান, বুদ্ধি, বুঝ, উপলব্ধি, অনুধাবন, ফিক্হ্ শাস্ত্র ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায় অন্ততঃ তিনবার 'ফিক্হ্ শাস্ত্র' অর্থে এসেছে–

হাদিস কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে না ক তা'রা কোরানের বাণী– সমান নর ও নারী![৩৫৪]

ব

বদল / বদলে/ বদলাতে[৩৫৫] শব্দটি তেরটি কবিতায় অন্ততঃ চৌদ্দবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'বিনিময়' অর্থে ছয়টি কবিতায়[৩৫৬] ছয়বার–

হায় অভাগী! আমায় দেবে তোমার মোহন মালা?
বদল দিয়ে মালা, নেবে আমার দহণ-জ্বালা?[৩৫৭]

'পরিবর্তে' অর্থে ছয়টি কবিতায়[৩৫৮] ছয়বার–

বিকার ঘোরে দিদি তাহার ডাকছে ছোট ভায়ে,
দুধের বদল ঝিনুক দিয়ে আমানি দেয় মায়ে ।[৩৫৯]

---

৩৫০. নজরুল ইসলাম, 'বাদল প্রাতের শরাব', "পূবের হাওয়া", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২২৪
৩৫১. মৌলবী সাহেবঃ সংযোজন, চিরঞ্জিব জগলুলঃ জিঞ্জির
৩৫২. নজরুল ইসলাম, 'চিরঞ্জিব জগলুল', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৭৭
৩৫৩. মিসেস এম রহমান, খালেদঃ জিঞ্জির, কৃষকের ঈদঃ নতুন চাঁদ
৩৫৪. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪২
৩৫৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বদল' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৫৬. দহন-মালাঃ ছায়ানট, চিঠি, দীওয়ান-ই-হাফিজঃ সংযোজন, নওরোজ, উমর ফারুকঃ জিঞ্জির, বকরীদঃ শেষ সওগাত
৩৫৭. নজরুল ইসলাম, 'দহন-মালা', "ছায়ানট", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৮৯
৩৫৮. মোহররমঃ অগ্নি-বীণা, আমানুল্লাহঃ জিঞ্জির, অভয় সুন্দর, ওঠরে চাষীঃ নতুন চাঁদ, বড় দিনেঃ শেষ সওগাত, জীবনে যাহারা বাঁচিল নাঃ ঝড়
৩৫৯. নজরুল ইসলাম, 'ওঠরে চাষী', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

'পরিবর্তন' অর্থে দু'টি কবিতায়[৩৬০] দু'বার–

বদলাবে তকদীর আমার,
ঘুচিবে সর্ব অন্ধকার,
পরির ললাটে, চুমু দেবো, বাঁধত তায়
আল্লাহ নামের রজ্জুতে   দিল-কোঠায়।[৩৬১]

বয়ান[৩৬২] শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩৬৩] তিনবার 'বর্ণনা' অর্থে এসেছে–

নলিন্ নয়ান ফুলের বয়ান মলিন এ দিনে
রাখ্‌তে পারে কোন সে কাফের আশেক্ বেদীনে?[৩৬৪]

বরাত > বার'আহ (برأة) ভাগ্য, অদৃষ্ট, মুক্তি, নিষ্কৃতি ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩৬৫] পাঁচবার 'ভাগ্য' অর্থে এসেছে–

বদ্-নসিবের বরাত খারাব বরাদ্ধ তাই ক'রলে কিনা আল্লায়,
পিচাশগুলো প'ড়ল এসে পেল্লায় এই পাগলাদেরই পাল্লায়![৩৬৬]

বাকী[৩৬৭] শব্দটি আঠারটি কবিতায়[৩৬৮] বিশবার 'অবশিষ্ট' অর্থে এসেছে–

রক্ত-মাংশ খেয়েছে তোমার, কঙ্কাল শুধু আছে বাকী,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা "আজো বেঁচে আছি" বল ডাকি'![৩৬৯]

বাতিল[৩৭০] শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'অগ্রাহ্য' অর্থে এসেছে–

সেই ভালো মোর – এই শারাবের
পিয়ালা দিয়ে তর করি দিল্,
সে সাধ আমার পুরল না তা
ভুলব গো আজ করব বাতিল্।[৩৭১]

---

৩৬০. নতুন চাঁদঃ নতুন চাঁদ, জীবনে যাহারা বাঁচিল নাঃ ঝড়
৩৬১. নজরুল ইসলাম, 'নতুন চাঁদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৫
৩৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বয়ান' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৬৩. প্রিয়ার রূপঃ ছায়ানট, মানিনীঃ পূবের হাওয়া, খদিজাঃ মরু-ভাস্কর
৩৬৪. নজরুল ইসলাম, 'মানিনী', "পূবের হাওয়া", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২২৪
৩৬৫. কামাল পাশাঃ অগ্নি-বীণা, শাদী মোবারকঃ মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৩বার)
৩৬৬. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫
৩৬৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বাকী' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৬৮. পুজারিণীঃ দোলন চাঁপা, শায়ক-বেঁধা পাখি, বিদায় বেলায়, পুবের হাওয়াঃ ছায়ানট, আশাঃ পুবের হাওয়া, দীওয়ান-ই-হাফিজঃ ৎযোজন, মুক্তিকাম, সত্য-কবিঃ ফণি-মনসা, সিন্ধু, চাঁদনী রাতেঃ সিন্ধু হিন্দোল, বার্ষিক সওগাত, উমর ফারুক, এ মোর অহংকারঃ জিঞ্জির, সুরের দুলাল (২বার)ঃ সন্ধ্যা, আর কত দিন?ঃ নতুন চাঁদ, দাদাঃ মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার), শাখ-ই-নবাতঃ ঝড়
৩৬৯. নজরুল ইসলাম, 'মুক্তিকাম', "ফণি-মনসা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৬০
৩৭০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বাতিল' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৭১. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

বিদায়[৩৭২] শব্দটি চৌত্রিশটি কবিতায়[৩৭৩] বায়ান্নবার 'বিদায়' বা 'প্রস্থান' অর্থে এসেছে–

যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খেয়া বেয়ে
জানি না তার আঁখি সেদিন থাকবে কোথায় চেয়ে ।[৩৭৪]

বিলকুল[৩৭৫] শব্দটি আটটি কবিতায়[৩৭৬] দশবার 'সম্পূর্ণ' অর্থে এসেছে–

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজ্‌দিল্‌ ঐ দুষ্‌মন সব বিলকুল সাফ হো গিয়া!
খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া![৩৭৭]

বুলবুল/ বুলবুলী[৩৭৮] শব্দটি ত্রিশটি কবিতায়[৩৭৯] চৌত্রিশবার সুবিখ্যাত গায়ক পাখি-বুলবুল অর্থে এসেছে; ফার্সী কাব্যে এ-সুকণ্ঠ পাখি সুবিস্তৃত স্থান দখল করে আছে; বাংলা কাব্যেও বিশেষ করে নজরুলের কবিতা ও গানে এ মহাভাগ্যবান পাখির পৌনঃপুনিক উপস্থিতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ।

গোলাপ-কুঁড়ির ডাক শুনেছে আজ বুঝি বুলবুল,
তাই ত এত গুণগুণানী সব কাজই ভুল ভুল;
হুর কুমারীর খত্‌ পেয়েছে আজ বুঝি বুলবুল॥[৩৮০]

বেদুঈন > বাদাবী (بدوى) বেদুঈন, যাযাবর, গ্রামীন জংলী, বর্বর, দুর্ধর্ষ মরুচারী আরব ইত্যাদি ।

শব্দটি সাতটি কবিতায়[৩৮১] এগারবার মরুচারী আরব অর্থে এসেছে–

আরবের যত গানের কবিরা 'কুলসুম' 'ইমরুল কায়েস'
এই বেদূঈন গোষ্ঠিতে তা'রা জন্মিয়াছিল এই সে দেশ![৩৮২]

---

৩৭২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বিদায়' শব্দ দ্রষ্টব্য

৩৭৩. শাত-ইল-আরব (২বার): অগ্নি-বীণা, মুক্তবন্ধী: বিষের-বাশি, পউষ, পুবের চাতক, অবেরার ডাক (২বার), পুজারিণী, পিছু ডাক:দোলন চাঁপা, হার-মানা হারা (২বার), নিরুদ্দেশের যাত্রী (২বার), পরশ পুজা (২বার), অনাদৃত (৩বার), বিদায় বেলায় (৩বার) অকরুণ পিয়া, বিধুরা-পথিক-প্রিয়া (২বার), আলতাস্মৃতি: ছায়ানট, স্নেহ পরশ: পুবের হাওয়া, সান্তনা: চিত্তনামা, চিঠি, লাল সালাম, আবরী ছন্দের কবিতা (২বার): সংযোজন, গোকুল নাগ (২বার): সর্বহারা, সত্য-কবি (২বার): ফণি-মনসা, সিন্ধু, গোপন প্রিয়া,বিদায়-স্মরণে, বধুবরণ, মাধবী প্রলাপ: সিন্ধু-হিন্দোল, অঘ্রাণের সওগাত (২বার), চিরঞ্জিব জগলুল (৩বার): জিঞ্জির, রীফ সর্দার:সন্ধ্যা, চির জনমের প্রিয়া: নতুন চাঁদ, খদিজা (২বার): মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার), শাখ-ই-নবাত (২বার): ঝড়

৩৭৪. নজরুল ইসলাম, 'পুবের চাতক', "দোলন চাঁপা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১২৬

৩৭৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বিলকুল' শব্দ দ্রষ্টব্য

৩৭৬. কামাল পাশা: অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাশী, প্রিয়ার রূপ: ছায়ানট, লাল সালাম, ফুল ছড়ি, দিওয়ান-ই-হাফিজ (২বার), আরবী ছন্দের কবিতা (২বার) সংযোজন, অনাগত: মরু-ভাস্কর

৩৭৭. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৪

৩৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'বুলবুলী' শব্দ দ্রষ্টব্য

৩৭৯. দোদুল ফুল: দোলন চাঁপা, দুপুর অবিসার, প্রিয়ার রূপ: ছায়ানট, সোহাগ: পুবের হাওয়া, সুন্দরী, অভিমানী, ফুল-ছড়ি (৩বার), কালোর উকিল, লাল সালাম, দিওয়ান-ই-হাফিজ, আরবী ছন্দের কবিতা (২বার): সংযোজন, দীল-দরদী: ফণি-মনসা, বার্ষিক সওগাত, সুবৃহ উম্মেদ, ভীরু, আয় বেহেশতে কে যাবি আয়, উমর ফারুক: জিঞ্জির, নিষিথ অন্ধকার, বাংলার আজিজ: সন্ধ্যা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, আর কত দিন?, মোবারকবাদ: নতুন চাঁদ, অনাগত (২বার), প্রত্যাবর্তন, সর্বহারা: মরু-ভাস্কর, হুল ও ফুল, নবযুগ: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, শাখ-ই-নবাত, মোবারকবাদ: ঝড়

৩৮০. নজরুল ইসলাম, 'ফুল-ছড়ি', "সংযোহন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৯৫

৩৮১. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের বাশী, পাহাড়ী গান: ছায়ানট, খালেদ: জিঞ্জির, জীবন বন্ধনা: সন্ধ্যা, অবতরণিকা, অনাগত (২বার), পরভৃত (৪বার): মরু-ভাস্কর

৩৮২. নজরুল ইসলাম, 'পরভৃত', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বোরকা[৩৮৩] শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩৮৪] তিনবার 'অবগুণ্ঠণ' অর্থে এসেছে-

কাবুল-লক্ষী দেহে মনে এই পরাধীনদের দেখিয়া কি
রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোরকায় তাঁর মুখ ঢাকি'?[৩৮৫]

ম

মউজ/ মওজ/ মৌজ > মাওজ (موج) তরঙ্গ, ঢেউ, ঊর্মী, লহরী ইত্যাদি।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[৩৮৬] ছয়বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে?
নিখিল-এতিম্‌ ভিড় করে কাঁদে আমার মানষ-লোকে![৩৮৭]

মজনুন > মাজনুন (مجنون) পাগল, উম্মাদ, জ্বিনে ধরা ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৩৮৮] দু'বার পাগল তথা প্রেমিক পাগল অর্থে এসেছে-

হে মজনুন কোন সে 'লাইলী'র
প্রণয়ে উম্মাদ তুমি? - বিরহ-অথির[৩৮৯]

মজলিস/মজলিশ[৩৯০] শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার ভিন্নার্থে এসেছে;

'বৈঠক' অর্থে দু'টি কবিতায়[৩৯১] দু'বার-

আনন্দের সে সভায় সকলি দানিল সায়
মজলিশে বসিল আসি' কন্যাপক্ষগণ।[৩৯২]

'আসর' অর্থে একটি কবিতায় একবার-

মরতে যদি হয় গো আমার শরাব পানের মজলিশে-[৩৯৩]

---

৩৮৩. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'বোরকা' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৮৪. সোহাগ: পূবের হাওয়া, চিঠি: সংযোজন, আমানুল্লাহ: জিঞ্জির
৩৮৫. নজরুল ইসলাম, 'আমানুল্লাহ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৭৮

৩৮৬. মিসেস এম রহমান, আয় বেহেশতে কে যাবি আয়, উমর ফারুক: জিঞ্জির, রুআইয়াৎ-ই-হাফিজ: সংযোজন, রুআইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার)
৩৮৭. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৩৯
৩৮৮. সিন্ধু: সিন্ধু হিন্দোল, সুবহ উম্মেদ: জিঞ্জির
৩৮৯. নজরুল ইসলাম, 'সিন্ধু', "সিন্ধু হিন্দোল", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৯৯
৩৯০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মজলিশ' শব্দ দ্রষ্টব্য
৩৯১. মোবারকবাদ: নতুন চাঁদ, সম্প্রদান: মরু-ভাস্কর
৩৯২. নজরুল ইসলাম, 'সম্প্রদান', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১১
৩৯৩. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

মজলুম > মাজলুম (مظلوم) অত্যাচারিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, নিপীড়িত ইত্যাদি।
শব্দটি তিনটি কবিতায়[৩৯৪] ছয়বার 'নির্যাতিত' অর্থে এসেছে–

সাত আসমান বিদারী' আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে মারিয়া করিবেন মজ্‌লুমের প্রাপ্য শোধ![৩৯৫]

মঞ্জিল > মানজিল (منزل) বিশ্রামাস্থান, পান্থশালা, গন্তব্যস্থান, লক্ষ্যস্থল, গৃহ ইত্যাদি।
শব্দটি তিনটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;
'পান্থশালা' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

আরাম সুখ মোর হারাম-বিলকুল পথের মঞ্জিল প্রিয়ার মুল্‌কের,
নকীব হরদম হাঁকায়, হাম্‌দম্‌ পথিক! দুরপথ্‌ গাঁঠরী তুল ফের![৩৯৬]

'গৃহ' অর্থে দু'টি কবিতায়[৩৯৭] তিনবার–

'নজুম সব বলছে সবাই, আসবে সে জন এ মঞ্জিল্‌–
এই সে মাসে; আমার ধ্যানে তাদের গোনায় আছে মিল।[৩৯৮]

মতলব[৩৯৯] শব্দটি দু'টি কবিতায় তিনবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;
'উদ্দেশ্য' বা 'অভিপ্রায়' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

মতলব হাসিল কর তোমার
খুবসুরতী রতির সাথে
অন্তর দিও না তারে
যে তব অযোগ্যতর ॥[৪০০]

'ফন্দি' ও 'কৌশল' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

ইহাই চরম বাক্য ঠিক।
নিরর্থক এ নহে সে দেখ,
মতলব করে তাহারা এক
মতলব করি আমি ও এক[৪০১]

---

৩৯৪. নকীব, খালেদ (৩বার): জিঞ্জির, ঈদের চাঁদ (২বার): নতুন চাঁদ
৩৯৫. নজরুল ইসলাম, 'ঈদের চাঁদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৫১
৩৯৬. নজরুল ইসলাম, 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩০৭
৩৯৭. আর কত দিন? (২বার): নতুন চাঁদ, কৈশোর: মরু-ভাস্কর
৩৯৮. নজরুল ইসলাম, 'কৈশোর', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৬
৩৯৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মতলব' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪০০. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" (২৫), নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১১৮
৪০১. নজরুল ইসলাম, 'সূরা তারেক', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩১২

Dhaka University Institutional Repository

ময়দান[৪০২] শব্দটি তেরটি কবিতায় ষোলবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'প্রান্তর' অর্থে তিনটি কবিতায়[৪০৩] চারবার–

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন।
এই দিনই 'মীনা' ময়দানে
পুত্র স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন করিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!
ছি ছি! কেঁপো না ক্ষুদ্র মন![৪০৪]

'মাঠ' অর্থে সাতটি কবিতায়[৪০৫] নয়বার–

হইলে বন্ধু মেষ-চারণের ময়দানে নিরালায়,
চকিত দেখায় চিনিল হৃদয় চির-চেনা আপনায়![৪০৬]

'রণক্ষেত্র' অর্থে তিনটি কবিতায়[৪০৭] তিনবার–

আমি তকবীর ধ্বনি করি শুধু কর্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তা'রা জমা হবে ময়দানে![৪০৮]

মরশুম/মরসুম[৪০৯] শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার ভিন্নার্থে এসেছে;

'মৌসুম' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ভাব্‌নু যখন করছে মানা
বন্ধুরা সব আগ্‌লে ভাঁটি –
দিলাম ছেড়ে এবার ফুলের
মরশুমে ভাই শরাব খাঁটি।[৪১০]

'সময়' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

গোলাপ, শরাব, বন্ধু লাভের মরসুম এই আনন্দের –
য'দিন বাঁচ শারাব পিও, সত্যিকারের এই জীবন।[৪১১]

---

৪০২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'ময়দান' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪০৩. কামাল পাশা (২বার), কোরবাণী, মোহররমঃ অগ্নি-বীণা
৪০৪. নজরুল ইসলাম, 'কোরবাণী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৬
৪০৫. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ বিষের-বাঁশী, দীওয়ান-ই-হাফিজঃ সংযোজন, ঈদ মোবারক, উমর ফারুক (২বার): জিঞ্জির, নতুন চাঁদঃনতুন চাঁদ, বকরীদ, জোর জমিয়াছে খেলা (২বার): শেষ সওগাত
৪০৬. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮২
৪০৭. আনোয়ারঃ অগ্নি-বীণা, জাগো সৈনিক আত্মা, নিত্য প্রবল হওঃ শেষ সওগাত
৪০৮. নজরুল ইসলাম, 'নিত্য প্রবল হও', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২১৪
৪০৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মরসুম' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪১০. নজরুল ইসলাম, 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (৬), "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৫
৪১১. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম"(৮৫), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

মর্সিয়া > মারছিয়াহ্ (مرثیہ) শোক, বিলাপ, শোকগাঁথা, বিয়োগান্ত ঘটনা বিষয়ে রচিত গান, মরসিয়া ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪১২] দু'বার 'কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত গান' অর্থে এসেছে–

ফিরে এল আজ সেই মহররম মাহিনা, –
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।[৪১৩]

মশগুল[৪১৪] শব্দটি ছয়টি কবিতায় ছয়বার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'ব্যস্ত' অর্থে তিনটি কবিতায়[৪১৫] তিনবার–

অপূর্ণই মোর এশক্-গুলবাগ তাতেই মশগুল ভ্রমর চঞ্চল,
হুর সে চায় না স-টোল লাল গাল, হরিণ চোখ্ মুখ্ কোমল ঢল্ঢল্ ॥[৪১৬]

'বিভোর' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

উড়ছে আতর, পুড়ছে দেদার ধুপ-ধুনো গুলগুল;
বেহেশ্তী খত পেয়ে সারা দুনিয়াটা মশগুল ॥[৪১৭]

'মগ্ন' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ধন-দৌলত চান না উনি
র'ন মশগুল খোদার নামে,
ওয়াজ নসিহত ক'রে তিনি
ঠিক রেখেছেন মোদের গ্রামে।[৪১৮]

'লিপ্ত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

'সরো'র মতন সরল তনু টাটকা-তোলা গোলাপ-ফুল,
কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে তুই হ' মশগুল।[৪১৯]

মশাল[৪২০] শব্দটি এগারটি কবিতায়[৪২১] এগারবার 'দীর্ঘ ও স্থূল প্রদীপ অর্থে এসেছে–

যে অন্তরের দীপ্তিতে তব হাতের মশাল জ্বলে,
ফুৎকারে তাহা নিভিবেনা, চল আগে চল নব বলে![৪২২]

---

৪১২. মহররম: অগ্নি-বীণা, মিসেস এম রহমান: জিঞ্জির
৪১৩. নজরুল ইসলাম, 'মহররম', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৫০
৪১৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মশগুল' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪১৫. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাঁশী, সোহাগ: পূবের হাওয়া, দীওয়ান-ই-হাফিজ: সংযোজন
৪১৬. নজরুল ইসলাম, 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩১২
৪১৭. নজরুল ইসলাম, 'ফুল-ছড়ি', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৯৫
৪১৮. নজরুল ইসলাম, 'মৌলভী সাহেব', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩০০
৪১৯. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (৭৫), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০৭
৪২০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মশাল' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪২১. প্রলয়োল্লাস: অগ্নি-বীণা, সেবক, সত্যমন্ত্র: বিষের-বাশী, ছাত্রদলের গান:সর্বহারা, অভিযান, দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জির: সিন্ধু-হিন্দোল,সুবহ উম্মেদ, অগ্রপথিক: জিঞ্জির, তরুণের গান, বাংলার আজিজ: সন্ধ্যা, হবে জয়: প্রলয় শিখা, নও-কাবা: মরু-ভাস্কর
৪২২. নজরুল ইসলাম, 'হবে জয়', "প্রলয় শিখা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ[৪২৩] শব্দটি ষোলটি কবিতায়[৪২৪] অন্ততঃ সাতাশবার 'মুসলমানদের উপাসনালয় মসজিদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।[৪২৫]

মহফিল/ মাহফিল > মাহ্.ফিল্ (محفل) সমাবেশ, জমায়েত, সভা, আসর, জলসা ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৪২৬] অন্ততঃ পাঁচবার 'আসর' অর্থে এসেছে–

শুধু আর্শের আতর-দানীতে যাহাদের হয় ঠাই,
তোমাদের মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই!
সেই মুকুলেরা এস মাহফিলে, বসাও ফুলের হাট
এই বাংলায় তোমরা আনিও মুক্তির আরফাত্![৪২৭]

মাজার/ মাঝার[৪২৮] শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;
'বুযুর্গ ব্যক্তিদের সমাধি' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার–

খালেদ! খালেদ! ভাঙ্গিবে না কি ও হাজার বছরী ঘুম?
মাজার ধরিয়া ফরিয়াদ করে বিশ্বের মজ্লুম!–[৪২৯]

'সমাধি' অর্থে দু'টি কবিতায়[৪৩০] দু'বার–

কহিলেন প্রভূ "ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে– জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম[৪৩১]

মাদরাসা/ মাদ্রাসা > মাদ্রাসাহ্ (مدرسة) বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র, ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষালয়, শিক্ষাঙ্গন, স্কুল, মতাদর্শ ইত্যাদি।
শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষালয়' অর্থে এসেছে–

মসজিদ মন্দির গির্জায় ইহুদ–খানায় মাদ্রাসায়
রাত্রি দিবস নরক-ভীতি স্বর্গ-সুখের লোভ দেখায়।[৪৩২]

---

৪২৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মসজিদ' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪২৪. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (২বার): বিষের-বাশী, দীওয়ান-ই-হাফিজ (২বার), আনন্দময়ীর আগমনে: সংযোজন, সাম্যবাদী, মানুষ (২বার): সাম্যবাদী, পথের দিশা, হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ: ফণি-মনষা, চাঁদনী রাতে: সিন্ধু-হিন্দোল, মিসেস এম রহমান, সুবহ্ উম্মেদ, উমর ফারুক (৩বার): জিঞ্জির, বিংশ শতাব্দী: প্রলয়-শিখা, আজাদ, নতুন চাঁদ, মোহররম (২বার), জোর জমিয়াছে খেলা: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৬বার)
৪২৫. নজরুল ইসলাম, 'সাম্যবাদী', "সাম্যবাদী", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৫
৪২৬. আয় বেহেশতে কে যাবি আয়: জিঞ্জির, মোবারকবাদ (৩বার): নতুন চাঁদ, সম্প্রদান:মরু-ভাস্কর
৪২৭. নজরুল ইসলাম, 'মোবারকবাদ', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪২
৪২৮. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'মাজার' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪২৯. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৪
৪৩০. সুবহ উম্মেদ: জিঞ্জির, অনাগত: মরু-ভাস্কর
৪৩১. নজরুল ইসলাম, 'অনাগত', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৫৮
৪৩২. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (৪৯), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০২

Dhaka University Institutional Repository

মানা[৪৩৩] শব্দটি চারটি কবিতায়[৪৩৪] অন্ততঃ চারবার 'নিষেধ' অর্থে এসেছে–

প্রেম ও আছে সখা, যুদ্ধ ও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হয়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই![৪৩৫]

মানে > মা'না (معنی) অর্থ, মানে, তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৪৩৬] তিনবার 'অর্থ' বুঝাতে এসেছে–

বুকের ভিতর ছ-পাই-ন-পাই, মুখে বলি স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই![৪৩৭]

মামুলি > মা'মূলী (معمولی) অতিসাধারণ, সামান্য, তুচ্ছ, অকিঞ্চিতকর ইত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৪৩৮] তিনবার 'সামান্য' অর্থে এসেছে–

শুধু বাদশাহী দম্ভ লইয়া আসিতে যদি, এ বন্ধি দেশ
ফুল মালা দিয়া না করি' বরণ করিত মামুরি আরজি পেশ ।[৪৩৯]

মাল[৪৪০] শব্দটি ছয়টি কবিতায় আটবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'ধন-সম্পদ' অর্থে চারটি কবিতায়[৪৪১] চারবার–

দাও কোরবাণী জান ও মাল,
বেহেশত তোমার কর হালাল ।[৪৪২]

'পণ্য' অর্থে দু'টি কবিতায়[৪৪৩] চারবার–

ওই সব্‌জা দরিয়া আসমানের আর চাঁদের নৌকা সেই,
সব্ ডুব গিয়া ভায়া কাওয়াম হার্জির মাল এ মদ গ্লাসেই![৪৪৪]

---

৪৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মানা' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৩৪. অবেলার ডাক : দোলন চাঁপা, সাবধানী ঘন্টা: ফণি-মনষা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (৬), কবির মুক্তি: শেষ সওগাত
৪৩৫. নজরুল ইসলাম, 'সাবধানী ঘন্টা', "ফণি-মনষা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৬৪
৪৩৬. বিদ্রোহীর বাণী: বিষের-বাশী, অভ্যুদয়, কৈশোর: মরু-ভাস্কর
৪৩৭. নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহীর বাণী', "বিষের-বাশী", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৯৯
৪৩৮. আমানুল্লাহ, খালেদ: জিঞ্জির, রীফ সর্দার: সন্ধ্যা
৪৩৯. নজরুল ইসলাম, 'আমানুল্লাহ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৭৯
৪৪০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মাল' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৪১. কোরবাণী: অগ্নি-বীণা, শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান, শোধ করো ঋণ, বকরীদ: শেষ সওগাত
৪৪২. নজরুল ইসলাম, 'শহিদী ঈদ', "ভাঙ্গার গান", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫৪
৪৪৩. দীওয়ান-ই-হাফিজ: সংযোজন, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৩বার)
৪৪৪. নজরুল ইসলাম, 'দীওয়ান-ই-হাফিজ', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩১১

Dhaka University Institutional Repository

মালিক[৪৪৫] শব্দটি আটটি কবিতায় আটবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'প্রভূ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

লোক সমাজের শাসক রাজা
রাজার শাসক মালিক সেই,
বিরাট যাহার সৃষ্টি এই,[৪৪৬]

'অধিপতি' অর্থে তিনটি কবিতায়[৪৪৭] তিনবার–

হায়রে অর্ধেক ধরার মালিক আমিরুল-মোমেনিন
শুনে সে খবর একাকী উষ্ট্রে চলেছে বিরামহীন[৪৪৮]

'অধীশ্বর' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন![৪৪৯]

'অধিকারী' অর্থে দু'টি কবিতায়[৪৫০] দু'বার–

দেব্‌তা-ঠাকুর স্বর্গবাসী
নাক ডাকিয়ে ঘুমান সুখে,
সুখের মালিক শোনে কি-কে
কাঁদছে নীচে গভীর দুখে ।[৪৫১]

'মনিব' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

মালিক তাহার হাঁকিতেছে দাম, বলির পশুর সম
শত বন্ধন-জর্জর নারী কাঁপে মূক অক্ষম ।[৪৫২]

মাল্লা[৪৫৩] শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৫৪] দু'বার 'চালক' বা 'নাবিক' অর্থে এসেছে–

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ী-মুখে সারি গান- লা শরীক আল্লাহ![৪৫৫]

---

৪৪৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মালিক' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৪৬. নজরুল ইসলাম, 'সত্য-মন্ত্র', "বিষের-বাঁশী", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৯২
৪৪৭. মিলন গান: ভাঙ্গার গান, উমর-ফারুক: জিঞ্জির, রীফ সর্দার: সন্ধ্যা
৪৪৮. নজরুল ইসলাম, 'উমর-ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৪
৪৪৯. নজরুল ইসলাম, 'ফরিয়াদ', "সর্বহারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৯
৪৫০. দীল-দরদী: ফণি-মনষা, নগদ কথা: সন্ধ্যা
৪৫১. নজরুল ইসলাম, 'নগদ কথা', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৩৭
৪৫২. নজরুল ইসলাম, 'নওকাবা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১৪
৪৫৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মাল্লা' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৫৪. খেয়াপারের তরণী: অগ্নি-বীণা, বিদ্রোহীর বাণী: বিষের-বাঁশী
৪৫৫. নজরুল ইসলাম, 'খেয়াপারের তরণী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

মাশুক > মা'শুক. (معشوق) প্রেমাস্পদ, প্রিয়তম, প্রেমেরপাত্র ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৫৬] দু'বার 'প্রেমাস্পদ' অর্থে এসেছে–

বিরাণ মুলুক ইরানও সহসা
জাগিয়াছে দেখি ত্যাজিয়া নিঁদ ।
মাশুকের বাহু দাড়ায়ে আশিক
কছম করিছে হবে শহীদ![৪৫৭]

মিনার[৪৫৮] শব্দটি সাতটি কবিতায়[৪৫৯] নয়বার 'উচুস্তম্ভ' বা 'আজানের জন্য ব্যবহৃত উঁচু চুড়া' অর্থে এসেছে–

তেমনি করিয়া কাবার মিনারে চড়িয়া মুয়াজ্জিন
আজানের সুরে বলে, কোনোমতে আজও বেঁচে আছে দ্বীন![৪৬০]

মিসকিন > মিস্‌কীন (مسکین) রিক্তহস্ত, নিঃস্ব, ভিখারী ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'নিঃস্ব' অর্থে এসেছে–

আমরা কাঙাল, আমরা গরীব ভিক্ষুক 'মিসকিন'
ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন ।[৪৬১]

মুনাজাত > মুনাজ.াত (مناجات) প্রার্থনা, আবেদন, গোপনকথা, নিভৃত আলাপ, মুনাজাত ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৬২] তিনবার 'মুনাজাত' বা 'প্রার্থনা' অর্থে এসেছে–

মজলুম যত মুনাজাত করে কেঁদে কয় "এয় খোদা,
খালেদের বাজু শম্‌শের রেখো সহি-সালামতে সদা!"[৪৬৩]

মুনাফেক/ মোনাফেক > মুনাফিক. (منافق) কপট, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ভণ্ড, শঠ, দ্বিমুখী ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৬৪] দু'বার 'কপট' অর্থে এসেছে–

দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেকদের চুরি,
মসজিদে ব'সে স্বার্থের তরে ইস্‌লামে হানা ছুরি![৪৬৫]

---

৪৫৬. বে-শরম: পুবের হাওয়া, সুব্‌হ উম্মেদ: জিঞ্জির
৪৫৭. নজরুল ইসলাম, 'সুব্‌হ উম্মেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ২৫২
৪৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মিনার' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৫৯. মানুষ: সাম্যবাদী, নকীব (২বার), খালেদ: জিঞ্জির, বাংলার আজিজ, দাড়িবিলাপ: সন্ধ্যা, অবতরনিকা (২বার): মরু-ভাস্কর, মোহররম: শেষ সওগাত
৪৬০. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৯
৪৬১. নজরুল ইসলাম, 'আর কত দিন?', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৪১
৪৬২. খালেদ (২বার): জিঞ্জির, দাদা: মরু-ভাস্কর
৪৬৩. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৫
৪৬৪. শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান, মিসেস এম রহমান: জিঞ্জির
৪৬৫. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

মুয়াজ্জিন[৪৬৬] শব্দটি আটটি কবিতায়[৪৬৭] এগারবার 'নামাজের জন্য আহবানকারী' অর্থে এসেছে–

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন
মুসলমানের রাত্রি তখন আর সকলের দিন ।[৪৬৮]

মুলুক[৪৬৯] শব্দটি সাতটি কবিতায়[৪৭০] নয়বার 'দেশ' বা 'রাজ্য' অর্থে এসেছে–

পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত!
তাই, তাদের তরে বরাদ্ধ ভাই আঘাত শুধু আঘাত ।[৪৭১]

মুসলিম[৪৭২] শব্দটি আটাশটি কবিতায়[৪৭৩] পঞ্চাশবার 'ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতি বা ব্যক্তি' অর্থে এসেছে–

আল্লা! এরাও মুসলিম, এরা রাসুলের উম্মত্
কেন পায়নি ক প্রেম আর ক্ষমা শান্তি ও রহমত?[৪৭৪]

মুসাফির[৪৭৫] শব্দটি দশটি কবিতায়[৪৭৬] এগারবার 'পথিক' বা 'ভ্রমণকারী' অর্থে এসেছে–

আরবের প্রাণ, আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্বদাই ।[৪৭৭]

মুশায়েরা > মুশা'আরাহ্ (مشاعرة) কাব্য প্রতিযোগিতা, কবি সম্মেলন ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৭৮] দু'বার 'কাব্য প্রতিযোগিতা' অর্থে এসেছে–

তেম্‌নি যখন গুলজার হয় শারাবখানা, 'মুশায়েরা',
মনে পড়ে রোকনাবাদের কুটীর তোমার পাহাড়-ঘেরা ।[৪৭৯]

---

৪৬৬. মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'মুয়াজ্জিন' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৬৭. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাশী, যুগের আলো: ফণি-মনষা, খালেদ, সুব্‌হ উম্মেদ, উমর ফারুক (৩বার): জিঞ্জির, বাংলার আজিজ: সন্ধ্যা, নতুন চাঁদ: নতুন চাঁদ, অবতরনিকা (২বার): মরু-ভাস্কর
৪৬৮. নজরুল ইসলাম, 'বাংলার আজিজ', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫১
৪৬৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মুলুক' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৭০. কামাল পাশা: অগ্নি-বীণা, অভিমানী: সংযোজন, দীওয়ান-ই-হাফিজ (২বার), দীল-দনদী: ফণি-মনষা, সুব্‌হ উম্মেদ: জিঞ্জির, আবাহন: সংযোজন, শাখ-ই-নবাত (২বার): ঝড়
৪৭১. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫
৪৭২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মুসলিম' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৭৩. আনোয়ার (৪বার), কোরবাণী (২বার), মোহররম: অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাশী, শহিদী ঈদ (২বার): ভাঙ্গার গান, ইন্দ্রপতন (২বার): চিত্তনামা, সাম্যবাদী: সাম্যবাদী, কাণ্ডারী হুশিয়ার: সর্বহারা, যা শত্রু পরে পরে , হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ: ফণি-মনষা, মিসেস এম রহমান, খালেদ (২বার), সুব্‌হ উম্মেদ (২বার), আমানুল্লাহ (২বার), উমর ফারুক: জিঞ্জির, নিসীথ অন্ধকার: সন্ধ্যা, নবীন চন্দ্র, হিতে বিপরীত (২বার): সংযোজন, মোবারকবাদ, আজাদ (৬বার): নতুন চাঁদ, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ: মরু-ভাস্কর, নিত্য প্রবল হও, মোহররম (৪বার), বকরীদ (৩বার) মহাত্মা মোহসিন, মোহসিন সম্মানে: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার), জীবনে যাহারা বাঁচিল না: ঝড়
৪৭৪. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৩৮
৪৭৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'মুসাফির' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৭৬. দীওয়ান-ই-হাফিজ: সংযোজন, মানুষ: সাম্যবাদী, মিসেস এম রহমান, আমানুল্লাহ: জিঞ্জির, প্রথম অশ্রু: সংযোজন, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (২বার), আজাদ: নতুন চাঁদ, পরভৃত, শৌশব লিলা: মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
৪৭৭. নজরুল ইসলাম, 'পরভৃত', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৭৫
৪৭৮. আয় বেহেশতে কে যাবি আয়?: জিঞ্জির, শাখ-ই-নবাত: ঝড়
৪৭৯. নজরুল ইসলাম, 'শাখ-ই-নবাত', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা > মোল্লা' (ملّا) বিজ্ঞ পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, আরবী-ফার্সী ভাষা ও ইসলামী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বংশীয় উপাধী বিশেষ ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায়[৪৮০] ছয়বার 'মৌলভী বা ইসলামী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি' অর্থে এসেছে–

আজ জল্লাদ নয় প্রহলাদ-সম মোল্লা খুন-বদন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যগ্রহ' শক্তির উদ্বোধন![৪৮১]

মোহর্রম/মোহররম > মোহ.র্‌রাম (محرم) আরবী মাসসমুহের প্রথম মাস।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৪৮২] সাতবার 'আরবী মাসের প্রথম মাস মোহররম' অর্থে এসেছে–

মুসলিমে মুসলিমে আনিয়াছে বিদ্বেষের বিষাদ,
কাঁদে আসমান জমিন, কাঁদিছে মোহররমের চাঁদ।[৪৮৩]

মৌলবী[৪৮৪] শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে;

'ইসলাম ধর্মে অভিজ্ঞ' অর্থে দু'টি কবিতায়[৪৮৫] চারবার–

দুনিয়াদারীর কাজ নিয়ে সব
দুনিয়ার লোক থাকে মাতি',
মৌলবী সা'ব দুনিয়া ভুলে'
জ্বালিয়ে রাখেন দ্বীনের বাতি।[৪৮৬]

'ক্বারী' অর্থে দু'টি কবিতায়[৪৮৭] দু'বার–

কাঠ-মোল্লার মৌলবীর
যুজ্‌দানে ইসলাম কয়েদ,
আজও ইসলাম আছে বেঁচে
তোমাদেরি তরে, মোজাদ্দেদ্![৪৮৮]

'মৌলবীরূপধারী মৌ বা মদলোভী ব্যক্তি' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

মদ-লোভীরে মৌলোভী কন,–
পান করে এই শারাব যারা,
যেমন মরে তেমনি ক'রে
গোরের পারে উঠবে তা'রা।[৪৮৯]

---

৪৮০. কামাল পাশা, কোরবাণী: অগ্নিবীণা, মানুষ (২বার): সাম্যবাদী, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২বার)
৪৮১. নজরুল ইসলাম, 'কোরবাণী', "অগ্নিবীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৬
৪৮২. মোহররম (২বার): অগ্নিবীণা, রীফ সর্দার: সন্ধ্যা, মোহররম (৪বার): শেষ সওগাত
৪৮৩. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম ', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১৩৭
৪৮৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ' মৌলবী' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৮৫. মৌলবী সাহেব (৩বার): সংযোজন, হুল ও ফুল: শেষ সওগাত
৪৮৬. নজরুল ইসলাম, 'মৌলবী সাহেব', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৯৯
৪৮৭. আমার কৈফিয়ৎ: সর্বহারা, রীফ সর্দার: সন্ধ্যা
৪৮৮. নজরুল ইসলাম, 'রীফ সর্দার', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৪৯
৪৮৯. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (৩২), "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

মৌলানা > মাওলানা (مولانا) ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী, ইসলাম বিষয়ক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, বন্ধু, অভিভাবক, মালিক ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৯০] দু'বার 'ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ' অর্থে এসেছে–

কোন শাস্ত্রী রা মৌলানা, বলো, জেনেছে তাহ্র ভেদ?
গাধার মতন রয়েছে ইহারা শাস্ত্র কোরান বেদ![৪৯১]

র

রদ[৪৯২] শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'প্রত্যাখ্যান' অর্থে এসেছে–

ফেলবে চিনে', মারবে প্রাণে, খোদার কালাম করবে রদ" ।
তালিব শুনে কাঁপ্‌ল ভয়ে, হাস্‌ল শুনে' মোহাম্মদ ।[৪৯৩]

রমজান > রামাদান (رمضان) আরবী নবম মাস, রোজার মাস; এ মাসে শারীরিকভাবে সামর্থবান নারী-পুরুষের জন্য সুব্‌হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ উপবাস থাকা ফরজ ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৪৯৪] তিনবার পবিত্র মাহে রমজান অর্থে এসেছে–

'মাহে রমজান' এসেছে যখন, আসিবে 'শবে কদর',
নামিবে তাঁহার রহমত এই ধূলির ধরার পর ।[৪৯৫]

রসুল > রাসূল (رسول) দূত, বার্তাবাহক, সংবাদ বাহক, মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহ প্রেরিত মহাপুরুষ, পয়গাম্বর, আল্লাহর পক্ষ থেকে সতন্ত্র পুস্তক ও শরীয়ত প্রাপ্ত নবী ইত্যাদি ।

শব্দটি নয়টি কবিতায়[৪৯৬] চৌদ্দবার 'আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ' অর্থে এসেছে–

আল্লা রাসুল মুখে বলে, তাঁর ক্ষমা পায়নিক এরা,
দেখেছে শুস্ক দামেস্ক শুধু, দেখেনি কা'বা ও হেরা ।[৪৯৭]

---

৪৯০. ফুল ও ফুল, গোড়ামী ধর্ম নয়: শেষ সওগাত
৪৯১. নজরুল ইসলাম, 'গোড়ামী ধর্ম নয়', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৬১
৪৯২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ' রদ' শব্দ দ্রষ্টব্য
৪৯৩. নজরুল ইসলাম, 'কৈশো', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৬
৪৯৪. সুবহ উম্মেদ: জিঞ্জির, কেন জাগাইলি তোরা: নতুন চাঁদ, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
৪৯৫. নজরুল ইসলাম, 'কেন জাগাইলি তোরা', "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৪
৪৯৬. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের বাশী, খালেদ, উমর ফারুক (৩বার): জিঞ্জির, সুরা শাম্‌স (২বার), সুরা তকভীর (২বার): আমপারা, কৈশোর, খদিজা: মরু-ভাস্কর, মোহররম (২বার): শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
৪৯৭. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

রহম > রাহ.ম (رحم) করুণা, দয়া, অনুগ্রহ, রহমত, আশিস, অনুকম্পা ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৪৯৮] দু'বার 'অনুগ্রহ' অর্থে এসেছে–

তুমি যেন সেই খোদার রহম্ এসেছিলে রূপ ধ'রে,
আর্শের ছায়া দেখাইয়া দিলে রূপের আর্শি ভ'রে ।[৪৯৯]

রহমত > রাহ.মাহ্ (رحمة) অনুগ্রহ, করুণা, কৃপা, দয়া, আশিস ইত্যাদি ।

শব্দটি সাতটি কবিতায়[৫০০] সাতবার 'দয়া' অর্থে এসেছে–

যেন উর্ধ্বের বরাভয় তুমি আল্লার রহমত্,
নিত্য দিয়াছ মৃত এ জাতিরে অমৃত শরবত্ ।[৫০১]

রাজী[৫০২] শব্দটি চারটি কবিতায়[৫০৩] পনরবার 'সম্মত' অর্থে এসেছে–

মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজী
সত্যের নামে চলিবেনা আর ফেরেববাজী![৫০৪]

রুহ/ রুহু > রুহ. (روح) আত্মা ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৫০৫] তিনবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

মালেকুল-মৌত করিবে কব্জ্ রুহ সেই খালেদের?–
হাজার রাজার চামড়া বিছায়ে মাজারে ঘুমায় শের![৫০৬]

ল

লওহ > লাওহ. (لوح) ফলক, বোর্ড, তক্তা, পাত, সাইনবোর্ড, শ্লেট, টেবলেট ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫০৭] দু'বার পবিত্র কোরআন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে যে ফলকে সংরক্ষিত ছিল, তা বুঝাতে এসেছে–

মহিমান্বিত মহা কোরআন এই
লিখিত সুরক্ষিত পাক "লওহে" ই ।[৫০৮]

---

৪৯৮. ওঠরে চাষী:নতুন চাঁদ, সালাম অস্ত রবি: ঝড়
৪৯৯. নজরুল ইসলাম, 'সালাম অস্ত রবি', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪
৫০০. কেন জাগাইলি তোরা, ঈদের চাঁদ: নতুন চাঁদ, সর্বহারা, কৈশোর: মরু-ভাস্কর, মোহররম: শেষ সওগাত, সালাম অস্ত-রবি, কবির প্রশান্তি: ঝড়
৫০১. নজরুল ইসলাম, 'সালাম অস্ত-রবি', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪
৫০২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ' রাজী' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫০৩. আমার কৈফিয়ত: সর্বহারা, খালেদ: জিঞ্জির, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ: মরু-ভাস্কর, জোর জমিয়াছে খেলা (১২বার): শেষ সওগাত
৫০৪. নজরুল ইসলাম, 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৯
৫০৫. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাশী, মিসেস এম রহমান, খালেদ: জিঞ্জির
৫০৬. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৬
৫০৭. সুরা বুরুজ: আমপারা, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৪৭)
৫০৮. নজরুল ইসলাম, 'সুরা বুরুজ', "আমপারা", নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

লানত > লা'নাত্ (لعنة) অভিসম্পাৎ, অভিশাপ, ধিক্কার, শাপ, লানত দেয়া, অনিষ্ঠ কামনা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অভিসম্পাৎ' অর্থে এসেছে–

লানত গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুম বাজে,
ধর্ম-ধ্বজা উড়ায় দাঁড়ি, 'গলিজ' মুখে কোরান ভাঁজে।[৫০৯]

লোকসান > নোকসান >.নোক.স.ান (نقصان) ক্ষতি, লোকসান, ঘাটতি, হ্রাস, স্বল্পতা, অভাব ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় 'ক্ষতি' অর্থে এসেছে–

আয় গুনাহ্‌গার, লাভ লোকসান খতিয়ে নে তোর এই বেলা,
আসবে না আর এমন বণিক, বস্‌বে না আর এই মেলা।[৫১০]

লোবান > লুবান (لبان) সুগন্ধি দ্রব্য, এক প্রকার আঠা জাতীয় বস্তু, যা সুগন্ধ লাভ করার জন্য আগুনে পোড়ানো হয়।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

শারাব সাকী ও রঙে রূপে
আতর লোবান ধুনা ধূপে
সয়লাব সব যাক ডুবে',[৫১১]

শ

শয়তান[৫১২] শব্দটি ছাব্বিশটি কবিতায় আটাশবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'প্রবঞ্চক' অর্থে তিনটি কবিতায়[৫১৩] তিনবার–

ভয়ে ভীরু ওরে ধর্মবীর।
আমরা হিংস্র চাই রুধীর।
শয়তান মোরা? আচ্ছা, তাই।
আমাদের পথে এসো না ভাই।[৫১৪]

'দূরাচার' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

ফিরে আসে দাবানল তবু নাই হুশ তিল!
ভাই আজ শয়তান, ভাই-এ মারে ঘুষ কিল![৫১৫]

---

৫০৯. নজরুল ইসলাম, 'আনন্দময়ীর আগমনে', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩২২
৫১০. নজরুল ইসলাম, 'কৈশোর', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৩
৫১১. নজরুল ইসলাম, 'নওরোজ', "জিঞ্জির", , নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫৮
৫১২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ' শয়তান' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫১৩. ধুমকেতু: অগ্নি-বীণা, দুঃশাসনের রক্ত পান: ভাঙ্গার গান, পাপ: সাম্যবাদী
৫১৪. নজরুল ইসলাম, 'দুঃশাসনের রক্ত পান', "ভাঙ্গার গান", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫২
৫১৫. নজরুল ইসলাম, 'আনোয়ার', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

'পাপাত্মা' অর্থে ছয়টি কবিতায়[৫১৬] ছয়বার–

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,

তোমার তখ্‌তে বসিয়া করিছে শয়তান ইন্‌সাফ্‌![৫১৭]

'ইবলিশ' অর্থে ষোলটি কবিতায়[৫১৮] আঠারবার–

শয়তান তা'রে শেষ করিয়াছে, ইমান লয়েছে কেড়ে',

পরান গিয়াছে মৃত্যু পুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে'![৫১৯]

শয়তানী > শায়তানী (شيطانى) শয়তানের কাজ, নষ্টামী ইত্যাদি ।

শব্দটি আটটি কবিতায়[৫২০] আটবার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

ইমান! ইমান! বল রাতদিন, ইমান কি এত সোজা?

ইমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানী বোঝা?[৫২১]

শরবৎ > শরবত > শারবাহ্‌ (شربة) মিষ্ট শীতল পানীয় ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫২২] দু'বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

জেদ্দার পূর্বে মক্কা, মদিনা, চৌদিকে পর্বত,
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর ওক্ত,

ঘন উথলে অদূরে 'জম্‌-জম্‌ শরবৎ![৫২৩]

---

৫১৬. রণ-ভেরী: অগ্নি-বীণা, ফরিয়াদ: সর্বহারা, পথের দিশা: ফণি-মনষা, উমর ফারুক: জিঞ্জির, অনাগত; মরু-ভাস্কর, চির বিদ্রোহী: শেষ সওগাত

৫১৭. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮১

৫১৮. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাঁশী, ইন্দ্রপতন: চিত্তনামা, পাপ, নারী, কুলি-মজুর: সাম্যবাদী, কৃষাণের প্রাণ: সর্বহারা, সাবধানী ঘন্টা: ফণি-মনষা, ঈদ মোবারক: জিঞ্জির, সুরা নাস, সুরা তকভীর: আমপারা, আজাদ: নতুন চাঁদ, নওকাবা (২বার): মরু-ভাস্কর, মোহররম, বিশ্বাস ও আশা, গোড়ামী ধর্ম নয় (২বার): শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ওমর-খৈয়াম (১৫৪)

৫১৯. নজরুল ইসলাম, 'বিশ্বাস ও আশা', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৪২

৫২০. আনোয়ার: অগ্নি-বীণা, সাবধানী ঘন্টা: ফণি-মনষা, রীফ-সর্দার: সন্ধ্যা, মোবারকবাদ, কৃষকের ঈদ: নতুন চাঁদ, আল্লাহর রাহে ভিক্ষা দাও, গেড়ামী ধর্ম নয়, কচুরীপানা: শেষ সওগাত

৫২১. নজরুল ইসলাম, 'কৃষকের ঈদ' "নতুন চাঁদ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৪৩

৫২২. নওরোজ: জিঞ্জির, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাঁশী

৫২৩. নজরুল ইসলাম, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', "বিষের-বাঁশী", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

শরাব[৫২৪]শব্দটি আঠারটি কবিতায়[৫২৫] একশত চারবার 'শুরা বা মদ্য' অর্থে এসেছে–

রোম সম্রাট শরাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে,
ইস্তাম্বুলী বাদশার যত নজুম আয়ু মাপে![৫২৬]

শরিক > শরীক > শারীক (شريك) অংশিদার, ভাগীদার, অংশগ্রহণকারী, দোসর ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;
'অংশীদার' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

এক সে পরম বিচারক, তাঁর শরীক কেহ নাই,
কাহারে শাস্তি দেন তিনি, দেখো দু'দিন পরে তা, ভাই![৫২৭]

'অংশগ্রহণ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

"হাশেম," "জোহরা" গোত্রের যত সেরা সর্দার
শরিক হইল শুভক্ষণে সে সালিশী সভার।[৫২৮]

শরীফ > শারীফ্ (شريف) ভদ্র, অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাবান, মহৎ ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫২৯] দু'বার 'সম্ভ্রান্ত' অর্থে এসেছে–

আরবী ভাষার ধাত্রী-মা ছিল এই সে গোষ্ঠী 'বনি সায়াদ'
এই গোষ্ঠীতে রাখিতে শিশুরে সব সে শরিফ করিত সাধ।[৫৩০]

শরিয়ত > শরীয়ত > শারী'আহ্ (شريعة) ইসলাম ধর্মের বিধি-নিষেধ, ইসলাম ধর্মীয় আইন-কানুন, বিধান, আইন, পথ, পন্থা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান' অর্থে এসেছে–

মন কহে, আজ ফুটল যখন এস্তার এই গোলাপ গুল্
শরিয়তের আজ খেলাফ্ ক'রে বেদম আমি করব ভুল।[৫৩১]

---

৫২৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ' শরাব' শব্দ দ্রষ্টব্য

৫২৫. বাদল প্রাতের শরাব, শরাবান তহুরা: পুবের হাওয়া, দীওয়ান-ই-হাফিজ (৫বার): সংযোজন, দীল-দরদী, সুরকুমার: ফণি-মনষা, অনামিকা, ফাল্গুণী: সিন্দু-হিন্দোল, খালেদ, সুবৃহ্ উম্মেদ, নওরোজ, ঈদ মোবারক, আয় বেহেশ্তে কে যাবি আয় (৩বার): জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (২১বার), আব কত দিন? (২বার), চাঁদ, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ: মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৫৪বার), শাখ-ই-নবাত (৮বার): ঝড়

৫২৬. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ' "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৫

৫২৭. নজরুল ইসলাম, 'গোঁড়ামী ধর্ম নয়', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৬২

528. নজরুল ইসলাম, 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ' "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৮

৫২৯. সুবৃহ্ উম্মেদ: জিঞ্জির, পরভৃত: মরু-ভাস্বর

৫৩০. নজরুল ইসলাম, 'পরভৃত' "মরু-ভাস্বক ", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৮

৫৩১. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" (৮৯), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

শর্ত > শর্‌ত্. (شرط) চুক্তি বিষয়ক নিয়ম বা ধারা, পূর্বশর্ত ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় চারবার 'চুক্তি বিষয়ক নিয়ম বা ধারা' অর্থে এসেছে–

আল্লার নামে শপথ করিল হাজির সবে–
সন্ধির সব শর্ত এবার কায়েম র'বে।[৫৩২]

শহীদ[৫৩৩] শব্দটি বাইশটি কবিতায় চল্লিশবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'সত্য ও ন্যায়ের পথে আত্মোৎসর্গকারী' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[৫৩৪] তেরবার–

স্বাধীন হাতের পূত মাটি দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চুঁড়া? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিদ![৫৩৫]

'দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবনদানকারী' অর্থে সতরটি কবিতায়[৫৩৬] সাতাশবার–

হে শহীদ! বীর! এই দোয়া ক'রো আরশের পায়া ধ'রি–
তোমারি মতন মরি যেন হেসেখুনের মোহরা পরি'![৫৩৭]

শাফায়াৎ/শাফায়াত > শাফা'আহ্ (شفاعة) সুপারিশ, মধ্যস্থতা, কারো পক্ষে অনুরোধ, নিবেদন ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৫৩৮] তিনবার 'সুপারিশ' অর্থে এসেছে–

ইবরাহিমের মত পুত্রেরে আল্লার রাহে দাও,
নৈলে কখনো মুসলিম নও, মিছে শাফায়াৎ চাও![৫৩৯]

শামিল > শামিল্ (شامل) অন্তর্ভূক্ত, পরিব্যাপ্ত, ব্যাপক, সাধারণ ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৪০] দু'বার 'অন্তর্ভূক্ত' অর্থে এসেছে–

সকলের পিছে নহে বটে জমাত্-শামিল নয়,
উহাদের চোখে হিন্দের মত নাই বটে নিদ্-ভয়![৫৪১]

---

৫৩২. নজরুল ইসলাম, 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ' "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৯

৫৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ' শহীদ' শব্দ দ্রষ্টব্য

৫৩৪. কামাল পাশা (৯বার): অগ্নি-বীণা, অশ্বিনীকুমার, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব: ফণি-মনষা, সুব্‌হ্-উম্মেদ, ঈদ মোবারক:জিঞ্জির

৫৩৫. নজরুল ইসলাম, 'হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব', "ফণি-মনসা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৯০

৫৩৬. রণভেরী (২বার), শাত-ইল-আরব (২বার), কোরবাণী, মোহররম (২বার): অগ্নি-বীণা, সেবক: বিষের-বাঁশী, শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান, কৃষাণের গান, আমার কৈফিয়ত: সর্বহারা, খালেদ (৪বার), আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়, উমর ফারুক: জিঞ্জির, রীফ সর্দার (৩বার): সন্ধ্যা, ঈদের চাঁদ (২বার): নতুন চাঁদ, ডুবিবেনা আশা তরী, বকরীদ (২বার), আল্লার রাহে ভিক্ষা দাও: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

৫৩৭. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৮

৫৩৮. খেয়াপারের তরণী: অগ্নি-বীণা, শাদী মোবারক: মরু-ভাস্কর, বকরীদ: শেষ সওগাত

৫৩৯. নজরুল ইসলাম, 'বকরীদ' "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৫০

৫৪০. খালেদ, নওরোজ: জিঞ্জির

৫৪১. নজরুল ইসলাম, 'খালেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪৯

শূরু, সুরু > শুরূ' (شروع) আরম্ভ, সুচনা, আরম্ভ করা, তাক করা ইত্যাদি ।

শব্দটি পাঁচটি কবিতায়[৫৪২] পাঁচবার 'শুরু' বা 'আরম্ভ' অর্থে এসেছে–

বাজে বাদলের মাদল ঝাঁজর মৃদঙ্গ গুরুগুরু
মাথার উপরে ছাতার তাম্বু, বৃষ্টি হয়েছে শুরু ।[৫৪৩]

শীত[৫৪৪] শব্দটি ষোলটি কবিতায় আঠারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'শীতকাল' অর্থে এগারটি কবিতায়[৫৪৫] তেরবার–

শীতের জরা দূর হয়েছে, ছুটছে বাহার-গুল,
গুল্‌শনে গুল ফুটল যখন– নাই তুমি বুলবুল ।[৫৪৬]

'শীত' অর্থে পাঁচটি[৫৪৭] কবিতায় পাঁচবার–

দরিদ্রে ভালোবেসে যার ভুঁড়ি ফেপে হ'ল ধামা ঝুড়ি,
শীতের দিনেও চর্ব্বি গলিয়া প'ড়ে চাপকান ফুঁড়ি',[৫৪৮]

শোকর > শোকর্‌ (شکر) কৃতজ্ঞতা, শোকরিয়া, ধন্যবাদ, প্রশংসা ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'কৃতজ্ঞতা' অর্থে এসেছে–

বৃদ্ধ তালিব মুনিয়া পরম ভাগ্য মানি'
খোদারে স্মরিয়া ভেজিল শোকর্‌ জুড়িয়া পানি ।[৫৪৯]

স

সওয়াব > ছাওয়াব্‌ (ثواب) প্রতিদান, প্রতিফল, পুরস্কার, পূণ্য ইত্যাদি ।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'পূণ্য' অর্থে এসেছে–

ওরে ফাঁকিবাজ, ফেরেব-বাজ,
আপনারে আজ দিসনে লাজ,–
গরু ঘুষ দিয়ে চাস সওয়াব?[৫৫০]

---

৫৪২. ইন্দ্রপতন: চিত্তনামা, আমার কৈফিয়ত: সর্বহারা, সাবধানী: ফণি-মনষা, আয় বেহেশতে কে যাবি আয়: জিঞ্জির, জোর জমিয়াছে খেলা: শেষ সওগাত

৫৪৩. নজরুল ইসলাম, জোর জমিয়াছে খেলা' "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৬৪

৫৪৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ' শীত' শব্দ দ্রষ্টব্য

৫৪৫. পুষ্করিণী: দোলন চাঁপা, হার-মানা-হার, বিধুরা-পথিক-প্রিয়া: ছায়ানট, সান্তনা: চিত্তনামা, রক্ত পতাকার গান: ফণি-মনষা, উন্মনা, বাসন্তি (৩বার), মঙ্গলাবরণ: সিন্ধু-হিন্দোল, বাংলার আজিজ: সন্ধ্যা, সুরা কোরাইশ: আমপারা, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৭৪)

৫৪৬. নজরুল ইসলাম, 'বাংলার আজিজ', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫২

৫৪৭. নিরুদ্দেশের যাত্রী: ছায়ানট, গরীবের ব্যাথা, আরবী ছন্দের কবিতা: সংযোজন, অঘ্রাণের সওগাত: জিঞ্জির, মোহররম: শেষ সওগাত

৫৪৮. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৩৮

৫৪৯. নজরুল ইসলাম, খদিজা' "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১০৭

৫৫০. নজরুল ইসলাম, 'শহিদী ঈদ', "ভাঙ্গার গান", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সন্দক > সুন্দূক্‌. (صندوق) সিন্দুক, বাক্স, ট্রাঙ্ক, কন্টেইনার, তহবিল, ফাণ্ড, ভাণ্ডার, কোষাগার ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সিন্দুক' অর্থে এসেছে–

ঐ বন্দুক, তোপ সন্দক তোর পড়ে থাক,

স্পন্দুক বুক যার![৫৫১]

সফর > সাফার্‌ (سفر) ভ্রমণ, যাত্রা, প্রস্থান, রওয়ানা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'ভ্রমণ' অর্থে এসেছে–

এল আজ মুত্তালিবের চোখের মণি, শান্তি শোকের,

এল আজ সফর ক'রে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের।[৫৫২]

সবর[৫৫৩] শব্দটি চারটি কবিতায়[৫৫৪] চারবার ধৈর্য অর্থে এসেছে–

স্বার্থান্বেষী চতুরের কাছে "সবর" ধৈর্য আর,

ওগো কাঙালের পরম বন্ধু, কতদিন খাবে মার?[৫৫৫]

সাকী[৫৫৬] শব্দটি আঠারটি কবিতায়[৫৫৭] একষট্টিবার 'সুরা পরিবেশনকারী' অর্থে এসেছে–

শারাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে, সাকী হেথায় এলাম ফের?

তৌবা ক'রেও পাইনে রেহাই হাত হতে ভাই এই পাপের।[৫৫৮]

সাকিম > সাক্বীম (سقيم) রোগাক্রান্ত, রুগ্ন, পীড়িত, অসুস্থ্য, রোগা, দুর্বল ইত্যাদি।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৫৯] দু'বার 'পীড়িত' বা 'অসুস্থ' অর্থে এসেছে–

ঢুঁড়ে ফেরে হেথা যুবা সেলিম

নূরজাহানের দূর সাকিম,[৫৬০]

---

৫৫১. নজরুল ইসলাম, 'রণ-ভেরী' "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪০
৫৫২. নজরুল ইসলাম, 'শৈশব লীলা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৭৮
৫৫৩. **মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'সবুর' শব্দ দ্রষ্টব্য**
৫৫৪. নওরোজ: জিঞ্জির, অভয় সুন্দর, ওঠরে চাষী: নতুন চাঁদ, আর কত দিন?: শেষ সওগাত
৫৫৫. নজরুল ইসলাম, 'আর কত দিন?' "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৪০
৫৫৬. **মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'সাকী' শব্দ দ্রষ্টব্য**
৫৫৭. বাদল প্রাতের শরাব (২বার), শরাবান তহুরা: পুবের হাওয়া, হাফিজ (৯বার), দীল দরদী, সুরকুমার; ফণি-মনষা, সিন্ধু (২বার), চাঁদনী রাতে (২বার): সিন্দু হিন্দোল, বার্ষিক সওগাত, খালেদ, সুবহ্‌ উম্মেদ, নওরোজ, ঈদ মোবারক, আয় বেহেশতে কে যাবি আয়?: জিঞ্জির, সুরের দুলাল: সন্ধ্যা, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (২বার), আর কত দিন? (৪বার): নতুন চাঁদ, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২২বার), শাখ-ই-নবাত (৮বার): ঝড়
৫৫৮. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম "(৬৯), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০৬
৫৫৯. নওরোজ: জিঞ্জির, অনাগত: মরু-ভাস্কর
৫৬০. নজরুল ইসলাম, নওরোজ' "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

সাদিক > স.াদিক (صادق) সত্যবাদী, সৎ, সত্য, খাঁটি, প্রকৃত, আন্তরিক ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৫৬১] তিনবার 'সত্যবাদী' অর্থে এসেছে–

ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল রব হেজাজের সবখানে,
এসেছে সাদিক আমীন মোহাম্মদ আরবস্তানে।[৫৬২]

সাফ[৫৬৩] শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'নির্মল' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল্ সাফ্![৫৬৪]

'নিশ্চিহ্ন' অর্থে চারটি কবিতায়[৫৬৫] ছয়বার–

খুব কিয়া ভাই খুব কিয়া!
বুজ্‌দিল্ ঐ দুষ্‌মন্ সব বিল্‌কুল্ সাফ হো গিয়া![৫৬৬]

সালাত > স.ালাত (صلوة) নামাজ, দোয়া, প্রার্থনা, দরূদ, অনুগ্রহ, রহমত ইত্যাদি।

শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'নামাজ' অর্থে তিনটি কবিতায়[৫৬৭] তিনবার–

কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ঐ শোন্ শোন্ "সালাতের" ধ্বনি "খায়রুম্-মিনান্নৌম!"[৫৬৮]

'দোআ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

তরুর ছায়া স'রে আসে বাঁচাতে গো রোদের তাত।
জন্তু জড় কইছে "সালাত" নতুন দিনের "তেলেস্‌মাত"![৫৬৯]

---

৫৬১. শাদী মোবারক, নওকাবা, খদিজা: মরু-ভাস্কর
৫৬২. নজরুল ইসলাম, 'নওকাবা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১৯
৫৬৩. **মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'সাফ' শব্দ দ্রষ্টব্য**
৫৬৪. নজরুল ইসলাম, 'খেয়াপারের তরণী' "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৪
৫৬৫. কামাল পাশা (৩বার), আনোয়ার: অগ্নি-বীণা, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (২৮), ঘোষণা: ঝড়
৫৬৬. নজরুল ইসলাম, 'কামাল পাশা', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৪
৫৬৭. রীফ সর্দার: সন্ধ্যা, অবতরণিকা, কৈশোর: মরু-ভাস্কর
৫৬৮. নজরুল ইসলাম, 'অবতরণিকা'"মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৫৫
৫৬৯. নজরুল ইসলাম, 'কৈশোর': মরু-ভাস্কর, নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সালাম > সালাম্ (سلام) শান্তি, সালাম, অভিবাদন, নিরাপত্তা, শ্রদ্ধা, সম্মান, নিবেদন ইত্যাদি ।

'অভিবাদন' অর্থে উনিশটি কবিতায়[৫৭০] তেইশবার–

ফেরেশ্‌তা সব করিছে সালাম, দেবতা নোয়ায় মাথা,
ভগবান-বুকে মানবের তরে শ্রেষ্ঠ আসন পাতা![৫৭১]

'শ্রদ্ধা' অর্থে আটটি কবিতায়[৫৭২] দশবার–

শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে
ঢাকেন মোদের সকল আয়েব,
পাক কদমে সালাম জানাই
নবীর নায়েব মৌলবী সাহেব ।[৫৭৩]

সালিশ > ছালিছ্ (ثالث) মধ্যস্থ, মিমাংসা বা নিস্পত্তি করার উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষ কর্তৃক গৃহীত তৃতীয় ব্যক্তি ইত্যাদি ।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৭৪] দু'বার 'মিমাংসা বা নিস্পত্তি করার উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষ কর্তৃক গৃহীত তৃতীয় ব্যক্তি' উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে–

সকল গোষ্ঠী সর্দার ওঠে আনন্দ চীৎকারী'–
"সম্মত এরে মানিতে সালিশ– আমীন এ ব্রত-চারী!"[৫৭৫]

সাহারা/শাহারা > স.াহ.ারা' (صحراء) মরুভূমি, নির্জন প্রান্তর, জনমানবহীন, উষর, বালুকাময়, হিমশীতল, হিমেল, বালুকাবর্ণ উত্যাদি ।

শব্দটি তিনটি কবিতায়[৫৭৬] তিনবার 'মরুভূমি' অর্থে এসেছে–

জীবন ঘিরিয়া ধু ধু করে আজ শুধু সাহারার বালি,
অগ্নি-সিন্ধু করিতেছে পান দোজখ করিয়া খালি![৫৭৭]

---

৫৭০ কামাল-পাশা (২বার): অগ্নি-বীণা, ফাতেহা-ই-দোয়াজ দাহম: বিষের-বাঁশী, ইন্দ্রপতন: চিত্তনামা, বন্দনা গান, লাল সালাম, দিওয়ানে হাফিজ (২বার), আনন্দময়ীর আগমনে: সংযোজন, সাবধানী ঘন্টা, দীল দরদী: ফণী-মনসা, চিরঞ্জিব জগলুল (২বার), উমর ফারুক: জিঞ্জির, অবতরনিকা, পরভুত, শাককুস সাদর (২বার), খদিজা, সম্প্রদান: মরু-ভাস্কর, নারী: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, সালাম অস্ত রবি: ঝড়

৫৭১. নজরুল ইসলাম, 'ইন্দ্রপতন', "চিত্তনামা", নজরুল রচনাবলী, ১ম খ., পৃ. ২৬৭

৫৭২. ল্যাবেঙিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গিত: পূবের হাওয়া, মৌলবী সাহেব, মুকুলের উদ্বোধন, আনন্দময়ীর আগমনে: সঙযোজন, আমানুল্লাহ, উমর ফারুক:(৩বার): জিঞ্জির, রীফ সর্দার: সন্ধ্যা, মহাত্মা মহসিন: শেষ সওগাত

৫৭৩. নজরুল ইসলাম, 'মৌলবী সাহেব', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩০০

৫৭৪. সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, নওকাবা: মরু-ভাস্কর

৫৭৫. নজরুল ইসলাম, 'নওকাবা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ, ৪, পৃ. ১১৮

৫৭৬. শাত-ইল আরব: অগিান-বীণা, মিসেস এম রহমান, উমর ফারুক: জিঞ্জীর

৫৭৭. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জীর", নজরুল রচনাবলী, খ, ২, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব[৫৭৮] শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'মনিব' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

সাহেব, গোলাম, খুনী, আশেক,
বিবি বাঁদী,– সব আজিকে এক![৫৭৯]

'বন্ধু' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

হুশিয়ার হও সাহেব! যেন
খুশি হয়ে কালের কুলি
তোমার জীবন-গেহ থেকে
আস্‌বাব সব উঠিয়ে নে' যায়॥[৫৮০]

সিজ্‌দা / সেজ্‌দা > সাজদাহ্ (سجدة) সিজদাহ্, মস্তক অবনতকরণ ইত্যাদি।

শব্দটি নয়টি কবিতায়[৫৮১] দশবার 'সেজদাহ্' অর্থে এসেছে–

থাকি কি না থাকি এই দুনিয়ায় তোমরা থাকিয়া দেখো,
সেদিন সেজ্‌দা ক'রো আল্লারে, কাঁদিয়া তাহারে ডেকো![৫৮২]

সিদ্দিক > সি.দ্দীক. (صديق) পরম সত্যবাদী। সত্যবাদিতার জন্য কিংবদন্তিতে পরিণত প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের উপাধী।

শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'সিদ্দীক' বা পরম সত্যবাদী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে বুঝানো হয়েছে–

যে সিদ্দিক ও আমীনে খুঁজেছে বাইবেল আর ঈসা,
তওরাত দিল বারে বারে সে যেই মোহাম্মদের দিশা,[৫৮৩]

সেরাত > সি.রাত. (صراط) পথ, পন্থা, রাস্তা ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় দু'বার 'পুলসেরাত' অর্থে এসেছে–

বাঁচায়ে আপনা ছেলে-মেয়ে
জান্নাত পানে আছ চেয়ে
ভাবিছ সেরাত হবেই পার।[৫৮৪]

---

৫৭৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'সাহেব' শব্দ দ্রষ্টব্য
৫৭৯. নজরুল ইসলাম, 'নওরোজ', "জিঞ্জীর", নজরুল রচনাবলী, খ, ২, পৃ. ১৫৭
৫৮০. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম "(৪২), নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১৬
৫৮১. খালেদ (২ বার), সুবহ উম্মেদ, উমর ফারুক: জিঞ্জির, সুরা আলাক, সুরা ইনশিকাক: আমপারা, অনাগত, কৈশোর: মরু-ভাস্কর, নিত্য প্রবল হও, একি আল্লার কৃপা নয়?: শেষ সওগাত
৫৮২. নজরুল ইসলাম, 'এ কি আল্লার কৃপা নয়?', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৬
৫৮৩. নজরুল ইসলাম, 'নওকাবা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ, ৪, পৃ. ১১৯
৫৮৪. নজরুল ইসলাম, 'ঈদ', "ভাঙ্গার গান", নজরুল রচনাবলী, ১ম খ., পৃ. ২৫৫

হক > হ.কক. (حق) সত্য, ন্যায়, হক, সঠিক, প্রকৃত, নিশ্চিৎ, যথাযথ, ন্যায্য ইত্যাদি।

শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'সত্য' অর্থে এসেছে-

দিন-দুনিয়ার আজ খুনিয়ার রোজ-হাশরের মেলা,
করছে অসুর হক-কে না-হক, হক তা'য়ালার হেলা![৫৮৫]

হজ / হজ্জ > হ.াজ্জ (حج) পূণ্যভূমি মক্কায় সমাবেশ ভিত্তিক মুসলমানদের অন্যতম প্রধান এবাদত।

শব্দটি দু'টি কবিতায়[৫৮৬] দু'বার উপরোক্ত অর্থে এসেছে-

এরাই কা'বার হজের যাত্রী, এদেরই দস্ত চুমি'
কওসর্ আনে নিঙারিয়া রণক্ষেত্রের মরুভূমি![৫৮৭]

হজরত / হযরত[৫৮৮] শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'বিশ্ব নবীর বিশেষণ হিসেবে 'হযরত' শব্দটি সাতটি কবিতায়[৫৮৯] সাতবার এসেছে-

হযরতের আর খদিজার ছিল একই গোষ্ঠী বংশ-শাখা,
আরব-পূজ্য যশোমণ্ডিত ত্যাগ-সুন্দর গরিমা-মাখা।[৫৯০]

'মহাসম্মানিত' অর্থে একটি কবিতায় একবার-

আছিল "হাজর্ আসওয়াদ" নামে প্রস্তর কা'বার দ্বারে,
কা'বার বোদন-দিনে হজরত ইবরাহিম সে তা'রে[৫৯১]

হবীব / হাবীব > হ.াবীব (حبيب) বন্ধু, সুহৃদ, প্রিয়জন, প্রিয়তম, প্রেমিক ইত্যাদি।

শব্দটি নয়টি কবিতায়[৫৯২] নয়বার আল্লার প্রিয়তম বান্দা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)কে বুঝানো হয়েছে।

লীলা-রসিক সে খোদার খেলা গো বুঝিতে পারে না এ চরাচর,
হবীব খোদার সাজিল আবার তাঁরি ইঙ্গিতে সওদাগর![৫৯৩]

---

৫৮৫. নজরুল ইসলাম, সেবক', "বিষের-বাঁশী", নজরুল রচনাবলী, ১ম খ., পৃ. ৬৮
৫৮৬. চাষীর-গীত: সংযোজন, বকরীদ: শেষ সওগাত
৫৮৭. নজরুল ইসলাম, 'বকরীদ', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৫০
৫৮৮. **মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় 'হজরত' শব্দ দ্রষ্টব্য**
৫৮৯. ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম: বিষের-বাঁশী, মৌলবী সাহেব: সংযোজন, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, খদিজা, নওকাবা: মরু-ভাস্কর, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম
৫৯০. নজরুল ইসলাম, 'শাদী-মোবারক', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ, ৪, পৃ. ১০২
৫৯১. নজরুল ইসলাম, 'নওকাবা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১৭
৫৯২. শহিদী ঈদ: ভাঙ্গার গান, খালেদ, উমর ফারুক: জিঞ্জির, অনাগত, আলো-আঁধার, সাককুস সাদর, সর্বহারা, খদিজা, সম্প্রদান: মরু-ভাস্কর
৫৯৩. নজরুল ইসলাম, 'খদিজা', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

হায়দর / হায়দরী > হ.ায়দার্ (حیدر) সিংহ, শক্তিশালী, বলবান ইত্যাদি।

শব্দটি চারটি কবিতায় চারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে;

'সিংহ' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

জাগো, ওঠো মুসলিম্, হাঁকো হায়দরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক![৫৯৪]

হযরত আলী (রা.)এর উপাধী 'হায়দর' অর্থে তিনটি কবিতায়[৫৯৫] তিনবার–

আবুবকর উস্‌মান, উমর আলী হায়দর্,
দাড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর![৫৯৬]

হাওয়া[৫৯৭] শব্দটি তেতাল্লিশটি কবিতায়[৫৯৮] চৌষট্রিবার 'বাতাস' অর্থে এসেছে–

আসবে আবার আশিন হাওয়া, শিশির ছেঁচা রাত্রি,
থাকবে সবাই থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রী!
আসবে শিশির রাত্রি![৫৯৯]

---

৫৯৪. নজরুল ইসলাম, 'মোহররম' "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৫০

৫৯৫. রণ-ভেরী, শাত-ইল আরব, খেয়া-পারের তরণী: অগ্নি-বীণা

৫৯৬. নজরুল ইসলাম, 'খেয়াপারের তরণী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৪

৫৯৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় 'হাওয়া' শব্দ দ্রষ্টব্য

৫৯৮. বিদ্রোহী, আগমণী: অগ্নি-বীনা, ঝড় (২বার): বিষের-বাঁশী, অবেলার ডাক (৩বার), পুজারিণী (২বার), আশান্বিতা (২বার): দোলন-চাঁপা, চৈতি হাওয়া (৩বার), অ-বেলায়, শেষের গান, নিরুদ্দেশের যাত্রী, শায়ক-বেঁধা পাখি, পলাতক, আশা, মুক্তিবীর, চির-চেনা, পূবের হাওয়া:ছায়ানট, স্মরণে (৪বার), বাদল-প্রাতের শরাব: পূবের হাওয়া, সুন্দরী, মুকুলের উদ্বোধন, দীওয়ান-ই-হাফিজ: সংযোজন, দীল-দরদী, সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ গীতি: ফণি-মনসা, সিন্ধু, পথের স্মৃতি (২বার), উন্মনা, মাধবী-প্রলাপ: সিন্ধু-হিন্দোল, খোশ আমদেদ, চিরঞ্জিব জগলুল: জিঞ্জির, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (৩বার), নতুন চাঁদ, নিরুক্ত, দুর্বার যৌবন: নতুন চাঁদ, অবতরণিকা, অনাগত (২বার), পরভৃত, প্রত্যাবর্তন, কৈশোর (২বার): মরু-ভাস্কর, সকল পথের বন্ধু: শেষ সওগাত, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (৬বার), উঠিয়াছে ঝড়, জীবনে যাহারা বাঁচিল না (২বার), শাখ-ই-নবাত: ঝড়

৫৯৯. নজরুল ইসলাম, 'অভিষাপ', "দোলন-চাঁপা" নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল-এর আরবী শব্দ-ব্যবহার: প্রকৃতি, শব্দগত তুলনা ও বৈশিষ্ট্য বিচার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দ ব্যবহারের ইতিহাস অনেক পুরনো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বর্তমানে যতটা সমৃদ্ধ, সূচনাপর্বে তেমনটা ছিল না। আজকের বাংলা ভাষার এ ঐতিহ্যবাহী অবস্থানে আসার পিছনে রয়েছে বহু ভাষাগোষ্ঠীর অবদান। বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমনের পর থেকেই বাংলা ভাষায় ওসব ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব পড়তে থাকে। বিশেষত আরবী-ফার্সীর প্রভাব চোখে পড়ার মতো।

ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ ইব্‌ন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে প্রায় ছয়শো বছরেরও (১২০৩-১৮৩৭ খৃ.) অধিক সময় এ দেশের রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সী এবং আরবী ভাষায় রচিত আল-কোরআন ও আল-হাদিস ছিল মুসলিম শাসনে আইনের প্রধান উৎস। ফলে আরবী ও ফার্সী ভাষা এ দেশের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপকভাবে মিশে যায়। তাছাড়া মোট বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মুসলিম বলে ধর্মীয় কারণেও আরবী ভাষা চর্চা ও আরবী পরিভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে আরবী ভাষা এ দেশীয় ভাষা বাংলার সাথে মিশে গেছে।

তাছাড়া সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসনামলের (১২০৩-১৭৫৭ খৃ.) অধিকাংশ শাসকই ছিলেন তুর্কী মুসলমান।[১] সেমেটিক রক্তের বিজয়ী তুর্কী শাসক ও তাদের অনুগামী আরব ও ইরানের বণিক, ধর্ম প্রচারক, আলেম-ওলামা ও সুফী-সাধকগণ আরবী-ফার্সী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২] উল্লিখিত বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলায় আরবী ও ফার্সী ভাষার আমদানী হয় এবং রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় তা শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন হয়ে উঠে। তুর্কীরা ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমান আর সংস্কৃতিতে ফার্সী। তাঁরা তুর্কী ভাষায় কথা বলতো, রাজনীতিতে ফার্সী এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আরবী ভাষা ব্যবহার করতো।[৩] এভাবে রাজার ভাষার প্রভাব প্রজাসাধারণের উপর পড়তে থাকে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে রচিত বড়ু চণ্ডিদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কয়েকটি আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ থেকে।[৪]

তুর্কী আমলে বহু সূফী-সাধক বাংলায় আগমন করেন। এদের মধ্যে মুসলিম বাংলার খ্যাতনামা দরবেশ ও বিদ্বান ব্যক্তি আল্লামা শেখ শরফুদ্দিন আবূ তাওয়ামা, তাঁর জামাতা শরফুদ্দিন আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া মানেরী, মাওলানা তকিউদ্দীন আরাবী, গাজী মুলক ইকরাম খান, খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর শিষ্য আবদুল্লাহ কিরমানী, মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবী, বদরুদ্দীন আল্লামা 'বদরশাহ', হযরত শাহ্ জালাল

---

১. মাহমুদ সবুক্তগীন (গজনীর রাজা), মোহাম্মদ ঘোরী (পৃথিরাজকে যিনি পরাজিত করেন), কুতুবুদ্দিন (ভারতের প্রথম মুসলমান সুলতান), এবং বঙ্গ বিজেতা ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ ইব্‌ন বখতিয়ার খিলজি।

২. ওয়াকিল আহমদ. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত (ঢাকা: খান ব্রাদার্স, ২০০২), ৩য়,সং. পৃ. ৯৭

৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৭

৪. শব্দগুলো হচ্ছে- কামান (ধনু),খরমুজা, মুজরিয়া, মজুর, বাকী, লেম্বু (নেবু), আফার (প্রচুর) ইত্যাদি। দ্রঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাংলা সাহিত্যের কথা (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

ইয়ামেনী ও মখদুম শেখ জালালুদ্দীন তিবরিজী (র.) অন্যতম। জালালুদ্দীন তিবরিজী (র.)–এর বহু অলৌকিক কাহিনী হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের 'শেক শুভোদয়া' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'শেক শুভোদয়া' গ্রন্থে অনেক আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।[৫]

তুর্কী আমলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিদর্শন 'শূন্য পুরাণ'। ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পণ্ডিত কর্তৃক রচিত শূন্য পুরাণে বেশ কিছু আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'শূন্য পূরাণের' পর ১৩৫০ খৃ. থেকে শুরু হয় বাংলা সাহিত্যের কথিত মধ্যযুগ। মধ্য যুগের দ্বিতীয় কবি এবং মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের আদি কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতি, কবি সারিবিদ খান, কবি দৌলত উজীর বাহরাম খাঁসহ মুসলমান কবিগণ আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের রম্য উপাখ্যান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি শেখ জৈনুদ্দীন রাসূলে কারীম (স.)-এর অসাধারণ ও অলৌকিক কৃতিত্ব অবলম্বনপূর্বক 'রসূল বিজয়' এবং তাঁর অনুকরণে শেখ ফয়জুল্লাহ্ 'গাজী বিজয়' ও 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্য রচনা করেন। মুসলমান কবিদের এ বিজয় কাব্যগুলো বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব বিবর্তন এনে দেয়।[৬]

মুসলমান কবিদের এ সকল সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যকে তাদের বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য ও চিন্তাধারা দিয়ে সমৃদ্ধশালী করে তোলে এবং আরবী-ফার্সী ভাষা থেকে বহু শব্দ, প্রবাদ ও ভাষা-পদ্ধতি আমদানী করে বাংলা ভাষায় এক অসাধারণ জীবনীশক্তি সঞ্চয় করেন। তাঁরা তাদের ভাষার সংগতি রক্ষার্থে এবং বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব তোলে ধরার প্রয়োজনে যথাস্থানে আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রয়োগ করেন। মধ্য যুগে এমন কোন মুসলিম কবি পাওয়া যাবেনা যিনি তাঁর কবিতায় সচেতনভাবেই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেননি।

মুসলমানদের ভাষা বিষয়ক ঐতিহ্যের প্রাচুর্য এবং এর শক্তিশালী প্রাণ চাঞ্চল্য হিন্দুদেরকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে কালক্রমে আরবী ও ফার্সী শব্দ এবং এর বাচ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের এরূপ একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে দাঁড়ায় যে, গোঁড়া হিন্দু কবিরাও এর ব্যবহার না করে পারেননি।

আরবী-ফারসী মিশ্রিত এ ভাষা সাধারণ শিক্ষিত মুসলমানের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র বেশ কিছু অংশ জুড়ে এ ভাষা-রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। তারও আগে শাহ্

---

৫. ড.মুহম্মদ আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, খ. ১, পৃ. ৯৯
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

গরীবুল্লাহ 'আমীর হামজা', 'ইউসুফ-জুলেখা' , 'জঙ্গনামা', 'সোনাভান' ও 'সত্যপীরের পুঁথি' এবং তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামযা 'জৈগুনের পুথি'তে এ জাতীয় ভাষা প্রয়োগ করেন।

পুঁথি সাহিত্যের কবিগণ অবাধে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছাড়াও আরবী-ফার্সীতে লিখিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, শেখ মুত্তালিব, আলাওল, আবদুল হাকিম, হায়াত মাহমুদ ও সৈয়দ নূরুদ্দীন এ ধারার পথিকৃত। এঁরা সকলেই ইসলামী শরা-শরীয়ত, মুসলিম কাহিনী, মুসলিম সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন বা সূফিতত্ত্ব, মুসলিম প্রেমোপাখ্যান, মর্সিয়া সাহিত্য, ঐতিহাসিক কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১৭৫৭ খৃ. পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী রাজ ভাষার মর্যাদা লাভ করে। মুসলমানগণ বিদেশী ভাষা ইংরেজীকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। হিন্দুরা ফার্সীর মত রাতারাতি ইংরেজী শিখে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে মার্শম্যান এবং উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষা হতে সমস্ত আরবী-ফার্সী শব্দ বাদ দেয়া স্থির করেন। হেনরী-পিটার-ফ্রস্টার-কেরী চক্র বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান হিসেবে চালাতে গিয়ে বাংলায় আরবী-ফার্সীর প্রবেশাধিকার কেড়ে নেয়। এ অবস্থায়ও মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যকর্মে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন। এমনকি রামরাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদারের মত প্রখ্যাত হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণও এ ধারার সাথে সম্পৃক্ত হন। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে আরবী-ফার্সী শব্দের রসময় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর তর্কবিতর্কমূলক বইগুলোতে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারের যে রীতি প্রবর্তন করে গেছেন তা আজো অনুসৃত হচ্ছে। শুধু শব্দ প্রয়োগই নয়, রাজা রামমোহন রায় ও গিরিশচন্দ্র সেন আরবী-ফার্সী ভাষা রপ্ত করে গ্রন্থও রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্র সেন বাংলায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করেন।

অনেক প্রখ্যাত হিন্দু পরিবারে ফার্সীভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। যেমন, কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। এ ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরই দিওয়ান-ই-হাফিজের স্বার্থক অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এ ভাষা অনন্যসাধারণ রূপ লাভ করে। বাংলা ভাষা বিবিধ ভাব-কল্পনার বাহন রূপে গড়ে উঠে। তিনিও তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারে কার্পণ্য করেননি। তাঁর সমসাময়িককালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করে কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করেন । কাজী নজরুল ইসলামও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর কাব্যে, সঙ্গীতে ফার্সী শব্দের পাশাপাশি অসংখ্য আরবী শব্দ প্রয়োগ করেন । শব্দগুলো এমন সুপ্রযুক্ত হল যে এটাই যেন বাংলা ভাষা ।

আধুনিক বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম আরবী শব্দ ও রূপকল্পের নিঃসঙ্কোচ ও সফল প্রয়োগকারী । তিনি তাঁর 'কবর-ই-নূরজাহান', 'শিরাজ-ই-হিন্দ', 'গান্ধিজী', 'আখেরী', 'দিল্লী-নামা' 'নওরোজের গান', 'পেয়ালার প্রেম', 'ঘুমতি নদী' ও 'ইনসাফ' ইত্যাদি কবিতায় সর্বাধিক সংখ্যক আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন । আরবী নামও ব্যবহৃত হয়েছে প্রচুর । পিতামহ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের মতো অগাধ পাণ্ডিত্য আর শব্দ প্রয়োগের অসামান্য দক্ষতা সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যেও সঞ্চারিত ছিল বলে তিনিও সফলভাবে বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেন । ভারতচন্দ্র যেমন অবস্থা ও চরিত্র বুঝে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করতেন, সত্যেন্দ্রনাথও তাই করেছিলেন ।

সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যানুবাদের একমাত্র পুরোধা । তিনি দেশ-বিদেশের বহু ভাষা আয়ত্ত করে অবলীলাক্রমে সে ভাষার কবিতা বাংলায় কাব্যানুবাদ করেছেন । এক ভাষার শব্দ-ব্যঞ্জনা, রূপকল্প, ঐতিহ্য ও মানসিকতা অন্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য হলেও তাঁর অনুবাদকর্মে তা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে । মূলের ভাবকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি আরবী-ফার্সী শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেছেন ।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সর্বমোট একশত আটষট্টিটি আরবী শব্দ আটশত একুশবার ব্যবহার করেছেন । তাঁর বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে আতর, আদায়, আমীর, ইজ্জত, ইশারাহ্, উজির, ওজন, কবর, কায়দা, কায়েম, কেলা, কোরান, খবর, খালাশ, খালি, খেতাব, খেয়াল, খোলা, গরীব, গোলাম, জবাব, জমা, জুলুম, দুনিয়া, নকল, ফকির, বাকী, বিদায়, বুলবুলী, মজলিশ, মশগুল, মশাল, মসজিদ, মালিক, মুলুক, শয়তান, শীত, সাকী, সাফ, সাহেব, সুলতান, হাওয়া, হাজির, হিসাব, হুকুম ইত্যাদি প্রধান । তিনি 'হাওয়া' শব্দটি সর্বাধিক সংখ্যক তিরান্নব্বইটি কবিতায় একশত তেইশবার ব্যবহার করেছেন । 'দুনিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সাতাশটি কবিতায় চলিশবার । 'বিদায়' শব্দটি একত্রিশটি কবিতায় পঁয়ত্রিশবার, 'হুকুম' শব্দটি বিশটি কবিতায় বত্রিশবার, 'শীত' শব্দটি পনেরটি কবিতায় বিশবার, 'খবর' শব্দটি পনেরটি কবিতায় সতরবার, 'সাকী' শব্দটি তেরটি কবিতায় সতেরবার, 'হিসাব' শব্দটি দশটি কবিতায় পনেরবার, 'জমা' শব্দটি এগারটি কবিতায় চৌদ্দবার, 'গোলাম' শব্দটি দশটি কবিতায় তেরবার, 'বাকী' শব্দটি তেরটি কবিতায় তেরবার, 'মালিক' শব্দটি বারটি কবিতায় বারবার, 'গরীব' শব্দটি নয়টি কবিতায় বারবার, 'মুলুক' শব্দটি দশটি কবিতায় এগারবার, 'খেয়াল' শব্দটি নয়টি কবিতায় দশবার, 'ইশারাহ্' শব্দটি ন'টি কবিতায় ন'বার, 'মশাল' শব্দটি ন'টি কবিতায় ন'বার, 'আতর' শব্দটি আটটি কবিতায় ন'বার, 'ওজন' শব্দটি সাতটি কবিতায় ন'বার, 'খালি' শব্দটি আটটি কবিতায় আটবার, 'নকল'

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার, 'মানা' শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার, 'জুলুম' শব্দটি ছ'টি কবিতায় সাতবার, এবং 'মসজিদ' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার ব্যবহার করেছেন। 'কোরান', 'মজলিশ' ও 'মশগুল' শব্দত্রয় ব্যবহার করেছেন ছ'টি কবিতায় ছ'বার, 'বুলবুলি' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় ছ'বার, 'সুলতান' শব্দটি চারটি কবিতায় ছ'বার এবং 'সাহেব' শব্দটি তিনটি কবিতায় ছ'বার। 'জবাব' 'মাফ' 'ফকির' ও 'হাজির' শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার, 'আমীর', 'কবর', 'খোলা', 'হরফ', ও 'হাওদা' শব্দগুলো চারটি কবিতায় পাঁচবার, 'ময়দান' ও 'সেলাম' শব্দদ্বয় তিনটি কবিতায় পাঁচবার, 'আখেরী' শব্দটি দু'টি কবিতায় পাঁচবার ও 'মাল' শব্দটি একটি কবিতায় পাঁচবার ব্যবহার করেছেন। 'আদায়', 'কায়দা', 'খালাস', 'খিতাব', 'বিলকুল', 'মাফ', ও 'হাকিম' শব্দগুলো চারটি কবিতায় চারবার, 'ইজ্জত', 'কেল্লা', 'খাতির', 'নজর' শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার, 'নায়েব' ও 'মীনার' শব্দটি দু'টি কবিতায় চারবার ব্যবহার করেছেন। 'উজির', 'জলসা', 'জারী', 'জাহির', 'জেয়াদা', 'নকীব', 'ফুরসৎ', 'বদল', 'মমতাজ', 'শহীদ', ও 'শূরু' শব্দগুলো তিনটি কবিতায় তিনবার, 'ওস্তাদ', 'দলিল', 'দোকান', 'মুরব্বী', ও 'মুসাফির', শব্দগুলো দু'টি কবিতায় তিনবার ব্যবহার করেছেন। দু'টি কবিতায় দু'বার ব্যবহার করেছেন 'ইসলাম', 'উকিল', 'কয়েদ', 'কলম', 'কসুর', 'কাজী', 'কাফের', 'গাজী', 'জাবর', 'তলব', 'নিকে', 'বুরুজ', 'মজবুত', 'মৎলব', 'মহল', 'মাল', 'মৌলবী', 'রদ', 'হজম', ও 'হাফেজ' শব্দগুলো। 'জিজিয়া', 'তাজ', 'দোয়াত', 'নাহি', 'বাতিল', 'মহব্বত', 'সাবেক', ও 'হক' শব্দগুলো একটি কবিতায় দু'বার ব্যবহার করেছেন। শুধুমাত্র একটি কবিতায় একবার ব্যবহার করেছেন 'আউলিয়া', 'আকবর', 'আবীর', 'আরব', 'আলিম', 'আলা', ঈদ', ইনসাফ', ইলম', ইলাহী', ইস্তাহার', 'ইহুদী', 'করম', 'কসর', 'কানুন', 'কুদরত', 'খতম', 'খবীশ', 'খালেদ', 'খাস', 'খিদমাত', 'গজল', 'গায়েব', 'জাফরান', 'জেহাদ', 'তাবে', 'তামাম', 'তালিম', 'তুফান', 'দাখিল', 'দোকানী', 'নজীর', 'নাজির', 'নিয়ত', 'ফিকির', 'বকেয়া', 'বয়ান', 'বুরকা', 'মক্কা', 'মক্কেল', 'মদিনা', 'মনিব', 'মরসুম', 'মরিয়ম', 'মহকুমা', 'মা'লুম', 'মুশা', 'মোসলেম', 'রাজী', 'রায়', 'লোকমান', 'লোকসান', 'শিয়া', 'শওয়াল', 'শরাব', 'সাকিন', 'সামিল', 'সুন্নী', 'সুফি', 'হাজী', 'হারাম', 'হালুয়া', 'হিম্মৎ', 'হুজুর', ও 'হুরী' ইত্যাদি শব্দসমুহ। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনটাতে একক অর্থ আবার কোনটাতে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ ও রূপকল্প ব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথের পরেই মোহিতলাল মজুমদারের নামটি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ইসলামী আবহ সংরক্ষণে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মোহিতলাল মজুমদারের উন্মেষকালে কলকাতার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র

Dhaka University Institutional Repository

ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'সহ 'মোসলেম ভারত' 'সওগাত' ও মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় বরেণ্য কবি-সাহিত্যিকদের লেখার পাশাপাশি করাচি থেকে পাঠানো হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ছাপা হতো। এ সকল পত্রিকায় শক্তিশালী মুসলমান লেখকগণ ইসলামী বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা, চরিতকাহিনী, গল্প ইত্যাদি রচনায় অগ্রসর হয়ে এলে মোহিতলালের মত তরুণ-কবির কাছে এক নতুন কল্পনার জগৎ উদ্ঘাটিত হয়। তিনি তাঁদের কাব্য-সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগের বাহুল্যতা দেখে অভিভূত হয়ে তাঁর কবিতায় আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারে মনযোগী হয়ে ওঠেন। এ সময় মোহিতলালের বিখ্যাত দু'টি কবিতা 'নাদিরশাহের জাগরণ' ও 'নাদিরশাহের শেষ' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি নিঃসংকোচে কবিতা দু'টিতে আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করলেন।

'মোসলেম ভারত' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে আরবী-ফার্সী বিষয় নিয়ে মোহিতলালের কাব্য রচনার জোয়ার আসে। শুধু যে শব্দ নির্বাচনেই তিনি নতুনত্বের দিকে ফিরলেন তা নয়, জীবনাবেগের দুর্ধর্ষতা, মধ্যযুগীয় মোগল জাতির অপরিমিত শক্তি ও সৌন্দর্যলালসার কল্পনা মোহিতলালের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অপরদিকে 'মানসী' সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়ের সাথে মোহিতলালের সখ্যতা গড়ে ওঠে। ইন্দুপ্রকাশ ভাল ফার্সী জানতেন। ইন্দুপ্রকাশের সাথে বন্ধুত্বসূত্রে মোহিতলালের ফার্সী কাব্যে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তাঁর সংসর্গে এসে মোহিতলাল হাফিজ, ওমর খৈয়ামসহ অনেক ফার্সী কবিদের সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রথম দিকের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে ওমর খৈয়ামের জীবনকথা 'জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম' স্মরণীয়। সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশের পূর্বেই মোহিতলালের মন যে ইসলামী আবহ তথা আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত ছিল উপরোক্ত আলোচনা থেকে তা-ই প্রতীয়মান হল। সে সাথে ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়ের সাহচর্য আর মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনা তাঁর নবীনতর সৃষ্টিপ্রেরণাকে আরো স্ফীত করে দিয়েছিল। বাস্তব আবহ রচনা, ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশ সৃষ্টি, রোমাঞ্চরস সঞ্চার আর বাংলা ভাষা ভাণ্ডারে নতুন ধ্বনিসম্পদ বৃদ্ধি–প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনে তিনি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

মোহিতলালের 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ', 'শেষ-শয্যায় নূরজহান', 'নূরজহান ও জহাঙ্গীর', 'হাফিজের অনুসরণে', 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' ও 'বেদুইন' কবিতায় আরবী-ফার্সী শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। তিনি সর্বমোট একশত চৌষট্টিটি আরবী শব্দ পাঁচশত ঊনত্রিশবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে আবীর, আল্লাহ, ইজ্জত, ইশারাহ্, ওক্ত, কবর, কাফের, খুলে, গরীব, গোলাম, জওয়াব, জল্লাদ, তাজ, দুনিয়া, নসীব, বদল, বিদায়, বুলবুলী, মসজিদ, মানা, মাপ, মালিক, শয়তান, শীত, সাকী, হাওয়া, হুকুম ইত্যাদি প্রধান। তিনি 'বিদায়' শব্দটি সর্বাধিক

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যক পঁচিশটি কবিতায় ত্রিশবার ব্যবহার করেছেন। 'আল্লা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ছ'টি কবিতায় বিশবার। 'দুনিয়া' শব্দটি আটটি কবিতায় সতেরবার, 'হাওয়া' শব্দটি তেরটি কবিতায় ষোলবার, 'হুকুম' শব্দটি চারটি কবিতায় পনেরবার, 'শয়তান' শব্দটি সাতটি কবিতায় তেরবার, 'মাপ' শব্দটি চারটি কবিতায় বারবার, 'সাকী' শব্দটি চারটি কবিতায় দশবার, 'শরাব' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় ন'বার, আর 'কাফের' ও 'খুলে' শব্দদ্বয় যথাক্রমে পাঁচটি কবিতায় আটবার ও তিনটি কবিতায় আটবার ব্যবহার করেছেন। 'মসজিদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ছ'টি কবিতায় সাতবার, 'তাজ' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার, 'জল্লাদ' শব্দটি দু'টি কবিতায় সাতবার। 'আবীর' শব্দটি ছ'টি কবিতায় ছ'বার, 'বুলবুল' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় ছ'বার, 'মানা' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় ছ'বার ও 'মালিক' শব্দটি চারটি কবিতায় ছ'বার ব্যবহার করেছেন। 'জওয়াব' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার ও 'কবর' শব্দটি দু'টি কবিতায় পাঁচবার ব্যবহার করেছেন। চারটি কবিতায় চারবার ব্যবহার করেছেন 'ওক্ত', 'বদল' ও 'শীত' শব্দত্রয় এবং তিনটি কবিতায় চারবার 'ময়দান', দু'টি কবিতায় চারবার 'ইজ্জত', 'নফর' ও একটি কবিতায় চারবার 'বাদে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনটি কবিতায় তিনবার ব্যবহার করেছেন 'আখেরী', 'ইশারাহ', 'গজল', 'নজর', 'নসীব', 'বিলকুল', 'সুরু' ও 'হজরত' শব্দসমূহ। দু'টি কবিতায় তিনবার 'গোলাম', 'তামিল', 'নূর' এবং একটি কবিতায় তিনবার 'নাজির' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দু'টি কবিতায় দু'বার এসেছে 'আকবর', 'আজান', 'আতর', 'আরজ', 'ইমান', 'এনসান', 'কসুর', 'কিয়ামাহ', 'কেরামত', 'খেয়াল', ' 'গরীব', 'জাফরান', 'তাজ্জব', 'নার', ফরাস', 'মজলিস', 'মতলব', 'মশাল', 'লাইলী', 'শোকর', 'বুরুজ', 'হাওদা', 'হাম্মাম', 'হাল', 'হুর' এবং একটি কবিতায় দু'বার 'ইনাম', 'কলম', 'কোরবান', 'তসবীর', 'মহল', ও 'হিসাব' শব্দগুলো। শুধুমাত্র একটি কবিতায় একবার ব্যবহার করেছেন 'আউলিয়া', 'আদব', 'আদম', 'আলী' 'আশেক', 'আহদ', 'আহাম্মক', 'ইদ', 'ইব্রাহিম', 'ইরাক','ইলাহী', ' ইসলাম', 'এশা', 'ওমরাহ', 'কওসর', 'কদর', 'কসম', ' 'কাফন', 'কিসমৎ', 'কুদরত', কোরান', 'কেল্লা', 'খবর', 'খাতির', 'খালি', 'খেলাফ', 'গজব', 'জান্নাত', 'জাহান্নাম', 'জিন', 'জেব', 'জোহরা', 'তকরার', 'তহুরা', 'তারিখ', 'তুফান', 'তৌহিদ', 'দোয়া', 'নকল', 'নকীব', 'নহর', 'নার্গিস', 'ফকির', 'ফেরদৌসী', 'বাকী', 'বাতিল', 'বোস্তান', 'মক্কা', 'মগরব', 'মজনু', 'মদিনা', 'মনিব', 'মমতাজ', 'মাঝার', 'মুয়াজ্জেন', 'মুরিদ', 'মুসকিল', 'মুশতারা', 'মুসল্লা', 'মুসাফের', 'মুসাবিদা', 'মেহেরাব', 'মোল্লা', 'রহমত', 'রহমান', 'রেওয়াজ', 'লোকসান', 'শরীয়াহ', 'শিয়া', 'শেখ', 'শেজদা', 'সবুর', 'সামিল', 'সাহেব', 'সুফি', 'সূরত', 'সুলতানা', 'সেলাম', 'সেলামত', 'হাকিম', ''হাফিজ', 'হায়াত', 'হারাম', 'হালাল', 'হাশিশ', 'হুজুর', ও 'হেজাজ'

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি শব্দসমূহ। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনটাতে একক অর্থ আবার কোনটাতে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের পর নজরুল-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর কাব্যে ব্যাপকভাবে আরবী-ফার্সী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। নজরুলের হাতে আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, বিপুল ব্যঞ্জনাময়, গভীর তাৎপর্যবাহী এবং বহুলাংশে সঠিক ও যথাযথ হয়েছে। নজরুল কাব্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে আরবী-ফার্সী শব্দের সুসম ব্যবহার। পয়ারের শোষণ ক্ষমতার মত নজরুলের শব্দ আত্মীকরণ ক্ষমতা অবিশ্বাস্য রকমের। উপমা সৃষ্টি, চিত্রকল্প রচনা, ভাষার সুনিপুণ রূপময় ব্যবহার এবং ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধি এত দূর যে, তাঁর সম্পর্কে কবি গুরুর নিম্নোক্ত উক্তিটি অকম্পিত কণ্ঠে নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়, "যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফুটাতে।"

নজরুল তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানে সার্থক ও সচেতনভাবেই আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর আরবী শব্দবহুল কবিতাগুলোর মধ্যে 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'রণভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম', 'শহিদী ঈদ', 'বার্ষিক সওগাত', 'খালেদ', 'সুব্‌হ-উম্মেদ', 'উমর ফারুক', 'ঈদ-মোবারক', 'আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়', 'নওরোজ', 'চিরঞ্জিব জগলুল', 'আমানুল্লাহ', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম', 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ', 'মিসেস এম রহমান', 'নকীব', 'অগ্রপথিক', 'রীফ-সর্দার', 'বাংলার আজিজ', 'প্রিয়ার দেওয়া শরাব', 'ওমর খৈয়াম গীতি', 'দিওয়ান-ই-হাফিজ গীতি', 'কাব্য আমপারা', 'আর কত দিন?', 'মোবারকবাদ', 'কৃষকের ঈদ', 'আজাদ', 'ঈদের চাঁদ', 'অবতরণিকা', 'অনাগত', 'অভ্যুদয়', 'স্বপ্ন', 'আলো-আঁধারী', 'দাদা', 'পরভূত', 'শৈশব-লীলা', 'প্রত্যাবর্তন', 'শাক্‌কুস সাদর', 'সর্বহারা', 'কৈশোর', 'সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ', 'শাদী মোবারক', খদিজা', 'সম্প্রদান', 'নওকাবা', 'সাম্যবাদী', 'নিত্যপ্রবল হও', 'একি আল্লার কৃপা নয়', 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়', 'জোর জমিয়াছে খেলা' ইত্যাদি প্রধান।

নজরুল তাঁর কবিতায় সর্বমোট এক হাজার চারশ' আঠারটি আরবী শব্দ দু'হাজার দু'শত পয়ষট্টিবার ব্যবহার করেন। তাঁর বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে আল্লা, নাহি, শরাব, দুনিয়া, হাওয়া, সাকী, আরব, বিদায়, নাবী, মুসলিম, ইসলাম, শহীদ, বুলবুল বা বুলবুলী, কোরান, সালাম, শয়তান, ঈদ, মসজিদ, আজান, খবর, বাকী, কোরবানী, খোলা, কাফের, শীত, জালিম, ময়দান, নকীব ইত্যাদি প্রধান। তিনি 'আল্লা' শব্দটি সর্বাধিক সংখ্যক ষাটটি কবিতায় একশ' ঊননব্বইবার ব্যবহার করেছেন। 'নাহি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন চুয়ান্নটি কবিতায় একশ' ত্রিশবার, 'শরাব' শব্দটি আটারটি কবিতায় একশ'

চারবার, 'দুনিয়া' শব্দটি ছত্রিশটি কবিতায় আটষট্টিবার, 'হাওয়া' শব্দটি তেতাল্লিশটি কবিতায় ছিষট্টিবার, 'সাকী' শব্দটি আঠারটি কবিতায় একষট্টিবার, 'আরব' শব্দটি আঠারটি কবিতায় ষাটবার, 'বিদায় শব্দটি চৌত্রিশটি কবিতায় বায়ান্নবার, 'নবী' বা 'নাবী' শব্দটি সতেরটি কবিতায় একান্নবার ও মুসলিম শব্দটি আটাশটি কবিতায় পঞ্চাশবার। 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ষোলটি কবিতায় পঁয়তাল্লিশবার, 'শহীদ' শব্দটি বাইশটি কবিতায় চল্লিশবার, 'আনোয়ার' শব্দটি দু'টি কবিতায় ছত্রিশবার, 'বুলবুল' বা 'বুলবুলী' শব্দটি ত্রিশটি কবিতায় চৌত্রিশবার, 'সালাম' শব্দটি সাতাশটি কবিতায় তেত্রিশবার, 'কোরান' শব্দটি চব্বিশটি কবিতায় তেত্রিশবার, 'ঈদ' শব্দটি বিশটি কবিতায় তেত্রিশবার, 'শয়তান' শব্দটি ছাব্বিশটি কবিতায় আটাশবার, 'মসজিদ' শব্দটি ষোলটি কবিতায় সাতাশবার, 'আজান' শব্দটি ষোলটি কবিতায় পঁচিশবার, 'কদম' শব্দটি দু'টি কবিতায় চব্বিশবার, 'খবর' শব্দটি বিশটি কবিতায় একুশবার, 'তুফান' শব্দটি আঠারটি কবিতায় একুশবার, 'বাকী' শব্দটি আঠারটি কবিতায় বিশবার, 'কাফের' শব্দটি পনেরটি কবিতায় বিশবার, 'কোরবানী' শব্দটি দশটি কবিতায় বিশবার ব্যবহার করেছেন।

'খোদা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন পনেরটি কবিতায় ঊনিশবার, 'জালিম' শব্দটি চৌদ্দটি কবিতায় আঠারবার, 'আমীন' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় আঠারবার, 'ময়দান শব্দটি তেরটি কবিতায় ষোলবার, 'হাওয়া' শব্দটি তেরটি কবিতায় ষোলবার, 'নকীব' শব্দটি এগারটি কবিতায় ষোলবার, ''দ্বীন' শব্দটি দশটি কবিতায় পনেরবার, 'নহর' শব্দটি ন'টি কবিতায় পনেরবার, 'রাজী' শব্দটি চারটি কবিতায় পনেরবার, 'হুকুম' শব্দটি চারটি কবিতায় পনেরবার, 'বদল' শব্দটি তেরটি কবিতায় চৌদ্দবার, 'গোলাম' শব্দটি বারটি কবিতায় চৌদ্দবার, 'খালী' শব্দটি দশটি কবিতায় চৌদ্দবার, 'রাসুল' শব্দটি ন'টি কবিতায় চৌদ্দবার, 'আদম' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় চৌদ্দবার, 'জমা' শব্দটি বারটি কবিতায় বারবার, 'জুলুম' শব্দটি এগারটি কবিতায় বারবার, 'খলিফা' শব্দটি তিনটি কবিতায় বারবার, 'মশাল' শব্দটি এগারটি কবিতায় এগারবার, 'মুসাফির' শব্দটি দশটি কবিতায় এগারবার, 'মুয়াজ্জিন; শব্দটি আটটি কবিতায় এগারবার, 'বেদুঈন' শব্দটি সাতটি কবিতায় এগারবার, 'ফকির' শব্দটি তিনটি কবিতায় এগারবার ব্যবহার করেছেন।

তিনি 'আরশ' শব্দটি দশটি কবিতায় দশবার, 'কিয়ামত' শব্দটি ন'টি কবিতায় দশবার, 'সিজদা' শব্দটি ন'টি কবিতায় দশবার, 'হাবীব' শব্দটি ন'টি কবিতায় ন'বার, 'জাহান্নাম' শব্দটি আটটি কবিতায় দশবার, 'বিলকুল' শব্দটি আটটি কবিতায় দশবার, 'ইমাম' শব্দটি ছ'টি কবিতায় দমবার, 'সাকী' শব্দটি ছ'টি কবিতায় দশবার ব্যবহার করেছেন। 'মশাল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ন'টি কবিতায় ন'বার, 'আতর' শব্দটি সাতটি কবিতায় ন'বার, 'মিনার' শব্দটি সাতটি কবিতায় ন'বার, 'মুলুক' শব্দটি সাতটি কবিতায় ন'বার, 'শরাব' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় ন'বার, 'কেতাব' শব্দটি চারটি কবিতায় ন'বার, 'ঈমান' শব্দটি

আটটি কবিতায় আটবার, 'মালিক' শব্দটি আটটি কবিতায় আটবার, 'শয়তানী' শব্দটি আটটি কবিতায় আটবার, 'আশেক' শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার, 'হযরত' শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার, 'রহমত' সাতটি কবিতায় সাতবার, 'মাল' শব্দটি ছ'টি কবিতায় আটবার, 'গজল' শব্দটি সাতটি কবিতায় সাতবার, 'গরীব' শব্দটি ছ'টি কবিতায় সাতবার, 'নিয়ামত' বা 'নিয়ামাহ' শব্দটি ছ'টি কবিতায় সাতবার, 'জবেহ' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার, 'জিন' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার, মৌলবী' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার, 'সাফ' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার ও 'মোহররম' শব্দটি তিনটি কবিতায় সাতবার ব্যবহার করেছেন।

'ইশারা' ও 'ফতোয়া' বা 'ফাতওয়া' শব্দ দু'টো ব্যবহার করেছেন ছ'টি কবিতায় ছ'বার, 'কওসর', 'জান্নাত', 'তাজ', 'মউজ' শব্দগুলো পাঁচটি কবিতায় ছ'বার, 'আখের' বা 'আখেরী' ও 'মোল্লা' শব্দদ্বয় চারটি কবিতায় ছ'বার এবং 'মজলুম' শব্দটি তিনটি কবিতায় ছ'বার ব্যবহার করেছেন। পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার ব্যবহার করেছেন 'আবীর', 'কালাম', 'খাস', 'তকবীর' ও 'শুরু' শব্দসমূহ, 'কিল্লা', 'জলসা', 'তসবী' শব্দসমূহ চারটি কবিতায় পাঁচবার, 'আমামা', 'তৌবা', 'ফজর', 'বরাত', 'মঞ্জিল', 'মহফিল' শব্দসমূহ তিনটি কবিতায় পাঁচবার এবং 'গোলামী' শব্দটি একটি কবিতায় পাঁচবার ব্যবহার করেছেন।

তিনি 'আউলিয়া', 'কাফন', 'খারাব', 'খেয়াল', 'গাজী', 'দাওত', 'দৌলত', 'নূর', 'মানা', 'সবর', ও 'হায়দর' শব্দসমূহ চারটি কবিতায় চারবার, 'আমীর', 'ওজন', 'কৌম', 'জওয়াব', 'দোকান', 'মাজার', 'সালাত' শব্দসমূহ তিনটি কবিতায় চারবার, 'কলম' দু'টি কবিতায় চারবার এবং 'শর্ত' শব্দটি একটি কবিতায় চারবার ব্যবহার করেছেন। তিনটি কবিতায় তিনবার ব্যবহার করেছেন 'এফতার', 'ওক্ত', 'কবুল', 'কসম', 'কাফেলা', 'কায়েম', 'জহরত', 'তামাম', 'দোয়া', 'ফেকা', 'বয়ান', 'বোরকা', 'মজলিশ', 'মশগুল', 'মানে', 'মামুলি', 'রমজান', 'রুহ', 'শাফায়াৎ', সাদিক', 'সাহারা' শব্দসমূহ, 'কলেমা', 'ফতে', 'মতলব' ও 'মুনাজাত' দু'টি কবিতায় তিনবার, এবং 'কবজ' শব্দটি একটি কবিতায় তিনবার ব্যবহার করেছেন।

'আশরাফ', 'ওজু', 'খেতাব', 'জাম', 'তসলিম', 'তাগিদ', 'তাজিম', 'তাবিজ', 'দখল', 'নওয়াব', 'নজর', 'নজুম', 'নবুয়ত', 'নেকাব', 'ফখর', 'ফজুল', 'মজনুন' 'মরসুম', 'মর্সিয়া', 'মাল্লা', 'মাশুক', 'মুনাফেক', 'মুশায়েরা', 'মৌলানা', রহম', 'লওহ', 'শরবৎ', 'শরিক', 'শরীফ', 'শামিল', 'সাকিম', 'সালিশ' ও 'হজ্জ' শব্দাবলী দু'টি কবিতায় দু'বার এবং 'আদব', 'খত', 'বাতিল', 'মাদ্‌রাসা' 'শরীয়ত' ও'সেরাত' শব্দসমূহ একটি কবিতায় দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি কবিতায় একবার ব্যবহার করা হয়েছে 'আকবর', 'আকিকা', 'আজব', আজীজ', 'আতীক', 'আরিফ', 'আলম', 'আহাদ', 'ইজ্জত', 'ইনসাফ', 'ইমারাত', 'ইয়াকুত', 'উকিল', উজির', 'উম্মত', 'উম্মি', 'এলহান', 'ওফাৎ', 'ওলি', 'ওহি', 'ওয়ারেশীন', 'কদর', 'কয়েদ', 'কানুন', 'কাৎরা', 'খবুজ', 'খিমা', 'খেলাফ', 'গমি', 'জিয়ারত', 'তফাৎ', 'তসল্লী', 'তারিখ', 'দলিল', 'নসীব', 'ফরাস', 'মিসকিন', 'রদ', 'লানত', 'লোকসান', 'লোবান', 'শোকর', 'সওয়াব', 'সনদক', 'সফর', 'সিদ্দিক', 'হক' শব্দসমূহ। নজরুলের ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনটা একক অর্থে আবার কোনটা একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

শৈশবে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে আরবী-ফার্সী শিক্ষা, লেটো দলে গান বাঁধার সময় হিন্দু পুরাণ ও কল্প-কাহিনীর সাথে গভীর পরিচয় এবং করাচীর সেনানিবাসে পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে ইরানী কবিদের কবিতাপাঠ, তারও আগে মুন্সি নুরুন্নবীর কাছে ফার্সী শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন নজরুল। তাছাড়া ইসলাম ধর্মে লালিত উত্তরাধিকারের সাথে আরব-পারস্যের নানান অনুষঙ্গ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ধর্মীয় কারণে তাঁকে শিখতে হয়েছে 'আল-কোরআন', যার ভাষা ক্লাসিক আরবী এবং গ্রাম্য মক্তবের শিক্ষক হিসেবে তা শেখাতে হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। এসব মিলিয়েই নজরুল লাভ করেন আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারের অধিকার। যে অধিকারের শিকড় সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল লালিত প্রান্তিক মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে চলে গেছে অনেক গভীরে। ফলে তিনি যুক্তিসিদ্ধ, মৌলিক ও অভাবিতপূর্ব আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারে নৈপূণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে মুগ্ধ-বিমোহিত মোহিতলাল মজুমদারের সাক্ষ্য প্রথমে গ্রহণ করা যাক। নজরুলের 'খেয়াপারের তরণী' পাঠ করে চকিত আনন্দে বিভোর মোহিতলাল তাঁকে 'বাংলার সারস্বত মণ্ডপে স্বাগত' জানিয়ে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদককে লেখেনঃ

"ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে, কোনখানে আপন অধিকারের সীমালংঘন করে নাই–এই প্রকৃত কবিত্ব শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দ অর্থগত ভাবের সুর, কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর-অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দবিন্যাস ও ছন্দ-ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া আছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিব–

আবু বকর উসমান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী এ যে তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।

Dhaka University Institutional Repository

কাণ্ডারী এ তরীর পাকামাঝি মাল্লা
দাঁড়ী মুখে সারি গান–'লা-শরীক আল্লাহ্ ।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাস এবং গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডমরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে; বিশেষত এর শেষ ছত্রের বাক্য 'লা-শরীক আল্লাহ'–যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধিন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাংলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।[৭]

কোন বিশেষ ভাষার শব্দরাজিকে অন্য ভাষায় প্রয়োগ করতে ভাষা বিষয়ে যে প্রাজ্ঞতা ও ব্যবহারিক নৈপুণ্য প্রয়োজন, নজরুলের তা অনেকটাই ছিল। তাঁর 'কাব্যে আমপারা', 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' ও 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' পাঠ করলে তা সহজেই অনুমেয়। আরবী-ফার্সীজাত শব্দ সম্বলিত মুসলিম ঐতিহ্যবাহী 'পুথি সাহিত্যের' সাথে নজরুলের প্রত্যক্ষ ও গভীর সম্পর্ক ছিল। উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, রূপকল্প সৃষ্টিতে সর্বোপরি ভাষার সুখকর বিন্যাস ও আবহ রচনায় তারই পরিচয় দীপ্ত। নজরুল সাধারণ সার্বজনীন অনুভূতি প্রকাশের জন্য অনেক আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্রও দেখিয়েছেন। মুসলিম সমাজের প্রচলিত এমন বহু শব্দ আছে যা নজরুলের পূর্বে কেউ ব্যবহার করেন নি, নজরুলের পরেও আজ পর্যন্ত তার সার্থক ব্যবহার হয়নি।

শব্দ ব্যবহারে নজরুলকে বলা চলে রাজমিস্ত্রির ভূমিকা পালন করেছেন। রাজমিস্ত্রি যেমন প্রাসাদ তৈরীকালে হাতুড়ি দিয়ে ইট পরীক্ষা করে তবে ইমারত গাঁথা শুরু করেন। ইট খারাপ মনে হলে প্রথম টোকাতেই বুঝতে পেরে সেটা বাতিল ঘোষণা করে ফেলে দেন, আবার যেখানে পুরো ইটের প্রয়োজন নেই, সেটা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে বা ছেঁটে-ছেঁটে ছোট করে ঠিক মানানসই মত বসিয়ে দেন। নজরুল তেমনি সাহিত্যের প্রাসাদ তৈরীতে বাছাই করা ইট তো ব্যবহার করেছেন-ই, তদুপরি ছন্দ, মাত্রা, তাল, লয় ইত্যাদি জনিত কারণে কোনো কোনো শব্দ/ইট ভেঙ্গে একটু ছোট করেছেন। যেমন আরবী 'তাওফিক' থেকে 'তৌফিক' এবং 'দাওয়াত' থেকে 'দাওত'-এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের মানানসই প্রয়োগ লক্ষণীয়।

যাহোক, বাংলা সাহিত্যে আরবী শব্দ ব্যবহারে তিনজন কবি–সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলাম অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাদের ব্যবহৃত শব্দসমূহ বাংলা সাহিত্যকে করেছে নবসাজে সজ্জিত আর বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধশালী। তাদের শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতামূলক পর্যালোচনাটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আকবর > আকবার (اكبر) সুমহান, বৃহত্তম, মহত্তর,সবচেয়ে বড় ইত্যাদি। নামবাচক বিশেষ্য।

---

৭. মুস্তফা নুরউল ইসলাম, নজরুল ইসলাম: নানা প্রসঙ্গ (ঢাকা: নজরুল ইনষ্টিটিউট, জুন ১৯৯১), পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

'আকবর' শব্দ দ্বারা মোগল সম্রাট আকবরকে বুঝানো হয়েছে। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) পিতা হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১৪ বছর বয়সে ১৫৫৬ খৃ. মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। একজন বিজয়ী বীর, প্রশাসক ও শিল্প সংস্থার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সমসাময়িক বিখ্যাত শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আবুল ফজল রচিত 'আকবর নামা' উল্লেখযোগ্য।[৮]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'দিল্লী-নামা' কবিতায় শব্দটি একবার উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করেছেন–

দেখেছ আবার আকবর শার
মার শোকে গোঁফ দাড়ি মুড়ানো।
মহলের মাঝে গণেশের পূজা
দিল্লী গো তুমি সকলি জানো।[৯]

মোহিতলাল মজুমদার 'আকবর' শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'সম্রাট আকবর' ও 'সুমহান' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

'সম্রাট আকবর' অর্থে শব্দটি নিম্নরূপ–

সেই দারা চায় তখত- তাউস্! ইসলামে করি নাশ
আকবর-শাহা চেয়েছিল যাহা– পুরাইতে সেই আশ।[১০]

'সুমহান' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

বুকে মারো ছুরি, গল্ গল্ করে' বাহিরিবে রাঙা জল,
এই দেখ–চোখে এখনি অশ্রু করিতেছে টলমল্,
–এত কুদরৎ তার!
আল্লা তা'লা –আকবর! এযে মতলব বোঝা ভার![১১]

আল্লাহু আকবর 'আল্লাহ মহান' আজানের এ ধ্বনির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক চিরদিনের। মুসলমানদের নাড়ির স্পন্দন আজানের এ ধ্বনি। মোহিতলাল আল্লা তা'লা শব্দের পরে মুসলমানদের সেই চিরপরিচিত 'আকবর' শব্দ যোগ করে একদিকে যেমন মুসলিম ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন, অপরদিকে 'আকবর' শব্দের সাথে বাক্যের শেষের ভার শব্দটির সম্পৃক্ততা বাক্যটিকে শ্রুতিমধুর করে দিয়েছে, যেমনটি 'সুমহান' অর্থে খুঁজে পাওয়া যেত না।

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'ইন্দ্রপতন' কাব্যে 'আকবর' শব্দটি দ্বারা ভারতের মোগল সম্রাট মহামতি আকবরকে বুঝায়েছেন। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজীব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শীব![১২]

---

৮. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলা পিডিয়া, খ. ১,পৃ. ১১৩-১১৪
৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলাশেষের গান", পৃ. ১৫০
১০. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ,প. ৬১৫
১১. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদির শাহের শেষ', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০৪
১২. নজরুল ইসলাম, 'ইন্দ্রপতন', "চিত্তনামা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আখেরে /আখেরী > আ'খির (أخر) শেষ, সমাপ্তি, পরকাল, পরিণাম, উপসংহার ইত্যাদি। শব্দটি উর্দু ভাষায় আখেরে ও আখেরী দু'ভাবে আসে। আরবীতে শব্দটি (ى) সম্বন্ধযোগে 'আখেরী' হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শব্দটি দু'টি কবিতায় পাঁচবার 'শেষ' অর্থে ব্যবহার করেছেন–

দাঁড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে
কেউ দিত, কেউ দিত বা তাড়ায়ে
'ভিখারীর ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায়'[১৩]

মোহিতলাল শব্দটিকে তিনটি কবিতায় তিনবার বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন; 'শেষ' অর্থে দু'টি কবিতায় দু'বার এবং 'পরকাল' অর্থে একটি কবিতায় একবার;

'শেষ' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

অবিশ্বাসীর আসর এটা যে–সুরা দিয়ে হয়
অতিথির সৎকার,
সুরু হতে সেই আখের অবধি হেথায় কেবলি–
অবাক চমৎকার![১৪]

'পরকাল' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

বাদ্‌শার ছেলে বিকাইয়া গেনু এক বসরাই গুলে!
খোদার বান্দা বুত্-পরস্ত্! – আখেরের ভয় ভুলে'।[১৫]

নজরুল ইসলাম আখেরী শব্দটি চারটি কবিতায় ছয়বার 'শেষ' অর্থে ব্যবহার করে একটি মুসলমানী আবহ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ আখেরী নবী ভাবটি মুসলমানী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। যার সাথে ঈমানী আকিদার সম্পৃক্ততা রয়েছে। আখেরী নবীর প্রতি বিশ্বাস না থাকলে তার ঈমান থাকবে না। কবিতায় ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

উমর! ফারুক! আখেরী নবীর ওগো দক্ষিণ-বাহু!
আহবান নয়–রূপ ধরে এস!– গ্রাসে অন্ধতা-রাহু[১৬]

আতর > 'ইতর (عطر) সুগন্ধি, সৌরভ, সুঘ্রাণ, সুবাস ইত্যাদি। তিনজন কবিই তাদের কাব্যে আতরের সুগন্ধি মেখেছেন এবং সকলেই শব্দটি একাধিকবার ব্যবহার করলেও একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ:

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শব্দটি আটটি কবিতায় নয়বার 'সুগন্ধি' অর্থে ব্যবহার করেছেন, তবে তাঁর 'আতরে' উচ্ছাস নেই, আনন্দ নেই, আছে তিরস্কারের ছোঁয়া। যেমন–

---

১৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শবাসীন', "তুলির-লিখন", পৃ. ১০৩
১৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শরাবখানা', "হেমন্ত-গোধূলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৭
১৫. মোহিতলাল মজুমদার, 'নূরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের এই প্রেমিক সমাজে আতর ব্যাভার নাই,
প্রিয়ার কেশের সুরভীতে মোরা মগণ সর্ব্বদাই ।[১৭]

মোহিতলাল মজুমদার ব্যবহার করেছেন দু'টি কবিতায় দু'বার, সেখানেও 'সুগন্ধি' অর্থের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় । যেমন-

অশ্রু- শিশিরে আতরের বাস, ঝরা পাপড়িও কেমন চায়!-
ফুলের মতন হওয়া কি বারণ?- রূপ র'বে বিনা দুখের দায়![১৮]

অপরদিকে নজরুল ইসলাম শব্দটি সাতটি কবিতায় নয়বার 'সুগন্ধি' অর্থে ব্যবহার করেছেন, তবে তাঁর আতরের এ সুগন্ধ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং বেহেশ্‌তী খত প্রাপ্তির আনন্দে দুনিয়াকে মশগুল করে দিয়েছে । কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ-

উড়ছে আতর, পুড়ছে দেদার, ধুপ-ধুনো গুল্‌গুল্‌;
বেহেশ্‌তী খত্‌ পেয়ে সারা দুনিয়াটা মশগুল॥[১৯]

ইজ্জত > ইজ্জৎ > ই.য্‌যাহ (عزة) আবরু, মান, মর্যাদা, গৌরব, সম্মান, সতীত্ব ইত্যাদি । এখানে তিনজন কবিই মুসলমানি আবহ রক্ষার্থে 'ইজ্জত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং 'ইজ্জত' শব্দের উপর্যুক্ত প্রতিশব্দ নেই বলেই কবিগণের শব্দটির ব্যবহার যথার্থ হয়েছে । সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার 'মান-সম্মান' অর্থে ব্যবহার করেছেন-

কাঁদতে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
'ইজ্জতে' ভাই রাখতে বজায় বল বাহুতেই আছে ।[২০]

মোহিতলালও শব্দটি দু'টি কবিতায় চারবার উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করেছেন । যেমন-

শাহ-বেগমের ইজ্জত কোথা? ওড়নাও গেছে ঘুচে'!
খালি পায়ে নেই জুতা টুকু! বুঝি শরম ফেলেছে মুছে'?[২১]

নজরুল ইসলাম শব্দটি একটি কবিতায় একবার 'মান-সম্মান' অর্থে ব্যবহার করেছেন-

চাহি না ক গাভী দুম্বা উট
কত টুকু দান? ও দান ঝুট ।
চাই কোরবাণী চাই না দান ।
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের
শর চাই তোর, তোর ছেলের,
দেবে কি? কে আছ মুসলমান?[২২]

---

১৬. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮০
১৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রিয়া যবে পাশে' :"তীর্থ সলিল"(কলকাতা:ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ, ১৩১৯ বাং.), সং. ২, পৃ. ৭২
১৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ?হ, পৃ. ১৩১
১৯. নজরুল ইসলাম, 'ফুলছড়ি', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৯৫
২০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গিরিরাণী', "কাব্য সঞ্চয়ন', পৃ. ১৫৩
২১. মোহিতলাল মজুমদার, ''নূরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০০
২২. নজরুল ইসলাম, 'শহিদী ঈদ', ''ভাঙ্গার গান', নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ইদ > ঈদ >'ইদ্ (عيد) উৎসব, খুশি, মুসলমানদের বিখ্যাত পর্বদ্বয়–ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ঈদ' শব্দ দ্বারা 'ঈদুল ফিতর'-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুসলমানদের রোজা শেষে কৃচ্ছ্রতা সাধনের পর খুশির ঈদ আসে, আকাশে চাঁদ ওঠে, মানুষের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে ওঠে। বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। শব্দটি একটি কবিতায় একবারই উপরোক্ত অর্থে এসেছে–

পালিলে শোকের রোজা কত না বরয–
ফল ভখি' পরি' দীন সাজ!
কৃচ্ছ্রের শেষে বিধি পূরাল মানস–
উদিল ইদের চাঁদ–তাজ।[২৩]

মোহিতলাল মজুমদার একটি কবিতায় একবার 'ঈদুল ফিতর' অর্থে এসেছে –

'রোজ'ার উপোস ভেঙ্গে দিল যেন
'ঈদ্'-রাতে!
রাত হ'ল দিন সেই আতশের
রোশনায়ে–
দিন হ'ল রাত, নয়নে নামিল
নিদ্ প্রাতে![২৪]

নজরুল ইসলাম ঈদ শব্দটি বিশটি কবিতায় তেত্রিশবার মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'ঈদুল ফিতর ও ইদুল আজহাকে বুঝায়েছেন। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

আজ আল্লার নামে জান্ কোরবাণে ঈদের পুত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য গ্রহ' শক্তির উদ্‌বোধন![২৫]

আলোচ্য 'ইদ' শব্দ দ্বারা কোরবানীর ঈদ তথা ঈদুল আজহাকে বুঝানো হয়েছে। কবি কোরবানীকে 'হত্যাযজ্ঞ' নয়, বরং 'সত্যগ্রহ' ও শক্তি ও কল্যাণ লাভের উপায় হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এখানে ঈদ অনাবিল আনন্দের সাথে ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করেছে। শব্দ প্রয়োগ যথাযথ ও বাঞ্ছিতরূপ লাভ করেছে।

ইসারা > ইশারা > ইশারাহ্ (إشارة) ইঙ্গিত, সংকেত, নির্দেশ, বরাত, সূত্র ইত্যাদি। শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। তিনজন কবিই শব্দটিকে 'ইঙ্গিত' ও 'নির্দেশ' উভয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

২৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'তাজ', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ৬৯
২৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'গজল গান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২০
২৫. নজরুল ইসলাম, 'কোরবাণী', "অগ্নি-বীণা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি 'নির্দেশ' অর্থে ব্যবহার করেছেন সাতটি কবিতায় সাতবার এবং 'ইঙ্গিত' অর্থে ব্যবহার করেছেন দু'টি কবিতায় দু'বার; 'নির্দেশ' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

দিল্লী পতির প্রিয় পাত্র সে
বদাউন-সর্দার
নগরী- সাজিল নাগরীর মতো
ইসারায় যেন তার ।[২৬]

'ইঙ্গিত' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

হঠাৎ কখন্ কোন্ গগণের পান্থ হাওয়ার কোন ইসারায়
শরীর পেল এক নিমিষে ওই নতুন সে কোন তারায়?[২৭]

মোহিতলাল শব্দটি তিনটি কবিতায় তিনবার 'ইঙ্গিত' অর্থে ব্যবহার করেছেন–

সেই যেন হোথা উকি দিয়ে চায়,
যেন মৃদু-মৃদু হাসে ইসারায় ।[২৮]

নজরুল ইসলাম শব্দটি ছয়টি কবিতায় ছয়বারই 'ইঙ্গিত' অর্থে ব্যবহার করেছেন । তবে নজরুলের ইশারায় ইসলামী আবহ তৈরি হয়েছে, খলিফার ইশারায় গির্জাকে মসজিদ বানানোর ইঙ্গিত ফুটে ওঠেছে । কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

ভাবিবে – খলিফা করেছে ইশারা হেথায় নামাজ পড়ি'
আজ হতে যেন এই গির্জারে মোরা মসজিদ করি![২৯]

ইসলাম > ইসলাম (إسلام) আত্মসমর্পণ করা, ইসলামগ্রহণ করা । ইসলাম শব্দ দ্বারা ইসলাম ধর্ম উদ্দেশ্য, পরিভাষিক অর্থে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, শান্তিস্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা । ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম । ইসলামের মূল উৎস কোরআন এবং হাদিছ । এর মূল কথা হচ্ছে-আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস, ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব, সকল নবী ও রাসুল, পরকাল, তাক.দীর ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস । তৎসঙ্গে সৎকর্মে আত্মনিয়োগও ইসলামের অন্যতম মূলকথা ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার ইসলাম (ধর্ম) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে–

এশিয়ার হক, হারুনের স্মৃতি, ইসলাম-সম্মান,–
মর্ম্মবিণার তিন তারে যার, পীড়িয়া কাঁদাল প্রাণ,[৩০]

---

২৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২৫৫
২৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বজ্রবোধন', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২১৫
২৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'রূপকথা', "হেমন্ত-গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ.৪০০
২৯. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৫
৩০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গান্ধিজী', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

মোহিতলাল ধর্ম হিসেবে ইসলাম শব্দটির ব্যবহার দেখিয়েছেন এভাবে–

সেই দারা চায় তখ্‌ত–তাউস! ইসলামে করি নাশ
আকবর–শাহা চেয়েছিল যাহা–পুরাইতে সেই আশ ।[৩১]

কাজী নজরুল ইসলাম ইসলামী জাগরণের কবি। ইসলামী চেতনায় সমৃদ্ধ, ইসলামী ঐতিহ্যে লালিত কবির কণ্ঠে ইসলামের বার্তা ধ্বনিত হবে এটাই স্বাভাবিক। ইসলাম যারা কবুল করেছে তারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত হবে, সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে হয় 'গাজী' না হয় 'শহীদের মর্যাদা লাভ করবে এ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছে। নজরুলের কাব্যে শব্দটির ব্যবহার সার্থক ও অর্থবহ হয়েছে। তিনি শব্দটি ষোলটি কবিতায় পঁয়তাল্লিশবার 'ইসলাম ধর্ম' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন–

হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তা'রা অসত্য সাথে রণ ।[৩২]

কবর > কবর > ক.ব্‌র (قبر) গোর, সমাধি ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটি চারটি কবিতায় পাঁচবার 'সমধি' অর্থে ব্যবহার করেছেন। এখানে কবি নিযামুদ্দিন আউলিয়ার কবরে স্বর্গীয় জ্যোতি, খিরনির ফুল আর উটপাখির মোতি ছড়িয়ে দিয়ে যে মুসলমানী আবহ রচনা করেছেন, তা 'গোর' বা 'সমাধি' দ্বারা যথোপযুক্ত হতো কি না সন্দেহ। স্বনামধন্য আউলিয়া সমাধিকে 'কবর' হিসেবে যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়েছে। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

আউলিয়া সাধু নিযামুদ্দিন
সঁপিল তোমায় স্বরগ-জ্যোতি
কবরে যাহার খিরনির ফুল
শোভাপায় উটপাখীর মোতি ।[৩৩]

মোহিতলালও কবর শব্দকে 'সমাধি' হিসেবে দেখিয়েছেন এবং তিনটি কবিতায় ছয়বার ব্যবহার করেছেন। তবে শাহদারার কবরটি সত্যেন্দ্রনাথের নিযামুদ্দিনের কবরের মতো আলোকিত নয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে কবরের ব্যবহার না থাকলেও মোহিতলালের কাব্যে শব্দটির প্রায়োগিক বিন্যাস চমৎকার হয়েছে। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

৩১. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুন্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা, মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫
৩২. নজরুল ইসলাম, 'নিত্য প্রবল হও', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪৩, পৃ. ২১৪
৩৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দিল্লীনামা', "বেলা শেষের গান", পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমাইলে বুঝি? ঘুমাও ঘুমাও! কাজ নাই মিছা জাগিয়া
আর–
ওই যা– হোথায় আলো নিবে গেল! কবর আঁধার
শাহ্দারার।[৩৪]

নজরুল ইসলাম 'কবর' শব্দটি চৌদ্দটি কবিতায় আঠারবার 'সমাধি' তথা মুসলমানদের মৃত্যু পরবর্তী কবরে দাফন করাকেই বুঝায়েছেন। পিরামিড একজাতীয় কবর আর মাটির কবরও কবর। তবে নজরুলের শব্দ ব্যবহারে কবরের আলাদা মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

নতুন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিসরের মমি,
শ্রদ্ধার আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি'![৩৫]

কাফের > কাফির (كافر) আবরক, কৃষক, অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, ইসলাম ধর্ম অস্বীকারকারী, পৌত্তলিক, বহু-ইশ্বরবাদী ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'ইসলাম ধর্ম অস্বীকারকারী" অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি ইসলাম এবং কাফের উভয়ই আলাদা স্বত্বা তাঁর একটি চমৎকার বিন্যাস কাব্যে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন 'আমি' কবিতায় কবি বলেন–

আমি ইসলাম, আমিই কাফের,
আমিই ধোবাই চন্দ্রতারা!
গগন-ললাটে মেঘের অলক
আমিই বরষা বৃষ্টি-ধারা![৩৬]

মোহিতলাল মজুমদার শব্দটি তিনটি কবিতায় আটবার ব্যবহার করেছেন এবং আল্লাহতে অবিশ্বাসীই কাফের তা তাঁর কাব্যে মুসলমান ও কাফের উভয় সত্তাকে পাশাপাশি উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তোলেছেন। 'শরাবখানা' কাব্যে কবি বলেন–

নিজেরে নিজেই জানিনা যখন
জানিব কেমনে কে ভগবান?
নই খৃষ্টান, ইহুদাও নই,
কাফের কিংবা মুসলমান।[৩৭]

---

৩৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ-শয্যায় নূরজহান', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩২
৩৫. নজরুল ইসলাম, 'চিরঞ্জিব জগলুল', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৭৪
৩৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আমি', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৪৭০
৩৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'শরাবখানা', "হেমন্ত গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কাব্যে 'কাফের' শব্দটি পনরটি কবিতায় বিশবার এসেছে। প্রতি বারেই তিনি 'আল্লাহতে অবিশ্বাসী'কে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, 'সুবহ-উম্মেদ' কবিতায় তিনি বলেছেন–

মেষ সম যারা ছিল এতদিন
শের হ'ল আজ সেই মেসের!
এ-মেষের দেশ মেষই রহিল
কাফ্রির অধম এরা কাফের![৩৮]

কোরান > কু.রআ'ন (قرآن) ইসলাম ধর্মের মূলগ্রন্থ, আরবী ভাষায় রচিত মুসলমানদের ধর্মীয় কিতাব; মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর ঐশিবাণী। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌল প্রেরণা ও উৎস এ কোরআন। মুসলিম জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণের সকল নিয়ম-কানুনই আল্লাহর কালাম কোরআন মাজিদ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আল্লাহর আদেশে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নিকট এ ঐশী বাণী নিয়ে আসেন। পবিত্র রমজান মাসের 'লাইলাতুল কদর'-এ সর্ব প্রথম কোরআন অবতীর্ণ হয়। পরবর্তিতে দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী কোরআনের বিভিন্ন অংশ প্রয়োজনানুসারে নাজিল হয়।[৩৯] সত্যেন্দ্রনাথ মুসলমানদের ঐশিগ্রন্থ হিসেবেই শব্দটিকে ছ'টি কবিতায় ছ'বার ব্যবহার করেছেন। কবি তাঁর বিশ্ববেদন কবিতায় শব্দটির প্রয়োগ করেছেন এভাবে–

মোস্লেম মানে কোরান কেবল
হিন্দু সে বেদ মানে।
মুশার বচন মানে ইহুদীরা
বাইবেল খৃষ্টানে;[৪০]

মোহিতলাল মজুমদার কোরান শব্দ দ্বারা একটি কবিতায় একবার মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনকে-ই বুঝায়েছেন। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

তোমার আদেশ – শ্রেষ্ঠ সে বাণী – কোরাণের তৌহিদ্
বরবাদ্ করে বুত্পরস্তি করিবারে তার জিদ।[৪১]

নজরুল ইসলাম কোরান শব্দটি চব্বিশটি কবিতায় তেত্রিশবার 'মহাগ্রন্থ আল-কোরআন' অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'মিসেস এম রহমান' কবিতায় তিনি কোরানের অপব্যাখ্যাকারীদের প্রসংঙ্গে বলেন যে, তারা কোরান, হাদিস পড়ে ঠিকই কিন্তু কোরানের মর্মবাণী মানে না। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস,
নারী, নর-দাসী, বন্দিনী র'বে হেরেমেতে বারোমাস!

---

৩৮. নজরুল ইসলাম, 'সুব্হ্ উম্মেদ', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৫৪
৩৯. ড. রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা (বগুড়াঃ সাহিত্য সোপান,২০০০), পুণঃমুদ্রণ,পৃষ্ঠা-১৩৩
৪০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিশ্ববেদন', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১০৮
৪১. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদিস কোরান ফেকাল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,

মানে না ক তা'রা কোরানের বাণী– সমান নর ও নারী![৪২]

খবর > খাব্‌র (خبر) বার্তা, সংবাদ, বৃত্তান্ত, তথ্য, সন্ধান ইত্যাদি। শব্দটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পনেরটি কবিতায় সতেরবার, মোহিতলাল মজুমদার একটি কবিতায় একবার এবং নজরুল ইসলাম বিশটি কবিতায় একুশবার 'সংবাদ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'ইনসাফ' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ খুনের সাথে খবরের একটি চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

খুনের খবর গুম করে যারা

রেখেছে রাজার কাছে

খুনীর্ দোসর শয়তান তারা,–

দাও ঝুলাইয়া গাছে।[৪৩]

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'শেষ শয্যায় নুরজহান' কবিতায় খবরের ব্যবহার করেছেন এভাবে–

বক্সিরে আমি খবর করিগে, হাকিম আসেনি এ– বেলা কেন?

মরিয়ম আর সখিনা– বাদীরে বলে দেই– থাকে হাজির যেন।[৪৪]

ভাষাশিল্পী কাজী নজরুল ইসলাম 'খবর' শব্দটি অনেকবার 'সংবাদ' অর্থে ব্যবহার করলেও তাঁর খবরের উচ্ছাস নানাবিধ। 'অবেলার ডাক' কবিতায় তিনি পূর্বের প্রেমময় স্মৃতিকে রোমন্থন করতে গিয়ে প্রিয়তমার প্রত্যাশিত প্রেমের বিরহ বেদনাকে তুলে ধরেছেন। যে ভালবাসা না পেয়ে আজ সে কবরে। আজ হয়তো আমি তাকে ভালবাসি এ সংবাদ পেলে আনন্দে তার কবর চৌচির হয়ে পড়বে। এখানে খবর দ্বারা বেদনার স্পন্দন ফুটে উঠেছে। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

তারে আমি ভালবাসি সে যদি তা পায় মা খবর,

চৌচির হয়ে পড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।[৪৫]

খেয়াল > খিয়াল্‌ (خيال) ছায়ামুর্তি, ধারণা, কল্পনা, স্বপ্ন, চেতনা, ভূত, স্মরণ, চিন্তা, বিশেষ লক্ষ্য ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শব্দটি ব্যবহারে বেশ বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। শব্দটি তিনি নয়টি কবিতায় দশবার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'কল্পনা' অর্থে পাঁচটি কবিতায় ছ'বার, 'স্মরণ' অর্থে একটি কবিতায় একবার, 'ধারণা' অর্থে একটি কবিতায় একবার, 'চিন্তা' অর্থে একটি কবিতায় একবার ও 'বিশেষ লক্ষ্য' অর্থে একটি কবিতায় একবার। একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা বিষয়ে অভিজ্ঞতার বিরল প্রমাণ। 'কল্পনা' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

---

৪২. নজরুল ইসলাম, 'মিসেস এম রহমান', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৪২
৪৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ইনসাফ', "বিদায়-আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩,পৃ. ২৫৮
৪৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'শেষ শয্যায় নুরজহার', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৬
৪৫. নজরুল ইসলাম, 'অবেলার ডাক', "দোলন চাঁপা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

এমনি করিয়া কাটে জীবনের দিন,
খেয়ালে, স্বপনে; চিত্ত ভাবনাহীন।
গানের নেশায় গান গায়, আঁকে ছবি,
ভাবের বাজারে কারবার করে কবি।[৪৬]

'স্মরণ' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

অসুরে যে রাজ্য নেছে, তাই সে খেয়াল হায়;
রোসের ভরে শিশুর 'পরে বজ্র নিয়ে ধায়।[৪৭]

'ধারণা' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

খেয়াল নাই – নাইরে ভাই
পাইনি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়,–খিল্‌খিলাই–
বুল্‌বুলির বোল্ সাধি![৪৮]

'চিন্তা' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ– –

নেইক খেয়াল, আত্মা বেঁচে জগৎ-জোড়া কিনছে জমিদারী!
কে জানে ক'দিনের ঠিকা, ঠিকাদারের ঠ্যাকার কিন্তু ভারী![৪৯]

'বিশেষ লক্ষ্য' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

কি পাই না পাই, আমরা তা ভাই মোটেই ধরিনে।
মার্চ্চ্ ক'রে যাই গোলার মুখে খেয়াল করিনে।[৫০]

মোহিতলাল মজুমদারও শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'স্বপ্ন' ও 'চেতনা' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তিনি 'পুজোর পোষাক' কবিতায় ছোট্ট মেয়ের স্বপ্নকে খেয়াল শব্দ দ্বারা চমৎকার উপমায়িত করেছেন। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

গিন্নির বড়–ই ইচ্ছে ছিল একটা দামী ফ্রক,
মেয়ের খেয়াল অন্য রকম– বাবা– সাজার সখ্![৫১]

'চেতনা' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

গাল দু'খানি টুক-টুকে হয় যখন শরাব পিয়ে,
বড় নজর নরম যখন আধেক বুঁজে গিয়ে–
জায়েদ তখন খেয়াল হারায়, দবদবিয়ে রগ
নেশার আগুন ভেল্কি লাগায় – দিল্ করে ডগ্ মগ।[৫২]

---

৪৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কবির কারবার', 'মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৯৯
৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্কন্ধধাত্রী', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২০১
৪৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ঝর্ণার গান', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২১৩
৪৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কোনো ধর্ম ধ্বজের প্রতি', "বিদায় আরতি", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ২২১
৫০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বাঙ্গালী পল্টনের গান', "বেলা শেষের গান", পৃ. ৭১
৫১. মোহিতলাল মজুমদার, 'পুজোর পোশাক', "রূপকথা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৯০
৫২. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৯
৫৩. নজরুল ইসলাম, 'আনন্দময়ীর আগমনে', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩২২

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ইসলামও খেয়াল শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তিনি চারটি কবিতার মধ্যে দু'টি কবিতায় 'স্মরণ' অর্থে এবং দু'টি কবিতায় 'কল্পনা' অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন; 'স্মরণ' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায় নামাজ পড়ে,
নাই ক' খেয়াল গোলামগুলোর হারাম এ-সব বন্ধী-গড়ে।[৫৩]

'কল্পনা' অর্থে 'নারী' কবিতায় কবি শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করেছেন–

খেয়ালের বশে তাদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা।
লব-কুশে বলে ত্যাজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা![৫৪]

গরিব, গরীব > গারীব (غريب) নির্ধন, নিরাশ্রয়, অপরিচিত, দরিদ্র, অদ্ভুত, বিস্ময়কর, বিরল, অসহায়, দুস্থ, নিঃস্ব ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শব্দটি নয়টি কবিতায় বারবার 'নির্ধন', 'অসহায়', 'দরিদ্র ও 'অপরিচিত' অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটি শব্দের একাধিক ব্যবহার এবং যথাস্থানে শব্দ প্রয়োগের অসামান্য দক্ষতা সত্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রীয় প্রভাবের মাঝে থেকেও স্বতন্ত্র আসনে সমাসীন করেছে। শব্দটি ব্যবহারে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ;

'নির্ধন' অর্থে চারটি কবিতায় পাঁচবার–

বিধাতার বরে গরীব মেসিহি আপন খেয়ালে
রয়েচে সুখে,
বাদ্‌শার চেয়ে বড় হয়ে গেছে তোমার মূরতি
ধরি এ বুকে।[৫৫]

'অসহায়' অর্থে তিনটি কবিতায় পাঁচবার–

ঘর ব'লে কিছু রাখিলে না গরীবের,
বেপর্দা আজ কোণটি ইজ্জতের;
লাজ ঢেকেছিল কুঁড়েয় গরীব মেয়ে,
তুমি এলে তার আব্‌রুর মাথা খেয়ে।[৫৬]

'দরিদ্র' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

"যা কিছু নিজের বশে সেই সুখ-স্বর্গ"
প্রতি গৃহ-কোণে রহি দাও এই মন্তর,
চির দুর্ভিক্ষের কর তুমি উচ্ছেদ,
মর্যাদা-বোধে ভর গরীবের অন্তর।[৫৭]

৫৪. নজরুল ইসলাম, 'নারী', "সাম্যবাদী", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬
৫৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'খেয়ালীর প্রেম', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৯৩
৫৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'উড়োজাহাজ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ২২
৫৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'চরকার আরতি', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

'অপরিচিত' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

দাঁড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে,
কেউ দিত, কেউ দিতবা তাড়ায়ে,
ভিখারীর ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায় ।[৫৮]

মোহিতলাল শব্দটি দু'টি কবিতায় দু'বার 'নির্ধন' ও 'অসহায়' অর্থে ব্যবহার করেছেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে– অভাব যখন দরজায় এসে দাঁড়ায়, ভালবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়। গরিবি হালত ভালবাসা লাভের অন্তরায়, এ আবহ সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষাগত শিল্পসত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'হাফিজের অনুসরণে' কবিতায় এ ভাবটি সুন্দর ও সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। 'নির্ধন' অর্থে কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

পিয়ারা আমার বড় যে রূপসী!– চাহে না সে –
এমন গরীব– অভাজন তারে ভালোবাসে,[৫৯]

'অসহায়' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

আছে বটে,– আছে!– শাদার উপরে ছোট সেই কালো দাগ ।
নাজির খাঁ
এবার চলিনু, গরীবেরে 'পরে আর করিও না রাগ ।[৬০]

নজরুল কাব্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে গরীবের কথা। তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুলো অসহায় মানুষদের নিয়ে লেখা। গরীব, মিসকিন, কাঙালদের প্রতি তাঁর দরদের অন্ত নেই। 'গরীব' শব্দটি নজরুল ছয়টি কবিতায় সাতবার 'দরিদ্র' অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং গরীবের সাথে কাঙাল, ভিক্ষুক ও মিসকিন শব্দের সমন্বয় সাধন করে সুন্দর ভাষাগত সমঞ্জস্যতা বিধান করেছেন। 'শেষ সওগাত' গ্রন্থের 'আর কত দিন?' কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

আমরা কাঙাল, আমরা গরীব, ভিক্ষুক "মিস্‌কিন্‌",
ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন ।[৬১]

গোলাম, (غـــلام) ভৃত্য, চাকর, দাস, ক্রীতদাস, একান্ত অনুগত, আজ্ঞাবহ, ছেলে, বালক ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি 'ভৃত্য বা চাকর' অর্থে পাঁচটি কবিতায় সাতবার, 'ক্রিতদাস' অর্থে একটি কবিতায় একবার, 'অপরিচিত' অর্থে একটি কবিতায় একবার, 'বালক' অর্থে একটি কবিতায় একবার এবং 'আজ্ঞাবহ' অর্থে দু'টি কবিতায় দু'বার ব্যবহার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন এটি। শব্দটি ব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাগত নৈপূণ্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ;

---

৫৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শবাসীন', "তুলির লিখন', পৃ. ১০৩
৫৯. মোহিতলাল মজুমদার, 'হাফিজের অনুসরণে', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১২৩
৬০. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১৬
৬১. নজরুল ইসলাম, 'আর কত দিন?', "শেষ সওগাত", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

'ভৃত্য বা চাকর' অর্থে–

প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা-নাকাড়া
গিয়েছে বেজে;
গোলাম তোমার আমীর হয়েছে, ওই চাহনির
ভুষণে সেজে![৬২]

'ক্রীতদাস' অর্থে–

কেনা গোলাম কেবল খাটে!– জোয়াল নিয়ে স্কন্ধে,
জাবনা খায়, আর জাবর কাটে ঘনায় যখন সন্ধ্যে।[৬৩]

'অপরিচিত' অর্থে–

দাড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে,
কেউ দিত, কেউ দিতবা তাড়ায়ে
ভিখারির ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায়।[৬৪]

'বালক' অর্থে–

বুঝ সমঝের বইছে হাওয়া, গোলাম-সমঝ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর করছে দাবী সব দুনিয়া দাড়িয়ে উঠে![৬৫]

'আজ্ঞাবহ' অর্থে–

সুলতানা! আমি গোলাম তোমার, বাঁধা আছি হাতে গলে,
রাখিতে, মারিতে, বিক্রি করিতে পার গো ইচ্ছা হলে[৬৬]

মোহিতলাল মজুমদার শব্দটি দু'টি কবিতায় তিনবার 'একান্ত অনুগত' ও 'আজ্ঞাবহ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'একান্ত অনুগত' অর্থে দু'টি কবিতায় দু'বার–

গোলাম হাজির, আনিয়াছি, দেখে লও;
দেখ এই কিনা, বান্দার 'পরে এই বার খুশী হও![৬৭]

'আজ্ঞাবহ' অর্থে একটি কবিতায় একবার –

এই দুনিয়ার বাদশাহ যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি –
ভুলিতে পারিনা– যে জন নফর তুমি যে গোলাম তারি![৬৮]

---

৬২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'খেয়ালীর প্রেম', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৯৩
৬৩. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গরু ওজরু', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৪৩
৬৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'শবাসীন', "তুলির লিখন", পৃ. ১০৩
৬৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'আখেরী',:"বেলাশেষের গান", পৃ. ১৩৩
৬৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'প্রেম পত্রিকা', "তীর্থরেণু", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩৮৩
৬৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১০
৬৮. মোহিতলাল মজুমদার, 'নুরজহান ও জহাঙ্গীর', "বিস্মরণী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কাব্যে গোলাম শব্দের ব্যবহার হয়েছে বারটি কবিতায় চৌদ্দবার। নজরুল সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিধানের লক্ষ্যে 'গোলাম' শব্দের বহুবিধ ব্যবহার করেছেন। অর্ধ জাহানের খলিফা হয়েও হযরত ওমর জেরুজালেম যাবার পথে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজ হাতে রশি টেনেছেন, এ দৃশ্য নজরুলকে আভিভূত করেছে। ইসলামী ঐতিহ্যের এ অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নজরুল তাঁর 'উমর ফারুক' কবিতায়। "উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি' আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি' সে উটের রশি?" কবিতায় খলিফার সাথে গোলামের সুসামঞ্জস্যতা একটি চমৎকার ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। 'ভৃত্য বা চাকর' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

উষ্ট্রের পিঠে আরাম করিয়া গোলাম রহিবে বসি'
আর হেঁটে যাবে খলিফা উমর ধরি' সে উটের রশি?[৬৯]

'আজ্ঞাবহ' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

মদের নেশায় গোলাম আমি সদাই থাকি নুইয়ে শির,
জীবন আমি পণ রাখি ভাই, প্রসাদ পেতে তার হাসির।[৭০]

জবাব > জওয়াব (جواب) উত্তর, কৈফিয়ত, প্রত্যুত্তর, সাড়া ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শব্দটি পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার 'উত্তর' ও 'কৈফিয়ত' অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'তুলির লিখন' কাবিতায় তিনি মনের মালিককে জবাব দিতে দেরী করার অভিযোগ তোলেছেন এভাবে–

মনের মালিক তফাৎ থাকে দ্যায় না সে ধরা,
কইলে কথা জবাব দিতে করেই না ত্বরা।[৭১]

'অনুশোচনা' কবিতায় তিনি 'কৈফিয়ত' অর্থে শব্দটিকে এভাবে ব্যবহার করেছেন–

সুধালে বারতা,– কী দিব জবাব ? –
গেছে– সব গেছে মারা,
কেল্লা যাহারা করিল দখল
কেউ ফেরে নাই তারা।[৭২]

মোহিতলাল মজুমদার জওয়াব মানে 'উত্তর' ও 'প্রত্যুত্তর'–উভয়টিই ব্যবহার করেছেন। শব্দটি 'প্রত্যুত্তর' অর্থে দু'টি কবিতায় দু'বার আর 'উত্তর' অর্থে তিনটি কবিতায় তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ; 'প্রত্যুত্তর' অর্থে–

জাফর তোমার কাফেরগুলাকে রাখিব না কাল প্রাকে,
রোজ কেয়ামৎ' দেখো দাঁড়াইয়া জুম্মা-বাড়ীর ছাতে।
– কোনো কথা নয় আর!

৬৯. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৫
৭০. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ- ই- ওমর খৈয়াম", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩১০
৭১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দুর্ভাগা', "তুলির লিখন", পৃ. ৮৯
৭২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অনুশোচনা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার ![৭৩]

'উত্তর' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

আরে বুজ্‌রুক! বুজরুকি রাখ! কথার জবাব চাই –

আমি চেয়েছিনু শিরটাই শুধু, এ তো আমি চাহি নাই ।[৭৪]

নজরুল ইসলাম জওয়াব শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার 'উত্তর' অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'উমর ফারুক' কবিতায় শব্দটি এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে–

কি দিব জওয়াব, কি করিয়া মুখ দেখাব রসুলে ভাই?

আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু! মোর অধিকার নাই[৭৫]

তুফান > তুফান্ (طوفان) প্লাবন, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সরযু' কবিতায় শব্দটি একবার মাত্র 'প্লাবণ' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন–

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় নাগর-দোলায় চলছে ঘোরাঘোরি,

উঠা-নামার চল্‌ছে তুফান, আগমনী ডাক্‌ছে কিসর্জনে,

ছায়াবাজীর পুতুল চলে সারি সারি উচিয়ে ছায়া-তুরী,

নেচে চলে হিন্দু মোগর, প্রসেনজিতের প্রাচীন ও পত্তনে ।[৭৬]

মোহিতলালে তুফানকে 'প্রবল শোরগোল' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' কবিতায় বলেছেন–

ছুবীর. ফলকে ঝলকে-ঝলক রক্তের ফোয়ারায়

অট্টহাসির তুফান তুলেছি– খোদা চেয়ে ছিল ঠায়![৭৭]

কাজী নজরুল ইসলাম 'তুফান' শব্দটি আঠারটি কবিতায় একুশবার ব্যবহার করেছেন। প্রতি বারই তিনি তুফানকে 'প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তুফান ঝড়ের প্রতীক, তাই শব্দটির ব্যবহারও সুসামঞ্জস্য হয়েছে। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

শারাব-খানায় গজল শোন তোমার কবির বন্দনা-গান;

তেম্‌নি করে সূর্য ডোবে, নহর-নীরে বহে তুফান ।[৭৮]

দুনিয়া > দুনইয়া (دنيا) পৃথিবী, বিশ্ব, জগৎ, ইহকাল ইত্যাদি। শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল সকলেই শব্দটি 'ইহকাল' অর্থে ব্যবহার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন

---

৭৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'নাদিরশাহের শেষ', " স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১০২
৭৪. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১২
৭৫. নজরুল ইসলাম, 'উমর ফারুক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৮৫
৭৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সরযু', "বেলা শেষের গান", পৃ. ৬
৭৭. মোহিতলাল মজুমদার, 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও অরংজীব', "অগ্রন্থিত কবিতা", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬১২
৭৮. নজরুল ইসলাম, 'শাখ-ই-নবাত', "ঝড়", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সাতাশটি কবিতায় চল্লিশবার, মোহিতলাল ব্যবহার করেছেন আটটি কবিতায় সতেরবার এবং নজরুল করেছেন ছত্রিশটি কবিতায় আটষট্টিবার। কবিগণের বহুল ব্যবহারে এ কথাই প্রমাণিত যে, কাব্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'দুনিয়া' শব্দের কোন বিকল্প নেই। এটাই যেন বাংলা শব্দ। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদী কে আর গর-বনেদী,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।[৭৯]

মোহিতলালের দুনিয়ায় তেজস্বিতা আছে, আছে হুংকার। এখানে রাজা-প্রজা সকলি সমান। কেউ কারো ভয়ে ভীত নই। অতএব আমাদের কেউ বাদ সাধলে তার রক্ষে নেই। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

এই দুনিয়ায় ডরি না কাহারে, আমরাই প্রজা আমরা রাজা!
আমাদের সাথে বাদ সাধে যেই, আমাদের হাতে পাবেই সাজা![৮০]

নজরুলের দুনিয়ায় সমব্যাথী বন্ধুর অভাব। তাঁর ভাষায় দুনিয়া জুড়ে প্রেমিক থাকলেও দীল্‌দরদী বন্ধু নেই। এ অব্যক্ত বেদনা নিয়েই তিনি দিওয়ান-ই-হাফিজে 'দুনিয়া' শব্দের ব্যবহার করেছেন এভাবে-

সব অজানা জানার মাঝে প্রেম-দেওয়ানা ফিরনু ভাই,
দুনিয়া জুড়ে দেখনু ঢুঁরে দিল্‌দরদী বন্ধু নাই।[৮১]

নজর > নাজ.ার (نظر) দৃষ্টি, লক্ষ্য, মনযোগ, পর্যবেক্ষণ, অভিনিবেশ ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম শব্দটিকে 'দৃষ্টি' অর্থে ব্যবহার করেছেন। নজরুল ইসলাম অবশ্য রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (৩৭)-এ 'নজর' শব্দটি 'লক্ষ্য' অর্থে ব্যবহার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'সাগর তর্পণ' কবিতায় 'নজর' লাগাকে 'চোখলাগা' বা 'নজরপড়া' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার 'দৃষ্টি' অর্থে এসেছে–

রাখব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের 'পর
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর![৮২]

মোহিতলালও শব্দটি তিনটি কবিতায় 'দৃষ্টি' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন–

ভূরুর কোণা সূরু কোথায় – নজর নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়াতলে![৮৩]

---

৭৯. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'জাতির পাতি', "কাব্য সঞ্চয়ন", পৃ. ৮২
৮০. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন' "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৩
৮১. নজরুল ইসলাম, 'দিওয়ান-ই-হাফিজ', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ৩১৪
৮২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাগর তর্পণ', "কুহু ও কেকা", পৃ. ২১৫
৮৩. মোহিতলাল মজুমদার, 'চোখের দেখা', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৬৯
৮৪. নজরুল ইসলাম, 'বাংলার আজিজ', "সন্ধ্যা", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কাব্যে 'নজর' শব্দ 'সোবহে সাদেকের' আলোকের উদ্ভাষণকে 'দৃষ্টি'র রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন, যে আলোকে মুয়াজ্জিন মিনারে চড়ে আজানের 'আল্লাহো আকবার ধ্বনি দিয়ে মুসল্লীদের নিদ্রা ভঙ্গ করেন। 'দৃষ্টি' অর্থে 'সন্ধ্যা' কবিতায় একবার এসেছে–

ফজর বেলার নজর ওগো উঠলো মিনার 'পর,
ঘুম টুটানো আজান দিলে– "আল্লাহো আকবার!"[৮৪]

'লক্ষ্য' অর্থে একটি কবিতায় একবার–

বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর
থাকে যেন তোমার নজর,
তৃণ কুটোর পরেও ত গো
পড়ে রবির প্রভাতী কর![৮৫]

ফকির > ফকীর > ফক়ীর > (فقير) গরীব, ভিখারী, অভাবী, সাধু দরবেশ ইত্যাদি। সত্যেন্দ্রনাথ নিঃস্ব অসহায়কে যেমন 'ফকির' বলেছেন, তেমনি সাধু-দরবেশকেও 'ফকীর' বলেছেন। তিনি পাঁচটি কবিতার মধ্যে দু'টিতে 'গরীব' অর্থে এবং তিনটিতে 'সাধু-দরবেশ' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তিনি হত-দরিদ্র প্রেমিককে দানশীল ধনির চেয়েও বেশী ভাল বলে মনে করেন। যেমন, 'সাকীর প্রতি' কবিতায় কবির অভিব্যক্তি নিম্নরূপ–

আচার নিষ্ঠ দানশীল ধনী হতে,
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহু মতে।[৮৬]

'সাধু-দরবেশ' অর্থে কবিতাটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

বিশ্বজীবের ব্যথার ব্যথি সোনার রাজ্য ফেলে
বেরিয়ে গেছে ফকীর-বেশে ছাই দিয়ে সংসারে[৮৭]

মোহিতলালের কাছে 'ফকির' মানেই সাধূ-সন্যাসী। যে ফকির দুনিয়ার সব কিছু ভুলে শুধু মাত্র ধ্যান তপস্যায় মগ্ন থাকে। তাঁর কাছে নারী দেহের রূপ কিছুই নয়। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

ভুলিয়াছি ভয়, স্নেহ ভুলিয়াছি, ভুলিয়াছি রাজনীতি;
রমনীর রূপ হারাম করেছি,– ফকিরের যেই রীতি[৮৮]

---

৮৫. নজরুল ইসলাম, 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' (৩৭), নজরুল রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ১১৫
৮৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সাকীর প্রতি', "তীর্থ সলিল", পৃ. ১৬৬
৮৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বুদ্ধবরণ', "বেলাশেষের গান", পৃ. ৯৮
৮৮. ইরাণী:স্বপন-পসারী, রমনার তাজ: অগ্রন্থিত কবিতা

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল ফকির শব্দটি তিনটি কবিতায় এগারবার 'সাধু-দরবেশ' ও 'দরিদ্র' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি সাধু-দরবেশ অর্থেই বেশীরভাগ জায়গায় শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। শুধু একটি জায়গায় গরীব অর্থে ব্যবহার করলেও ব্যবহারটি হয়েছে প্রণবন্ত। যেমন-'সাধু-দরবেশ' অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিুরূপ-

রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বদ্ধ দু'টি হাত

থুয়ে ফকীর পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত।[৮৯]

'গরীব' অর্থে অর্থে শব্দটির ব্যবহার নিুরূপ-

আজি আরাফাত-ময়দান পাতা গাঁয়ে গাঁয়ে,

কোলাকুলি করে বাদশা-ফকীরে ভায়ে ভায়ে,[৯০]

বিদায় > বিদা' (وداع) বিদায়, প্রস্থান, ছুটি, বিতাড়ন ইত্যাদি। শব্দটি এত বহুল ব্যবহৃত যে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শব্দটি একত্রিশটি কবিতায় পয়ত্রিশবার, মোহিতলাল মজুমদার পঁচিশটি কবিতায় ত্রিশবার এবং নজরুল ইসলাম চৌত্রিশটি কবিতায় বায়ান্নবার 'বিদায়' বা 'প্রস্থান' অর্থে ব্যবহার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের বিদায়ে রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তিরস্কারের ছোঁয়া। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ-

বিদায় শেয়াল, নেকড়ে বিদায়, বিদায় ভালুক ভাই,

সুবল ব'লে ছিল যে-জন সে আর বেচেঁ নাই।[৯১]

মোহিতলালের বিদায়ে রয়েছে আনন্দ আর ভালবাসার ছোঁয়া, রয়েছে মধুরতা। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ-

আমি চাই শুধু ক্ষণিকের স্মৃতি-

নিমিষের দেখা, মধুর বিদায়।[৯২]

পক্ষান্তরে নজরুলের কবিতায় বিদায়ের করুণ ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কোন বিদায়কেই মানুষ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না, আর সে বিদায়টি যদি হয় মৃত্যু তাহলে তো কোন কথাই নেই। কবি তাঁর শেষ বিদায়ের ক্ষণে তাঁর প্রিয়তমার স্বরূপ কী হতে পারে তাই কবিতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ-

যেদিন আমি বিদায় নেব শেষের খেয়া বেয়ে

জানি না তার আখি সেদিন থাকবে কোথায় চেয়ে।[৯৩]

---

৮৯. নজরুল ইসলাম,'মুক্তি', "সংযোজন", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ২৮৪
৯০. নজরুল ইসলাম, 'ঈদ মোবারক', "জিঞ্জির", নজরুল রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১৬৯
৯১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গায়ের পালা', "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্র রচনাবলী, খ. ৩, পৃ. ৬২
৯২. মোহিতলাল মজুমদার, 'ক্ষণিকা', "হেমন্ত-গোধুলী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৪৬৯
৯৩. নজরুল ইসলাম, 'পুবের চাতক', "দোলন চাঁপা", নজরুল রচনাবলী, খ. ১, পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

মজলিশ বা মজলিস > মাজলিস্ (مجلس) সভা, সমাবেশ, অধিবেশন, আসর, পরিষদ, বোর্ড, আড্ডা ইত্যাদি। শব্দটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার 'আসর' অর্থে এবং একটি কবিতায় একবার 'আড্ডা' অর্থে ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে মোহিতলাল ব্যবহার করেছেন 'আসর' অর্থে দু'টি কবিতায় দু'বার, আর নজরুল ইসলাম শব্দটিকে একটি কবিতায় 'আসর' অর্থে একবার ও দু'টি কবিতায় 'বৈঠক' অর্থে দু'বার ব্যবহার করেছেন। 'যশমন্ত' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটিকে 'আসর' অর্থে ব্যবহার করেছেন এভাবে –

নক্সা দেখে আপনি তুমি তুষলে বখশিশে,
দেওয়ান-খাসে ঠাঁই দিলে হে গুণবীর মজলিসে।[৯৪]

'আড্ডা' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন এভাবে–

এ সকল কথা আগে ভাবি নাই;
দিন গেছে টো টো ক'রে,–
দোকানে দোকানে মজলিস্ রেখে,–
ফল পেড়ে পাখী ধরে।[৯৫]

মোহিতলালের মজলিসে শব্দ 'আসর' বুঝিয়েছেন। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ–

রং–বেরঙের সাজ করে ওরা, শাদা-চোখে হয় সুর্মা-টানা!
মজলিসে বসে' মিঠে মদ খায়, পিঠে ঠেস দিয়ে তাকিয়াখানা![৯৬]

কবি নজরুলের মজলিসটি হল বিশ্বের সেরা মজলিস। যে মজলিসে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)–এর বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। এমন একটি মুসলমানী আবহ রক্ষার্থে নজরুল শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার ব্যাতিক্রমী কোন শব্দ এখানে মানানসই হতো কি না সন্দেহ। 'বৈঠক' অর্থে কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নীম্নরূপ–

তালিব উঠিয়া কহে "লগ্ন যায় আর নহে,
বন্ধুগণ শুভকার্য হোক সমাপন।"
আনন্দের সে সভায় সকলি দানিল সায়
মজলিশে বসিল আসি' কন্যাপক্ষগণ।[৯৭]

'আসর' অর্থে কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নীম্নরূপ–

মরতে যদি হয় গো আমার শরাব পানের মজলিশে–
স্বর্গ-নরক সমান, পাশে থাকবে শারাব আর প্রিয়া।[৯৮]

---

৯৪. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,'যশমন্ত', "তুলির লিখন", পৃ. ৮১
৯৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিদ্যার্থী', "তুলির লিখন", পৃ. ৯৪
৯৬. মোহিতলাল মজুমদার, 'বেদুঈন', "স্বপন-পসারী", মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ১৩৪
৯৭. নজরুল ইসলাম, 'সম্প্রদান', "মরু-ভাস্কর", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ১১১
৯৮. নজরুল ইসলাম, "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম", নজরুল রচনাবলী, খ. ৪, পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। বাংলা ভাষার জন্মেরও বহু আগ থেকে এ দেশের বুলিতে আরবীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তা ছিল ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন আরবদেশ থেকে নদী পথে অসংখ্য পীর-মাশায়েখের বাংলায় আগমনের ফলশ্রুতিতে। এরপর প্রায় ছয় শতোর্ধ বছর সেমেটিক রক্তের আরব-ইরানীয় রাজা-বাদশাহদের এদেশ শাসনের মধ্যদিয়ে আরবী-ফার্সীর প্রভাব আরো কার্যকর হয়। আর এ কারণেই মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রভাব পড়ে আরবী ও ফার্সীর। সৈয়দ সুলতান, জৈনুদ্দিন, সারিবিদ খান, শেখ চান্দ, শাহ মোহাম্মদ সগীর, আলাওল, দৌলত কাজী বাহরাম খা, সৈয়দ মর্তুজা, হেয়াত মাহমুদ, সৈয়দ হামজা, শাহ্ গরীবুল্লাহ–প্রমূখ এ সময় আরবী-ফার্সী মিশ্রিত পদ্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এরপর শুরু হয় মার্শম্যান ও উইলিয়াম কেরীদের আরবী ও ফার্সীর নিসূধনযজ্ঞের কাজ। বাংলা ব্যাকরণ রচনাসহ নানাবিধ বই-পুস্তক লিখেও থামাতে পারলো না বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দের অনুপ্রবেশের এ ধারাটি। বরং ব্যাপক থেকে আরো ব্যাপকতর হলো। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণের পাশাপাশি হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণও এগিয়ে এলেন কাব্য-সাহিত্যের এ ধারাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে। এদের মধ্যে রাজা রাম রাম বসু, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ মিত্র, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার অন্যতম। এঁদের রচনাসমূহে আরবী-ফার্সী শব্দ এমনভাবে গ্রথিত হল যে, এটাই যেন বাংলা ভাষা। এরপর বাংলা সাহিত্যে ধ্রুবতারাসম আবির্ভূত হলেন হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। ঝড়ের বেগে এসে 'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ' হায়দরী হাঁক হেনে বাংলা সাহিত্যের হিরন্ময় মুকুটটি ছিনিয়ে নেন। সাহিত্য জগতে হৈ চৈ পড়ে যায়। সাহিত্য প্রেমিরা তাঁর আরবী-ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগের অসাধারণ দক্ষতা দেখে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে পড়েন। তাঁর শব্দ প্রয়োগের নন্দন-তাত্ত্বিক বিন্যাস দেখে চকিত আনন্দে বিভোর হয়ে 'বাংলার সারস্বত মণ্ডপে' তাঁকে স্বাগত জানান।

সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল–বাংলা কাব্য জগতের এ তিন-দ্রষ্টা আরবী ও ফার্সীজাত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন আর বাংলা ভাষাকে করেছেন সমৃদ্ধশালী। তাঁদের কবিতাসমূহে প্রচুর আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় সর্বমোট একশত আটষট্টিটি আরবী শব্দ আটশত একুশবার ব্যবহার করেছেন। শুধু 'হাওয়া' শব্দটি সর্বাধিক তিরান্নব্বইটি কবিতায় একশত তেইশবার ব্যবহার করেছেন। মোহিতলাল মজুমদার একশত চৌষট্টিটি আরবী শব্দ পাঁচশত ঊনত্রিশবার ব্যবহার করেছেন। তিনি 'বিদায়' শব্দটি সর্বাধিক পঁচিশটি কবিতায় ত্রিশবার ব্যবহার করেছেন। নজরুল তাঁর অসংখ্য কবিতায় সার্থক ও সচেতনভাবেই আরবী-

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় সর্বমোট এক হাজার চারশ' আঠারটি আরবী শব্দ দু'হাজার দু'শত পয়ষট্টিবার ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি 'আল্লা' শব্দটি সর্বাধিক ষাটটি কবিতায় একশ' ঊননব্বইবার ব্যবহার করেছেন। আরবী ও ফার্সী শব্দ এবং এর বাচ্যরীতি বাংলা সাহিত্যের এরূপ একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে দাঁড়ায় যে, তাঁরা এর ব্যবহার না করে পারেননি। কেননা তারা ঐ সকল সাবলিল ও প্রাণবন্ত শব্দ সমুহের উপযুক্ত প্রতিশব্দ অন্যত্র খুঁজে পাননি।

সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের কাব্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে আরবী-ফার্সী শব্দ। তাঁদের ব্যবহৃত আরবী শব্দের পরিসংখ্যান থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এর ব্যাপকতা সহজেই অনুমেয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের মত হিন্দু কবিগণ এত বিপুল পরিমাণ আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হয়তো এ অভিসন্দর্ভ রচনা না হলে বুঝাই যেত না।

নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা' থেকে শুরু করে 'মরু-ভাস্কর', 'সর্বহারা' ও অন্যান্য গ্রন্থের উপর জরিপ চালিয়ে মোটামুটিভাবে প্রায় **তিন** হাজার বিদেশী শব্দের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ **তিন** হাজার শব্দের মধ্যে ৬০% আরবী শব্দ, ৩০% ফার্সী শব্দ এবং ১০% অন্যান্য শব্দ। এ পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান যে, নজরুল ইসলামী ঐতিহ্য রূপায়ণে ইসলামেরই মৌল-ভাষা আরবী ভাষাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাধাণ্য দিয়েছেন। যদিও অনেক গবেষক অজ্ঞতাবশত নজরুলের ফার্সী শব্দ ব্যবহারের আধিক্যতা দাবী করে আসছে।

যাহোক, "সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের এক অজানা বিষয় সাহিত্য-প্রেমিকদের জন্য উদ্ঘাটিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। নজরুলের আরবী-ফার্সী-উর্দু শব্দ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা হলেও শুধু আরবী শব্দের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা বাংলা সাহিত্যে এ প্রথম। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের মত কবিগণ আরবী-ফার্সী বিষয়ে এতটা সচেতন ছিলেন এবং তাঁদের কবিতাসমূহে এত ব্যাপক ব্যবহার করেছেন এ অভিসন্দর্ভ রচনা না হলে পাঠকমহলের কাছে তা হয়তো অজানাই থেকে যেত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী

আল্ কোরআনুল কারীম।

আহমদ হাসান আল-যায়্যাত : তারিখ আদব আল আরবী উর্দু অনুবাদ, লাহোর: প্র.বি,১৯৬১।

জুরজী যায়দান : তারীখু আাদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ্, মাতবা'আতু হিলাল, মিশর, ১৯৫৭।

বাংলা

অশোক কুমার মিত্র : নজরুল প্রতিভা পরিচিতি, বাণী ভবন, ঢাকা, ১৯৬৯।

ডক্টর অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়(সম্পাদিত) : সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৪।

ঐ : সত্যেন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৬।

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ : মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।

আজহার ইসলাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসংগ-প্রাচীন মধ্যযুগ, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা,১৯৭৭।

আজহারউদ্দিন খান : বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬১।

আজহারউদ্দিন খান ও ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত) : মোহিতলালের পত্র গুচ্ছ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৯।

আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

আতাউর রহমান : নজরুল কাব্য সমীক্ষা, ৩য় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।

ড. আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংখ্যা, মুক্তধারা, ঢাকা, ফরাসগঞ্জ, ১৯৮৩।

আনিসুল হক চৌধুরী : বাংলার মূল, ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক : বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রমিনেন্ট ঢাকা, পাবলিকেশন, ২০০৩ ।

আ ফ ম ইসহাক : মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, ৩য় সংখ্যা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ : বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬ ।

ঐ : ইকবাল ও নজরুলের কাব্যে ভাবধারা, ই ফা বা, ঢাকা, ২০০৩ ।

ডক্টর আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

ঐ : বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ ।

আবদুল কাদির : নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, ঢাকা, ১৯৮৯ ।

ঐ : নজরুল পরিচিতি, ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮ ।

আবদুল কাদির (সম্পাদিত) : নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৬ ।

ঐ : নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৭ ।

ঐ : নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

ঐ : নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী : বাংলাদেশে আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা, ই ফা বা, ঢাকা, ২০০৫ ।

আবদুল মমিনচৌধুরী : প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বর্ণায়ন, ঢাকা,২০০২ ।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : বাংলা ও বাঙ্গালী মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারা, সৃজন প্রকাশনী লিঃ, ঢাকা, ফাল্গুন-১৩৯৭ ।

আবদুল মান্নান : শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের জীবনী, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মান্নান তালিব : বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০।

ঐ : বাংলাদেশে ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০২, ২য় সংস্করণ।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ : করতলে মহাদেশ, ২য় সংস্করণ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।

ঐ : নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

ঐ : নজরুল ইসলামঃ কালজ কালোত্তর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

আব্দুল মুকীত চৌধুরী : নজরুল ইসলামঃ ইসলামী কবিতা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৫।

ড. মুহম্মদ আবদুর রহীম (অনু. ড. আসাদুজ্জামান) : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১।

আবুল কালাম মুস্তাফা (সংকলক ও সম্পাদক) : বাংলা একাডেমী নজরুল শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

আব্বাস আলী খান : বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৫।

মো. আবু বকর সিদ্দীক : আরবী সাহিত্য সমালোচনা, সুলতানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।

আবদুর রহমান খান : বাংলা সাহিত্যের কালাক্রমিক পরিচয়, ১ম খণ্ড, গুরুগৃহ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪।

আবদুস সাত্তার : আধুনিক আরবী সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪।

ঐ : নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ, নজরুল ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২।

আবদুল হক ফরিদী : মাদ্রাসা শিক্ষা:বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৫।

সৈয়দ আলী আহসান : 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ পরিচয়', ১৩৪৮ পৌষ সংখ্যা।

আহমদ শরীফ : মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৯ বাং।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা-সাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

ঐ : মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য, প্রবন্ধ সংগ্রহ, চতুর্থ সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

ঐ : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮৪।

ঐ : মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৫।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পাদিত) : বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (পরিমার্জিত সংস্করণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৩য় মুদ্রণ, ২০০৩।

এস. সি. রায় চৌধুরী : সোস্যাল কালচারাল এণ্ড ইকনোমিক হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া , সুরজিদ পাবলিকেশন্স, দিল্লী, ১৯৪৮।

ওয়াকিল আহমদ : বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ৩য়,সংস্করণ, খান ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২।

ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদিত) : সাহিত্য পত্রিকা (নজরুল জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা), বিয়াল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৫, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. কথাকলি সেনগুপ্ত : মোহিতলাল কবিতাপাঠ, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০১।

কাজী আবদুল ওদুদ : সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশিত কবি নজরুল ইণ্ডিয়ানা, কলকাতা, ১৯৫৭।

কাজী দীন মুহাম্মদ : আমাদের ভাষা ও সাহিত্য, মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য-গদ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯২, পুনঃমুদ্রণ।

ঐ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকাঃ ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৮।

কাজী নজরুল ইসলাম : অগ্নি-বীণা, আর্য্য পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯২২।

ঐ : দোলন-চাঁপা, আর্য্য পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯২৩।

ঐ : বিষের-বাঁশী, কাজী নজরুল ইসলাম, হুগলী, ১৯২৪।

ঐ : ভাঙ্গার গান, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৪।

ঐ : ছায়ানট, বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯২৪।

ঐ : পূবের হাওয়া, মজিবুল হক, বি. কম, বরিশাল, ১৯২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ : চিত্তনামা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৫ ।

ঐ : সাম্যবাদী, বেঙ্গল পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯২৫ ।

ঐ : সর্বহারা, বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯২৬ ।

ঐ : ঝিঙে ফুল, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৬ ।

ঐ : ফণি-মনসা, কাজী নজরুল ইসলাম, কলকাতা, ১৯২৭ ।

ঐ : সিন্দু-হিন্দোল, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৭ ।

ঐ : সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৮ ।

ঐ : জিঞ্জীর, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৮ ।

ঐ : চক্রবাক, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৯ ।

ঐ : সন্ধ্যা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯২৯ ।

ঐ : প্রলয়-শিখা, কাজী নজরুল ইসলাম, কলকাতা, ১৯৩০ ।

ঐ : রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৩০ ।

ঐ : চন্দ্রবিন্দু, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৩১ ।

ঐ : কাব্য আমপারা, করিম বখ্‌শ ব্রাদার্স প্রেস, কলকাতা, ১৯৩৩ ।

ঐ : নির্ঝর, কলকাতা, ১৯৩৫ ।

ঐ : নতুন চাঁদ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৪৫ ।

ঐ : শেষ সওগাত, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৮ ।

ঐ : ঝড়, বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৬০ ।

কে.এম.রাইসউদ্দিন খান : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৯৬ ।

গোলাম মঈনুদ্দীন : কবি ফররুখঃ ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

ড. মোহাম্মদ গোলাম রসুল : সমাজ ও সভ্যতার ইতিকথা, আলীগড় লাইব্রেরী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯০ ।

গোলাম হুসায়ন সলীম, অনু. আকবর উদ্দীন : বাঙলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

জামিল চৌধুরী (সম্পাদিত) : বাংলা একাডেমী বাংলা বানান-অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পদিত : মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রতিভা, এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২।

ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় : মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭৯ বাং।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন : সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৮।

ড. নুরুর রহমান : সৈয়দ মুজতবা আলীঃ জীবন কথা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (আল-মু'জামুল ওয়াফী), রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫।

ফজলুল হাসান ইউসুফ : বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২।

বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত (সম্পাদিত) : ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, ১৯৬৩, ৩য় সংস্করণ।

শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, বাক সাহিত্য প্রা. লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১।

ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত) : মোহিতলাল মজুমদারের কাব্য সংগ্রহ, কলকাতাঃভারবি, ১৯৯৭।

মনসুর মুসা সম্পাদিত : বাঙলাদেশ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৪।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : প্যারিচাঁদ রচনাবলী, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৬৮।

মমতাজুর রহমান তরফদার : হুসাইন শাহী বেঙ্গল, ঢাকা, ১৯৬৫।

মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ (সম্পাদিত) : কাজির সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৩৯৭ বাং.।

মিনহাজ-ই-সিরাজ : তাবাকাত-ই-নাসিরী, ঢাকা, ১৯৮৩।

মুজাফ্ফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৭, ৩য় প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

মুন্সী রহমান আলী তায়েশ : তাওয়ারিখ-এ-ঢাকা কলিকাতা,ষ্টার অব ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৯১০।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত) : নজরুল ইসলাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯।

ঐ : নজরুল ইসলামঃ নানা প্রসঙ্গ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯১।

মোহিতলাল মজুমদার : 'শিলাইদহে রবীন্দ্রস্মৃতি'-প্রবন্ধ রবিপ্রদক্ষিণ, কলকাতা, ১৩৫৬ বাংলা।

ঐ : সাহিত্যকথা, বঙ্গ ভারতী গ্রন্থালয়, হাওড়া, ১৩৬৬ বাংলা, কলকাতা, ২য় সংস্করণ।

রঞ্জিতকুমার দেব (সম্পাদিত) : কবি নজরুল, সংস্কৃতি পরিষদ, ইণ্ডিয়ানা পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯৫৭।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, কলকাতা, ১৯৮১।

ড. রশীদুল আলম : মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, বগুড়াঃ সাহিত্য সোপান, ২০০০, পুনঃমুদ্রণ।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭১।

রিজিয়া সুলতানা : গুলে বকাওলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাংলা সাহিত্যের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

শাহাবুদ্দীন আহমদ : ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : কাজি নজরুল ইসলাম, সঙস্কৃতি পরিষদ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৫৭।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : কুহু ও কেকা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬৮ বাং.।

ঐ : বেলা শেষের গান, এম.সি.সরকার এণ্ড সন্স, কলকাতা, তা.বি।

ঐ : তুলির-লিখন, কান্তিক প্রেস, কলকাতা, ১৩২১ বাং.।

ঐ : তীর্থ সলিল, ইন্ডিয়ানা পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৩19

Dhaka University Institutional Repository

বাং., ২য় সংস্করণ ।

ঐ : কাব্য সঞ্চয়ন, এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, বাং. ১৩৭২ ।

ঐ : ধূপের ধোঁয়ায়, আর্য-সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৯২৯ ।

ঐ : বিদায় আরতি, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা, তা.বি ।

ঐ : বেণু ও বীণা, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, ১৯২৬ ।

ঐ : রঙ্গমল্লী, কলকাতাঃ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ, তা. বি ।

ঐ : সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, এম. সি সরকার এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৪৫ ।

ঐ : হোম-শিখা, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, কলকাতা, ১৯০৭ ।

সনজিদা খাতুন : কবি সত্যেন্দ্রনাথ, নিতাইচন্দ্র দাস, কলকাতা, ১৯৫৮ ।

ঐ : সত্যেন্দ্র কাব্য পরিচয়, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯ ।

সম্পাদনা পরিষদ (ই. ফা. বা) : ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬ ।

ঐ : ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৬ ।

ঐ : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি ।

ঐ : সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন : আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বুক ফোরাম, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

ঐ : আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : অর্থনীতিক ভূ-গোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত)	:	বাংলা পিডিয়া, ১ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।
ঐ	:	বাংলাপিডিয়া, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।
ঐ	:	বাংলা পিডিয়া, ১০ম খণ্ড, বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।
ঐ	:	বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, এসিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।
সুকুমারসেন	:	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৮।
ড. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়	:	অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ, এ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৮ বাং.।
সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত)	:	বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।
সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	:	রবীন্দ্র-স্মৃতি,কলকাতা, ১৩৬৪ বাং.।
ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল	:	বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ, বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭।
হরপ্রসাদ মিত্র	:	কবি সত্যেন্দ্রনাথের কথা, শারদীয় জনসেবক, কলকাতা, ১৩৬১।
হাকিম আরিফ	:	নজরুল-শব্দপঞ্জি, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	:	গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।
ড. হাসান জামান	:	সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭।
হেমেন্দ্রকুমার রায়	:	যাঁদের দেখেছি, কলকাতা, ১৩৫৯, ২য় পর্ব।
হেয়াতনন্দন নজরমামুদ	:	তৌহিদঈমান, জ্যোতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯।
ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পাদিত)		

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী

K.N.Dikshit : Mamoriors of the Archaeological Survey of India, 1938

Kazi Abdul Mannan : The Emargence and Development of Dobhasi Literature in Bangla up to 1855, Dhaka, 1974.

Nahru jawahar lal : The discovery of India, Calcutta, 1946.

Muhammad Mohor Ali : History of the Muslim of Bengal, Voll. 1, Imam Muhammad Ibn Sa`ud Islamic University, Riyadh, 1985.

Shamsuddin Ahmed (ed.) : Inscriptions of Bengal, Vol, 4, Varendra Research Museum, Rajshahi

S. K. Ikram & Spear, (ed) : Cultural Heritage of Pakistan, Oxford University Press', London, 1955.

Sunity Kumar chatterjee : The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta. 1926, Vol-1.

Hunter W.W : Indian Musalman, Lahore,1964.

সাময়িকী

A.H.vidyarthi : Arabic: The Mother of all languages; Sanskrit: Its incognito Offspring. (The Islamic Riview, January, 1959), Vol-XLVII, No-1.

আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দিন : সেমিটিক (সামী) ভাষা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা:কার্তিক-চৈত্র সংখ্যা,১৩৮২ ।

ঐ : বাংলাদেশে আরবী ও উর্দু চর্চা (অপ্রকাশিত প্রবন্ধ)

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আলী আশরাফ : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৯ বাংলা, শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা ।

এ, এ, এম নুরুল আলম : বাংলাদেশে আরবী চর্চার ভবিষ্যত ও প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৯৩, পয়তাল্লিশ সংখ্যা ।

কাজী রফিকুল হক : বাংলা ভাষায় আরবী-ফার্সী-তুর্কী-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান, সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ২০০০, তেতাল্লিশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ।

প্রমথ চৌধুরী : সত্যেন্দ্রনাথ, 'সবুজ পত্র', কলিকাতা, জৈষ্ঠ ও আষাঢ ১৩২৯ ।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান : বাংলাদেশে ইসলামঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা ।

বাংলাবিভাগ (প্রকাশিত) : সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢা.বি.,জুন.২০০০, তেতাল্লিশ বর্ষ, সংখ্যা .৩ ।

সাচু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় : সত্যেন্দ্র পরিচয়, 'প্রবাসী' কলকাতা, শ্রাবণ-১৩২৯ ।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপধ্যায় : সত্যেন স্মরণে, 'ভারতী'-১৩২৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

মোহিতলাল মজুমদার

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলাম